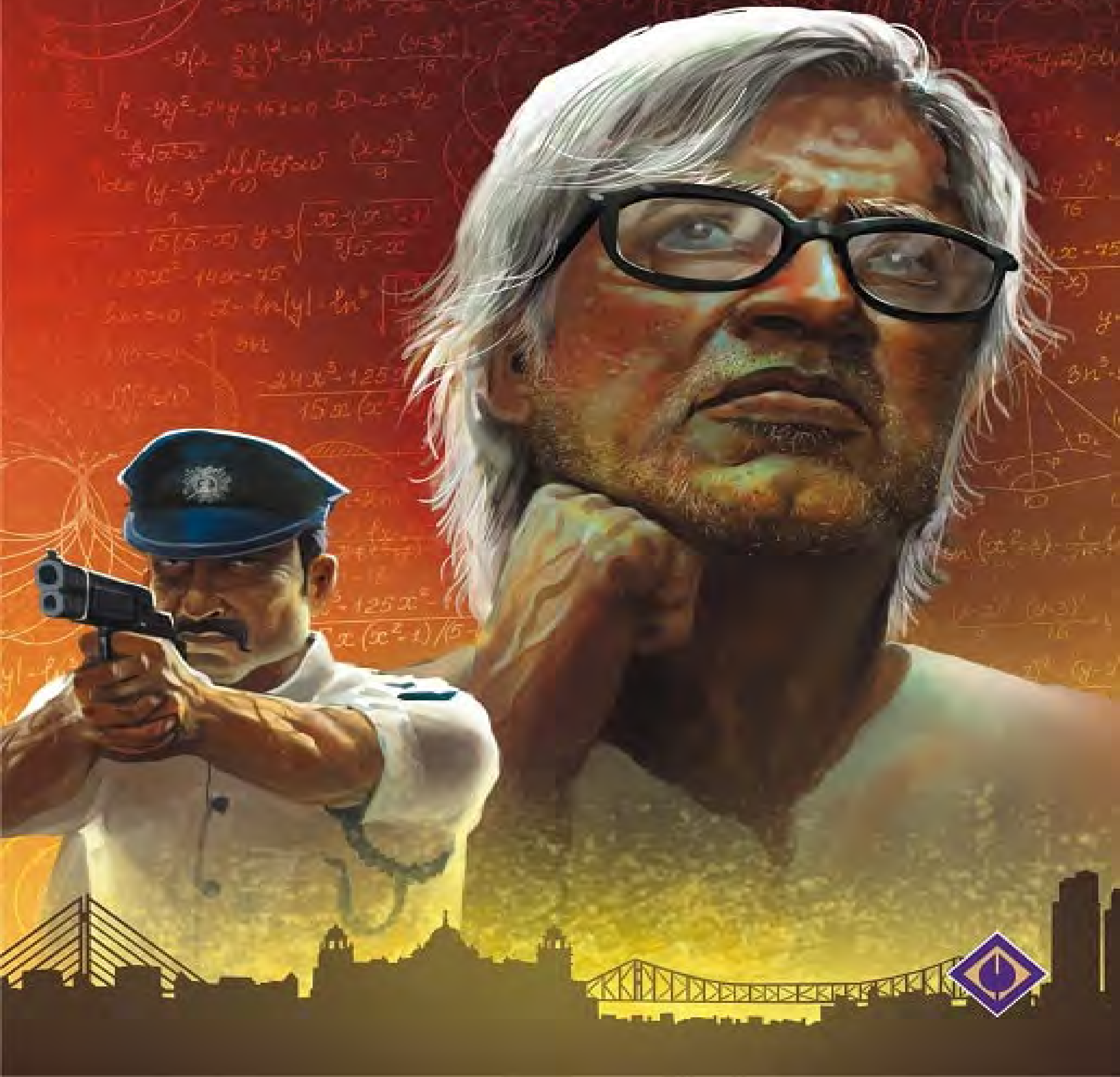
অনীশ দেব

গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র



গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র

অনীশ দেব

গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র



পত্রভারতী®

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী®, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুমন্ত গুহ

GOYENDA A.C.G SAMAGRA
Collection of Detective Stories
by Anish Dev
Published by PATRA BHARATI® 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones +91-033-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-645-8

তরুণ সাহিত্যিক
মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু—

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

কিশোর সাহিত্য
প্রতিঘাত সম্পূর্ণ
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভয়পাতাল
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

বিজ্ঞান। জানা অজানা
পাই নিয়ে রূপকথা
বিজ্ঞানের হরেকরকম
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু

বয়স্ক সাহিত্য
আগুন রঙের বুলেট
ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ
লাশতালাশ
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
বারোটি রহস্য উপন্যাস
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

এসিজি—অশোকচন্দ্র গুপ্ত। ষাট বছর পেরিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধ হুনুর—হুনুরিয়ানা যার শখ। পেশায় ছিলেন অধ্যাপক, এখন নেশায় গোয়েন্দা। এসিজির ন'টি 'রহস্যময়' অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বই—চারটি গল্প, আর পাঁচটি উপন্যাস।

এসিজি চরিত্রের মধ্যে আমার খুব চেনা বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধেয় একজন অধ্যাপকের ছায়া রয়েছে। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়) যখন ছাত্র ছিলাম এবং পরে সেখানে অধ্যাপনা করার সময়ে 'স্যার'-কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর ছায়া কমবেশি প্রভাব ফেলেছে এসিজি-র চরিত্রে।

এসিজিকে নিয়ে আমার প্রথম গল্প 'পাখি ধরা' প্রকাশিত হয়েছিল 'ঝালাপালা'-র পূজাবার্ষিকীতে। তারপর নানা সময়ে আরও তিনটে গল্প প্রকাশিত হয় 'আনন্দমেলা' পত্রিকায়।

পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিশ্বাসঘাতকদের জন্য'—অধুনালুপ্ত 'প্রসাদ' পত্রিকার পুজোসংখ্যায়। তবে তারও কয়েকবছর আগে সেটার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয় 'অপরাধ' পত্রিকার পুজোসংখ্যায়—নাম ছিল 'এই খুনি লীলাময়'।

'এক ইঞ্চির গরমিল' উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রসাদ' পত্রিকায়। তবে মনে নেই, পুজোসংখ্যায় না অন্য কোনও বিশেষ সংখ্যায়।

এরপর 'কিশোর ভারতী'। এই পত্রিকার পুজোসংখ্যায় 'আকাশঘুম' প্রকাশিত হয়। 'দরজা বন্ধ ছিল' উপন্যাসটিও প্রকাশ পায় 'কিশোর ভারতী'-র পুজোসংখ্যায়—সম্ভবত ২০১৮ সালে। এটিই এসিজি চরিত্রকে নিয়ে আপাতত আমার শেষ লেখা। লেখাটি এই প্রথম কোনও বইয়ে জায়গা পেল।

'অন্তরে পাপ ছিল' মাপে উপন্যাস নয়—নেহাতই বড় গল্প। লেখাটি 'দেশ' পত্রিকার গোয়েন্দাকাহিনি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই হল ন'টি লেখার সংক্ষিপ্ত 'ইতিহাস'।

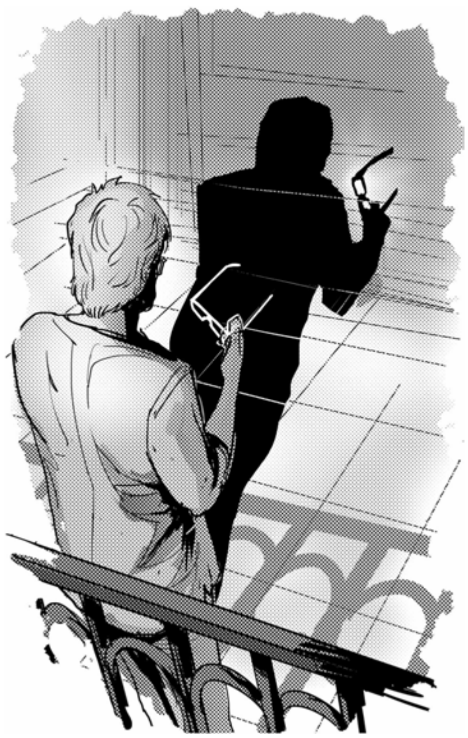
একই চরিত্রকে কেন্দ্র করে নিয়মিত লিখে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই এসিজিকে নিয়ে তথাকথিত কোনও 'সিরিজ' আমি তৈরি করতে পারিনি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা এই ন'টি লেখাকে একসঙ্গে একটি বইয়ে গ্রন্থিত করার সাধ আমার মনে জেগেছিল। বন্ধুবর ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার সেই সাধ পূর্ণ করলেন। ওঁকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই।

আর আপনি, যিনি এই ভূমিকা পড়ছেন, আপনাকে এবার পাঠক হিসেবে এই ন'টি কাহিনির দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ, পাঠক হিসেবে আপনার মতামতই শেষ কথা।

সেই শেষ কথা শোনার জন্যে আমি নতমস্তকে অপেক্ষায় রইলাম।

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সূচিপত্র



সম্পাদিত ও পরিবেশিত বই

সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক
কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প

গল্প

পাখি ধরা





পরনের সাদা ধবধবে পাঞ্জাবির সঙ্গে এক মাথা সাদা ধবধবে চুল একেবারে মিশে গিয়েছিল। বৃদ্ধের শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে অতি-আধুনিক একটা টেপরেকর্ডারের ওপরে। টেপ চলছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম শিসের শব্দ। মিষ্টি এবং কর্কশ সুর। পাখি ডাকছে।

বৃদ্ধ তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। হাতে খাতা-পেনসিল। নোট নিচ্ছেন। কখনও কখনও ঘাড় নাড়াচ্ছেন। আবার কোনও এক ফাঁকে পেনসিল-ধরা হাতে টান মারছেন শুভ্র চুলের গোছায়। তারপরই চশমার কালো ফ্রেম ঠিকঠাক করছেন।

'গুড মর্নিং, গুপ্তাসাব। সক্কালবেলায় নকলি চিড়িয়ার ডাকে কোনও মউজ নেই।'

ফিরে তাকালেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে এসিজি। হাসলেন। সাতসকালে তাঁর এই আস্তানায় হুটহাট করে ঢুকে পড়ে এরকম দোআঁশলা ভাষায় মন্তব্য করতে পারে মাত্র একজনই। ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব। মুখের রেখা কাঠ-কাঠ, চোয়াড়ে, গায়ের রং রোদে পোড়া, চোখ শরীরে বিঁধে যায় যেন, আর পুরুষালি মোটা গোঁফ।

দেখে রঘুপতিকে যতই অপ্রিয় মনে হোক এসিজি ওকে ভীষণ ভালোবাসেন। একসময় এসিজির ছাত্র ছিল ও। কথাবার্তায় রুক্ষ হলে কী হবে, মনটা বড় ভালো। আর কাজ-পাগল। মনে পড়ে, একবার একটা নির্বোধ ওকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিল। ও হাসতে-হাসতে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে তার ডান হাতটা ভেঙে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যার সব কাজই বাঁ-হাতের তার আবার ডাঁয়ে হাতের জরুরত কী?'

খোলা জানলার পাশেই টেবিলে কোকিল-ঘড়ি। ন'টা এখনও বাজেনি। ঘড়ির পাশেই স্টেনলেস স্টিলের 'মোনালিসা' ফ্লাস্ক। রঘুপতি জানে, ভোরবেলায় উঠেই এসিজি নিজের হাতে ফ্লাস্কভর্তি কফি করে রাখেন। কারণ, এখানে এখনও পরের হাত বলে কিছু নেই। স্ত্রী মালিনী চলে গেছেন প্রায় এক যুগ আগে। আর একমাত্র মেয়ে ঊর্মিলারও বিয়ে হয়ে গেছে গত বছর।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত টেপরেকর্ডার বন্ধ করে খাতা-পেনসিল গুছিয়ে রাখলেন তার পাশে। হাসতে-হাসতে বললেন, 'বোসো, রঘুপতি। নকলি চিড়িয়ার ডাকে মউজ না থাকলে কী হবে, আমার ফ্লাস্কের কফিতে থাকতে পারে। আজাকে দেখো।'

ছাপা কাপড়ে আবৃত বেতের চেয়ারে বসল রঘুপতি যাদব। গা এলিয়ে দিল শোয়ার ভঙ্গিতে। হেসে বলল, 'স্যার, পাখিতে কী মজা পান বুঝি না। মাঝে-মাঝে ডাক শুনতে ভালো লাগে। তা বলে দিনভর কিচিরমিচির?'

এসিজি কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিলেন রঘুপতিকে। তারপর ঘরের মেঝেতে সাজিয়ে রাখা বইয়ের কয়েকটা স্তূপকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে আর-একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

সাদা পাজামা টেনে ঠিক করে বললেন, 'তুমিই বা চোর-ডাকাত-খুনে-বদমাসের মধ্যে কী মজা পাও বুঝি না। পাখিরা তার চেয়ে অনেক ভালো।'

রঘুপতি যাদব কফিতে চুমুক দিল কয়েকবার। তারপর সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'গুপ্তাসাব, আপনার জরুরি কাজে ডিস্টার্ব করলাম...।'

এসিজি ঝুঁকে পড়ে রঘুপতির কাঁধ চাপড়ে দিলেন আলতো করে। বললেন, 'যা শুরু করেছি তা এক-আধ দিন পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। অন্তত দু-বছর লাগবে।'

'কী কাজ?' রঘুপতির কৌতূহল হল। কপালে ভাঁজ পড়ে।

এসিজি মাথার চুল টানলেন একবার। তারপর ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'বার্ড কমিউনিকেশন। পাখিদের ভাষা। কোন-কোন পাখি কীরকম ভাষায় কথা বলে তাই বোঝার চেষ্টা করছি। যে-টেপটা বাজাচ্ছিলাম, সেটা গত সপ্তাহে সুন্দরবনের জঙ্গলে টেপ করা। এর মধ্যে রাডি কিংফিশারের আওয়াজ শুনতে পেলে?'

'ব্লাডি কিংফিশার?' রঘুপতি জলদি চুমুক দিয়ে ফেলে কফির কাপে। তারপরই 'উঃ' করে ওঠে। একটু সময় নিয়ে ও বলল, 'স্যার, আমি এদিকে এক ব্লাডি কিংফিশারকে নিয়ে ফেঁসেছি। গত কয়েক বছর ধরে প্রীতম দাস চৌধুরি বহু মছলি পাকড়েছে। কিন্তু আমরা ওকে ফাঁদে ফেলতে পারিনি। মছলি পাকড়েছে আর শটকেছে। সিধা ন'দো গিয়ারা।'

এসিজি বাধা দিয়ে বললেন, 'রঘুপতি, জিভে আগল দাও। বোঝাই যাচ্ছে তুমি ডিসটার্বড, না হলে আমাকে ডিসটার্ব করতে আসতে না। তা এই প্রীতম দাস চৌধুরি লোকটা করেছে কী? খুন করেছে?'

রঘুপতি যাদবের কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাশের ছোট্ট টেবিলে কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, 'এতদিন শুধু ওর খুন করাটাই বাকি ছিল। পরশু সেটা সেরে ফেলেছে।' একটু থেমে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি, খুনটা দাস চৌধুরিই করেছে। কিন্তু কী করে করেছে ধরতে পারছি না। লোকটা গহেরা পানিকা মছলি, গুপ্তাসাব।'

রঘুপতির মুখের দিকে তাকিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত ওর অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তাটা অনুভব করতে পারছিলেন। ছেলেটা সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ওর চাকরিকে। লালবাজার ওর কাছে মন্দির। আর পুলিশি উর্দি ওর গর্ব। কিন্তু প্রীতম দাস চৌধুরি ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

এসিজি কাশলেন। মাথার এক গোছা চুল ধরে টানলেন বারদুয়েক। তারপর বললেন, 'প্যাঁচার মতন মুখ করে বসে থেকো না, রঘুপতি। আমি এখনও মরে যাইনি। আই নো হাউ টু ক্যাচ আ রেয়ার বার্ড।' হাসলেন এসিজি, বললেন, 'একটা কথা তোমাকে তো সবসময় বলি। চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফও আমার নেই। এছাড়া দেবেন্দ্রবিজয়, হুকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের ছিটেফোঁটা গুণও নেই আমার মধ্যে। তবে আমি, সাধারণ একজন গোয়েন্দা, মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। সুতরাং, মনে হয় প্রীতম দাস চৌধুরির ধাঁধা আমি সলভ করতে পারব।'

কোকিল-ঘড়িতে সুরেলা শব্দে ন'টা বাজল।

রঘুপতি দেখল এসিজির দিকে। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে বৃদ্ধের মাথায়। সাদা চুলের গুচ্ছ চকচক করছে রুপোর মতো। পাখি-পাগল এই মানুষটা একসময়ে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করতেন। এখন পাখি আর অপরাধী নিয়ে গবেষণা করেন। বলেন, বার্ড ওয়াচিং আর ম্যান ওয়াচিং-এ নাকি অনেকটাই মিল। ঈশ্বর জানেন!

রঘুপতি একটু সময় নিয়ে মনে-মনে গল্পটা গুছিয়ে নিল। তারপর শুরু করল, 'দাস চৌধুরির নাম আপনি হয়তো শোনেননি, তবে লোকটা বহত সাল ধরেই দু'নম্বরি কারবার চালাচ্ছে। যেমন, প্রথমে করত কালোয়ারি, চোরাই মাল-টাল খরিদ করত। তারপর ধরমতল্লায় একটা হোটেল খুলে বসল। ছোট কিন্তু টিপটপ হোটেল। নাম, ''মুসাফির''। তো হোটেল খোলার পর লোকটা স্মাগলিং-এর বেওসায় নেমে পড়ল। তারপর শুনেছি গত বছর থেকে নাকি ড্রাগের লাইনে পা দিয়েছে।'

একটু ফাঁক পেতেই অশোকচন্দ্র গুপ্ত হাত তুললেন, বললেন, 'রঘুপতি, ডিয়ারবয়, তোমার রাজধানী এক্সপ্রেসের গতি কিছুটা কমাতে পারলে ভালো হয়। তোমাদের রেকর্ডে দাস চৌধুরির নাম নেই?'

রঘুপতি বলল, 'আছে। তবে সে সবই ছোটামোটা লাফড়া। সবক'টা কেসেই জামিনে ছুট হয়ে গেছে। তা ছাড়া প্রীতম পয়সাওয়ালা রইস। সবসময় এক নম্বর ল'ইয়ার দাঁড় করায়।'

এসিজি চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলেন কফির ফ্লাস্কের দিকে। নিজের জন্য এক কাপ ঢাললেন। রঘুপতির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করতে ও মাথা নাড়াল। বিরক্তভাবে বলল, 'স্যার, আমি দু-রাত্তির ধরে ঘুমোতে পারছি না। আমার জান জ্বলে যাচ্ছে। প্রীতমকে ধরার এটাই সুনহরি মওকা। কিন্তু যদি এবারেও পিছলে বেরিয়ে যায় তা হলে—।'

'টেক ইট ইজি, রঘুপতি,' কফির কাপ হাতে নিয়ে এসিজি ফিরে এলেন। চেয়ারে গুছিয়ে বসে কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মাথা গরম না করে গল্পটা ধীরে-ধীরে বলো। গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাও, বলো।'

'মুসাফিরের চারতলাটা প্রীতম নিজে ব্যবহার করে। তিনটে ঘর আছে সেখানে। গত পরশু, সকালে ওর দুই দোস্ত মুকেশ আর সুদেশ তেওয়ারি হোটেলে আসে। মুকেশ আর সুদেশ দু-ভাই। তবে ওরা দুজনেই প্রীতমের বিজনেস পার্টনার। কীসের বিজনেস তা বলতে পারব না। তবে পাঁচ-ছ'রকম তো হবেই। তার মধ্যে কয়েকটা ন্যাচারালি কালা ধান্দা।'

এসিজি চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিলেন। হাতের কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। হঠাৎই চোখ খুলে বললেন, 'লোকগুলোর ছবি এনেছ তুমি?'

পাশেই একটা খালি চেয়ারে একটা মোটা ফোল্ডার পড়ে ছিল। সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রঘুপতি। এসিজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'শুধু ফটো কেন, এখানে ওই তিনজনের পুরা দাস্তান পেয়ে যাবেন। এ ছাড়া স্পটের নানান ফটোগ্রাফ আর রিপোর্টও আছে।'

এসিজি ফোল্ডারটা নিলেন। তাঁর চোখ সজাগ হল। শীর্ণ শরীর ঋজু হল। কয়েক চুমুকে কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলেন। তারপর পাখি-দেখা তীক্ষ্ণ চোখে ফোল্ডারের কাগজপত্র উলটেপালটে দেখতে শুরু করলেন। তাঁর চশমার কাচ চকচক করছিল।

প্রথমেই প্রীতম দাস চৌধুরির ছবি। বছর পয়তাল্লিশের মোটাসোটা মানুষ। গায়ের রঙ কালো। কপাল মাথার দিকে উঠে গেছে অনেকটা। চোখ দুটো কুতকুতে, শয়তানের নজর যেন তাতে। চোখের নিচে চর্বির থাক। বেপরোয়া অত্যাচারের চিহ্ন। গলায় সোনার সরু চেন।

ছবির নিচেই রয়েছে প্রীতমের দাস্তান বা জীবনী। সেটা খুঁটিয়ে পড়লেন এসিজি। তারপর পাতা উলটালেন।

মুকেশ তেওয়ারি। বয়েস বোধহয় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। রোগা ফরসা চেহারা। চোখেমুখে ভীষণ পরিশ্রমের ছাপ। আর দৃষ্টিতে যেন একটা চাপা জেদ ফুটে বেরোচ্ছে।

ফটোর ওপরে একটা সিলমোহরের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। সেটার কথা রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করতেই ও বলল, 'মুকেশ তেওয়ারিই মারা গেছে গত পরশু। পাতা উলটালেই ওর ডেডবডির ফটো দেখতে পাবেন। এই তসবিরটা আমরা ওর পাসপোর্ট থেকে কপি করেছি।'

এরপর সুদেশ তেওয়ারি। বয়েসে দাদার চেয়ে অন্তত বছর আট-দশের ছোট। চুল খাটো করে ছাঁটা। সরু গোঁফ। চোয়ালের রেখা উদ্ধত। চোখের নজর দাদার মতোই।

ফটো দেখা শেষ করে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বাকি রিপোর্টগুলোয় চোখ বোলাতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎই চোখ তুলে রঘুপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাঃ, তোমার ধৈর্য দেখছি নিতান্ত পলকা।'

রঘুপতি যাদব উশখুশ করছিল। একটু অস্বস্তিবোধ করল।

সেটা লক্ষ করে এসিজি বললেন, 'ওকে রঘুপতি, তুমি গল্পটা বলে যাও। আমার কান মনোযোগ দিয়ে শুনছে।'

রঘুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আগের চেয়ে অনেক নরম গলায় এবং ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করল, 'খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি বিজনেসের ব্যাপারে মাথা বলতে ছিল মুকেশ তেওয়ারিরই। সুদেশ প্রীতমের প্রায় সমান উমরের হওয়ার জন্যে দুজনে বেশিরভাগ সময়টাই ফুর্তিফার্তা করে কাটিয়ে দিত। এবারে বিজনেসের কোনও কনট্র্যাক্ট নিয়ে বোধহয় লাফড়া হয়েছিল। তাতে হোটেলের চাকর-বেয়ারা বহত হল্লাগুল্লা শুনেছে। মুকেশ তেওয়ারিই চিৎকার চেঁচামেচি করছিল বেশি। মাঝে-মধ্যে প্রীতম দাস চৌধুরি ওর গুসসা ঠান্ডা করার কোশিশ করছিল।'

এসিজি ফোল্ডারের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'ঝগড়াটা হয় সন্ধে সাড়ে ছ'টায়?'

রঘুপতি বুঝল গুপ্তাসাব রিপোর্টটা ধেয়ান দিয়েই পড়ছেন। ও শুধু ঘাড় হেলাল। তারপর বলল, 'সে যাই হোক, মুকেশ তেওয়ারি অনেক মেহনতের পর ঠান্ডা হয়। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটার সময় সে মারা যায়। তখন ওর পাশের ঘরে বসে প্রীতম আর সুদেশ গল্প করছিল, আর ভিডিয়োতে কী একটা সিনেমা দেখছিল। হঠাৎই প্রীতম একটা শব্দ শুনতে পায় অন্তত স্টেটমেন্টে সেরকমই বলেছে। শব্দটা অনেকটা নাকি ধামাকার মতো। এই পটকা-ফটকা যেমন হয়। সুদেশ বলেছে, সে কিছু শুনতে পায়নি। অবশ্য বুঝতেই পারছেন, সে হয়তো ঠিক বহাল তবিয়তে ছিল না। চোখে রং ধরে গিয়েছিল। তা আওয়াজটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা দুজনে ছুটে যায় পাশের ঘরে। দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু দরজা কেউ খোলে না। তখন প্রীতম চাবির ফুটোয় নজর দিয়ে দেখে। সুদেশকেও দেখায়। তারপর সুদেশকে বলে, চাবিটা ভেতর থেকে তালার গর্তে ঢোকানো রয়েছে। ইয়ানি অন্দর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়েছে। তারপর চাবিটা আর কেউ খুলে নেয়নি।'

এসিজি শব্দ করে ফোল্ডার বন্ধ করলেন। রেখে দিলেন পাশের টেবিলে। তাঁর মুখে-চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। কপালে চার-পাঁচটা ভাঁজ ফেলে বলে উঠলেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর তারপর?'

রঘুপতি যাদব গালে হাত ঘষল। ঠোঁট উলটে বলল, 'তারপর আর কী, ধাক্কাধাক্কি করে সুদেশ যখন দরজা ভাঙতে যাবে তখন প্রীতম ওকে থামায়। একটা দারুণ মতলব দেয়। কোথা থেকে একটা অখবারের পাতা এনে তার অর্ধেকটা দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর একটা কাঠ দিয়ে চাবির ফুটোর ভেতরে খোঁচা দেয়। ভেতরের চাবিটা শব্দ করে পড়ে যায় নিচে। তখন অখবারের পাতাটা টেনে নিতেই চাবিটা বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। সেটা নিয়ে প্রীতম নিজেই দরজার তালা খোলে। তারপর হুড়মুড় করে দু-মক্কেল একসাথ ঢুকে যায় ঘরের ভেতরে।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত হাসলেন। কফির কাপ নিয়ে চলে গেলেন ফ্লাস্কের কাছে। কফি ঢালতে-ঢালতে শিস দিয়ে উঠলেন। যেন কোনও পাখি ডাকছে। তারপর আবার ফিরে এলেন চেয়ারে, পরপর তিন-চার চুমুক দিলেন কাপে।

এসিজির আচরণ দেখে রঘুপতি যাদব থেমে গিয়েছিল। চোখ বড় করে বলে উঠল, 'স্যার, ম্যায়নে কোই খুশিকি বাত সুনায়া কেয়া?'

'বেশক, ইন্সপেক্টরসাব, বেশক। তবে তুমি থেমো না, প্লিজ কন্টিনিউ।' এসিজির চোখে চাপা কৌতুক।

রঘুপতি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাম কি লীলা রামহি জানে। তো যাই হোক, ওরা দুজনে ঘরে ঢুকে দ্যাখে মুকেশ তেওয়ারি বিছানার কাছে একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছে। ডাঁয়ে হাথে রিভলভার ঝুলছে। আর বুকের বাঁ দিকে গোলি কি নিশান। খতম। ব্যস। তখন প্রীতম দাস চৌধুরি তার দোস্ত সুদেশকে বলে মুকেশ তেওয়ারি সুইসাইড করেছে। বড়ি আফসোস কি বাত। তাতে সুদেশ তেওয়ারি হঠাৎই খেপে যায়। ও বলে, না, ওর দাদা খুন হয়েছে। তারপর ও ঘরের সবক'টা দরওয়াজা আর খিড়কি ভালো করে দেখে। লেকিন সব অন্দরসে বন্ধ। একদম ছিটকিনি লাগানো, গুপ্তাসাব। অন্য কোনও লোক যে মুকেশকে খুন করে হাতে রিভলভার সাজিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে তার কোনও উপায় নেই। কামরার দরওয়াজা-খিড়কি সব অন্দর থেকে পাক্কা বন্ধ ছিল। কিন্তু তাতেও সুদেশ তেওয়ারি বুঝতে চায় না। ও খালি বলে, আমার বড়াভাইকে কেউ সাজিশ করে খুন করেছে। সুইসাইড না-মুমকিন। ইমপসিবল।'

রঘুপতি একটু থামল। এসিজি কফি শেষ করে ফেলেছিলেন। কাপটা রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা খুন হয়েছে বলে সুদেশ তেওয়ারি গোঁ ধরে বসে আছে কেন?'

রঘুপতি হেসে বলল, 'এইখানেই মজা, স্যার। সেদিন বিকেলে মুকেশ তেওয়ারি নাকি ভাইকে বলেছিল, আগামীকাল অর্থাৎ, গতকাল বেওসার কীসব হিসাবকিতাব নিয়ে বসবে। আজকাল হিসেবপত্তরে নাকি উলটা-সিধা গড়বড় দেখা যাচ্ছে। এর জন্যে মুকেশ পুরোপুরি প্রীতমকেই দায়ী করেছে। এ ছাড়া দু-ভাইয়ে মিলে কাল সকালে ওদের এক বুড়ি মওসিকে বড়বাজারে দেখতে যাবে প্ল্যান করেছিল। তারপর তো সাড়ে

ছ'টায় কাজিয়া। আর সাড়ে বারোটায় মুকেশ তেওয়ারির খেল খতম। এই সব কারণেই সুদেশ কিছুতেই মানতে পারছে না ওর দাদা খুদকুশি মানে, সুইসাইড করেছে।'

রঘুপতি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। হাত-পা নেড়েচেড়ে আড়মোড়া ভাঙল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'রিভলভারটা কার?'

রঘুপতি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধকে। বলল, 'কার আবার, মুকেশ তেওয়ারির! রিপোর্টে লেখা আছে।'

'গুলি কি ক্লোজ রেঞ্জ থেকে করা হয়েছিল? ব্যালিস্টিক রিপোর্ট কী বলছে?'

'ক্লোজ রেঞ্জ। কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু সুদেশ তেওয়ারি হইচই শুরু করে দিয়েছে। আর প্রীতম দাস চৌধুরির দাঁত বের করা হাসি আমি সইতে পারছি না। ষোলো আনা মোটিভ রয়েছে, কিন্তু কোনও সবুত নেই।' বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতে ঘুষি মারল রঘুপতি যাদব। বলল, 'শয়তানটাকে অন্দর করতে পারলে মউজ করে পালিশ লাগাব। কিন্তু...।'

'আঃ, রঘুপতি।' অশোকচন্দ্র স্নেহের সুরে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠান্ডা হয়ে বোসো দেখি। তোমাকে আমি প্রমাণ-টমান সব জোগাড় করার মতলব বাতলে দিচ্ছি।'

রঘুপতি যাদব চেয়ারে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু তার মুখে অসন্তোষের ছোঁয়া লেগে রইল।

এসিজি বললেন, 'সুদেশ কি গুলির আওয়াজ শুনেছিল?'

'ও তো বলছে, না শোনেনি।'

'হোটেলের আর কেউ কিছু শুনেছে?'

একটু ভেবে রঘুপতি বলল, 'সুলেমান নামে এক বেয়ারা কসম খেয়ে বলছে রাত বারোটা নাগাদ ও একটা ধামাকার শব্দ শুনেছে। কিন্তু সন্ধের পর সুলেমান একটু-আধটু নেশা করে। তো কে জানে আসলি নকশা কী!'

এসিজি নড়েচড়ে বসলেন। সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন দু-বার। বললেন, 'রঘুপতি তুমি ঠিকই বলেছ। মুকেশ তেওয়ারি খুন হয়েছে। আর, ওকে খুন করেছে প্রীতম দাস চৌধুরি।'

রঘুপতি যাদব শিরদাঁড়া টানটান করে বসল। জিজ্ঞাসা করল, 'লেকিন ক্যায়সে, স্যার? দরওয়াজা-খিড়কি সব তো অন্দরসে বনধ ছিল!'

এসিজি হেসে বললেন : 'সেটাই তো বন্ধ ঘরের রহস্যের মজা, রঘুপতি। তবে এটুকু তোমাকে বলে রাখি, মুকেশ তেওয়ারিকে গুলি করা হয়েছে বারোটা নাগাদ। তোমার সুলেমানের কথাই বোধহয় ঠিক। খোঁজ করে দেখো, ওই সময়ে প্রীতম দাস চৌধুরি বন্ধুবর সুদেশকে ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হয়েছিল কিনা। তা ছাড়া আমার ধারণা, গুলি করার সময়ে সে হয়তো রিভলভারের মুখে চাদর-টাদর কিছু চাপা দিয়ে থাকবে। তাতে গুলির আওয়াজটা অনেক ভোঁতা শোনাবে। তোমার কাজ হবে সেই দাগি চাদরটা উদ্ধার করা। হয় ওটা হোটেলের স্টোররুমে আছে, নইলে প্রীতম গুঁজে দিয়েছে কোনও উনুনে।'

রঘুপতি অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'খুন করার পরে ও কী করল। সেটা ভি বলুন।'

'বলছি।' এসিজি একটু দম নিয়ে বললেন, 'ঘরের জানলাগুলো ঝটপট বন্ধ করে দিল প্রীতম। তারপর দরজার ভেতর দিকের চাবির গর্তে এমন একটা চাবি ঢুকিয়ে দিল যার মাথাটাই কাটা। অর্থাৎ, তালা খোলার জন্যে চাবির যে-অংশটা সবচেয়ে জরুরি সেইটুকুই কেটে বাদ দেওয়া। এই অকেজো চাবিটা দরজার ভেতর দিকে লাগিয়ে প্রীতম বাইরে এসে দরজা টেনে দরজা লক করে দেয় বাইরে থেকেই। হোটেলের মালিক হওয়ার সুবাদে প্রীতমের কাছে মুকেশের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয়ই ছিল।'

'সে যাই হোক, জলদি কাজ সেরে প্রীতম ফিরে এল সুদেশের কাছে। এসে এতক্ষণ গরহাজির থাকার জন্যে যা হোক একটা বাহানা শোনাল। তারপর সাড়ে বারোটা নাগাদ মিথ্যে বলল যে, সে একটা তোমার ভাষায়, ধামাকার শব্দ শুনতে পেয়েছে। তখন সে জোর করেই সুদেশকে সঙ্গে নিয়ে মুকেশের ঘরের দরজায় হাজির হয়। ওকে সাক্ষী মানার জন্যে ভেতর দিকে লাগানো অকেজো চাবিটা ওকে দেখায়। এমনিতে ওরকম

ভাবে তালায় চাবি ঢোকানো থাকলে বাইরে থেকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খোলা মুশকিল। তাই প্রীতম খবরের কাগজ পেতে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে অত সব কাণ্ড করেছে।'

এসিজি থামতেই রঘুপতি বলল, 'কিন্তু যে-চাবিটা অখবারের পাতা দিয়ে প্রীতম বাইরে বের করে নিয়ে এল সেটা তো ফালতু! তা হলে ওই চাবি দিয়ে দরজা খুলে গেল কী করে, স্যার?'

হাসলেন এসিজি। বললেন, 'একে বাংলায় বলে হাতসাফাই, রঘুপতি। সুদেশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে এত কষ্ট করে বের করে আনা অকেজো চাবিটা বোধহয় আসল চাবির সঙ্গে পালটে নিয়েছিল প্রীতম। আসল চাবিটা ওর পকেটেই ছিল হয়তো। ব্যস, তারপর আর কী!'

রঘুপতি উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে ফোল্ডারটা তুলে নিল টেবিল থেকে।

অশোকচন্দ্র গুপ্তও উঠে দাঁড়ালেন। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'রঘুপতি, এবারে কী-কী জিনিস খুঁজে বের করতে হবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তার মধ্যে আসল হচ্ছে ওই মাথা কাটা চাবিটা। আর খোঁজ করে দ্যাখো, কোনও চাবিওয়ালা সেইদিন সন্ধেবেলা ''মুসাফির'' হোটেলে এসেছিল কিনা। অবশ্য চাবি কাটাকাটির কাজটা প্রীতম দাস চৌধুরি নিজেও করে থাকতে পারে। সাড়ে ছ'টা থেকে বারোটা, অন্তত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়। পেয়েছিল লোকটা।'

'থ্যাংক য়ু, স্যার,' বলে বড়-বড় পা ফেলে চলে যাচ্ছিল রঘুপতি, ওকে থামালেন এসিজি।

'একটা কথা, রঘুপতি। আমি তো শুধু, থিয়োরি বাতলে দিলাম। বাস্তবে সেটা কতটা মিলবে জানি না। কে জানে, প্রীতম দাস চৌধুরি হয়তো সত্যিই মুকেশ তেওয়ারিকে খুন করেনি...।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'সে ভার আপনি আমার ওপরে ছেড়ে দিন। কালই আপনাকে ফোন করে থিয়োরির রেজাল্ট জানিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। লেকিন, গুপ্তাসাব, কী করে আপনি এই থিয়োরির আইডিয়া পেলেন? ইট ইজ একসিলেন্ট।'

অশোকচন্দ্র চুলের গোছায় টান মারলেন। হেসে বললেন, 'জন ডিকসন কার, রঘুপতি, জন ডিকসন কার। এই ভদ্রলোক জন ডিকসন কার আর কার্টার ডিকসন, এই দুটো নামে সারাটা জীবন শুধু বন্ধ ঘরের রহস্য আর অসম্ভব সমস্যা নিয়ে কিতাব লিখে গেছেন। সুতরাং, যখনই আমি কোনও ক্লোজড রুম প্রবলেম পাই তখনই জন ডিকসন কারের মতো করে ভাবতে চেষ্টা করি। তবে সব সময় যে পারি তা নয়...।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'আপনাকে বিনয় মানায় না। জন ডিকসন কারের চেয়েও আপনি জাদা অকলমন্দ। এগেইন আ বিগ থ্যাংকস, স্যার। গুড বাই।'

রঘুপতি যাদব চলে গেল হনহনিয়ে। অশোকচন্দ্র আবার টেপরেকর্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেপ চালু করলেন। নাম-না-জানা পাখিরা আবার মিষ্টি সুরে ডাকতে শুরু করল। এসিজি তখন জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখছিলেন।

মুদ্রারাক্ষস





ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত ভীষণ মনোযোগ দিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোটটা দেখছিলেন।

নোটটা ভারী অদ্ভুত। আর পাঁচটা নোটের সঙ্গে বিচিত্র দুটো তফাত।

প্রথমত, নোটের যে-দিকে ৫০ সংখ্যাটা ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, তার ডান পাশে অশোকস্তম্ভের নিচে 'সত্যমেব জয়তে' কথাটা লেখা নেই। আর দ্বিতীয় আশ্চর্য হল, নোটটার উলটোপিঠে পার্লামেন্ট ভবনের যে-ছবি আছে, তার ছাদে শুধু পতাকাদণ্ডটি দাঁড় করানো রয়েছে, জাতীয় পতাকা উধাও।

একটু দূরে দাঁড়ানো বছর পয়তাল্লিশের বেঁটে-খাটো চেহারার স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক অশোকচন্দ্র গুপ্তের কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'সাধারণত পঞ্চাশ টাকার যেসব নোট বাজারে পাওয়া যায় তাতে ''সত্যমেব জয়তে'' কথাটাও পাবেন, আর উলটোদিকে পার্লামেন্ট ভবনের মাথায় ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে ফ্ল্যাগটাও দেখতে পাবেন।'

অথচ এই নোটটার ফ্ল্যাগ উধাও! তা ছাড়া নোটটায় অশোকস্তম্ভের দিকটার রং কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি—নোটটাকে তুলে ধরলেন ঘরের খোলা জানলার দিকে। আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওটাকে।

এইবার কথা বলল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব, 'না, স্যার, যা ভাবছেন তা নয়। এই নোটটা জাল নয়, একেবারে আসলি।'

রঘুপতি যাদব একসময়ে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে এসিজির ছাত্র ছিল। এসিজি তখন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করতেন।

তারপর জীবনের নানা পথ ঘুরে রঘুপতি যাদব কীভাবে যেন লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াডে ইন্সপেক্টর হয়ে গেছে। আর অশোকচন্দ্র গুপ্ত বয়সে পঁয়ষট্টির ঘর পেরিয়েও তাঁর গোয়েন্দাগিরির শখ ছাড়তে পারেননি।

এসিজি নোটের নম্বরটা দেখলেন : ২ সিবি ৫৪৭৫৪১। গভর্নরের জায়গায় ইংরেজি আর হিন্দিতে সই করেছেন কে. আর. পুরি।

রঘুপতি ঠিকই বলেছে, নোটটা জালনোট নয়। অথচ কী বিচিত্র!

'জয়দেববাবু...' মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন অশোকচন্দ্র, বললেন, 'এটাকে কি রেয়ার নোট বলা যায়?'

ভদ্রলোকের নাম জয়দেব সরকার। থাকেন টালাপার্কের কাছে। কাগজের ব্যবসা করেন। তবে খুব অল্প বয়েস থেকেই তাঁর রেয়ার কয়েন আর নোটের দিকে ঝোঁক। এ-সম্পর্কে অনেক জানেন। অন্তত রঘুপতি যাদব সেরকমই জানিয়েছে এসিজিকে।

আর যদি তা সত্যি না হত, তা হলে সকাল ন'টায় জয়দেববাবুকে বাড়ি থেকে তুলে এসিজির বাড়িতে নিশ্চয়ই সে নিয়ে আসত না।

জয়দেব সরকার সামান্য হেসে বললেন, 'তা যৎসামান্য রেয়ার বইকি। এ নোট আপনি সহজে খুঁজে পাবেন না।'

এসিজি নোটটা জয়দেব সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিভে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলেন। ফ্ল্যাটের খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-পাঁচ সেকেন্ড। তারপর রঘুপতিকে লক্ষ করে বললেন, 'মাই ডিয়ার রঘুপতি, জয়দেববাবুর হেল্প পেলে আর কোনও চিন্তা নেই। তোমার মার্ডারার একেবারে সোজা ক্যাচ কট কট।'

'এসিজি, প্লিজ, মজাক করবেন না। বলরাম চৌধুরির মার্ডার কেস আর-এক উইকের মধ্যে সলভ করতে না পারলে আমার পজিশন ঢিলে হয়ে যাবে।'

এসিজি একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেটে জম্পেশ করে টান দিয়ে জয়দেব সরকারকে বললেন, 'আপনারা বসুন একটু কফি খান।' তারপর নিজেই এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

রঘুপতি এসিজিকে কমদিন চেনে না। প্রাক্তন স্যারের শ্যামবাজারের এই ফ্ল্যাটে সে মোটেই নতুন নয়। এসিজির স্ত্রী কিডনির সমস্যায় কাবু হয়ে আকাশের তারা হয়ে গেছেন প্রায় দশ বছর। আর একমাত্র মেয়ে ঊর্মিলার বিয়ে হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে এই সাদা চুল বৃদ্ধ মানুষটিই এই ফ্ল্যাটে একা-একা থাকেন। দিনরাত মেতে থাকেন পাখি আর পাখির ডাকের রহস্য নিয়ে। এ ছাড়া রহস্য-গোয়েন্দা কাহিনির পোকা। সেই কবে থেকে ওই রসে ডুব দিয়ে চুপটি করে বসে আছেন, এখনও মাথা তোলেননি।

ফাইফরমাসের একটা বাচ্চা ছেলে বিশু আর রান্নার একজন ঠিকে লোক নিয়ে দিব্যি আছেন এসিজি। মাঝে-মাঝে স্যারের এই জীবনকে হিংসে করে রঘুপতি যাদব। পড়াশোনা, সিগারেট, আর কফির নেশায় বেশ মেতে আছেন রোগা লম্বা মানুষটি।

রঘুপতি যা ভেবেছিল তাই। কফির ফ্লাস্ক আর তিনটে কাপ হাতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এসিজি। রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, এই নাও, আমাদের জন্যে কফি ঢালো আর তুমিও নাও।'

তিনটে কাপ আর ফ্লাস্ক পড়ার টেবিলের কাছাকাছি একটা টি-টেবিলে রেখে এতক্ষণ ধরে ঠোঁটে ঝোলানো জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিলেন এসিজি। একটা চেয়ার টেনে বসলেন ওদের কাছাকাছি। তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'রঘুপতি, কাল তোমার টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে আমার মাথা ঘুরছে। কেন জানো?

তোমার যে-কয়েকটা স্পেশাল কথা আমার কানে লেগে আছে সেগুলো এইরকম : ফেমাস বিজনেসম্যান বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন, ওঁর বড় ছেলে বিশাল পলিটিক্যাল লিডার, লক্ষ কোটি টাকা দামের রেয়ার কয়েন, আর সবার ওপরে ক্লোজড রুম প্রবলেম—বন্ধ ঘরের রহস্য।' দরাজ গলায় হাসলেন অশোকচন্দ্র : 'বলো, মাথা ঘুরবে কিনা?'

রঘুপতি যাদব হেসে বলল, 'স্যার, এতেই থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেল! তো আমার হালত কীরকম একবার ভেবে দেখুন—।'

এসিজি কথায়-কথায় প্রায়ই নিজেকে থিঙ্কিং মেশিন বলেন। আর ব্যাপারটা বোঝাতে আঙুল দিয়ে সাদা চুলে ঢাকা মাথায় টোকা মারেন।

রঘুপতি কফি ঢালার কাজ শেষ করতেই একটা কাপ তুলে নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে এসিজি বললেন, 'রঘুপতি, জয়দেববাবুকে নিয়ে আমরা স্পটে যাওয়ার আগে তুমি ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে আমাদের শোনাবে? অবশ্য আজকের আনন্দবাজার আর টেলিগ্রাফ আমি পড়েছি। জয়দেববাবুও খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

জয়দেব সরকার শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। এসিজির প্রশ্নে তাড়াহুড়ো করে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়েছি। ওই রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা ছিল বলেই একটু ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়েছি।'

রঘুপতি ঝটপট চুমুক দিয়ে কফির কাপ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ করে দিল। কাঁচা-পাকা গোঁফে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল।

'আজ শুক্রবার। বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন সোমবার দিন দুপুরে। উনি চৌধুরি ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিক ছিলেন। ওঁর ব্যবসার অ্যানুয়াল টার্নওভার প্রায় তিরিশ কোটি টাকা। ব্যবসা ছাড়া ভদ্রলোকের তেমন কোনও শখ ছিল না। লেকিন রিসেন্টলি নাকি পুরোনো নোট আর কয়েনের দিকে ঝোঁক গিয়েছিল।

'বলরাম চৌধুরির বয়েস করিব সত্তর-বাহাত্তর, ওয়াইফ অ্যাবাউট চার বছর আগে মারা গেছেন, তবে জানদার আদমি ছিলেন। ওঁর দু-ছেলে। বড়জন তো মোটামুটি নামি পলিটিক্যাল লিডার। লাস্ট ইলেকশানে জেতার পর অল্পের জন্যে মিনিস্টার হতে পারেননি। নাম শুনলে আপনি হয়তো চিনতে পারবেন, স্যার। সতীনাথ চৌধুরি।'

এসিজি মন দিয়ে রঘুপতি যাদবের কথা শুনেছিলেন আর মাঝে-মাঝে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছিলেন। প্রাক্তন ছাত্রের কথায় হাত বাড়ালেন নিজের বই-আর-কাগজপত্র-ছড়ানো অগোছালো টেবিলের

দিকে। সেখানে একটা রুবিক কিউব পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে লাল-নীল-হলদে-সবুজ খুদে কিউবগুলোকে কয়েকটা মোচড় দিলেন। রুবিক কিউবের নকশা বদলে গেল। ওটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান হাতে ঠোঁটের সিগারেট নামিয়ে টি-টেবিলে রাখা একটা অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লেন। তারপর হেসে বললেন, 'সরি, রঘুপতি। আমার কাছে যেসব ইনফরমেশান জরুরি নয় সেগুলো আমি মাথায় রাখি না। বলরাম চৌধুরি, চৌধুরি ইন্ডাস্ট্রিজ, সতীনাথ চৌধুরি এসব নামের চেয়ে কোনান ডয়েলের মিস্টার শার্লক হোমস, কিংবা রুথ রেন্ডেলের ইন্সপেক্টর ওয়েক্সফোর্ড আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট। যাকগে, তুমি বলে যাও—।'

জয়দেব সরকার এই দুটি মানুষকে লক্ষ করছিলেন। ওঁদের কথাবার্তা শুনতে তাঁর খারাপ লাগছিল না। একজন বন্ধুর মারফত ইন্সপেক্টর যাদব গতকাল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। অনেক আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, কোনও ভয় নেই। একটা মার্ডারের ব্যাপারে রেয়ার কয়েনের বিষয়ে কিছু মতামত দরকার। তাতে তদন্তের কাজে অনেকটাই সাহায্য হবে।

তাই আজকের দিনটা জয়দেব সরকার ছুটি নিয়েছেন ব্যবসা থেকে। খুব কম বয়েস থেকে ব্যবসায় ঢুকেছেন, ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন, বড় করেছেন। সেই সঙ্গে বয়েসটাও একটু-একটু করে বেড়েছে। বিয়ে-থা করা হয়ে ওঠেনি। তবে রেয়ার কয়েন আর নোটের নেশায় ডুবে গেছেন। আর নেশার টানেই আজ এই অদ্ভুত বৃদ্ধের বাড়িতে ছুটে এসেছেন ইন্সপেক্টর যাদবের সঙ্গে। আসার সময় পকেটে করে বেশ কিছু জিনিসও নিয়ে এসেছেন, যদি কোনও কারণে দরকার পড়ে।

রঘুপতি যাদব ঠোঁট উলটে হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যার মানে অনেকটা 'রামজীর লীলা রামজীই জানে' গোছের। তারপর আবার বলতে শুরু করল।

'বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে, ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে, একতলায় নিজের বেডরুমে। ওঁর মুখের ওপরে বালিশ চেপে ধরেছিল মার্ডারার। বালিশে থোড়াসা ব্লাডও লেগেছে। কিন্তু খুনির সঙ্গে সেরকম লড়াই হয়নি। মানে, বাড়ির কেউ কোনও শব্দ শুনতে পায়নি। তবে বাড়িটা বেশ বড় সঙ্গে বাগানও আছে। তা ছাড়া বাড়ির সবাই তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের ঘুম লাগিয়েছে।'

'বাড়িতে তখন কে-কে ছিল?' প্রশ্নটা করে শেষ-হয়ে-যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন এসিজি।

'প্রায় সবাই। কারণ, বলরামবাবুর দু-ছেলের কেউই নোকরি করেন না। বড়জনের কথা তো একটু আগেই বলেছি। আর ছোটজন, মণিনাথ চৌধুরি, গানবাজনা-পাগল মানুষ। বাবার ব্যবসায় দুজনের কেউই বসেন না। তবে দুজনেই ফ্যামিলি ম্যান। বড়ছেলের একটি ছেলে আছে, কুন্তল, ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওর পুজোর হলিডে চলছে। তা সেদিন বাড়িতে সবাই ছিল। মণিনাথ গানবাজনা করছিলেন। ওঁর এক গানের ওস্তাদ সেদিন ছিল ওঁর সঙ্গে। ওস্তাদের নাম অশোক জানা। রোগা, কালো, পান-চিবোনো চেহারা। ড্রেস দেখে গানের ওস্তাদ বলে মনে হলেও চেহারা দেখে সন্দেহ হয়। মনে হয়, চ্যাংড়া, লাফাঙ্গা, মাওয়ালি। মাঝে-মাঝেই থেকে যায় চৌধুরিদের বাড়িতে।'

'বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ওদের বাড়ির ঠিকে কাজের বউ সুখীর মা বাগিচায় রোদে ছড়ানো জামাকাপড় তুলছিল। তখনই সে জানলা দিয়ে দেখতে পায় বড়বাবু কেমন পিকিউলিয়ার স্টাইলে বিস্তারায় শুয়ে আছেন। সুখীর মা গিয়ে চেঁচামেচি করতে সবাই এসে দরওয়াজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। এই হচ্ছে ব্যাপার।'

কথা থামিয়ে কিছু একটা শোনার প্রত্যাশায় রঘুপতি ওর স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বলরামবাবুর ঘরের জানজায় গ্রিল বসানো আছে নিশ্চয়ই?'

রঘুপতি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতে চাইল। তারপর বলল : 'সেইজন্যেই তো ক্লোজড রুম প্রবলেম। আর সতীনাথ চৌধুরি এই কেসটা নিয়ে ভীষণ পলিটিক্যাল প্রেসার তৈরি করেছেন। তাই তো লালবাজারকে নাক

গলাতে হয়েছে। এখন আপনি যা করার করুন। আই ওয়ান্ট দ্য ব্লাডি মার্ডারার।'

রঘুপতি কখনওই খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল না। কিন্তু ভীষণ সৎ আর পরিশ্রমী। তাই এসিজি বরাবরই ওকে পছন্দ করতেন, এখনও করেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এসিজি একটা অসহায় ভাব খুঁজে পেলেন। ওর মুখের বসন্তের দাগ কিংবা ছোটো করে ছাঁটা চুল সেই ভাব লুকোতে পারেনি।

'আর রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা?' এতক্ষণ চুপ করে শোনার পর জয়দেব সরকার আমতা-আমতা করে প্রশ্ন করলেন। জানলা দিয়ে আসা আলো ওঁর কপালের ডান দিকে হাইলাইট তৈরি করেছে।

রঘুপতি অস্পষ্ট একটা শব্দ করে তারপর বলল, 'ওটা স্পটে গেলেই বুঝতে পারবেন। বডি রিমুভ করে ঘরটা লক করে রাখা হয়েছিল। ঘরের সব জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। আমি চাবি নিয়ে এসেছি। আর লোকাল থানাকেও ইনফর্ম করা আছে যে, আমরা স্পটে আজ সকলে যাব। কিঁউ, গুপ্তাসাব, অব চঁলে?' শেষ প্রশ্নটা চোখ বুজে সিগারেটে টান দেওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি-পরা মানুষটিকে লক্ষ্য করে।

চোখ খুললেন এসিজি। বললেন, 'চলো, যাওয়া যাক। ব্যাপারটা একটু-একটু বোঝা গেল।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে-উঠতে অশোকচন্দ্র বললেন, 'রঘুপতি, একটা ব্যাপার কেমন মজার দ্যাখো। যে-ঘরে ওরা সবাই গায়ের জোরে দরজা ভেঙে ঢুকেছে, সেই ঘর থেকে খুনি পালিয়েছে বুদ্ধির জোরে।' হাসলেন বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন।

রঘুপতি পালটা হেসে ডান হাতের মাসল ফুলিয়ে বলল, 'এখন তো আমার গায়ের জোর আর আপনার বুদ্ধির জোর, দুটো নিয়েই আমরা যাচ্ছি। অব দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু-এ কাতিল মে হ্যায়।'

প্রাক্তন ছাত্রের কথা শুনে প্রাক্তন স্যার হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর সেই আচমকা হাসিতে তাঁর ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ে গেল তিনি চেষ্টা করেও সেটা সামলাতে পারলেন না।

সল্টলেক জায়গাটা কলকাতার কত কাছে, অথচ কত দূরের বলে মনে হয়। কলকাতা শহরের যানজট, গাড়ির হর্নের তীব্র শব্দ, কালো ধোঁয়া, ভিড়, চিৎকার, কিছুই এখানে নেই। তা ছাড়া বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই কেমন চোখ জুড়িয়ে যায়।

বলরাম চৌধুরির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এই কথাটাই মনে হচ্ছিল এসিজি-র।

প্রকাণ্ড মাপের বাড়ি। নাম 'চৌধুরি ভিলা'। সাদা আর বাদামি রং। বড় লোহার গেটের ওপাশে বড় উঠোন। তার একপাশে সারি-সারি টবে ফুলগাছ। আর বাঁদিকে বেশ বড় মাপের বাগান।

বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ফরসা মতন একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল বাগানের পাশ দিয়ে। তার নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় গামছা দিয়ে তৈরি পাগড়ি। গায়ে মেরুন রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে সরু পাজামা আর কোমরে বেল্ট।

বাচ্চাটা 'সাবু! সাবু!' বলে চিৎকার করছিল। এসিজিদের দেখামাত্রই চিৎকার করে উঠল, 'সাবু! জলদি এসো। দেখে যাও কারা এসেছে।'

রঘুপতি যাদব অশোকচন্দ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'কুন্তল।'

এসিজি ইশারায় ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

কুন্তল বেশ স্মার্টভাবে উত্তর দিল, 'এখন আমি চাচা চৌধুরি।'

এসিজি অবাক হয়ে বললেন, 'চাচা চৌধুরি মানে?'

খিলখিল করে হেসে উঠে কুন্তল বলল : 'এ মা, চাচা চৌধুরির নাম জানে না! চাচা চৌধুরির কমিক্স বই পড়োনি?'

এসিজির অতিকষ্টে মনে পড়ল যে, ম্যাগাজিনের স্টলে এই নামে কমিকস দেখেছেন, এবং সেই 'চৌধুরি' বানানে কোনও উ-কার ছিল না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। সাত-তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন তিনি।'

'জানো, চাচা চৌধুরির বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর!'

এসিজি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাগানের দিক থেকে ছুটে এল আর-একটি ছেলে। বয়েস ষোলো-সতেরো। ময়লা রং। পরনে শুধু একটা হাফ প্যান্ট। পাঁজরা গোনা যাচ্ছে।

'হুকুম করুন, চাচা চৌধুরি' বলতে-বলতে ছুটে আসছিল ছেলেটা। কিন্তু তিনজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর কথা আটকে গেল মাঝপথেই।

'ও হচ্ছে সাবু', নতুন বালকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল কুন্তল।

রঘুপতি বিড়বিড় করে বলল, 'এর নাম বিলু। এ-বাড়িতে ফাইফরমাশের কাজ করে।'

অশোকচন্দ্র কুন্তলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবসময় তোমরা এমনই খেলা করো?'

'না, না। যখন বিলুদার কোনও কাজ থাকে না তখন খেলি।'

'চাচা চৌধুরি আর সাবু সেজে কী করো?'

'সারা বাড়ি আর বাগানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। দেখি কোথাও কোনও বিপদ হচ্ছে কিনা। জানো তো, চাচা চৌধুরি সবার খুব উপকার করে। কাউকে ভয় পায় না। আর সাবুর গায়ে এমন জোর যে, উড়ন্ত এরোপ্লেনকে ধরে আছাড় দিতে পারে...।'

শেষ কথাটা শুনে বিলু সাদা-সাদা দাঁত বের করে সরল হাসি হাসল।

জয়দেব সরকার একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে ফেলে রেখে বাচ্চাদের সঙ্গে এই গালগল্প! এ-গল্প তো পরেও করা যেত!

অধৈর্য হয়ে পড়েছিল রঘুপতিও। ও চাপা গলায় বলল, 'স্যার, গপসপ পরে হবে। আগে চলুন, বলরাম চৌধুরির কামরাটা দেখবেন চলুন।'

অশোকচন্দ্র শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে কুন্তলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রঘুপতির কথায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ওর দিকে তাকালেন মায়ার চোখে। তারপর হেসে বললেন, 'মাই ডিয়ার রঘুপতি, কতবার তোমাকে বলেছি যে, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফও আমার নেই। এছাড়া দেবেন্দ্রবিজয়, হুকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধিও নেই আমার। তবে আমি অতি সাধারণ এক হুনুর মানে, গোয়েন্দা যে মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নেয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোকচন্দ্র কুন্তলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখন চলি, চাচা চৌধুরি। পরে তোমার সঙ্গে আবার গল্প করব।' তারপর রঘুপতিকে বললেন : 'চলো, কোথায় নিয়ে যাবে চলো—।'

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে পৌঁছে গেলেন একটা সুদৃশ্য কাঠের দরজার সামনে। রঘুপতি যাদব কলিংবেলের বোতাম টিপল। কুন্তল আর বিলু দৌড়ে চলে গেল বাগানের দিকে।

এ-বাড়িতে আসার পথে রঘুপতি আরও অনেক খবর দিয়েছে এসিজিকে। প্রত্যেকের জবানবন্দির সারমর্ম জানিয়েছে। এসিজির কিছু এলোমেলো প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে।

অশোকচন্দ্র বেশ বুঝতে পারছিলেন রঘুপতি টেনশনে ভুগছে। ধৈর্য ব্যাপারটা ওর বরাবরই একটু কম। এখন সেটা বোধহয় আরও কয়েক দাগ কমে গেছে।

বলরাম চৌধুরির শোবার ঘরে এসে রঘুপতির টেনশনটা আরও স্পষ্ট হল। ও হাত-পা নেড়ে খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু বলতে শুরু করল। ওর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল একইসঙ্গে।

'গুপ্তাসাব' কখনও-কখনও অশোকচন্দ্রকে এই নামেও ডেকে থাকে রঘুপতি, বলল : 'ঘরের সবকিছু সেদিনের মতোই আছে। শুধু ডেডবডি আর রক্তমাখা বালিশটা সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও চিজ ইধার-

উধার করা হয়নি।'

ঘরে ঢোকার সময় রঘুপতি বলরাম চৌধুরির দু-ছেলেকেই ডেকে নিয়েছে। সতীনাথ চৌধুরি গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়ালেও মণিনাথ বেশ বিরক্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন। মণিনাথের সঙ্গে তাঁর গানের গুরু অশোক জানাও এসে উপস্থিত।

রঘুপতি চাপা গলায় সকলের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে এসিজিকে।

মণিনাথ ভুরু কুঁচকে হাই-পাওয়ার চশমার কাচ দিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমার এখানে হাজির থাকাটা কি খুব জরুরি? নতুন একটা সুর তৈরি করছিলাম...মানে, যা বলার পুলিশকে তো আগেই জানিয়েছি...বাবা তো আর ফিরে আসবেন না...।'

সতীনাথ চৌধুরি শুধু স্থির ঠান্ডা চোখে তাকালেন ছোটো ভাইয়ের দিকে। সে-দৃষ্টিতে নীরব শাসন ছিল। মণিনাথ তৎক্ষণাৎ কথা থামিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। সেই অবস্থাতেই বন্ধু এবং গুরু অশোক জানার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

গানের মাস্টারমশাইয়ের গলার শিরা, কণ্ঠা ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট। কে জানে প্রতিদিন গানের চর্চা করে এই অবস্থা হয়েছে কিনা। আর গলার দৈর্ঘ্যও নেহাত ফেলনা নয়।

তিনি গুনগুন করে কী একটা সুর ভাঁজছিলেন। কালো ঠোঁট পানের রসে লালচে। বন্ধুর দৃষ্টি লক্ষ করে তাঁর পিঠে হাত রেখে জড়ানো গলায় বললেন, 'বড়দার কথা অমান্য করতে নেই, মণিভাই। ও-সুর আমি পরে তুলিয়ে দেব'খন—।'

বলরাম চৌধুরির ঘরের দরজা যে আবার মেরামত করা হয়েছে সেটা লক্ষ করলেন এসিজি। আর একইসঙ্গে নতুন হাজির হওয়া তিনটি মানুষকে খুঁটিয়ে জরিপ করলেন।

তালা খুলে রঘুপতি যাদব বলরাম চৌধুরির ঘরে আমন্ত্রণ জানাল এসিজিকে। জয়দেব সরকারকেও ডেকে বলল : 'আসুন, জয়দেববাবু—।'

কিন্তু সতীনাথ ও মণিনাথকে অনুসরণ করে যখন অশোক জানা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন তখন মুখিয়ে দাঁড়িয়ে রঘুপতি বলল : 'আপ কিঁউ আ রহে হ্যায়, মাস্টারজি?'

অশোক জানা কয়েকবার ঢোঁক গিলে ইতস্তত করে বললেন, 'না,মানে, মণিভাই খুব সেন্টিমেন্টাল তো...হঠাৎ যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায়...পিতৃশোক বলে কথা...।'

'তার জন্যে আমরা আছি। আপ দফা হো যাইয়ে—।'

'মানে!'

'মানে আপনি আসতে পারেন—।' বলেই দরজাটা 'মাস্টারজি'র মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে রঘুপতি।

তারপর উত্তেজিতভাবে শুরু করেছে ওর ধারাবিবরণীর রাজধানী এক্সপ্রেস।

এসিজি একহাতে সিগারেটে টান মারছিলেন, আর অন্য হাতে টানছিলেন সাদা চুলের গোছা। চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ঘরের প্রতিটি জিনিস প্রায় গোগ্রাসে গিলছিল।

ঘরে বড়-বড় দুটো জানলা। দুটোই বাগানের দিকে। জানলায় ঘিয়ে রঙের সুদৃশ্য গ্রিল বসানো। গ্রিলের ওপাশে ঘষা কাচের শার্সি বসানো পাল্লা। গ্রিলের লোহাগুলো প্রায় আট মিলিমিটার পুরু। এ-গ্রিল কাটার বা ভাঙার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

জানলা দিয়ে বাগানের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদ আর আলো এসে পড়েছে ঘরে।

একটা জানলার সোজাসুজি বলরাম চৌধুরির খাট। আর-একটা জানলার সামনে বসানো রয়েছে একটা বড় টেবিল। টেবিলে প্রচুর ফাইল আর কাগজপত্র। আর তার সামনে একটা গদি-আঁটা স্টিলের চেয়ার—টেবিলের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরানো।

এ ছাড়া ঘরে টিভি, আলনা, আলমারি, টেলিফোন, কোয়ার্টজ দেওয়াল-ঘড়ি আর একটা বুক কেস রয়েছে।

স্টিলের চেয়ারটা ছাড়া অতিথিদের বসার জন্য ঘরে দুটো লাল রঙের প্লাস্টিকের কিউব রয়েছে। আর তার সঙ্গে মানানসই প্লাস্টিক আর কাচে তৈরি একটা শৌখিন টি-টেবিল।

টেবিলের কাছে গিয়ে ডানদিকের ওপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলল রঘুপতি যাদব। জয়দেব সরকারকে ইশারায় ডেকে বলল, 'মিস্টার সরকার, সেই সকাল থেকে আপনি বোধহয় বোর হয়ে গেছেন। এইবার আপনার সাবজেক্টে এসে গেছি। ইধর আইয়ে। দেখিয়ে' বলে খোলা ড্রয়ারের ভেতরে আঙুল দেখিয়ে রঘুপতি বলল : 'রেয়ার কয়েন্স। তবে জেনুইন রেয়ার কিনা আপনি বলতে পারবেন।'

ড্রয়ারটার কাছে এসে জয়দেব সরকার মানুষটা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। এতক্ষণ যার কথাবার্তায় চেহারায় তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না এখন সে যেন শিকারি চিতা হয়ে গেল পলকে।

ড্রয়ারে একটা সাদা কাগজের ওপরে অন্তত পনেরো-বিশটা বড় মাপের তামার পয়সা পড়ে আছে। তার বেশিরভাগই বদখত চেহারার, গায়ে সবুজ কপার সালফেটের দাগ-ধরা।

জয়দেব সরকার গোটা ড্রয়ারটাকে বাইরে বের করে নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর থিঙ্কিং মেশিনকে তাজ্জব করে দিয়ে পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে তামার পয়সাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

রঘুপতি আর এসিজি ভদ্রলোকের দুপাশে দাঁড়িয়ে ওঁর কাজকর্ম লক্ষ করছিলেন।

একটা-একটা করে প্রত্যেকটা কয়েন দেখলেন জয়দেব সরকার। একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে পকেট থেকে পেন বের করে কীসব লিখে নিতে লাগলেন মাঝে-মাঝে।

রঘুপতি যাদব আবেগহীন গলায় মন্তব্য করল, 'আপনি নিশ্চিন্তে কাজ করুন, মিস্টার সরকার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টের টিম তাদের কাজ কমপ্লিট করে গেছে।'

'অ্যাঁ' জয়দেব সরকার আচমকা মনোযোগ ভেঙে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর বোধহয় রঘুপতির কথার সারমর্ম তাঁর মাথায় ঢুকল। তাই 'ও, ঠিক আছে' বলে আবার মাথা নামিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর জয়দেব সরকার আতসকাচ টেবিলে রেখে মাথা তুলে এসিজি আর রঘুপতিকে দেখলেন। একটু দূরে সতীনাথ আর মণিনাথ চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোক ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন এসিজিকে, 'ওঁদের সামনেই বলব?'

'বলুন।'

এসিজি হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা হাতে নিয়ে জানলার গ্রিলের দিকে এগোলেন। টুকরোটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলার সময় কয়েকটা গাছগাছালির পাশে কুন্তলকে দেখতে পেলেন।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন এসিজি।

কুন্তল ছুটে গ্রিলের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার পাগড়ি তখনও একই ঢঙে বসানো। ওর কয়েক হাত পিছনে সাবু, ওরফে বিলু।

'কী করছ, চাচা চৌধুরি?'

কুন্তল চোখ বড়-বড় করে বলল, 'বাড়ির ওপরে ওয়াচ রাখছি...কখন কী বিপদ হয়।'

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাচ্চাটার সরল চোখ দেখলেন অশোকচন্দ্র। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, খেলা করো গিয়ে।'

এসিজি গ্রিলের নকশাটা বেশ ভালো করে দেখলেন। সত্যি, এ-গ্রিল কারও পক্ষে কাটা বা বেঁকানো বেশ কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া সেরকম কোনও চেষ্টার ছাপ কোনও গ্রিলেই দেখেনি রঘুপতি।

এসিজি টেবিলের কাছে ফিরে এসে নতুন একটা সিগারেট ধরাতেই জয়দেব সরকার গলাখাঁকারি দিলেন, বললেন, 'স্যার, মিস্টার চৌধুরি ইদানীং বোধহয় রেয়ার কয়েন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন—।'

'কেন?' রঘুপতি জিজ্ঞাসা করল।

'কারণ, আমি জানি একজন বিদেশি বায়ার মানে, খদ্দের—এখন বিশেষ কয়েকটা কয়েনের জন্যে হন্যে হয়ে কলকাতা আর তার আশেপাশে চষে বেড়াচ্ছে। একইসঙ্গে প্রচুর দালালও ঘুরছে বাজারে। মিস্টার চৌধুরির পয়সাগুলোর মধ্যে সেরকম কয়েকটা কয়েন দেখতে পাচ্ছি—।'

সতীনাথ আর মণিনাথ খুব তাড়াতাড়ি ওঁদের কাছে চলে এলেন। প্রায় হাঁ করে জয়দেব সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওদের নজর ছিটকে যাচ্ছিল কয়েনগুলোর দিকে।

'আপনাদের বাবার কাছে কয়েনের খোঁজে কোনও লোকজন আসত?' রঘুপতি দু-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

মণিনাথ বললেন, 'কীসের খোঁজে আসত জানি না, তবে বেশ কিছুদিন ধরে দেখতাম উলটোপালটা ধরনের লোক বাবার কাছে আসত।'

'বেশ কিছুদিন বলতে?' এসিজি জানতে চাইলেন।

'এই মাস চার, সাড়ে চার' উত্তর দিলেন সতীনাথ। অবশ্য উত্তর দেওয়ার আগে মণিনাথের নীরব সমর্থন খুঁজেছেন।

জয়দেব সরকার বলে উঠলেন, 'প্রায় মাসছয়েক ধরে এই কয়েন খোঁজার ঢেউ উঠেছে। কলকাতা থেকে ব্যাপারটা এখন গ্রাম-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে।'

'রেয়ার কয়েনের কথা কী বলছিলেন' সতীনাথ আসল প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন না।

জয়দেববাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, 'যেসব রেয়ার কয়েনের খোঁজ চলছে তার মধ্যে বেশিরভাগই হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাফ আনা, মানে, আধ আনা। কয়েনগুলো বাজারে ছাড়ার বছরগুলো হল : ১৬১৬, ১৭১৭, ১৮০৬, ১৮১৮, ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪২, ১৮৪৪। এতে যেসব ছবির ছাপ আছে সেগুলো হল : জোড়া ডাব, রাজা রামচন্দ্রের দরবার, হনুমান, জোড়া সাপ এইসব। পয়সাগুলো মেইনলি তামার তৈরি, তার সঙ্গে বোধহয় কিছুটা করে ইরিডিয়াম মেশানো আছে—।'

'ইরিডিয়াম! ওটা তো রেয়ার মেটাল!' অশোকচন্দ্র গুপ্ত অবাক হয়ে বললেন।

জয়দেব সরকার মাথা নেড়ে হাসলেন : 'হয়তো সাধারণ ইরিডিয়াম নয়, তার কোনও রেডিওঅ্যাকটিভ আইসোটোপ। মানে ইরিডিয়াম-১৯১ আর ইরিডিয়াম-১৯৩। তেজস্ক্রিয় হলেও ইরিডিয়ামের এই দুটো আইসোটোপ খুব স্টেবল—মানে, হাফ লাইফ অনেক বেশি।'

'তা হলে তো সেই কয়েনের রেডিওঅ্যাকটিভিটি থাকবে!' একটু ভয়ের গলায় বললেন এসিজি।

জয়দেব সরকার জোর দিয়ে বললেন, 'থাকবেই তো! তবে তার এফেক্ট কী হবে সেটা বলতে পারব না। বাজারের খবর হচ্ছে, এ-ধরনের পয়সা নাকি আতপ চাল টানে। মানে, চুম্বক যেমন লোহা টানে আর কী! তারপর কেউ-কেউ বলছে, তাতে নাকি আতপ চালের দানার রঙও পালটে যায়। তবে একটা ধান ভেঙে সঙ্গে-সঙ্গে তার চালের দানাটা দিয়ে টেস্ট করতে হবে—এতে নাকি চালের দানাটায় কোনও ময়েশ্চার জমে না।'

'বলেন কী, মশাই!' মণিনাথ তাঁর হাই-পাওয়ার চশমা নাকের ডগায় ঠিক করে বসাতে-বসাতে বললেন।

জয়দেব সরকার মণিনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বললাম তো, এসব খবর আমার কানে এসেছে। গুজব না সত্যি বলতে পারব না। কারণ, এই চালের দানা টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা আমি স্বচক্ষে দেখিনি।'

সতীনাথের গম্ভীর মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। তিনি এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবাকে আমি বেশ কয়েকবার ধানের শিষ নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখেছি—।'

'বাবা কি চালের দানা নিয়ে কয়েন টেস্ট করছিলেন?' মণিনাথ যেন আপনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

'হতে পারে।' রঘুপতি বলল, 'তবে ইয়ে সচ হ্যায় গুপ্তাসাব, কী আমরা ঘরের মেঝেতে বেশ কয়েকটা চালের দানা দেখেছিলাম। ওগুলোকে আমরা তেমন কোনও ইম্পর্ট্যান্স দিইনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেসটা কী—।'

'বাবার কালেকশানে কি ওরকম রেয়ার কয়েন সত্যি-সত্যি আছে?' সতীনাথ জয়দেব সরকারের কাছে জানতে চাইলেন।

'আছে। ১৭১৭, ১৮৩৯, আর ১৮৪০ সালের তিনটে আধ আনা এখানে আছে।' আঙুল দিয়ে টেবিলে রাখা কয়েনগুলোর দিকে দেখালেন জয়দেববাবু।

'সত্যি?' বিস্ময় মেশানো প্রশ্নে যেন ফেটে পড়লেন মণিনাথ আর সতীনাথ।

এসিজি বেশ অবাক হয়ে তাকালেন জয়দেব সরকারের দিকে। রঘুপতির চোয়ালের রেখা শক্ত হল, চোখ ছোটো হয়ে এল।

কয়েক সেকেন্ড সবাইকেই উৎকণ্ঠায় রেখে তারপর হেসে জয়দেব সরকার বললেন : 'সাল তারিখ ঠিক থাকলেও এই তিনটে পয়সাই নকল। তা না হলে এগুলোর এক-একটার দাম কম করেও কয়েক লক্ষ টাকা হত।'

এ-কথায় কয়েকটা বেলুন যেন চুপসে গেল ঘরের মধ্যে।

'এরকম প্রচুর নকল কয়েন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে কিনে ঠকছেও। আবার কেউ-কেউ কয়েন হাতে পেয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাচ্ছে।' কথা বলতে বলতে টেবিল থেকে আতসকাচটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন জয়দেব সরকার।

রঘুপতি যাদব সতীনাথ আর মণিনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কয়েনের ব্যাপারে কিছু জানেন না?'

দুজনেই মাথা নাড়লেন।

এসিজি সিগারেট হাতে নিয়ে ঘরটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলেন। কখনও দরজার কাছে, কখনও বিছানার পাশে, আর কখনও বা জানলার গ্রিলের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন।

'মিস্টার সরকার', জয়দেববাবুকে লক্ষ করে বলল রঘুপতি, 'দেখুন তো, টেবিলের এইসব কাগজপত্রে কয়েনের ব্যাপারে আর কিছু পান কিনা—।'

একটুও ব্যস্ত না হয়ে জয়দেব সরকার টেবিলের কাছে এলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে একটা-একটা করে কাগজ দেখতে লাগলেন।

সতীনাথ চৌধুরি রঘুপতি যাদবকে লক্ষ করে সামান্য রুক্ষ স্বরে জানতে চাইলেন, 'কবের মধ্যে আপনি কেসটা সলভ করছেন, ইন্সপেক্টর যাদব?'

রঘুপতি অশোকচন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন, 'কোশিশ তো করছি। সেইজন্যেই আজ আমার স্যারকে নিয়ে এসেছি।'

তাচ্ছিল্যের চোখে এসিজির দিকে দেখলেন সতীনাথ। তারপর বললেন, 'বাবা আমাদের পার্টিকে বিরাট ডোনেশান দিতেন। আমার ওপর খুব চাপ আসছে—।'

মণিনাথ যেন দাদাকে সায় দিতেই বলে উঠলেন, 'সলভ করতে না পারেন, অন্তত কাউকে অ্যারেস্ট তো করুন—।'

রঘুপতির বসন্তের দাগ-ধরা মুখে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। ও অভদ্র স্বরে জবাব দিল, 'অ্যারেস্ট ম্যায় আভি ইসি বক্ত কর সকতা হুঁ। লেকিন সে আপনার হেলথের পক্ষে ভালো হবে না।'

মণিনাথ স্পষ্ট শিউরে উঠে নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেলেন।

'এই কাগজটা দেখুন' জয়দেব সরকার একটা কাগজ দেখিয়ে সকলের মনোযোগ চাইলেন, 'এটা একটা কয়েনের টেস্ট রিপোর্টের জেরক্স কপি।'

রঘুপতি আর এসিজি কাগজটা দেখার জন্য জয়দেববাবুর খুব কাছে এসে ঝুঁকে পড়লেন।

'ম্যাড্রাসের ''জুপিটার'' নামের কোনও এক কম্পিউটারাইজড এয়ার কন্ডিশনড ল্যাবরেটরিতে এই টেস্টটা করা হয়েছে। ১৬১৬ সালের কপার-ইরিডিয়াম হাফ আনা কয়েন। হাতে পাঞ্চ করে তৈরি। ভর ৮২ গ্রাম ৭০০ মিলিগ্রাম। আর কয়েনটা এক সেন্টিমিটার পুরু।' রিপোর্টটা আর-একবার দেখে নিয়ে জয়দেব সরকার বললেন, 'এ ছাড়া রেডিওঅ্যাকটিভিটিও বেশ আছে দেখছি—।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি প্রশ্ন করলেন, 'এই জেনুইন কয়েনটা হাতে পেলে তার দাম মোটামুটিভাবে কত হতে পারে, মিস্টার সরকার? লাখ টাকা?'

রিপোর্টটা টেবিলে রেখে দিয়ে একটু হেসে জয়দেববাবু, বললেন, 'যে সত্যি-সত্যি অ্যান্টিক কয়েনের কদর বোঝে, তার কাছে এর দাম অনায়াসে কয়েক কোটি টাকা হতে পারে।'

ঘরে যেন বাজ পড়ল। অনেকক্ষণ সবাই চুপ। শুধু কোয়ার্টজ ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা নড়ার টিকটিক শব্দ।

ওই নোংরা চেহারার কয়েনগুলোর এত দাম! ভাবল রঘুপতি। অশোকচন্দ্র স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'রঘুপতি, এবার তুমি বোধহয় বলরামবাবুর মার্ডারের জেনুইন মোটিভের হদিস পেয়ে গেছ।'

হঠাৎই সতীনাথ ও মণিনাথের দিকে ফিরে এসিজি বিনীতভাবে বললেন, 'আপনারা যদি একটু বাইরে অপেক্ষা করেন তা হলে ভালো হয়। আমরা একটু আলাদা কথা বলতে চাই—।'

'ওঃ, শিওর' বলে সতীনাথ দরজার দিকে এগোলেন।

মণিনাথ দাদাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে টেবিলের কয়েনগুলোর দিকে কয়েকবার দেখলেন।

ওঁরা চলে যেতেই রঘুপতি দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। তারপর বলল, 'গুপ্তাসাব, এবার বলুন, কী বুঝলেন?'

'একটা ব্যাপার আমি বোধহয় সলভ করতে পেরেছি, রঘুপতি—।'

'কোন ব্যাপার?'

'তোমার ক্লোজড রুম প্রবলেম। বন্ধ ঘর থেকে খুনি কীভাবে পালাল সেটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি।'

রঘুপতি প্রত্যাশা-ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল প্রাক্তন স্যারের দিকে।

জানলার কাছে গিয়ে সিগারেটের শেষ হয়ে আসা টুকরোটা বাইরে ফেলে দিলেন এসিজি। তারপর ঘাড়ের-কাছে-নেমে-আসা সাদা চুলের গোছায় বারকয়েক টান মেরে বললেন, 'চলো, রঘুপতি। এবারে যাওয়া যাক। তবে যাওয়ার আগে চাচা চৌধুরির সঙ্গে একবার কথা বলে যাব—খুব জরুরি কথা।'

রঘুপতি বেশ অবাক হলেও কিছু বলল না।

ঘরটা শেষবারের মতো দেখে নিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বেরিয়ে এলেন বাইরে। ওঁকে অনুসরণ করে জয়দেব সরকার ও রঘুপতি যাদব।

'রঘুপতি, এই রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে তুমি একটু নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে তদন্ত শুরু করো। আর আমি তোমাকে বাড়তি কিছু ইনফরমেশন দেব। মনে হয়, এ-থেকে তুমি দিন-সাতেকের মধ্যেই মার্ডারারকে খাঁচায় পুরতে পারবে।' প্রাক্তন ছাত্রের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'কী, খুশি তো?'

কথা বলতে-বলতে ওঁরা বাড়ির মোজেইক করা চাতালে বেরিয়ে এসেছিলেন। সতীনাথ আর মণিনাথ কোথা থেকে যেন ওঁদের দেখতে পেয়ে ব্যস্ত পায়ে কাছে চলে এলেন।

রঘুপতি সতীনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের কো-অপারেশনের জন্যে ধন্যবাদ।'

সতীনাথ সৌজন্য দেখিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এসিজির কথায় সেটা আর বলে উঠতে পারলেন না।

'আপনার ছেলেকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, কয়েকটা কথা বলব—।'

'তার মানে! বাবার মার্ডারের ব্যাপারে ওইটুকু বাচ্চার কী বলার আছে!' বেশ বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন সতীনাথ।

'চাচা চৌধুরি আর সাবুর গল্প করব। সে আপনি বুঝবেন না।' হেসে বললেন এসিজি। তারপর রঘুপতিকে চোখের ইশারা করলেন। যার মানে, 'কুন্তলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

রঘুপতি বাড়ির ভেতর দিকে রওনা হতেই সতীনাথ আহত গলায় বললেন, 'থাক, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি—।'

সতীনাথ চলে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কুন্তল চলে এল লাফাতে-লাফাতে। এখন ওর মাথায় পাগড়ি নেই, কোমরের বেল্টও উধাও।

'আমাকে ডেকেছ?'

'হ্যাঁ, তোমার দাদুর ব্যাপারে একটু চাচা চৌধুরির সাহায্য চাই। চলো, বাগানে চলো।'

ভ্যাবাচ্যাকা মণিনাথকে চাতালে দাঁড় করিয়ে রেখে এসিজি কুন্তলকে নিয়ে বাগানের গাছপালার মধ্যে চলে এলেন। ওঁকে অনুসরণ করে সঙ্গী হলেন জয়দেব সরকার আর রঘুপতি যাদব।

নানান গাছের ফাঁক দিয়ে বলরাম চৌধুরির ঘরের জানলা দুটো দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে আঙুল তুলে এসিজি কুন্তলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো তো, চাচা চৌধুরি, লাস্ট সোমবার দুপুরে তুমি কি কাউকে ওই জানলার কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?'

'দাঁড়াও, ভেবে বলছি।' বাচ্চা ছেলেটা আঙুলে কর গুনতে লাগল আর ধীরে-ধীরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ...।'

'কুন্তলবাবু, চাচা চৌধুরির বুদ্ধি কম্পিউটারের মতো প্রখর। চাচা চৌধুরি একবার যা দ্যাখে তা কখনও ভোলে না—' অশোকচন্দ্র কুন্তলকে উৎসাহ দিতে চাইলেন।

'মনে পড়েছে! মনে পড়েছে!' কুন্তল আচমকা লাফিয়ে উঠে বলল, 'গানকাকু ওই ডানদিকের জানলার গ্রিলের কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন করছিল।'

'গানকাকু!'

'হ্যাঁ। কাকুমণিকে যে গান শেখায়।'

এসিজি 'চকাৎ' শব্দে একটা চুমু খেলেন কুন্তলের গালে। তারপর বললেন, 'থ্যাংক য়ু, চাচা চৌধুরি। তুমি আমার চেয়েও বড় হুনুর।'

'হুনুর মানে!' অবাক চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকাল কুন্তল।

'এটা ফারসি শব্দ—বাংলায় ঢুকে পড়েছে। এর মানে হল, খুব বুদ্ধিমান, এককথায় গোয়েন্দা বলতে পারো। আজ আমরা চলি। পরে একদিন এসে তোমার সঙ্গে খুব গল্প করব।'

চৌধুরি ভিলার বাইরে এসে রঘুপতি এসিজিকে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপারটা কী হল, গুপ্তাসাব?'

এসিজি নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ড্যাম সিম্পল, রঘুপতি। গানের মাস্টারমশাই অশোক জানা-ই হচ্ছে কালপ্রিট—তোমার রেয়ার বার্ড। তবে সেরকম কোনও প্রমাণ তো নেই। তুমি ওকে খাঁচায় পুরে ছত্রিশ রকম পুলিশি দাওয়াইয়ের সাইতিরিশটি ডোজ অ্যাপ্লাই করলেই বোধহয় কনফেশান পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু জানলার কাছে উনি কী করছিলেন?' জয়দেব সরকার জানতে চাইলেন।

ওঁরা কথা বলতে-বলতে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে এসিজি বললেন, 'রঘুপতি, রামভক্ত হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে আসার গল্পটা তোমার মনে আছে তো! বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে গোটা পর্বতটাই বয়ে নিয়ে এসেছিল পবন-নন্দন।' সিগারেটে পরপর দুটো লম্বা টান দিয়ে তারপর বললেন : 'এও অনেকটা সেইরকম। জানলার গ্রিলটা কাটতে বা ভাঙতে না পেরে অশোক জানা হনুমানের মতো গোটা গ্রিলটাই খুলে নিয়েছিল জানলার ফ্রেম থেকে। এই কাজের জন্যে খানিকটা নারকোল তেল আর একটা ভারী স্ক্রু-ড্রাইভারই

যথেষ্ট। আমার ধারণা, ও আগে থেকেই গ্রিলের বেশ কয়েকটা স্ক্রু খুলে রেখেছিল। ঘটনার দিন শেষ একটা কি দুটো স্ক্রু খুলে গ্রিল সরিয়ে ও বলরামবাবুর ঘরে ঢোকে। তারপর নিজের কুকর্ম আড়াল করতে জানলার ঘষা কাচের পাল্লা ভেজিয়ে দেয়। কাজ সেরে বেরিয়ে এসে যখন ও গ্রিলটা আবার জায়গামতো বসিয়ে স্ক্রু এঁটে দিচ্ছিল, তখনই বোধহয় কুন্তল ওকে দেখতে পায়। ব্যস, এই হল তোমার ক্লোজড রুম প্রবলেম।'

একটু থেমে এসিজি রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কী, এবার খুশি তো? এবার পারবে তো জাল গোটাতে?'

রঘুপতি চওড়া হেসে বলল, 'স্যার, ভাগ্যিস আপনি শার্লক হোমসের মতো পাইপ টানতে পারেন না, আর এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফ আপনার নেই!'

'কেন, তা হলে কী হত?' কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

'তা হলে আপনি গল্পের বইয়ের পাতায় ঢুকে যেতেন। বলরাম চৌধুরির মার্ডার কেস আর সলভ হত না।'

ওঁরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন জোর গলায়।

চুনিলালবাবুর লাল চুনি





'গু প্তাসাব, ব্যাপারটা ঠিক খুন নয় তবে অনেকটা খুনের মতো।'

গাড়ির জানলার বাইরে চোখ রেখে বিকেলের কলকাতা দেখতে-দেখতে কথাটা বলল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

ক্যাডবেরি রঙের মারুতি আটশো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ছুঁয়ে এগোচ্ছিল বাগবাজারের দিকে। গাড়ির পিছনের সিটে উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিল রঘুপতি। ওর পাশেই বসে অধ্যাপক ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে এসিজি। তাঁর সরু-সরু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত ডানহিল সিগারেট।

এমনিতে এসিজির প্রিয় উইলস ফিলটার। কিন্তু রঘুপতি কোথা থেকে যেন এক কার্টন ডানহিল জোগাড় করে এসিজিকে উপহার দিয়েছে একটু আগেই। আর সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে একটা সমস্যা যেটা ঠিক খুন নয়, খুনের মতো।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রাক্তন ছাত্র রঘুপতিকে দেখছিলেন এসিজি।

ছোট করে ছাঁটা চুল, কাঁচা-পাকা চওড়া গোঁফ, তামাটে মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। হাতের শিরা এবং পেশি দুশমনদের সাবধান করে দেওয়ার মতো। আর চোয়ালের উদ্ধত রেখা সেখানে জুড়ে দিয়েছে একটা বেপরোয়া ভাব। এ ছাড়াও একটা 'কিলার ইন্সটিংক্ট' যেন আবছাভাবে খুঁজে পাচ্ছিলেন এসিজি।

ছাত্রজীবনের রঘুপতির সঙ্গে আজকের কাজ-পাগল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদবের কতটা অমিল, সেটাই ভাবছিলেন ওর প্রাক্তন 'স্যার' অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

'এ ছাড়া, স্যার, ব্যাপারটার মধ্যে পাখিও আছে—' এসিজির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল রঘুপতি, 'আপকা ফেবারিট—পঞ্ছি। অওর উসকে সাথ এক রুবিকি কাহানি।'

মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে তুলে অশোকচন্দ্র বললেন : 'রুবির কাহিনি? তার মানে!'

'রুবি—যাকে বাংলায় আপনারা চুনি বলেন। জেমস্টোন। খুব কস্টলি।'

ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন এসিজি। বললেন, 'তোমার টেনশন কমাও রঘুপতি। তখন থেকে যেরকম খাপছাড়াভাবে ইনফরমেশানের টুকরো ছড়িয়ে চলেছ, তাতে আমার মতো থিঙ্কিং মেশিনেরও মস্তক ঘূর্ণিত। তোমাকে তো বহুবার বলেছি, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাউ কাম অন, বেশ রয়েসয়ে গুছিয়ে গল্পটা বলো আমাকে।'

একটু আহত হয়ে রঘুপতি বলল, 'বলছি, গুপ্তাসাব, কিন্তু ''ঘূর্ণিত'' মানে কী?'

হো-হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ হুনুর। ছোট-হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'সে তোমাকে পরে বলে দেব। এখন শুরু করো তোমার ''রুবিকি কাহানি''—।'

ওঁদের গাড়ি তখন বাগবাজারের বাটার দোকানের কাছে বাঁদিকে বাঁক নিচ্ছে।

রঘুপতি যাদব একটু গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করল। ওর ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সামান্য ছোট হয়ে এল।

ওর পাশে বসা খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা বৃদ্ধ মানুষটি তখন আনমনাভাবে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছেন, আর বাগবাজার বাটার মোড়ে পুজোর কেনাকাটার ভিড় দেখছেন। কিন্তু তাঁর কান ও মস্তিষ্কের মনোযোগ পুরোপুরি রঘুপতির দিকে। রঘুপতির কাছ থেকে সংক্ষেপে যা জানা গেল, তা হল এই :

বাড়িটার নাম 'লালমহল'। বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি দু-মহলা পুরনো বাড়ি। বাড়ির দালানে বিশাল-বিশাল ডোরাকাটা থাম। থামের মাথায় কার্নিশের খাঁজে গোলা পায়রার বাস। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এখনও ছোট মাপের দুর্গাপুজো হয়।

বাড়িটার রং লাল। অন্তত এককালে তাই ছিল। কালের প্রকোপে সেই লাল কোথাও গোলাপী, কোথাও বা বর্ণহীন হয়ে পড়েছে। বাড়ির সদর দরজায় রং-চটা শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'রায়বাহাদুর রবীন্দ্রলাল গোস্বামী'।

রবীন্দ্রলাল অন্তত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে ইহলোক ছেড়েছেন। তবে তাঁর চার ছেলে এখনও বহাল তবিয়তে 'লালমহল'-এ বাস করেন।

বড় ছেলে শ্যামসুন্দরলাল গতকাল মারা গেছেন। তিনি সবসময় পাখি নিয়ে মেতে থাকেন—মানে, থাকতেন। বাড়ির অনেকটা অংশ তাঁর খাঁচায়-খাঁচায় ছয়লাপ।

মেজো ছেলে চুনিলাল মণিরত্নের ব্যবসা করেন। দেব-দেবীভক্ত ধর্মভীরু, মানুষ। অন্য ভাইদের মতো সংসার-ধর্ম করেননি।

সেজো রঙ্গলাল হিসেব মতো বেকার। তবে শোনা গেছে তিনি নাকি টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ করেন।

আর সকলের ছোট গজেন্দ্রলাল এখনও ঠিক কোনও ব্যবসায় থিতু হয়ে বসতে পারেননি।

ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল, দুপুর দুটো নাগাদ।

শ্যামসুন্দরলালের কাছে একটা ফোন এসেছিল। কে ফোন করেছিল সেটা জানা যায়নি। টেলিফোনে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে-বলতেই তিনি আচমকা হার্টফেল করে মারা যান।

তাঁর চিৎকারে বাড়ির অনেকে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

ব্যাপারটায় এমনিতে কোনও জটিলতা ছিল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। তা ছাড়া শ্যামসুন্দরলালের বয়েসও হয়েছিল প্রায় বাষট্টি।

কিন্তু গোলমাল বাঁধালেন চুনিলালবাবু। তিনি বললেন যে, প্রায় দু-লাখ টাকা দামের একটা টকটকে লাল চুনি তিনি তাঁর বড়দার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন।

সেটার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সেইজন্যই গুপ্তাসাবকে জরুরি তলব করেছে রঘুপতি। খুঁজে বের করতে হবে চুনিলালবাবুর চুনি।

রঘুপতির কথা শেষ হতে-না-হতেই এসিজি প্রশ্ন করলেন, 'শ্যামসুন্দরলালের মারা যাওয়ার ব্যাপারটাকে তুমি ''খুনের মতো'' বলছ কেন?'

'বলছি কী আর সাধে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রঘুপতি। তারপর বলল, 'ওই হতচ্ছাড়া জেবরাতের জন্যে ক'দিন ধরেই কোন এক আদমি শ্যামসুন্দরবাবুকে থ্রেট করছিল। তাতে উনি ভয়ও পেয়েছিলেন, আবার খুব এক্সাইটেডও হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, উনি এভাবে মারা না গেলে হয়তো ওই আননোন পারসনের হাতে খুন হয়ে যেতেন...।'

এসিজি এক ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলেন আবার। চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সেই লোকটা কেমন করে জানল যে, চুনিটা শ্যামসুন্দরলালবাবুর কাছে আছে?'

ঠোঁট উলটে রঘুপতি বলল, 'কে জানে! হয়তো কারও কাছ থেকে ইনফরমেশান পেয়েছে।'

'যখন শ্যামসুন্দর মারা যান তখন চুনিলাল কোথায় ছিলেন?'

'বাড়িতেই।' কথাটা বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রঘুপতি কী যেন দেখল। তারপর বলল, 'স্যার, আমরা লালমহলে এসে গেছি।'

বাড়ির সামনে ভাঙাচোরা ট্রাম-রাস্তা। কোথাও কোথাও জল জমে আছে। বাড়ির উলটোদিকে দুটো বিশাল মাপের গোডাউন। তার পিছনেই বোধহয় গঙ্গা।

ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলে রঘুপতি এসিজিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আইয়ে, স্যার—ওয়েলকাম টু লালমহল।'

এসিজি প্রাক্তন ছাত্রের ভঙ্গি দেখে সামান্য হাসলেন। তারপর মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, 'চলো, দেখা যাক তোমার চুনিলালবাবুর চুনি উদ্ধার করা যায় কিনা।'

কলিংবেল টিপতেই বাড়ির দরজায় একজন বয়স্ক পুরুষ এসে হাজির হলেন। দেখে বনেদি বাড়ির 'পুরাতন ভৃত্য' বলেই মনে হল। রঘুপতি নিজের পরিচয় দিতেই দ্রুত আদর-আপ্যায়ন শুরু হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে রঘুপতি যাদব নিচু গলায় বলল, 'ব্যাপারটা লালবাজার পর্যন্ত গড়াত না। তবে চুনিলালবাবুর থোড়াবহত আপার লেভেল কানেকশান্স আছে। সেইজন্যেই...।'

কথা বলতে-বলতে ওঁরা চৌকো মাপের বিশাল ঠাকুর-দালানে এসে পড়েছিলেন। তার একপাশে চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। এখন শুধু শেষ তুলির টান আর সাজসজ্জা বাকি।

হঠাৎই ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামলা রঙের একজন ভদ্রলোক। তাঁর ডান হাতের তিন আঙুলে রুপো দিয়ে বাঁধানো তিনটে পাথরের আংটি। প্রকট হেসে তিনি বললেন, 'আগমনের খবর পেয়েছি/তাই রিসিভ করতে এসেছি। অধমের নাম রঙ্গলাল/চুনিটা বেপাত্তা হয়েছে গতকাল।'

এসিজি অবাক হয়ে লালমহলের রঙ্গলালবাবুকে দেখছিলেন।

পরনে ফতুয়া গোছের পাঞ্জাবি আর ধুতি। মাথার মাঝখানে সিঁথি। তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুল। ছোট-ছোট চোখ। কপালের বাঁদিকে একটা ছোট আঁচিল। নাকটা সামান্য বড় মাপের। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মুখে প্রসাধনের সুবাস। আর সদাসঙ্গী আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

'শ্যামসুন্দরলালবাবু কোন ঘরে মারা গিয়েছিলেন?' রঘুপতি জানতে চাইল।

রঙ্গলাল অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'দোতলার পাখিঘরে/ওই ঘরটার ঠিক ওপরে...' আঙুল তুলে দূরের কোণে একটা ঘর দেখালেন তিনি।

এসিজি যে-কথাটা মনে-মনে ভাবছিলেন, সেটাই মুখে প্রকাশ করলেন, 'আপনি কি সবসময় ছড়া কেটে কথা বলেন?'

রঙ্গলালবাবু মাথা সামান্য নিচু করে বললেন, 'আমি একজন স্বভাব-কবি/ কবিতায় কথা বলা আমার হবি।'

রঘুপতি যে এই উত্তর শুনে ঠোঁট টিপে হাসল সেটা বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখ এড়াল না।

দুর্গাপুজো এবার দেরিতে। তাই রোদ্দুর পড়ে আসছে তাড়াতাড়ি। উঠোন থেকেও রোদ সরে যাচ্ছে পুবের দিকে।

মাথার ওপরে কয়েকটা পায়রা ঝটপট করছিল। শান-বাঁধানো উঠোনে নানা জায়গায় ওদের অপকীর্তির ছাপ।

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে এগোলেন দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। তখনই কোথা থেকে ছুটে এল বছর ন'-দশের একটা ছোট মেয়ে। হাঁফাতে-হাঁফাতে রঙ্গলালবাবুকে লক্ষ করে বলল, 'জেঠু, মেজো-জেঠু বলেছে ওঁদের পাখিঘরে নিয়ে বসাতে।'

কথাটা বলেই মেয়েটা ছুট্টে চলে গেল।

রঙ্গলালবাবু বললেন, 'গজেন্দ্রর ছোট মেয়ে। সবসময়—'

'—চলে ধেয়ে।' পাদপূরণ করে হেসে উঠলেন এসিজি।

পুরোনো আমলের শান-বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। পালিশ করা মেহগনি কাঠের রেলিং। সিড়ির ল্যান্ডিং-এর দেওয়ালে এক অভিজাত পুরুষের তৈলচিত্র। গিল্ট ফ্রেমে বাঁধানো। কে জানে, ইনিই হয়তো স্বর্গীয় রবীন্দ্রলাল গোস্বামী।

এসিজি আর রঘুপতি রঙ্গলালকে অনুসরণ করে উঠছিলেন। রঘুপতি চাপা গলায় ওর প্রাক্তন স্যারকে বলল, 'অজীব ব্যাপার, গুপ্তাসাব। যাঁর নাম চুনিলাল তিনি চুনি, মানে হিরে-জহরতের বেওসা করেন। যাঁর নাম রঙ্গলাল তিনি সবসময় মজাক করে কথা বলেন। তবে যিনি মারা গেছেন...।'

রঘুপতির কথায় বাধা দিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বললেন, 'শ্যামসুন্দরলাল গোস্বামীর নামটা প্রথম থেকেই আমার পিকিউলিয়ার লাগছিল। এরকম নাম কখনও শুনিনি। তবে ''শ্যামসুন্দর'' নামে একরকম মুনিয়া পাখি পশ্চিমবাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের বাগানে এরা বাসা বাঁধে। মাপে চড়ুই পাখির মতো। মাথা কালো, বুক সাদা, বাকিটা গাঢ় বাদামি রঙের। ইংরেজি নাম ''ব্ল্যাক হেডেড মুনিয়া'', আর ল্যাটিন নাম ''লোনচুয়া মলাক্কা''। সুতরাং শ্যামসুন্দরলালবাবুর শখটাও তাঁর নামের সঙ্গে মিল রেখে।'

'তা হলে বাকি রইলেন গজেন্দ্রলালবাবু। তিনি কি হাতির ব্যবসা করেন, নাকি হাতির খোঁজখবর রাখা তাঁর শখ?'

সামান্য মজা করে বলা রঘুপতি যাদবের শেষ কথাটা বোধহয় রঙ্গলালবাবুর কানে গিয়ে থাকবে। কারণ, হঠাৎই তিন-চার ধাপ ওপর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'হস্তী নয়—হস্তীদন্ত/গজেন্দ্রর পয়মন্ত।'

এসিজি আর রঘুপতি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। গজেন্দ্রলাল তা হলে হাতির দাঁতের ব্যবসা করেন!

গতকালই একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে এ-বাড়িতে। অথচ রঙ্গলালকে দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না তেমন কোনও আঘাত পেয়েছেন। তবে বাড়িটাকে কেমন যেন বেশিরকম চুপচাপ মনে হল। শুধু পায়রার বকবকম ওঁদের কানে আসছিল।

এসিজির সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। দোতলার পাখিঘরে পৌঁছেই তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন। ঘরটাকে একপলক দেখার পর তিনি যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, সেটা রঘুপতি যাদব স্পষ্ট বুঝতে পারল।

কারণ, পাখিঘরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য পাখির স্টাফ করা মডেল। নানান মাপের রংবেরঙের পাখি। কিন্তু ওরা সকলেই স্থির, চুপচাপ।

পাখিঘরটাকে ঘর না বলে হলঘর বলাই ভালো। ঘরের মাপ অন্তত বিশ ফুট বাই তিরিশ ফুট। ঘরের মেঝেতে সাদা-কালো মার্বেল পাথরের নকশা। সেই নকশায় সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি। এখনও দিব্যি ঝকঝকে তকতকে।

চুনিলালবাবু একটা আরাম-কেদারায় চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ লাল।

ওঁদের ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সংক্ষেপে পরিচয়ের পালা শেষ করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ইন্সপেক্টর যাদব। সরাসরি কাজের কথায় আসি। অশৌচ অবস্থায় কী বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে পড়লাম বলুন তো!' একটু থেমে কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঘুপতি যাদবকে বসতে বললেন, 'বসুন, আপনারা বসুন। আপনারা আসছেন শুনে ছোটভাইকে বাইরের কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি আপনাদের জন্যে ওয়েট করছি।'

এমন সময় ছোট্ট মেয়েটা এক দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকল। রঙ্গলালবাবুর কাছে গিয়ে বলল, 'বসন্তদা চা নিয়ে আসছে। মা পাঠিয়ে দিয়েছে—।'

কথাটা শেষ করেই মেয়েটা বেণী দুলিয়ে আবার দে ছুট।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চা-মিষ্টি ইত্যাদি ট্রেতে সাজিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মাঝবয়েসি একজন লোক। শ্বেতপাথরের তৈরি একটা গোল টেবিলে কাপ-প্লেটগুলো নামিয়ে রাখতেই রঙ্গলালবাবু সেগুলো সবিনয়ে এগিয়ে দিলেন রঘুপতি ও অশোকচন্দ্রের দিকে।

চুনিলালবাবুর পরনে হাফহাতা সাদা শার্ট আর পাজামা। গলায় সরু সোনার চেন। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। জুলপির কাছটায় চুলে দিব্যি পাক ধরেছে। ভুরু, লোমশ। দুই ভুরুর মাঝখানে চিরস্থায়ী বিরক্তির ভাব।

এসিজি ঘরটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলেন।

ঘরের আসবাবপত্র যা কিছু সবই ব্রিটিশ আমলের। একপাশে বড় মাপের চেয়ার-টেবিল। চেয়ারে ফুলকাটা তাকিয়া বসানো। আর টেবিলে গাদা-গুচ্ছের বই আর কাগজপত্র। সেইসঙ্গে রয়েছে পেন-পেনসিল, আতসকাচ, পেতলের পেপারওয়েট আর কয়েকটা পাখির পালক। টেবিলের বাঁ দিকে রাখা কর্ডলেস টেলিফোন।

দেখে বোঝাই যায়, এটা ছিল শ্যামসুন্দরলালের পড়াশোনার ঘর।

ঘরটার তিনদিকের দেওয়ালে বড়-বড় মাপের দেওয়াল আলমারি। তাতে ঠাসা রাজ্যের বই। এসিজির নজরে পড়ল সেখানে সালিম আলি ও ডিলন রিপলির কয়েকখণ্ডে লেখা ভারত ও পাকিস্তানের যাবতীয়

পাখির হাত-বই পরপর সাজানো রয়েছে।

ঘরের সিলিং-এ ঝুলছে দুটো চার ব্লেডের পাখা। দেখে বোঝা যায়, ব্লেডগুলো কাঠের তৈরি। আর ঘরের দু-দিকের দেওয়ালে ডিজাইন করা শৌখিন পিতলের ব্র্যাকেটে ঝুলছে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় চুনিলালবাবু সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দিলেন। তারপর রঘুপতির কাছে এসে বললেন, 'আমার দাদা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ওঁর হার্টের প্রবলেম ছিল ঠিকই, কিন্তু হয়তো আরও কয়েক বছর বাঁচতেন। আমার জন্যেই অকালে বড়দার প্রাণটা গেল। বউদির দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। অথচ আমারও উপায় নেই। চুনিটা খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাকেও হয়তো গুপ্তঘাতকের হাতে মরতে হবে। তাই শোক তাকে তুলে রেখে পাগলের মতো চুনি খুঁজতে বসেছি...।'

চুনিলালবাবু থামতেই রঘুপতি তাকাল অশোকচন্দ্রের দিকে।

বৃদ্ধ তখন চোখ বুজে সিগারেটে জম্পেশ টান দিচ্ছেন।

রঘুপতি বলল, 'গুপ্তাসাব, আমার সঙ্গে চুনিবাবুরই টেলিফোনে কথা হয়েছিল। আপনি ওকে কী জিজ্ঞাসা করবেন করুন—।'

এসিজি চোখ খুলে পাখির মেলার দিকে তাকালেন। কম করেও একশো পাখি সাজানো রয়েছে ঘরের ডানদিকটায়। তার সবই পশ্চিমবাংলার পাখি। ছোট মাছরাঙা, বাঁশপাতি, টুনটুনি, চন্দনা, দোয়েল, কাদাখোঁচা, শ্যামা, ময়না, নীলকণ্ঠ, চাক দোয়েল, বেনেবউ, এমনকী একটা মোহনচূড়াও রয়েছে। পাখিগুলোর পায়ের কাছে সাদা কার্ডে ওদের পরিচয় লেখা—ঠিক যেমনটি জাদুঘরে থাকে।

এসিজি মাথার সাদা চুলে টান মেরে জানতে চাইলেন, 'ট্যাক্সিডার্মি করা এই পাখিগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে?'

চুনিলালবাবু বললেন, 'দাদার খেয়াল। বেশিরভাগই কেনা। তবে কয়েকটা বোধহয় নিজে অর্ডার দিয়ে করিয়েছেন।'

'চুনির ব্যাপারটা আমাদের একটু খোলসা করে বলুন—।'

চুনিলালবাবু ওঁদের কাছাকাছি একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ উশখুশ করে তারপর বললেন, 'আমি মণিরত্নের ব্যবসা করি। মানে, দামি পাথর কেনা-বেচা করি। নিজে পাথর কাটিংও করি, পালিশও করি। তবে সেরকম এক্সপার্ট নই। ছাদের দক্ষিণ দিকের একটা ছোট ঘরে আমার কাটিং মেশিন আর গ্রাইন্ডিং মেশিন আছে।'

'সে যাই হোক, পাথরের কাজকারবারে আমাকে প্রায় রোজই বটতলা আর মেছুয়ায় যেতে হয়। সেখানে মহাজনদের কাছ থেকে দরকার মতো মাল নিয়ে আসি। তো দিনসাতেক আগে মেছুয়াতে এক মহাজনের ঘরে আমি একটা বার্মিজ রুবি পেয়ে যাই। চুনিটার রং ঠিক পায়রার রক্তের মতো গাঢ় লাল। আর একেবারে বেদাগ।'

'আমি সেখানে গিয়েছিলাম খড় কিনতে—'

'খড় মানে?' চুনিলালকে বাধা দিয়ে জানতে চেয়েছেন এসিজি।

'খড় মানে একেবারে র'পাথর—যেটা দেখে দামি পাথর বলে একেবারেই বোঝা যায় না। সেগুলো অ্যাসিড ট্রিট করে ঠিকমতো কেটে পালিশ-টালিশ করতে পারলে অনেকগুলো দামি পাথর পাওয়া যেতে পারে। এর আগে বেশ কয়েকবার খড় কিনে আমি ভালো প্রফিট করেছি।'

'তারপর কী হল?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল রঘুপতি।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার একজন কোটিপতি কাস্টমার বার্মিজ চুনির কথা বলে রেখেছিল। এই চুনিটার হদিস পেতেই আমার মনটা নেচে উঠল। এটা তাকে বেচতে পারলে অন্তত থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট করা যাবে।'

'সেই কাস্টমারের নাম কী?' রঘুপতি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

চুনিলালবাবু অবাক চোখে তাকালেন রঘুপতির দিকে, বললেন, 'মাপ করবেন, ইন্সপেক্টর যাদব। কাস্টমারের নাম বলতে পারব না—ট্রেড সিক্রেট।'

মাথার সাদা চুলের গোছায় হাত চালিয়ে এসিজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাথরটার সাইজ কীরকম ছিল?'

চুনিলাল গোস্বামী ব্যবসায়ীর ঢঙে বললেন, 'প্রায় সাড়ে ন' রতি। মানে, পৌনে ন' ক্যারাট-এর কাছাকাছি।'

'ক্যারাট-এর হিসেব কেমন জট পাকিয়ে যায়', হেসে বললেন এসিজি, 'এক ক্যারাট মানে কত গ্রাম?'

'দুশো মিলিগ্রাম। এই পাথরটার ওজন প্রায় পৌনে দু-গ্রাম মতো ছিল। আর বেশ লম্বাটে।'

'ফির কেয়া হুয়া?' রঘুপতির ধৈর্যে যে ভালোরকম টান পড়েছে সেটা তার প্রশ্নের ঢঙেই বোঝা গেল।

চুনিলাল কী যেন চিন্তা করছিলেন। রঘুপতির প্রশ্নে চমকে উঠে বললেন, 'পাথরটা আমি চেনা মহাজনের কাছ থেকে দু-সপ্তাহের ধারে নিয়ে আসি। কিন্তু ওটা নিয়ে আসার পরদিন থেকেই কেউ আমাকে টেলিফোন করে হুমকি দিতে থাকে। বলে যে, পাথরটা যেন আমি কাউকে বিক্রি না করে সোজা আবার মহাজনের কাছে ফেরত দিয়ে আসি।'

'মিস্টার গুপ্ত, আমাদের হিরে-জহরতের লাইনে উড়ো টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার ব্যাপারটা নেহাতই মামুলি। তাই আমি প্রথম-প্রথম ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু দিনতিনেক যেতে-না-যেতেই হুমকির ব্যাপারটা সিরিয়াস চেহারা নিতে থাকে। মার্কেট থেকে কানাঘুষোয় খবর পেলাম, এতবড় বার্মিজ চুনি বাজারে বহুদিন আসেনি। তাই হিসেব-ছাড়া দাম দিয়ে কেনার মতো দু-তিনজন কাস্টমার নাকি ওটার জন্যে হন্যে হয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের এজেন্টরা নাকি মারাত্মকরকম ডেঞ্জারাস।'

'তখন আমি...' একটু থেমে চুনিলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তখন আমি ব্যাপারটা বড়দাকে খুলে বলি। বড়দা ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে একরকম পুত্র স্নেহে ছোট-ছোট ভাইদের মানুষ করেছেন। আমাদের বিষয়সম্পত্তি সজাগ হয়ে দেখাশোনা করেছেন। আমাদের সবরকম বিপদ-আপদ থেকে আগলে-আগলে রেখেছেন—' চুনিলালবাবুর চোখে জল এসে গেল। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, 'বড়দা চলে গিয়ে আমাদের মাথার ওপর থেকে বটগাছের ছায়া সরে গেল। আমার বিপদের কথা শুনে বড়দা আমাকে বললেন, ''তোর কোনও চিন্তা নেই। তুই চুনিটা আমার কাছে দে, আমি ওটা রেখে দেব। তারপর দেখি, কে ওটা আমার কাছ থেকে নিতে পারে!'' '

'আমি সেইমতো বড়দাকে পাথরটা দিয়ে দিই পরশুর আগের দিন—মানে, শুক্রবার। কিন্তু আশ্চর্য, তার পরদিন থেকেই সেই নাম-না-জানা লোকটা বড়দাকে যা-তা বলে শাসাতে থাকে।'

'দাদার একটাই দোষ ছিল—অল্পেতেই ভীষণ রেগে যেতেন। এই করে-করেই হার্টের ট্রাবল বাঁধিয়েছিলেন। আগে দু-বার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। তাই দাদা যখন লোকটার সঙ্গে টেলিফোনে চিৎকার করে কথা বলতেন তখন আমার ভয় করত। পরশু রাতেই আমি ঠিক করি, ঢের হয়েছে, চুনি বেচে প্রফিটে আর কাজ নেই। ওটা আমি মহাজনকে ফেরতই দিয়ে দেব। কিন্তু দাদাকে সে-কথা বলতেই তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। ফলে আমি গৃহশান্তির কথা ভেবে চুপ করে যাই।'

'তারপর...তারপর, কাল দুপুরে, ওই লোকটা আবার টেলিফোন করে। দাদা তখন এই ঘরে ওই চেয়ারটায় বসেছিলেন। দাদার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আমি পাখিঘরে ছুটে আসি। দাদা তখন টেলিফোনে বলছেন, ''আমি থাকতে কেউ চুনির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারবে না। আমাকে ভয় দেখানো অত সহজ নয়...।'' '

'আমি দাদাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কারণ, দাদার তখন চোখ-মুখ লাল, বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন। ভয় হচ্ছিল, খারাপ কিছু না একটা হয়ে যায়...।'

চুনিলালবাবু একটু থামতেই এতক্ষণ নীরবে সাক্ষী হয়ে বসে থাকা রঙ্গলাল বললেন, 'সেই মুহূর্তে আমিও ছুটে আসি/গজেনকেও পেলাম পাশাপাশি।'

চুনিলালবাবু বিরক্ত হয়ে তাকালেন ছোট ভাইয়ের দিকে, বললেন : 'আঃ, রঙ্গ, কী হচ্ছে! পদ্য নিয়ে পাগলামির একটা লিমিট থাকা দরকার। এখন কি একটু স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যায় না!'

রঙ্গলালের মুখে আহত ভাব ফুটে উঠল। তিনি মিনমিন করে স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'লিমিট থাকলে সেটা কখনও কবিতা হয় নাকি! কবিতার নামে সেটা তখন হয়ে যায় ফাঁকি...।'

'দোহাই, তোর স্বভাবকবিতা এবার বন্ধ কর।' চুনিলালবাবু যে বেশ রেগে গেছেন সেটা তাঁর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল।

একটু সময় নিয়ে তারপর তিনি খবর পড়ার মতো নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'তারপর আমাদের তিন ভাইয়ের চোখের সামনেই বুক খামচে ধরে বড়দা টেবিলে কাত হয়ে পড়েন। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই তিনি টেবিলে পড়েছিলেন বলে সেরকম আঘাত পাননি। কিন্তু বুকের কষ্টটা নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক হচ্ছিল। কারণ, তিনি বুকের কাছে হাত ঘষছিলেন বারবার। আর যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছিল তাঁর মুখ দিয়ে।

'আমি গজেনকে পাঠালাম পাড়ারই এক ডাক্তারকে তক্ষুনি ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, বড়দার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীর প্রায় স্থির। মুখ থেকে একটানা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

'বড়দা আমাকে বলেছিলেন, চুনিটা তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন যে, কেউ ওটা খুঁজে পাবে না। সে-কথা আমার মনে ছিল। তাই ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছি, ''বড়দা, চুনিটা কোথায় রেখেছ?''

'উত্তরে বড়দা গোঙানির মতো শব্দ করে দুবার বললেন, ''পেলি না গো, পেলি না গো—'', তারপরই সব শেষ।

'কাল দুপুর থেকে আমরা দাদার সৎকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর কাল সারা রাত ধরে আমি চুনিটার খোঁজ করেছি। বউদি ওই শোকের মধ্যেই আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছেন। আমাকে হয়তো সবাই অমানুষ ভাবছে, মিস্টার গুপ্ত, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বুঝুন। একে ওই হুমকি। তার ওপর চুনিটার দাম প্রায় পৌনে দু-লাখ টাকা। মহাজনকে যে এক কথায় দাম দিয়ে দেব তারও উপায় নেই। তাই মরিয়া হয়ে লোকজন ধরে লালবাজারে খবর দিয়েছি।'

কথা শেষ করে চুনিলালবাবু মাথা নিচু করলেন। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন কয়েকবার।

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা সব জায়গা খুঁজে দেখেছেন? সিন্দুক-টিন্দুক, ব্যাঙ্কের লকার—সব?'

চুনিলালবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, 'আজ সকালেই বউদিকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়েছিলাম। লকারে ওটা নেই।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে-করতে চলে গিয়েছিলেন পাখির ঝাঁকের কাছে। রংবেরঙের পাখিগুলো দেখতে-দেখতে কল্পনায় যেন ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। ঘাড়ের কাছে সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। তারপর দূর থেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন চুনিলালবাবুর দিকে, 'কোনও জায়গায় খুঁজতে বাকি রাখেননি? সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন?'

চুনিলালবাবু বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, প্রাণের দায়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। যে করে হোক চুনিটা মহাজনকে ফেরত দিয়ে আমাকে আগে প্রাণে বাঁচতে হবে।'

পাখিগুলো ভীষণ আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন এসিজি। আর একইসঙ্গে কী যেন ভাবছিলেন।

নিচের তলা থেকে একটা বাচ্চার কান্না ভেসে এল। সেই সঙ্গে কোনও মহিলার বকাবকির শব্দ।

রঙ্গলালবাবুও বোধহয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন, 'মেজদা, এমনও তো হতে পারে, বড়দা মারা যাওয়ার সময় চুনিটা কোথায় আছে সেটা বলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন...।'

বোঝা গেল, মেজদার ধমকে স্বভাবকবি তাঁর কাব্য প্র্যাকটিস আপাতত মুলতুবি রাখার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু রঙ্গলালবাবুর কথায় ঝটিতি ঘুরে তাকালেন থিঙ্কিং মেশিন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। দু-ভাইয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'শেষ কথাটা আপনারা ঠিক শুনেছিলেন?'

চুনিলাল ইতস্তত করে বললেন, 'আমার তো ''পেলি না গো'' বলেই মনে হয়েছিল। গোঙানির মধ্যে স্পষ্ট করে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'তুই কী শুনেছিস, রঙ্গ?'

একটু আমতা-আমতা করে রঙ্গলাল বললেন, 'আমার...আমার যেন ''গেলি না গো'' বলে মনে হয়েছিল...।'

'এর তো বাংলাটাও গণ্ডগোলের।' এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'বাক্যের প্রথমটা ''তুই'' সম্বোধনে, আর শেষটা ''তুমি''...কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে...।'

রঘুপতি যাদব বেশ চিন্তিতভাবে রঙ্গলালবাবুকে বলল, 'আপনি ওই শেষ কথাটা একবার আপনার বড়দার মতো করে বলে শোনাতে পারেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় এ তো কোনও শক্ত কাজ নয়।' মেজদার দিকে একপলক তাকিয়ে রঙ্গলাল সোজা গিয়ে শ্যামসুন্দরলালবাবুর চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'গেলি না গো, গেলি না গো!'

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান হয়ে গেলেন এসিজি। হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

ঘরের সকলেই তো এসিজির কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক।

রঘুপতি অবাক সুরে বলল, 'স্যার, কেয়া বাত হ্যায়? কোই চুটকুলা ইয়াদ আয়া?'

কোনওরকমে হাসি থামিয়ে এসিজি বললেন, 'চুটকুলা মানে, চুটকিই বটে, রঘুপতি। আশা করি তোমার মিস্ট্রি সলভ হয়ে গেছে।' চুনিলালবাবুকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'একটা চিমটে এনে দিন। আপনার অমূল্য চুনি বোধহয় আমি খুঁজে দিতে পারব।'

কথাটা শোনামাত্রই রঙ্গলালবাবু তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন, হাতে একটা লম্বা চিমটে—যা দিয়ে অনায়াসে কোনও দৈত্যের মাথার পাকাচুল বাছা যায়।

রঙ্গলালের পিছু-পিছু যিনি এলেন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি গজেন্দ্রলাল। চুনিলালবাবু তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় কীসব বলতে লাগলেন।

কিন্তু ততক্ষণে রঙ্গলালবাবুর হাত থেকে চিমটে নিয়ে স্টাফ করা পাখিগুলোর একটার কাছে গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন অশোকচন্দ্র।

পাখিটা মাপে পায়রার চেয়ে ছোট। মেটে রঙের শরীরে কালো ছোপ-ছোপ দাগ। পেটের দিকটা সাদা। আর সরু লম্বা ঠোঁট।

এসিজি ওঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এই পাখিটার নাম কাদাখোঁচা। মাছ, শামুক-টামুক খায়। নাকি সুরে ডাকে। গ্রাম-বাংলার সব জায়গাতেই দেখা যায়। এটার ডান চোখটা দেখুন—দেখেই বোঝা যায়, এটা নিয়ে কারিকুরি করেছে কেউ...।'

এসিজি কথা বলতে-বলতেই ডান চোখের পুঁতিটা খুঁচিয়ে তুলে চিমটে দিয়ে তার ভেতরটা আরও ভালো করে খোঁচাচ্ছিলেন।

হঠাৎই বেরিয়ে পড়ল হারানো চুনিটা। মেঝেতে ঠিকরে পড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর থামল।

ঘরের আলোয় ওটা লাল আভা ছড়িয়ে চিকচিক করতে লাগল।

একটা অস্ফুট শব্দ করে চুনিলালবাবু ছুটে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন লাল টুকটুকে পাথরটা। ওটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে আবেগ থরথর গলায় বললেন, 'মা তারা ব্রহ্মময়ী!'

তারপর পাথরটা শার্টের বুকপকেটে রেখে এসিজির হাত চেপে ধরে বললেন : 'মিস্টার গুপ্ত, আপনি দেবদূত হয়ে আজ আমাকে বাঁচালেন—।'

এসিজি হেসে বললেন, 'আমি নয়, আপনাকে বাঁচিয়েছেন রঙ্গলালবাবু। উনি ঠিকই বলেছেন। শ্যামসুন্দরলালবাবু মারা যাওয়ার সময় ''পেলি না গো, পেলি না গো'' বলেননি, উনি বলেছিলেন, ''গেলিনাগো গেলিনাগো''। কথাটা বাংলা নয়—কাদাখোঁচা পাখির বৈজ্ঞানিক নাম। এই দেখুন, এই কার্ডে ইংরেজি আর ল্যাটিন নাম—দুটোই আছে।'

সকলে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল কার্ডে লেখা নাম দুটো :

Fantail Snipe (gallinago gallinago)

রঘুপতি যাদব এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানিয়ে এসিজিকে বলল : 'স্যার, য়ু আর এ জিনিয়াস!'

অশোকচন্দ্র নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সে শুধু তোমার মতে, রঘুপতি। নাও, এবার চলো—।'

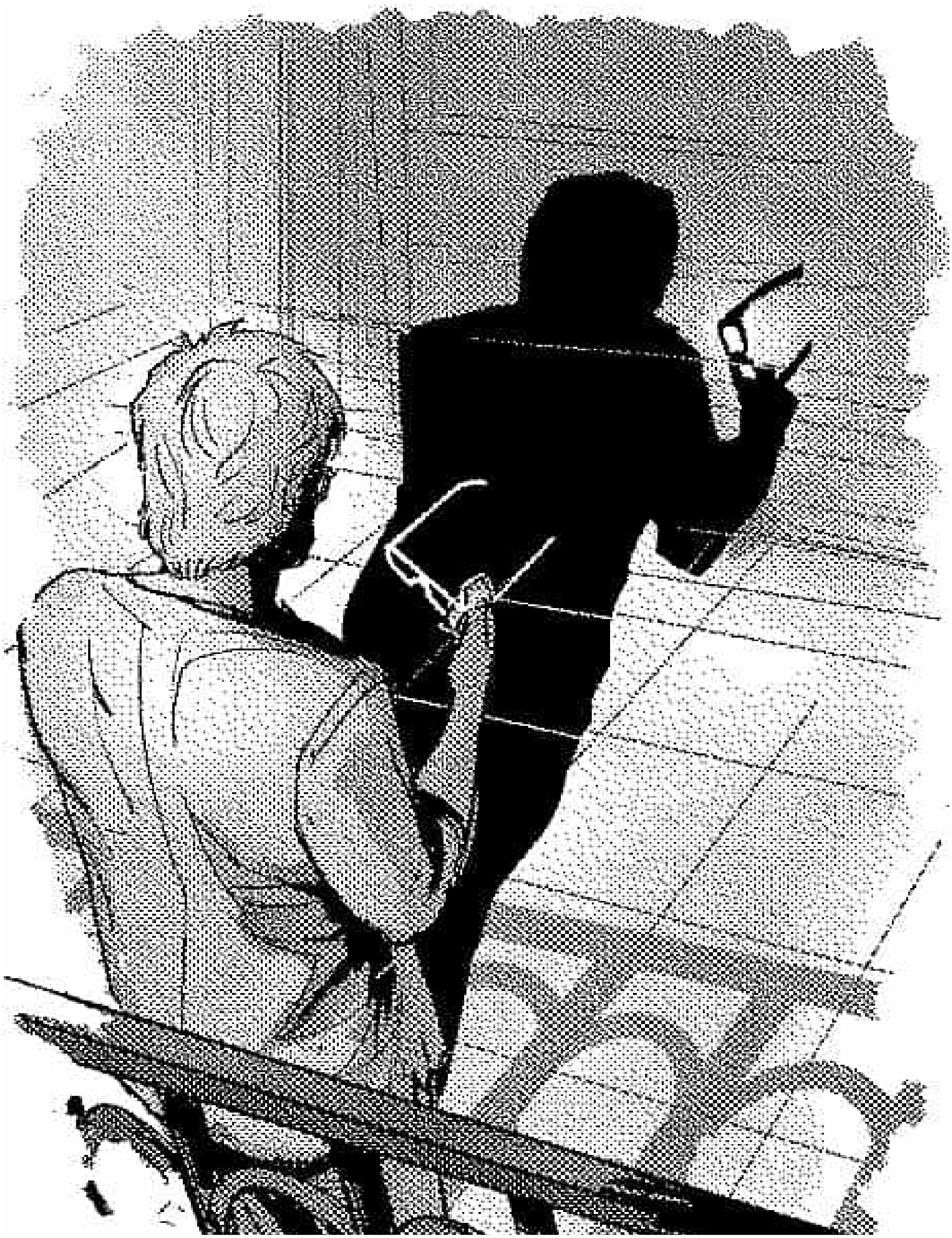
রঙ্গলালবাবু এসিজির সামনে এসে জোড়হাত করে দাঁড়ালেন। আকর্ণ হেসে ছন্দে বললেন, 'প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানী ছিলেন অ্যারিস্টটল/আপনি আরও জ্ঞানী দুঁদে ব্যারিস্টটল।'

এসিজি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যারিস্টটল মানে!'

'ওই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশান—' মাথা নামিয়ে বিনয়ের হাসি হেসে রঙ্গলাল বললেন : 'কবিতার শেষটা মেলানোর জন্যে ব্যারিস্টার আর অ্যারিস্টটলের সন্ধি করেছি—।'

আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

ছাইয়ের আড়ালে





খুন-জখমের পক্ষে দিনটা মোটেই আদর্শ ছিল না।
শীতের সবে শুরু।

আকাশ মেঘলা, থমথমে, আর নির্জন। সেখানে একটিও পাখি উড়ছে না। প্রতিটি গাছের পাতা স্থির, চুপচাপ। সব মিলিয়ে প্রকৃতির সর্বাঙ্গে যেন অবসাদ আর ক্লান্তির ছাপ।

দোতলার ফ্যাটের জানলার কাছে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে কীসব ভাবছিলেন অধ্যাপক অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি।

মেয়ে ঊর্মিলাকে অনেকদিন পর তিনি লম্বা চিঠি লিখতে বসেছেন। চিঠিতে 'লালমহল'-এর স্বভাবকবি রঙ্গলাল গোস্বামীর প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। এসিজি লিখেছেন : '...এই বিচিত্র কবি ভদ্রলোক কীভাবে আমার প্রশংসা করেন তার কয়েকটি নমুনা তোকে শোনাই। তুই তো আমাকে গোয়েন্দা বলে মনেই করিস না! অথচ এই ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে কী-কী বলেছেন শোন, ''প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানী ছিলেন অ্যারিস্টটল/আপনি আরও জ্ঞানী দুঁদে ব্যারিস্টটল।'' ' কিংবা ' ''আমি আপনার গুণমুগ্ধ/ আপনি যেন খাঁটি দুগ্ধ!'' ' আবার ' ''গোয়েন্দা, পক্ষিবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী/ অমর, আকবর, এবং অ্যান্টনি।'' ' আর সবশেষে ' ''দেখে আপনার তীকষ্ণবুদ্ধি/ হলেম আমি নিহতবুদ্ধি।'' '

'আমি তোর বাবা বলেই তুই আমাকে গোয়েন্দা হিসেবে পাত্তা দিস না। নইলে...'

উইলস ফিলটারে চোস্ত টান দিয়ে আপনমনেই হাসলেন অশোকচন্দ্র। ছোটবেলা থেকেই বরাবর ঊর্মিলাকে প্রশংসায় অবিচল থাকার উপদেশ দিয়ে এসেছেন। অথচ আজ স্বভাবকবি রঙ্গলালের কথা বলতে গিয়ে, মেয়ের সঙ্গে চিঠিতে মজা করতে গিয়ে, সেইসব উদ্ভট ধরনের প্রশংসায় তিনি নিজেই অল্পসল্প তৃপ্তির আমেজ টের পাচ্ছেন।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন এসিজি।

যা ভেবেছেন তাই। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

'গুড মর্নিং, স্যার, রঘুপতি বলছি।'

'বলো।'

'মুড খারাপ করার জন্যে মাফ চাইছি। তবে ব্যাপারটা ক্লোজড রুম প্রবলেম। ইসি লিয়ে আপকো ডিসটার্ব কর রহা হুঁ।'

'কেউ মারা গেছেন নাকি?' কৌতূহলী হলেন এসিজি।

'হ্যাঁ। ওল্ড ম্যান পরমেশ্বর সরকার।'

'মার্ডার?' মাথার সাদা চুলের গোছায় কয়েকবার টান মেরে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দা।

'সেটাই তো পারফেক্টলি ক্লিয়ার নয়। দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক।'

এসিজি একপলক আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি চলে এসো। আর রওনা হওয়ার আগে রঙ্গলালবাবুকে একটা ফোন করে দিয়ো। ওর ফোন নাম্বারটা লিখে নাও...।'

ফোন নম্বরটা বলার পর এসিজি যেন আপনমনেই মন্তব্য করলেন, 'লালমহলের রঙ্গলাল/দেখা হয়নি বহুকাল।'

তারপর ফোন রেখে দিয়ে ঊর্মিলার চিঠিটা শেষ করতে বসলেন।

হাতের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই নতুন আর-একটা সিগারেট ধরালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

কলিংবেলের শব্দটার মধ্যে রঘুপতির বাজানো চেনা সুর ছিল না। সুতরাং দরজা খুলতেই যে রঙ্গলাল গোস্বামীর মুখোমুখি হবেন সেটা এসিজি ভেবেই রেখেছিলেন।

পরনে হাফহাতা পাঞ্জাবি, ধুতি, আর হালকা বাদামি শাল। তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুলের মাঝবরাবর সিঁথি। ছোট-ছোট চোখ, কপালের বাঁদিকে একটা ছোট আঁচিল। সামান্য ঘামে ভেজা মুখে প্রসাধনের ছাপ।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে রঙ্গলাল বললেন, 'বহুদিন পরে এলাম/ গোয়েন্দাকে কবির সেলাম।'

রঙ্গলালের ঠিক পিছনেই ছিল রঘুপতি যাদব। প্রথম-প্রথম রঙ্গলালের আচরণে কিছুটা বিরক্ত হলেও এখন রঘুপতি ব্যাপারটা মানিয়ে নিয়েছে। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় এখন ও স্যারের মতো মজাই পায়।

ড্রইংরুমে তিনজনে গুছিয়ে বসামাত্রই রঘুপতি ওর কাজের কথা শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাক্তন ছাত্রকে বাধা দিলেন অশোকচন্দ্র। বললেন, 'রঘুপতি, আগে একটু আরাম করে কফি খাও, তারপর শুরু করো তোমার রাজধানী এক্সপ্রেস—।'

জানলার বাইরে শীতের সন্ধে নেমেছে। এসিজির ঠিকে কাজের লোক 'ললিতের মা' আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। তবে বছর তেরো বয়েসের 'কম্বাইন্ড হ্যান্ড' বিশু রয়েছে। একটু আগেই এসিজির জন্য দু-প্যাকেট সিগারেট এনে দিয়েছে ও। নিজের কাজের ঝক্কি কমাতে এসিজি ওকে কফি তৈরি করা শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন ওকে ডেকেই তিনকাপ কফির ফরমাশ করেছেন।

কফি খেতে-খেতে টুকটাক কথা হচ্ছিল। তারই মধ্যে রঙ্গলাল গোস্বামী হঠাৎ জানালেন, 'আমার একটা কবিতার বই বের করছি।'

অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, 'এ তো খুবই ভালো খবর। তা কবে বেরোচ্ছে বইটা?'

'সামনের মাসের অমাবস্যায়। বইয়ের নাম দিয়েছি ''স্বভাবকবিতাসমগ্র''।'

রঘুপতি যাদব জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ অমাবস্যায় রিলিজ করছেন কেন?'

রঙ্গলাল লাজুক হেসে বললেন, 'আমি মা-কালীর একটু ইয়ে কিনা...। আমার স্বভাবকবিতার প্রথম বই...তাই ঈশ্বরের একটু-আধটু ইয়ে দরকার...।'

রঘুপতি মুচকি হেসে তাকাল এসিজির দিকে। এসিজি তখন কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বললেন, 'ঈশ্বর এখন থাক। বরং পরমেশ্বরের কথা শুনি—পরমেশ্বর সরকার। বলো, রঘুপতি, শোনাও তোমার ''বন্ধ ঘরের রহস্য''।'

রঘুপতি যাদব গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করল তার কাহিনি।

পরমেশ্বর সরকারের বাড়ি কেশব সেন স্ট্রিটে—আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকায়। ওঁরা কয়েক পুরুষের বনেদি বড়লোক—রইস আদমি বলতে যা বোঝায় তাই। কলকাতা আর তার আশেপাশে ওঁদের প্রায় গোটা আটেক সিনেমা হল আছে। এ ছাড়া জমিজমা আর বাড়ির কোনও হিসেব নেই।

পরমেশ্বর সরকারের বয়েস হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর। ভদ্রলোক বিপত্নীক। তাঁর এক ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলে অর্কদেবের বয়েস পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে, বউয়ের নাম সুভদ্রা। ওঁদের বছর আট-দশের পিঠোপিঠি দুই ছেলে—তুতুন আর মিমো।

অর্কদেবের পরের বোনের নাম ঈশানী। বছর পনেরো আগে বিয়ে হয়ে গেছে। ঈশানী দিনসাতেক হল বাপের বাড়িতে এসে রয়েছেন।

পরমেশ্বরবাবুর ছোট মেয়ে হিমানীর বয়েস প্রায় চল্লিশ হবে। বিয়ে করেননি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্সে এম. এসসি. করার পর সেখানেই ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণা করছেন।

ঘটনা ঘটেছে আজ সকালে।

দোতলায় পুবদিক ঘেঁষে পরমেশ্বরবাবুর পড়াশোনার ঘর। ঘরের লাগোয়া বড় বারান্দা। সেখানে আরামকেদারা আর টেবিল পাতা থাকে। পরমেশ্বরবাবু সেখানে বসে দিনের অনেকটা সময় কাটাতেন। কখনও চায়ের কাপ হাতে আয়েস করতেন, কখনও বা বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করতেন।

আজ সকালে ন'টা নাগাদ অর্কদেব হঠাৎ দেখেন পরমেশ্বরবাবু তাঁর ঘরে একটা চেয়ারে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসে আছেন। তাঁর সামনে টেবিলে আধ কাপ চা, অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেট, আর তার পাশেই

খানিকটা পোড়া ছাই।

বারান্দার দিকের কাচের জানলা দিয়ে অর্কদেব তাঁর বাবাকে ওই অবস্থায় দেখতে পান। কেমন যেন সন্দেহ হওয়ায় তিনি দরজার কাছে গিয়ে বাবাকে ডাকতে থাকেন। তারপর কোনও সাড়া না পেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত লোকজন জড়ো করে অর্কদেব দরজা ভাঙতে বাধ্য হন। সে সময় দু-বোন তাঁর কাছেই ছিলেন।

ঘরের সব ক'টা জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সুতরাং ব্যাপারটা সহজ-সরল আত্মহত্যা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ডাক্তারি পরীক্ষায় চায়ের কাপে পোকামাকড় মারার বিষও পাওয়া গেছে। আর পোস্ট মর্টেমের প্রাথমিক খবর অনুযায়ী সরকারসাহেবের পাকস্থলীতে ওই একই বিষের হদিস মিলেছে।

কিন্তু সবকিছু মিলে যাওয়া সত্ত্বেও একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে, পরমেশ্বরবাবু সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে মারা গেছেন। অথচ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অর্কদেববাবুরা চায়ের কাপে সামান্য গরম চা পেয়েছেন। এ ছাড়া জ্বলন্ত সিগারেটের ব্যাপারটাও সমস্যা বাঁধিয়েছে।

এমনিতে পরমেশ্বরবাবু প্রায় দশ বছর হল ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কখনও-সখনও কাজের লোকদের দিয়ে এক-আধটা আনিয়ে খেতেন। অথচ সমস্যা হল, তাঁর ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও দেশলাই বা সিগারেট লাইটার পাওয়া যায়নি। আর শেষ সমস্যা ওই ছাই।

ধারাবিবরণী শেষ করে একটা জোরালো দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটুতে চাপড় মারল রঘুপতি, বলল, 'এইজন্যেই স্যার আপনাকে ফোনে বলেছি, মার্ডার না সুইসাইড ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক।'

এসিজি রোগা শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে হাতের ছোট-হয়ে-আসা সিগারেটের টুকরোটাকে টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। সামান্য হেসে প্রশ্ন করলেন, 'সুইসাইড বা মাডার যা-ই হোক, কেসটা তোমার কাছে গেল কেমন করে?'

তেতো হাসল রঘুপতি। তারপর বৃদ্ধ হুনুরের চোখে তাকিয়ে বলল, 'সিরফ আপকে লিয়ে, স্যার।'

এসিজি অবাক হয়ে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আমার জন্যে! তার মানে? ঠাট্টা করছ?'

হাসল রঘুপতি যাদব, বলল, 'আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ও. সি. বিজন শর্মা আমার খুব বন্ধু। আমার কাছে ও আপনার কথা অনেক শুনেছে। আপনার পিকিউলিয়ার ইন্টারেস্টের কথা ও জানে। তাই পি. এম. রিপোর্টের খবর পাওয়ামাত্রই আমাকে ফোন করে সব জানিয়েছে। আপনি চাইলে কাল আমরা পরমেশ্বর সরকারের বাড়ি ভিজিট করতে পারি। অব আপকি মরজি—।'

রঙ্গলালবাবু, এতক্ষণ চুপটি করে বসে রঘুপতির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এখন হঠাৎই সক্রিয় হয়ে এসিজিকে অনুরোধের সুরে বললেন, 'অবশ্যই যেতে হবে গোয়েন্দাপ্রবর/সুইসাইড না মার্ডার—রহস্য জবর।'

দু-হাতের দশ আঙুল মাথায়-মাথায় ঠেকালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েক সেকেন্ড আপনমনে কী যেন ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে রঘুপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাব তো নিশ্চয়ই, তবে তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

রঘুপতি ব্যাজার মুখ করে বলল, 'মাফ করনা, গুপ্তাসাব। আপনার যা কিছু কোয়েশ্চেন আছে সব কাল শর্মাকে করবেন। ও অনেক বেটার উত্তর দিতে পারবে। আমি বরং ওকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। যদি বলেন, কাল আমি আর ও আপনার এখানে চলে আসব। তারপর একসঙ্গে স্টার্ট দেব—।'

অশোকচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, 'তুমি শর্মাকে নিয়ে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে এখানে চলে এসো। কারণ, আমি আটটা থেকে ন'টার মধ্যে পরমেশ্বরবাবুর ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে চাই।'

এসিজির কথায় রঘুপতি তেমন একটা ভরসা পেল না। অস্পষ্ট স্বরে ও বলল, 'শর্মা তো সব ছানবিন করে দেখেছে। আপনি কি আর নতুন কিছু পাবেন?'

রঘুপতির কথায় অশোকচন্দ্র হাসলেন। মাথার সাদা চুলের গোছায় বারকয়েক টান মেরে বললেন, 'তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, রঘুপতি? তুমি জানো, তোমার ওই শর্মাকে দিয়ে যা হবে না তা এই শর্মাকে দিয়ে হতেও পারে—তাই না? ঠিক আছে, তুমি যাতে হতাশ না হও সে-চেষ্টা আমি করব। নাউ চিয়ার আপ। এসো, একটু জমিয়ে গল্প করা যাক।'

রঙ্গলাল গোস্বামী হাতে হাত ঘষে বললেন, 'এসিজি স্যার, একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই বলুন।'

চোখ নামিয়ে সঙ্কুচিতভাবে রঙ্গলাল বললেন, 'যাতে কথাটা মোলায়েম শোনায় তাই স্বভাবকবিতায় বলছি। ''অকুস্থলে তিনজন মহা অনাচার/রঙ্গলাল সঙ্গী হলে সংখ্যা হবে চার।'' এর ইনার মিনিংটা বুঝতে পারলেন, স্যার?'

অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। কাল সকালে তিনজন নয়, চারজন একসঙ্গে রওনা হব। তা না হলে আপনি আমার তদন্তরসে বঞ্চিত হবেন, আর আমরা বঞ্চিত হব আপনার কাব্যরস থেকে। এবার আপনার কয়েকটা কবিতা শোনান দেখি।'

'কবিতা নয়, স্বভাবকবিতা।' এসিজিকে শুধরে দিলেন রঙ্গলাল।

বাড়িটার নাম 'সরকারভিলা' শুধু নামে নয়, কাজেও।

প্রায় আট কাঠা জায়গা জুড়ে তিনতলা বাড়ি, আর লাগোয়া ছোট বাগান। বাড়িটার রং হালকা সবুজ। তবে বারান্দা আর জানলায় গাঢ় সবুজের বর্ডার দেওয়া।

সদরের বিশাল লোহার গেট খুলে দিল উর্দি পরা দারোয়ান। এসিজি, বিজন শর্মা, রঘুপতি যাদব আর রঙ্গলাল গোস্বামী ভেতরে ঢুকলেন।

সামনেই শান বাঁধানো বিশাল চাতাল। সেখানে দুটো নাদুস-নুদুস বাচ্চা ছেলে লাল রঙের একটা বল নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে। ওদের বয়েস আট-দশ বছর হবে। পরনে টি-শার্ট, সোয়েটার আর হাফ প্যান্ট।

দারোয়ানের প্রশ্নের উত্তরে বিজন শর্মা বলেছেন যে, ওঁরা অর্কদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান। দারোয়ান তখন ইশারা করে বাঁদিকের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।

বাড়িটা সদর দরজার বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বাড়ি আর উঠোন পেরোলেই শুরু হয়ে গেছে বাগানের এলাকা। সদরের কাছ থেকেই বাগানের বেশ কয়েকটা গাছের মাথা নজরে পড়ছিল।

বাঁদিকের দরজা লক্ষ করে এগোতেই ডানপাশে গ্যারেজ চোখে পড়ল। সেখানে একটা মারুতি জেন, আর একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে।

মার্বেল পাথর বাঁধানো দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠলেই বড় মাপের ভারী কাঠের দরজা। যিনি দরজা খুললেন তাঁকে দেখেই অর্কদেব সরকার বলে মনে হল এসিজির।

টকটকে ফরসা গায়ের রং। পরনে সামান্য লাট হয়ে যাওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি। তার ওপরে একটা সাদা শাল জড়ানো। চোখে চশমা। মুখের চামড়ায় বয়েসের ভাঁজ পড়েছে। কাঁচা-পাকা চওড়া গোঁফ, জোড়া ভুরু, চোখের তারায় কটা ভাব, মাথার এলোমেলো চুল বেশ পাতলা হয়ে এসেছে।

বিজন শর্মা সৌজন্যের হাসি হেসে বললেন, 'নমস্কার, অর্কদেববাবু। কাল রাতে আপনাকে তো ফোন করে বলে রেখেছিলাম। ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত আপনার বাবার...মানে...ইয়ের ব্যাপারে আমাদের একটু হেলপ করতে এসেছেন।'

চঞ্চল চোখ ঘুরিয়ে অর্কদেব এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আপনি ডাক্তার?'

মাথার চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে এসিজি বললেন, 'হ্যাঁ, লেখাপড়ার ডাক্তার। আরও ভালো করে বলতে গেলে ফিজিক্সের ডাক্তার।'

অর্কদেব অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন, বললেন, 'সরি, কিছু মনে করবেন না। আসুন, ভেতরে আসুন বসুন।'

ওঁরা চারজন বসবার ঘরে ঢুকলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা যেন পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেল।

ঘরের মেঝেতে চকচকে ইটালিয়ান মার্বেল পাথর বসানো। ডানদিকে পুরোনো ধাঁচের কারুকাজ করা ডিভান—বোধহয় মেহগনি কাঠের তৈরি। সোফা-সেটি যেন কারুকাজ করা ছোটখাটো সিংহাসন। ডিভানের পাশে দাঁড় করানো প্রায় আলমারির মাপের এক বিচিত্র পিতামহ-পেন্ডুলাম-ঘড়ি। তার নকশা কাটা পেন্ডুলামের সামনে ঝুলছে তিনটে পিতলের চোঙ। ঘণ্টি বাজানোর কাজটা বোধহয় ওরাই করে।

বাঁদিকে জানলার কাছে একটা সুদৃশ্য টেবিলে রাখা আছে দুটো টেলিফোন—একটা পুরোনো ধাঁচের, আর-একটা আধুনিক। সিলিং থেকে ঝোলানো রয়েছে সিলিং পাখা। তবে নজর করে দেখলে সেখানে ব্রিটিশ আমলের হাতে টানা পাখার আংটাও চোখে পড়ে।

সোফায় বসে অশোকচন্দ্র ঘরটাকে জরিপ করে দেখছিলেন।

এখানে আসার পথে ও. সি. বিজন শর্মা আর রঘুপতি যাদবের কাছে যা-যা শুনেছেন তাতে সরকাররা লাখপতি নয়, কোটিপতি। ওঁরা প্রায় চার পুরুষের ধনী।

পোস্ট মর্টেমের পর পরমেশ্বরবাবুর মৃতদেহ এখনও অর্কদেবরা হাতে পাননি। বিজন শর্মা সামান্য অপরাধী-সুরে জানালেন, 'ডেডবডি পেতে-পেতে হয়তো বিকেল হয়ে যাবে।'

অর্কদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের কোণ মুছে নিলেন, বললেন, 'আমাদের যা-কিছু দেখছেন সবই বাবার দান। বাবাকে আমরা সবাই খুব শ্রদ্ধা-সমীহ করতাম। হঠাৎ কেন যে উনি সুইসাইড করলেন...যদিও কিছুদিন ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।'

শর্মা একটু গলাখাঁকারি দিলেন। তারপর সকলের সঙ্গে অর্কদেবের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'ওই সুইসাইডের ব্যাপারটা নিয়েই খানিকটা গোলমাল থেকে গেছে। সেইজন্যেই ডক্টর গুপ্তকে রিকোয়েস্ট করে নিয়ে এসেছি।'

'গোলমাল! কীসের গোলমাল?' শোকের মধ্যেও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন অর্কদেব।

রঘুপতি ভুরু কুঁচকে অর্কদেবকে দেখছিল। এসিজি বুঝতে পারলেন, ও যদি সরাসরি এই কেসের দায়িত্বে থাকত তা হলে এখনই হয়তো রুক্ষভাবে কিছু বলে বসত।

বিজন শর্মা শান্তভাবে নরম গলায় বললেন, 'মিস্টার সরকার, আপনার বাবার ঘরের দরজা-জানলা ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ ছিল। সেই অবস্থায় টেবিলে জ্বলন্ত সিগারেট আর কাগজপোড়া ছাই পাওয়া গেল—অথচ ঘরের কোথাও দেশলাই কিংবা লাইটারের চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য দেশলাই কি লাইটার পাওয়া গেলেও আমাদের সন্দেহ থেকে যেত ওই সিগারেট পরমেশ্বরবাবু আদৌ ধরিয়েছেন কিনা। কারণ, উনি মারা গেছেন সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে, অথচ সিগারেটটা ন'টার সময়েও জ্বলছিল। সুতরাং অন্য কেউ নিশ্চয়ই ওই সিগারেট ধরিয়েছে, কাগজ পুড়িয়েছে। কিন্তু...।'

শর্মার কথার খেই ধরে রঘুপতি বলল, 'লেকিন অওর কোই যদি সিগারেট জ্বালাবে তো সে দরওয়াজা-খিড়কি বন্ধ করে ঘর থেকে পালাবে কেমন করে?'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত অর্কদেব সরকারের অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। সেটায় গভীর টান দিয়ে আমেজে চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন, 'সুইসাইড হোক বা হোমিসাইড হোক, তাতে আপনার তো কোনও প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, অর্কদেববাবু!'

'না, তা নয়...তবু...।'

রঙ্গলাল গোস্বামী এই প্রথম মুখ খুললেন, 'আসলে এসিজি স্যার জানতে চান : "সুইসাইড, না হোমিসাইড/খাঁটি গোল, না সেমসাইড।" '

অর্কদেব অবাক হয়ে রঙ্গলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাইরের উঠোনে বাচ্চা দুটো 'গোল! গোল!' করে প্রবল চিৎকার করছিল। অর্কদেব বিরক্ত হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে গেলেন জানলার কাছে। চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, 'তুতুন! মিমো! কী হচ্ছে! গোলমাল কোরো না—এখানে আমি গেস্টদের সঙ্গে কথা বলছি।'

সাময়িকভাবে বাচ্চাদুটোর চেঁচামেচি কমে গেল।

এসিজি অর্কদেবকে বললেন, 'আমি আপনার বাবার ঘরটা একবার দেখব।'

পেন্ডুলাম-ঘড়িতে মিষ্টি সুরে সাড়ে আটটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

ওঁরা উঠে দাঁড়াতেই কোথা থেকে একটা বড়সড় মাপের কানঝোলা লোমওয়ালা কুকুর ঘরে এসে ঢুকল। কুকুরটার গায়ের রং উজ্জ্বল হলদে-বাদামি। সামান্য লেজ নেড়ে কুকুরটা অর্কদেব সরকারের পায়ের কাছে গা ঘষতে লাগল।

এসিজি কুকুরটার জাত চিনতে পারলেন : গোল্ডেন রিট্রিভার।

অর্কদেব কুকুরটাকে 'টমি! টমি! গো।' বলতেই ওটা গম্ভীর চালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এসিজিকে উদ্দেশ করে অর্কদেব বললেন, 'চলুন, ওপরে চলুন। মিস্টার শর্মা তো ঘরটা সিল করে রেখে গেছেন—।'

বিজন শর্মা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ। চলুন, খুলে দিচ্ছি।'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে মার্বেল পাথরের খাটো স্তম্ভ। সেখান থেকে শুরু হয়ে গেছে পালিশ করা কাঠের মসৃণ রেলিং।

মার্বেল পাথরের ধাপে পা ফেলে ওঁরা ওপরে উঠতে যাবেন, ঠিক তখনই তুতুন আর মিমো ছুটে চলে এল ওঁদের কাছে।

বয়েসে সামান্য ছোট ছেলেটি বল আঁকড়ে ধরে লুকিয়ে পড়তে চাইল অর্কদেবের পিছনে। একইসঙ্গে অনুযোগের সুরে বলল, 'দ্যাখো না বাপি, দাদা আমার থেকে বল কেড়ে নিচ্ছে।'

বড়জন প্রতিবাদে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, অর্কদেব তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বললেন : 'তুতুন, কেন এরকম অসভ্যতা করছ! বলো তো, ওঁরা কী ভাববেন!'

তারপর এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার দুই ছেলে...ভীষণ দুরন্ত...।'

এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাচ্চা দুটোকে বললেন, 'তোমাদের দুজনকে একটা ইন্টারেস্টিং ধাঁধা দিই, সলভ করতে পারলে প্রাইজ পাবে।'

এ-কথা শুনেই গোলগাল দু-ভাই ঝগড়া ভুলে এসিজির কাছে চলে এল।

এসিজি বললেন, 'বলো তো, একটা মশা আর একটা মাছির লড়াই হলে কে জিতবে?'

সঙ্গে-সঙ্গে দুজনে হাঁ করে ভাবতে শুরু করল।

এসিজি হেসে ওদের বললেন, 'উত্তরটা ভেবে পেলেই আমাকে বলে যাবে—আমি দোতলায় তোমাদের ঠাকুরদার ঘরে আছি।'

ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন।

অশোকচন্দ্রের প্রশ্নটা শোনার পর থেকেই রঙ্গলাল গুম হয়ে কী যেন ভাবছিলেন। সেই ভাবুক ভাবটা বজায় রেখেই তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'প্রশ্নটা বড় কঠিন, বড় ইন্টারেস্টিং/মশা জেতে, নাকি মাছি, করিলে ফাইটিং।'

বিজন শর্মা আর অর্কদেব অবাক হয়ে রঙ্গলালকে দেখলেন। অর্কদেবের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসিও দেখা গেল।

প্রাচীন বিলাসবহুল বাড়িটার প্রতিটি অংশই এসিজিকে মুগ্ধ করছিল। দোতলায় উঠতে-উঠতে তিনি মনে-মনে ভাবছিলেন এইবার বোধহয় একটা বড়সড় পাখির খাঁচা দেখতে পাবেন, অথবা দাঁড়ে বসা অস্ট্রেলিয়ার অপূর্ব কাকাতুয়া।

কিন্তু এসিজিকে হতাশ হতে হল। তবে অর্কদেবকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনতলার ছাদে পাখির খাঁচা একটা ছিল—দেশি-বিদেশি বহু পাখিও ছিল সেখানে। কিন্তু কী এক মড়ক লেগে রাতারাতি সব পাখি মারা যায়। তারপর থেকে পরমেশ্বর আর পাখি পোষেননি।

দোতলায় উঠে পরমেশ্বর সরকারের ঘরের দিকে এগোতে-এগোতে মহিলা-কণ্ঠের কথা শোনা গেল। তার একটু পরেই চওড়া বারান্দার লাগোয়া একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দুজন ভদ্রমহিলা।

একজনের সিঁথিতে সিঁদুর। ফরসা মোটাসোটা ভারী চেহারা। চোখে চশমা। পরনে গোলাপি তাঁতের শাড়ি। বয়েস পয়তাল্লিশের এদিক-ওদিক হবে।

রঘুপতি যাদব আর বিজন শর্মার কাছে বিশদ বিবরণ যা শুনেছেন তাতে এসিজি অনুমান করলেন ইনি পরমেশ্বরবাবুর বড় মেয়ে ঈশানী মজুমদার।

দ্বিতীয় মহিলার রোগা ছিপছিপে চেহারা। পরনে হালকা রঙের আধুনিক নকশা কাটা শাড়ি। চোখে মানানসই চশমা। এখন চল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও বেশ সুন্দরী। তবে চোখে মুখে চোয়ালে কেমন একটা একরোখা উদ্ধত ভাব। মনে হয় ইনি নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত, নিতে নয়।

পরমেশ্বর সরকারের ছোট মেয়ে হিমানী সরকার। মনে-মনেই যেন আওড়ালেন এসিজি।

পরমেশ্বরবাবু মারা যাওয়ার ফলে তিন ছেলেমেয়েই সরাসরি বিশাল বড়লোক হয়ে যাবেন। বৃদ্ধ যদি সত্যি-সত্যিই খুন হয়ে থাকেন তা হলে এই তিনজনের মধ্যেই খুনি লুকিয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে ওঠার জন্য খুনি ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন?

পরমেশ্বর সরকার যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছিলেন। আর বছরকয়েক অপেক্ষা করলে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো তাঁর মত্যু হত। তা হলে...।

অর্কদেব, ঈশানী আর হিমানীকে দেখে ওঁদের কাউকে খুনি বলে ভাবতে বেশ কষ্ট পেলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তুতুন আর মিমোর কথা মনে পড়ল তাঁর। বাপি অথবা পিসিদের একজনকে ঠাকুরদার হত্যাকারী হিসেবে মেনে নিতে কী কষ্টই না হবে ওদের! নেহাত বয়েস কম বলে হয়তো পুরো ব্যাপারটা ততটা বুঝে উঠতে পারবে না।

নাঃ, খুন যেমন জঘন্য কাজ তেমনই খুনি খুঁজে বের করার কাজটাও জঘন্য।

পরমেশ্বর সরকারের ঘরের কাছে এসে বিজন শর্মা সিল ভেঙে ঘরের তালা খুলে দিলেন।

অর্কদেব, হিমানী ও ঈশানীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ওঁরা চারজন ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

ঘরে ঢুকেই রঙ্গলালবাবু নাক কুঁচকে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলেন কয়েকবার।

অশোকচন্দ্র অবাক হয়ে স্বভাবকবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল?'

চোখে সবজান্তার দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলে রঙ্গলাল বললেন, 'অন্তরীক্ষ, জল, স্থল/সবার ওপরে অকুস্থল।'

বিজন শর্মা আর রঘুপতি ঠোঁট টিপে হাসল। তারপর রঘুপতি আঙুল তুলে পুবদিকের কাচের জানলার কাছে রাখা একটা বড় মাপের টেবিল দেখিয়ে মন্তব্য করল, 'পরমেশ্বরবাবু ওই টেবিলে বসেছিলেন...।'

বিজন শর্মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শুধু টেবিল নয়, গোটা ঘরটাকেই জরিপ করে দেখছিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

পুরোনো সময়ের ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। চেয়ার, টেবিল, ছোট মাপের পেন্ডুলাম দেওয়াল-ঘড়ি, আলমারি, আর বইয়ের র‍্যাক—সবকিছুর গায়েই সেই পরিচয়ের সিলমোহর। বইয়ের র‍্যাকের অসংখ্য বই জানিয়ে দেয় পরমেশ্বর পড়ুয়া লোক ছিলেন।

জানলার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন এসিজি।

কাচের জানলাটা প্রায় চার ফুট বাই চার ফুট। জানলা বন্ধ ছিল।

জানলার বাইরেই চওড়া বারান্দা। সেখানে একটা টেবিল আর ইজিচেয়ার রয়েছে। ওই চেয়ারে বৃদ্ধ পরমেশ্বর সরকার আর কখনও শরীর এলিয়ে বিশ্রাম নেবেন না সেটা ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হল এসিজির। পুরোনো আসবাবগুলো রয়ে গেছে, শুধু পুরোনো মানুষটা চলে গেছে।

বারান্দায় সকালের রোদ এসে পড়েছিল। কাচের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে পরমেশ্বরের ঘরের টেবিলেও। টেবিলের ঝকঝকে পালিশ করা কাঠ সেই রোদের প্রতিবিম্ব ছিটকে দিয়েছে ঘরের দেওয়ালে।

হাতঘড়ি দেখলেন এসিজি। প্রায় পৌনে ন'টা। সূর্য যত ওপরে উঠবে টেবিলের রোদ ততই সরে যাবে জানলার দিকে। এখন টেবিলের মাত্র সিকিভাগ রোদের আওতায় রয়েছে। আরও আধঘণ্টা আগে নিশ্চয়ই বেশি ছিল।

টেবিলে একটা পাথরের তৈরি অ্যাশট্রে পড়ে ছিল। হাতের ছোট হয়ে আসা সিগারেটটা কী করে যেন নিভে গিয়েছিল। সেটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে অশোকচন্দ্র ছোট্ট করে প্রশ্ন করলেন, 'এটা পরমেশ্বরবাবুর সেই অ্যাশট্রে?'

বিজন শর্মার কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ দেখা যাচ্ছিল। হয়তো বুঝতে চাইছিলেন রঘুপতি যাদবের প্রাক্তন স্যার এই বৃদ্ধ হুনুর তদন্ত করে নতুন আর কোন তথ্য আবিষ্কার করেন। এসিজির প্রশ্নে তটস্থ হয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, একই অ্যাশট্রে। অ্যাশট্রের খাঁজে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটটা আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম। ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে, সিগারেটের ফিলটারের দিকে ঠোঁটের চাপের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হয়তো খেয়ালবশে পরমেশ্বর সরকার সিগারেটটা ধরিয়েছিলেন, তবে খাননি। খোঁজ করে জেনেছি, উনি গত পরশু একজন কাজের লোককে দিয়ে একটা সিগারেট আনিয়েছিলেন। হয়তো কাল সকালে সেটাই ধরাবেন বলে ভাবছিলেন।'

এসিজি মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'হুঁ—কিন্তু ধরাননি।'

'কাগজ-পোড়া ছাইটা ওই জায়গায় ছিল—' অ্যাশট্রের কাছাকাছি চক দিয়ে দুটো 'ক্রস' চিহ্ন দেওয়া ছিল। তারই একটা দেখিয়ে বিজন শর্মা বললেন।

তখন রঘুপতি অন্য 'ক্রস' চিহ্নটা দেখিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ওইখানে তা হলে চায়ের কাপ ছিল...।'

এসিজি লক্ষ করলেন, অ্যাশট্রে এবং চকের মার্ক দেওয়া জায়গা দুটো রোদের বেশ কাছাকাছিই রয়েছে। একটু আগেই হয়তো ওখানে রোদ পড়েছিল।

রঘুপতি কী যেন ভেবে ইতস্তত করে বলল, 'গুপ্তাসাব, রোদ পড়ে চা গরম হয়ে যায়নি তো!'

অশোকচন্দ্র তারিফের নজরে ফিরে তাকালেন রঘুপতির দিকে, বললেন, 'ভালো বলেছ। গুড ডিডাকশন। কিন্তু সিগারেটে আগুন ধরল কী করে, আর কাগজ পুড়ে ছাই হল কী করে?'

'সেটাই তো আমি কাল থেকে ভাবছি।' ব্যাজার মুখে মন্তব্য করলেন শর্মা।

টেবিলটাকে ঘিরে বারকয়েক পাক খেলেন এসিজি। একইসঙ্গে তিনি কাচের জানলার দিকে দেখছিলেন। হঠাৎই তিনি বিজন শর্মাকে লক্ষ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'জানলার লকটা ভালো করে চেক করেছেন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজন শর্মা। তারপর শ্রান্ত গলায় বললেন, 'চেক করেছি মানে! কাল এক চাবিওয়ালাকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে এসেছিলাম। সে জানলা-দরজা সব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছে। তারপর স্পষ্ট বলেছে, কোনও অবস্থাতেই জানলা দরজার ছিটকিনি বাইরে থেকে খোলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কেউ যে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে কায়দা করে জানলা বা দরজা টেনে দিয়ে ভেতরের ছিটকিনি আটকে দেবে, তাও অসম্ভব। সুতরাং বুঝতেই পারছেন...।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'লকড রুম পাজল...আপনার ফেভারিট, স্যার।'

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন এসিজি, পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে নতুন আর-একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে আরও একবার ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঘরটার মাপ বড়জোর দশ বাই দশ। ঘরে দুটো একই মাপের জানলা, একটা পুবদিকের দেওয়ালে, আর-একটা দক্ষিণে—দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকটায়। দুটোই কাচের জানলা, তার ওপরে পরদা টেনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জানলা দুটোর ছিটকিনি ভেতর থেকে আঁটা। ঘরের একটিমাত্র দরজা ভারী কাঠের তৈরি, তবে তার ছিটকিনিটা ভাঙা। গতকাল এই সময়ে অর্কদেবরা ধাক্কা দিয়ে ছিটকিনি ভেঙে ঘরে ঢুকেছেন। ঘরের আসবাবপত্র বলতে দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, একটা টিভি, আর চারটে বইয়ের র‍্যাক।

বিজন শর্মার কাছেই অশোকচন্দ্র শুনেছেন ঘরটা পরমেশ্বরবাবুর পড়াশোনার আর বিশ্রামের ঘর ছিল। দোতলার কোণের দিকে তাঁর শোওয়ার ঘর। রোজ ঘুম থেকে উঠেই তিনি এ-ঘরে চলে আসতেন। সকালের রোদ টেবিলে রেখে চা খেতেন, বই পড়তেন, ছেলেমেয়েরা বা অন্য কেউ কথা বলতে এলে এ-ঘরে বসেই সেইসব কথাবার্তা সারতেন।

কিছুদিন ধরে পরমেশ্বরবাবু নাকি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির অনেকটা অংশ রামকৃষ্ণ মিশন বা ওইরকম কোনও প্রতিষ্ঠানে দান করে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এমনকী ফোন করে উকিলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তাও নাকি বলেছিলেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে, কিছু দিন ধরেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি তর্ক-বিতর্ক চলছিল। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, ছেলেমেয়েরা তাঁকে গুরুজন হিসেবে ছিটেফোঁটাও গুরুত্ব দেয় না। এ-কথা তিনি প্রায়ই চিৎকার করে বলতেন। দু-নাতির কাছেও এ-নিয়ে আক্ষেপ করতেন। কথনও-কখনও নাকি কান্নাকাটিও করতেন। বাড়ির কাজের লোকরা সব শুনেছে।

ঘরটা দেখতে-দেখতে বিজন শর্মার কথাগুলো মনে পড়ছিল এসিজির।

তা হলে ডিপ্রেশানের শিকার হয়ে বৃদ্ধ পরমেশ্বর সরকার সত্যি-সত্যিই সুইসাইড করেছেন? নাকি ব্যাপারটা খুব...আর রঘুপতি যাদবের কথামতো 'দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক'!

কিন্তু খুনই যদি হবে, তা হলে দরজা-জানলার ছিটকিনি ভেতর থেকে এঁটে দিয়ে খুনি ঘর থেকে পালাল কেমন করে?

এইসব ভাবতে-ভাবতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন এসিজি। কার্বন ফ্রেমের চশমাটাকে সামান্য নেড়েচেড়ে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন।

রঙ্গলাল গোস্বামী বইয়ের র‍্যাকের কাছে ঘোরাঘুরি করছিলেন। হঠাৎই একটা বই তাক থেকে টেনে নিয়ে তিনি চলে এলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দার কাছে। বইটা এসিজির মুখের কাছে ধরে বললেন, 'এই পুস্তকটি লক্ষ্যণীয়, এসিজি স্যার।'

এসিজি বইটার দিকে তাকালেন। জেমস হিলটনের লেখা গোয়েন্দা উপন্যাস 'ওয়াজ ইট মার্ডার?' ১৯৩১ সালে গ্লেন ট্রেভর ছদ্মনামে লেখা।

সামান্য হেসে রঙ্গলালের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, স্বভাবকবিবর, আমি এখন এই প্রশ্নটা নিয়েই ভাবছি।'

রঙ্গলাল একটু ইতস্তত করে বইটা আবার জায়গামতো রেখে দিয়ে এলেন।

রঘুপতি স্যারকে লক্ষ করছিল। ও আলতো গলায় জিগ্যেস করল, 'অন্ধকারে কোনও রোশনি চোখে পড়ল, স্যার?'

এসিজি প্রাক্তন ছাত্রের দিকে ফিরে অনেকটা যেন আপনমনেই বললেন, 'সেটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা, এমন যদি হয়, ধরো, খুনি বিষ মেশানো চা-টা পরমেশ্বর সরকারকে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তারপর পরমেশ্বরবাবু দরজা-জানলা সব ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন, এবং বিষাক্ত চা খেয়ে মারা গেলেন। তখন —'

বিজন শর্মা এসিজিকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তাতে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে চারটে ব্যাপার : গরম চা, জ্বলন্ত সিগারেট, কাগজ পোড়া ছাই, আর—।'

'ঘরের ভেতরে নো দেশলাই—' শর্মাকে বাধা দিয়ে ছন্দে পাদপূরণ করলেন রঙ্গলাল।

'ব্যাপারটা মার্ডার বলে ভাবতে চাইলে যে-সমস্যা, সুইসাইড বলে ভাবলেও সেই একই। মানে, প্রবলেমের সেকেন্ড পার্টটা থেকেই যাচ্ছে।' আপনমনে বললেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত, 'তা হলে সেকেন্ড পার্টটাই প্রথমে সলভ করার চেষ্টা করে দেখি।'

রঘুপতি তার স্যারের কথায় হেসে বলল, 'আপনার যা মরজি।'

এসিজি আনমনাভাবে সিগারেটে টান দিয়ে চললেন, আর একইসঙ্গে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বৃদ্ধ পরমেশ্বর সরকারকে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। ছেলেমেয়েদের ওপরে তিতিবিরক্ত মানসিক অবসাদে ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষটি কি সত্যই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন? নাকি বৃদ্ধ পিতার ওপরে তিতিবিরক্ত তিন ছেলেমেয়ের কেউ রাগের মাথায় একটা জঘন্য কাজ করে ফেলেছে?

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে, সিগারেট ধরিয়ে কাগজ পোড়ানোর পর সেই আগুনে পরমেশ্বরবাবু দেশলাইটাকেও পুড়িয়ে ফেলেছেন! অথবা, দেশলাই বা লাইটারটাকে কারও হাত দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিংবা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জানলা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন!

তাই যদি হবে, তা হলে উনি মারা যাওয়ার কম করে একঘণ্টা পরেও চা কী করে গরম ছিল, আর সিগারেটই বা কেমন করে জ্বলছিল।

এত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়েও বিষয়গুলো রঘুপতি আর শর্মার সঙ্গে আলোচনা করলেন এসিজি। এবং যথারীতি চা আর সিগারেটের সমস্যায় এসে ধাক্কা খেলেন।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তেই তা হলে পৌঁছতে হয় যে, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ হওয়ার পর বাইরে থেকে চা-সিগারেটের ব্যাপারটা করা হয়েছে। অথচ আপাতভাবে কাজটা অসম্ভব।

নিজের ওপরে যেন খানিকটা বিরক্ত হয়েই ঘরের বাইরে চলে এলেন বৃদ্ধ হুনুর।

অর্কদেব ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আত্মীয়স্বজন কয়েকজন চলে এসেছেন বাড়িতে। পরমেশ্বরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বলতে একমাত্র নিস্তব্ধতা। সকলেই বেশ নিচু গলায় কথা বলছিলেন।

বিজন শর্মা এসিজির পিছন-পিছন বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি এসিজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি অর্কদেব, ঈশানী বা হিমানীর সঙ্গে কথা বলতে চান?'

এসিজি আলতো হেসে বললেন, 'নতুন আর কী জিগ্যেস করব! যা জানার আপনার কাছেই তো জেনে গেছি। বন্ধ ঘরের রহস্য ভেদ করতে পারলেই বাকি সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে।'

রঘুপতি যাদবের কথা মনে পড়ল আবার 'দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক—।'

কিন্তু কী সেই ট্রিক, কী সেই কৌশল?

এইসব ভাবতে-ভাবতে পুব দিকের বারান্দায় চলে এলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। সকালের রোদ সরতে-সরতে এখন পরমেশ্বরের ঘরের বাইরে, বারান্দার মেঝেতে। মেঝেতে পড়ে থাকা রোদের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন।

বারান্দার নিচেই বাগান। বাগানে অনেক সবুজ। রোদ পড়ে মসৃণ পাতাগুলো চিকচিক করছে। ছোট হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা বাগানের দিকে ছুড়ে দিলেন এসিজি।

বাগানে নিয়মিত পোকামাকড় মারার ওষুধ দেওয়া হয়। সেই ওষুধই কেউ মিশিয়ে দিয়েছে পরমেশ্বরের চায়ের সঙ্গে। সকালে একসঙ্গে সকলের চা তৈরি হয়েছে। কাজের লোকরাই চা ভাগ করে যার-যার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। চা খাওয়ার সময় অর্কদেব একবার বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। তাতে বৃদ্ধ পরমেশ্বর বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে অর্কদেব চলে এসেছিলেন ঘর থেকে।

অর্কদেবকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন বিজন শর্মা।

অর্কদেব ঘটনাটা অস্বীকার করেননি। তিনি যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই : ব্যারাকপুরে ওঁদের তিনটে সেকেলে ধাঁচের সিনেমা হল আছে। অর্কদেবের ইচ্ছে, দুটো হল বিক্রি করে সেই টাকায় অন্য সিনেমা হলটাকে ভোল পালটে একেবার আধুনিক করে তোলেন। এ-ব্যাপারে তিনি লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও এগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু পরমেশ্বর সরকার বেঁকে বসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সেকেলে হলেই কি যে-কোনও জিনিস বিক্রি করে দিতে হবে। তারপর সিগারেট খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে অর্কদেবের একটু কথাকাটাকাটি হয়।

সম্পত্তি থাকলে ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে। কিন্তু তার জন্য এতবড় দুঃসাহসী কাজ কি অর্কদেব বা অন্য কেউ করতে পারেন! যদিও বা করে থাকেন তা হলে কীভাবে? তার ওপর গরম চা আর জ্বলন্ত সিগারেটের জট তো আছেই!

চুলের গোছায় টান মেরে চোখ থেকে কার্বন ফ্রেমের চশমাটা খুলে নিলেন এসিজি। সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের গাছপালা তাঁর চোখে কিছুটা ঝাপসা হয়ে গেল। যে চোখ থাকতেও ভালো করে দেখতে পায় না তার ঝাপসা দেখাই ভালো—নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে ভাবলেন এসিজি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে তাকালেন পরমেশ্বরবাবুর ঘরের জানলার দিকে। কাচের ভেতর দিয়ে আবছাভাবে রঘুপতি, বিজন শর্মা ও রঙ্গলাল গোস্বামীকে দেখা যাচ্ছে। ওঁরা ঘরের ভেতরে ঘোরাঘুরি করছেন।

হঠাৎই অশোকচন্দ্রের চোখ পড়ল বারান্দার মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর রোগা শরীরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বারান্দার মার্বেল পাথরের মেঝেতে অনেকটা অংশ জুড়ে রোদ পড়েছে। আর একইসঙ্গে এসিজির হাতে আলতো করে ধরা চশমার ছায়াও পড়েছে সেখানে। চশমার কাচের ছায়ার মাঝখানটায় একটা করে রোদের উজ্জ্বল টিপ : সূর্যের প্রতিবিম্ব।

এসিজি চশমাটা বারকয়েক নেড়েচেড়ে কাচের ছায়া দুটো লক্ষ করলেন। যদিও চোখে চশমা না থাকায় লক্ষ করার কাজটা খুব ভালোভাবে করা যাচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বুঝতে কোনওরকম অসুবিধে হল না।

চশমাটা চোখে দিয়ে পরমেশ্বরবাবুর জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন অশোকচন্দ্র। জানালার কাচে টোকা দিয়ে রঘুপতিদের ইশারা করে বাইরে আসতে বললেন। তারপর আপনমনেই হেসে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ হুনুর।

'কী ব্যাপার, গুপ্তাসব? এনি সলিউশান?' কাছে এসে দাঁড়ানোমাত্রই কৌতূহলী প্রশ্ন ছুড়ে দিল রঘুপতি যাদব।

উত্তরে অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, 'আমি একটা খাঁটি গর্দভ, রঘুপতি। বুঝতে পারছি, ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনায় আমার অনেক ফাঁক থেকে গেছে। বিশেষ করে অপটিক্সে—মানে, আলোক-বিজ্ঞানে...।'

'আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' হতবম্ব হয়ে মন্তব্য করলেন বিজন শর্মা।

এসিজি শর্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার মার্ডার মিস্ট্রি আমি এখনও সলভ করতে পারিনি, তবে বন্ধ ঘরের মিস্ট্রি সলভ করতে পেরেছি।'

রঙ্গলাল বললেন, 'অধম এখনও ইন অন্ধকার/ আজ্ঞা হোক খুলে বলিবার।'

এসিজি মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে বিজন শর্মাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি অর্কদেববাবুকে একবার এখানে আসতে বলুন। আর ওঁর দু-বোনকেও আসতে বলবেন।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁরা তিনজনে বারান্দায় এসে হাজির। অর্কদেব চেষ্টা করে শান্ত স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখেছেন। তবে ঈশানী ও হিমানীর মুখে বিব্রত ও বিরক্ত ভাব বেশ স্পষ্ট।

অর্কদেব নরম গলায় বললেন, 'ওপরের কাজ হয়ে গেলে নিচে চলুন—সেখানে আপনাদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

এসিজি মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাব—তবে তার আগে একটু জরুরি কাজ সেরে নেব।'

তারপর সরাসরি হিমানীর চোখে তাকিয়ে কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন বললেন, 'হিমানীদেবী, আপনার কাছে কি চার-পাঁচ ইঞ্চি ডায়ামিটারের কোনও ম্যাগনিফাইং গ্লাস—মানে, আতসকাচ আছে?

চশমার পিছন থেকে কয়েক সেকেন্ড ঠান্ডা চোখে অপলকে অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন হিমানী। তারপর বললেন, 'সবই বুঝতে পেরেছেন তা হলে?'

অর্কদেব আর ঈশানী অবাক চোখে ছোট বোনের দিকে তাকালেন।

হিমানীর বাঁকা প্রশ্নের উত্তরে এসিজি হেসে বললেন, 'না, সবটা বুঝতে পারিনি—যেটুকু পেরেছি বলি—ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন।'

'সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে কোনও এক সময় আপনি পরমেশ্বরবাবুর ঘরে এসেছিলেন—হয়তো ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলার ছিল। আপনি এসে দেখলেন, ঘরের দরজা-জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। আর বারান্দার লাগোয়া ওই জানলার কাছে টেবিলে মাথা রেখে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন আপনার বাবা।

'এ ছাড়াও কয়েকটা জিনিস দেখতে পেলেন আপনি। অর্ধেক খাওয়া চায়ের কাপ, তার কাছাকাছি একটা কাগজ, আর অ্যাশট্রের খাঁজে রাখা একটা গোটা সিগারেট।

'পরমেশ্বরবাবু যে সুইসাইড করেছেন, সেটা বুঝতে আপনার বিশেষ কষ্ট হল না। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, আপনার মনে হল ব্যাপারটা একটু জট পাকিয়ে দেওয়া যাক। তাই ঘর থেকে আতসকাচটা নিয়ে এলেন। এই বারান্দায় তখন রোদ এসে পড়েছিল। ওই কাচের জানলা দিয়ে সেই রোদ পরমেশ্বরবাবুর টেবিলে গিয়েও পড়েছিল। সুতরাং, এরপর আপনার কাজ হল, আতসকাচ দিয়ে সূর্যকে ফোকাস করে টেবিলের ওপরে ফেলা। বড় ডায়ামিটারের আতসকাচ থাকলে কাজটা মোটেই কঠিন নয়।

'তারপর আতসকাচ তার যা-কাজ তা-ই করেছে। সিগারেট ধরিয়েছে, কাপের চা গরম করেছে, আর টেবিলে পড়ে থাকা কাগজটা পুড়িয়েছে। আমার ধারণা, কাগজটা পরমেশ্বরবাবুর সুইসাইড নোট ছিল—তাতেই স্পষ্ট লেখা ছিল, কেন তিনি আত্মহত্যা করছেন—।'

এসিজির কথা শেষ হল।

সবাই ভাবছিল, হিমানী নিশ্চয়ই চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন, অথবা কান্নায় ভেঙে পড়বেন। কিন্তু হিমানী কোনওটাই করলেন না। বরং ঠান্ডা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ডক্টর গুপ্ত। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার ঘরেই আছে। আমার রিসার্চের কাজে লাগে—গ্রাফ থেকে কোনও ভ্যালু নেওয়ার সময়, কিংবা কোনও ফটোগ্রাফ খুঁটিয়ে দেখার সময়। আপনি ফিজিক্সের লোক—আপনি বুঝতে পারবেন।' চোখের চশমাটা একবার ঠিক করে নিলেন হিমানী। তারপর আক্ষেপের সুরে বললেন, 'বাবার দিন-দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মানসিক অবসাদে হয়তো ভুগছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে ভীষণ বদমেজাজি আর খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের তিনজনের সঙ্গে তো প্র্যাকটিক্যালি চাকর-বাকরদের মতো ব্যবহার করতেন।'

'কিন্তু প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল সুইসাইডটাকে আপনি হঠাৎ জট পাকাতে গেলেন কেন?' বিজন শর্মা হিমানীর কাছে জানতে চাইলেন।

'দাদার জন্যে।' নিষ্প্রাণ গলায় স্পষ্ট উত্তর দিলেন হিমানী। তারপর অর্কদেবের দিকে ফিরে বললেন, 'দাদা, কিছু মনে কোরো না। তোমার লোভ তোমাকে একটু-একটু করে অন্যরকম করে দিচ্ছে। বাবার সঙ্গে তোমার যেসব ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত তার অনেকটাই আমার কানে এসেছে। তোমার হাতে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে আমি বা দিদি কেউই নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। এ নিয়ে আমাদের খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার। বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারটা আগে মিটে যাক—।'

অর্কদেবের চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি কোনও জবাব দিলেন না।

ঈশানী চোখে আঁচল চেপে হঠাৎই কাঁদতে শুরু করলেন।

এসিজি রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, আমার কাজ শেষ—এবার আমি যাই। তুমি আর শর্মা মিলে এই ব্যাপারটা নিয়ম-টিয়ম মেনে ফাইল বন্দি কোরো।'

বিজন শর্মা এসিজিকে বললেন, 'চলুন, ডক্টর গুপ্ত, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। হেলপ করার জন্যে মেনি থ্যাঙ্কস।'

অর্কদেব কাছে এগিয়ে এসে খুব কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'একটু চা না খেয়ে যেতে পারবেন না...প্লিজ...।'

অশোকচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে রাজি হলেন।

রঘুপতি বলল, 'শর্মা, চায়ের পর তা হলে ফরমালিটিগুলো সেরে নেওয়া যাবে।'

অর্কদেব ওঁদের চারজনের সঙ্গে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোলেন। ঈশানী আর হিমানী একইভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

যেতে-যেতে অর্কদেব বললেন, 'কাল সকালে সিগারেট খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে রাগারাগির সময় বাবার লাইটারটা আমিই কেড়ে নিয়ে এসেছিলাম...কিন্তু তারপর...এরকম সব ব্যাপার হবে বুঝিনি।'

রঙ্গলাল এসিজিকে প্রশ্ন করলেন, 'হিমানীদেবীকে আপনি কী করে সন্দেহ করলেন, স্যার?'

'লেন্সের ব্যাপারটা বুঝতে পারার পরই মনে হয়েছিল এটা বোধহয় বিজ্ঞান জানা কোনও লোকের কাজ। আর সেরকম লোক তো এ-বাড়িতে একজনই...। কিন্তু আতসকাচ নিয়ে ওইসব কাণ্ড করার সময় হিমানীকে দোতলার বারান্দায় কেউ দেখতে পেল না, এটা ভাবতেই অবাক লাগছে!'

এসিজির এই সমস্যার সমাধান করে দিল দুই মূর্তিমান : তুতুন আর মিমো।

মশা-মাছি সমস্যার সমাধান করে দুটো বাচ্চাই উন্মুখ হয়ে বৃদ্ধ গোয়েন্দার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এসিজি ওদের বললেন, 'ধাঁধার উত্তর শোনার আগে তোমাদের একটা প্রশ্ন করব। কাল সকালে দোতলায় তোমাদের ঠাকুরদার বারান্দায় কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?'

ওরা একইসঙ্গে জানাল, হ্যাঁ। ছোটপিসি বারান্দায় ঠাকুরদার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। হাতে সেই বড় কাচটা ছিল—যেটা দিয়ে লেখা বড়-বড় দেখায়। ওরা তখন বাগানে খেলছিল।

অশোকচন্দ্র আপনমনেই হাসলেন। ওদের সঙ্গে কথা বললে অনেক আগেই বন্ধ ঘরের রহস্যের সমাধান হয়ে যেত। বাচ্চারা বড়দের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।

এইবার তিনি মশা-মাছির সমস্যার উত্তর জানতে চাইলেন বাচ্চা দুটোর কাছে।

উত্তরে মিমো প্রথমে বলল, 'মশা জিতবে, মাছি হেরে যাবে।'

এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'কেন?'

'মশা মাছিটাকে তাড়া করে হুল ফুটিয়ে সব রক্ত টেনে নেবে। তাতে মাছিটা উইক হয়ে গিয়ে মারা যাবে।'

তখন তুতুন বলল, 'না, জেঠু, দুজনেই মরে যাবে। মশা মাছিটাকে কামড়ে দিলে মাছিটার ম্যালেরিয়া হবে, আর মাছির থেকে মশার হবে কলেরা—তাতে দুজনেই মরে যাবে।'

তুতুনের উত্তর শুনে কেউ আর হাসি চাপতে পারলেন না।

অশোকচন্দ্র পকেট থেকে টাকা বের করে অর্কদেবকে অনুরোধ করলেন কাউকে দিয়ে দুটো ক্যাডবেরি চকোলেট আনিয়ে দেওয়ার জন্য। ওদের প্রাইজ।

রঙ্গলাল গোস্বামী মাথা নেড়ে বললেন, 'কোশ্চেনটা ছিল শক্ত, ছিল ইন্টারেস্টিং/মশা-মাছি দুজনেই ইকোয়াফাইটিং।'

রঘুপতি যাদব অবাক হয়ে রঙ্গলালকে প্রশ্ন করলেন, 'ইকোয়াফাইটিং মানে?'

সলজ্জ হেসে রঙ্গলাল বললেন, 'ওই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশান। ''ইকোয়াল ইন ফাইটিং''-কে প্রথমে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের নিয়মে সমাসবদ্ধ করেছি। তারপর নিপাতনে বয়েল করে সন্ধি করে ছেড়ে দিয়েছি।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত খোলা গলায় হেসে উঠে বললেন, 'স্বভাবকবিবর, আপনার সত্যিই কোনও জবাব নেই।'

রঙ্গলাল বললেন, 'স্বভাবকবিতায় ব্যাকরণের অ্যাপ্লিকেশানটাই আসল, স্যার।'

উপন্যাস

অন্তরে পাপ ছিল



কে যেন বলে গেছেন, খুন অতি জঘন্য কাজ—খুনি ধরার কাজ তার চেয়েও জঘন্য।

এ-কথাটা ভাবামাত্রই হেসে ফেললেন বৃদ্ধ হুনুর ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে এসিজি। কারণ, এই কথাটা কোনও মহাপুরুষ মোটেই বলে যাননি। বহু বছর ধরে খুন এবং খুনি ঘাঁটাঘাঁটি করে এই বিশ্বাসে তিনি নিজেই পৌঁছে গেছেন। একটা কথা বহুদিন ধরে বিশ্বাস করলে একসময় মনে হয়, কথাটা নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও মহাপুরুষ বলে গেছেন। নিজের বিশ্বাসের দায় তখন অনায়াসে কোনও মহাজনের ঘাড়ে চেপে যায়।

একটু আগেই একটা টেলিফোন এসেছিল। গড়পাড় থেকে কে এক দীপ্তিমান বসাক এসিজিকে ফোন করেছিলেন।

'হ্যালো, ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত আছেন?' একটু ভারি অথচ বেশ চমৎকার গলায় প্রশ্ন করল কেউ।

'হ্যাঁ—বলছি।'

'আ-আমার নাম দীপ্তিমান বসাক। আ-আমাকে আপনি চিনবেন না।' থতিয়ে-থতিয়ে বললেন দীপ্তিমান, 'একটা জরুরি ব্যাপারে আপনার হেলপ চাইছি। যদি কাইন্ডলি আপনার সঙ্গে দেখা করার পারমিশান দেন...।'

দীপ্তিমান বসাক নামে কাউকে চেনেন না এসিজি। কী করে তিনি এসিজির ফোন-নম্বর পেলেন কে জানে! তবে ভদ্রলোকের গলা বেশ উত্তেজিত এবং নার্ভাস বলে মনে হল।

'কী ব্যাপারে দেখা করতে চান আপনি?' আন্তরিক গলায় জানতে চাইলেন এসিজি।

অশোকচন্দ্র একসময় রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করতেন। সেটা জেনে অনেকে ফিজিক্সের সমস্যা নিয়ে আসেন। তবে তাঁরা সবই পাড়ার লোক। আর এলাকার বাইরে থেকে অনেকে যোগাযোগ করেন ছাত্র পড়ানোর জন্য। তাতে তিনি বিব্রত হন—অনেকসময় বিরক্তও হন। কারণ, কোচিং ক্লাস তিনি অপছন্দ করেন।

দীপ্তিমান কি ছাত্র পড়ানোর ব্যাপারে দেখা করতে চান নাকি?

'আমার খুব ক্লোজ একজন রিলেটিভ পাঁচদিন আগে মারা গেছেন। অ্যাক্সিডেন্ট। মানে, এমনিতে অ্যাক্সিডেন্ট বলেই মনে হচ্ছে। তবে...।'

এসিজি সজাগ হলেন পলকে। মাথার ধবধবে চুলের গোছায় আলতো করে কয়েকবার টান মারলেন।

'তবে কী?'

'আপনাকে...আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ব্যাপারটা...ব্যাপারটা জেনুইন অ্যাক্সিডেন্ট। অন্য কিছু নয়।' ফোনের ও-প্রান্তে দীপ্তিমানের গলা কাঁপছিল।

'আপনার কি ধারণা ব্যাপারটা আসলে মার্ডার?

'হতেও তো পারে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দীপ্তিমান বসাক : 'আবার নাও হতে পারে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলব। আজ সন্ধে সাতটা নাগাদ গেলে আপনার অসুবিধে হবে?'

দীপ্তিমানের কথায় একটা আকুল ভাব টের পাচ্ছিলেন এসিজি। তাই কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে রাজি হলেন। বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দীপ্তিমানকে বললেন সন্ধে সাতটায় আসতে।

আর তারপরই মনে হল ওই কথাটা : খুন অতি জঘন্য কাজ—খুনি ধরার কাজ তার চেয়েও জঘন্য। কারণ, আপাতভাবে নির্দোষ যে-মানুষটা স্বাধীনভাবে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে, তার দিকে বেপরোয়া আঙুল তুলে খুনের কলঙ্কের সিলমোহর তার কপালে স্থায়ীভাবে এঁকে দেওয়া—সত্যিই খুব জঘন্য। তখন এসিজির নিজেকেই কেমন অপরাধী বলে মনে হয়।

একটা সিগারেট ধরালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর কাছে এসে দীপ্তিমান কী বলবেন কে জানে! তা ছাড়া, তাঁর ওই রিলেটিভ কোন থানার এলাকায় মারা গেছেন এসিজি জানেন না। যদি সত্যি-সত্যিই তাঁকে

রহস্যভেদের কাজে নামতে হয় তা হলে ব্যাপারটা অনেকটা নাক গলানোর মতো ব্যাপার হয়ে যাবে। সেই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

সুতরাং সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন অশোকচন্দ্র। লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াডে ডায়াল করলেন।

দীপ্তিমান বসাক যখন এসিজির শ্যামবাজারে ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন তখন সাতটা বেজে মিনিট পনেরো হয়েছে।

রঘুপতি যাদব এসেছে অনেক আগেই। বসবার ঘরে বসে আয়েস করে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল রঘুপতি। আর প্রাক্তন স্যারের কাছ থেকে পাখির বিষয়ে নানান কথা শুনছিল। সম্প্রতি এসিজি পাখির ডাকের স্পেকট্রাল অ্যানালিসিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বিদেশে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটে এ নিয়ে গবেষণা করে সিগনাল রিকন্সট্রাকশনের মাধ্যমে কোনও-কোনও পাখির ডাকের হুবহু নকল করতে পেরেছে। এমনকী, তারা বহু স্ত্রী-পাখির ব্রিডিং কল নকল করে পুরুষ-পাখিকে গাছের আড়াল থেকে বাইরে টেনে এনেছে।

এসব রোমাঞ্চকর গবেষণার কথাই এসিজি শোনাচ্ছিলেন রঘুপতিকে। আর রঘুপতি অবাক হয়ে লম্বা ছিপছিপে মানুষটাকে দেখছিল। কোথায় ফিজিক্স, আর কোথায় পাখি! আর কোথায়ই বা গোয়েন্দাগিরি!

'স্যার, কী করে যে আপনি এতদিকে মন লাগাতে পারেন সে আপনিই জানেন!' কফির কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বলল রঘুপতি।

হাতের সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে এসিজি বললেন, 'মন তো লাগাই না! মন লেগে যায়।'

ঠিক তখনই কলিংবেল বেজে উঠল।

এসিজি ওঠার আগেই সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল রঘুপতি। প্রাক্তন স্যারের দিকে ইশারা করে বলল, 'আপ বৈঠিয়ে...।' এবং এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল।

'নমস্কার। আমার নাম দীপ্তিমান বসাক। জ্যামের জন্যে পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেল।'

এ-কথা বলে ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁকে ভালো করে জরিপ করলেন এসিজি।

প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা ভদ্রলোকের খুঁড়িয়ে চলা। বোধহয় ছোটবেলায় পোলিও বা ওইরকম কোনও অসুখ হয়েছিল। চৌকোনা মুখ। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। চোখদুটো অস্বাভাবিকরকম বড়। গাল সামান্য ভাঙা। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে। পুরু ঠোঁটের ওপরে সরু গোঁফ। গায়ের রং ময়লা। বয়েস তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ।

চেহারায় বেঁটেখাটো দীপ্তিমানকে দেখে প্রথমেই যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা সেটা ভালো নয়। কিন্তু ওঁর গলার স্বর একেবারে হিপনোটাইজ করে ফেলার মতো।

এসিজি উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্তিমানকে প্রতি নমস্কার জানালেন। তারপর একটা খালি সোফায় বসতে ইশারা করলেন।

দীপ্তিমান বসতেই এসিজি গলা চড়িয়ে বিশুকে ডাকলেন। বিশু বোধহয় ভেতরের ঘরে টিভি দেখছিল। ডাক শুনে এসে দাঁড়াল। বারো-তেরো বছরের এই ছেলেটি অশোকচন্দ্রের দিন-রাতের সঙ্গী।

'ভালো করে তিনকাপ কফি কর দেখি—।'

অর্ডার পেয়েই বিশু ব্যস্তভাবে চলে গেল কফির আয়োজন করতে।

রঘুপতির সঙ্গে দীপ্তিমানের আলাপ করিয়ে দিলেন এসিজি। দীপ্তিমান সতর্ক চোখে রঘুপতিকে দেখলেন।

পরনে সাদা-পোশাক, তবু পুলিশ-পুলিশ ভাবটা বোঝা যায়। ফরসা মুখে বসন্তের দাগ। ছোট করে ছাঁটা চুল। কাঁচা-পাকা গোঁফ। চওড়া কাঁধ দেখেই বোঝা যায় এঁর সঙ্গে হিসেব করে মোকাবিলায় নামলে ভালো

হয়।

'বলুন, মিস্টার বসাক। যা বলার খোলাখুলি বলুন—কোনও অসুবিধে নেই। আপনারটা পুরোপুরি শোনার পর আমার ওপিনিয়ন দেব।'

এক পলক দুজনের দিকে তাকালেন দীপ্তিমান। তারপর পুরু ঠোঁটের ওপরে জিভের ডগা বুলিয়ে নিয়ে ছোট্ট করে গলাখাঁকারি দিলেন। গায়ের হালকা নীল সোয়েটারটা বারকয়েক টানলেন। ওঁর ইতস্তত ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ঠিক কোথা থেকে শুরু করবেন সেটা ভেবে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর হ্যাঁচকা দিয়ে চলতে শুরু করা মোটরগাড়ির মতো কথা বলতে শুরু করলেন দীপ্তিমান।

এসিজির হাতের সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। অবশেষটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। দীপ্তিমানকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'নিন, শুরু করুন...।'

আপনমনেই ছোট করে কয়েকবার মাথা নাড়লেন দীপ্তিমান। তারপর রেডিয়োতে শোকসংবাদ পাঠ করার মতো ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করলেন 'ব্যাপারটা যেখানে হয়েছে সেই বাড়িটা বাদুড়বাগান স্ট্রিটে। চার নম্বর বাড়ি। আর যিনি মারা গেছেন তাঁর নাম চারুবালা মজুমদার। বয়েস হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর। তিনি ছিলেন ও-বাড়ির আশ্রিতা...।' মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তিনি যোগ করলেন, 'আমি ওঁকে মা বলে ডাকতাম—চারুমা। আসলে আমি অনাথ। সংসারে আমার আপন বলতে কেউ কোনওদিন ছিল না। কিন্তু বছর পনেরো আগে চারুবালার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ওঁর সঙ্গে কেমন যেন স্নেহ-মায়ার সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম।'

রঘুপতি পকেট থেকে কাগজ-পেন বের করে দরকারমতো নোট নিচ্ছিল। ও জানে, স্মৃতির ওপরে পুরোপুরি নির্ভর না করে লিখে রাখাই ভালো। ওর স্যার অবশ্য মনে-মনে মাথায় সবকিছু লিখে নেন। নিজেকে থিঙ্কিং মেশিন বলে জাহির করাটা ওঁর পক্ষেই মানায়।

বিশু কফির ট্রে নিয়ে ঘরে এল। কফির কাপ আর বিস্কুটের প্লেট তিনজনের সামনে টেবিলে সাজিয়ে দিল। এসিজিকে লক্ষ করে বলল, 'মাসি আটটার পর এসে রান্না করে দেবে বলে গেছে।'

এসিজি ঘাড় নাড়লেন। মাসি বলতে ললিতের মা—এসিজির ঠিকে কাজের লোক।

বিশু চলে যেতেই এসিজি আর রঘুপতি কফির কাপে চুমুক দিলেন। দীপ্তিমানকে ইশারায় কফি খেতে অনুরোধ করলেন এসিজি। কিন্তু দীপ্তিমান যেন ওঁর ইশারা দেখেও দেখলেন না। কেমন এক শূন্য চোখে ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

'নিন, কফি নিন—।' এসিজি বললেন।

'ওঃ, হ্যাঁ—' চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিলেন দীপ্তিমান। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'যা বলছিলাম। চারুবালার সঙ্গে আমি স্নেহ-মায়ার সম্পর্কে কেন জড়ালাম সে নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ছোটবেলায় অনাথ আশ্রম থেকে কী করে যেন আমি দেওঘরের সৎসঙ্গ আশ্রমে পৌঁছে যাই। সেখান থেকে পরে কলকাতায় আসি। গড়পাড়ে একটা বাড়িতে সিঁড়ির তলায় একটা ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করি। আর হালসীবাগানে সৎসঙ্গের একটা ছোট ব্রাঞ্চ আছে—সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকি। ছোটবেলা থেকেই জ্যোতিষে আমার আগ্রহ ছিল। বড় হয়ে সেই জ্যোতিষচর্চা করেই আমার দিন চলতে লাগল।

'চারুবালা হালসীবাগানের আশ্রমে যাতায়াত করতেন। সেই থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ। খুব অল্পবয়েসে ওঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন। সেই থেকেই উনি ভাইয়ের সংসারে থাকতেন। সংসারে ভাই-ই ছিল ওঁর একমাত্র আপনজন। কিন্তু সেই ভাই—মনোহর রায়—বছরআষ্টেক আগে ক্যান্সারে মারা যান। এমনিতেই চারুবালার মনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ছিল। আশ্রমে গিয়ে আমাকে তার কিছু-কিছু বলতেন। ভাই চলে যাওয়ার পর ওঁর দুর্দশা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওঁর উপায় ছিল না। কপর্দকহীন বিধবা আর কোথায়-ই বা ঠাঁই পাবে! আর আমি যেখানে থাকি সেখানে আমারই জায়গা হয় না, তো চারুমা!'

চোখে কী পড়েছে এই ভান করে বোধহয় চোখের কোণ মুছে নিলেন দীপ্তিমান। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করলেন, 'চারুমা ঠিক কপর্দকহীন ছিলেন না। তবে ওঁর নিজস্ব চল্লিশ হাজার টাকা ওঁর বড় ভাইপো অজয়েন্দ্রর সঙ্গে জয়েন্টলি ফিক্সড ডিপোজিট করা ছিল। তার ওপরে চারুমার কোনও কন্ট্রোল ছিল না। আর, আজকের দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকায় কী-ই বা হয়!

'লাস্ট চার-পাঁচ বছর ধরে চারুমার মাথায় একটু গোলমাল দেখা দেয়। ঠিক পাগল হয়ে যাননি, তবে খানিকটা ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলা যায়। আমার কাছে এসে হঠাৎ-হঠাৎ ভাইয়ের বউ আর ভাইপোদের নামে নানান অকথা-কুকথা বলতেন। কখনও-কখনও বউমারা বা নাতি-নাতনিরাও বাদ যেত না। অনেক চেষ্টা করেও তখন ওঁকে শান্ত করা মুশকিল ছিল।

'ব্যাপারটা আমি বয়েসের দোষ বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওঁর কোনও-কোনও কথায় বুঝতাম, পাগলামির ঝোঁকে উনি যা-যা বলেন তার অনেকটাই সত্যি। হয়তো কারও কথায় বা ব্যবহারে ব্যথা পেয়েছেন, অভিমান হয়েছে—আমার কাছে এসে চারুমা সবকিছু যেন উগরে দিতেন। আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিতাম, শান্ত করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যেটা ছিল—ওঁর বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই ওঁকে পাগলের মতো ট্রিট করতেন।

আমি—।'

দীপ্তিমানকে বাধা দিয়ে এসিজি বললেন, 'উনি কীভাবে মারা গেছেন?'

স্রোতে আচমকা বাধা পড়ায় দীপ্তিমান পলকের জন্য যেন বেসামাল হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে। আজ শুক্রবার। চারুমা মারা গেছেন শনিবার—সন্ধেবেলা।'

একটা সিগারেট ধরালেন এসিজি। দীপ্তিমানকে অফার করতে তিনি বললেন, 'না, থাক। আমি কখনও-কখনও খাই।'

রঘুপতি যে সিগারেট খায় না তা এসিজি ভালো করেই জানেন।

সিগারেটে টান দিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত জানতে চাইলেন, 'চারুবালা ছাদ থেকে পড়ে গেলেন কীভাবে?

'ওঁদের বাড়িটা ভীষণ পুরোনো। বহুবছর ধরেই ডেঞ্জারাস কন্ডিশানে রয়েছে। রিপেয়ার-টিপেয়ার কখনও করা হয়নি। রং চটে গেছে, পলেস্তারা খসে গেছে। ছাদের পাঁচিল জায়গায়-জায়গায় ভাঙা। কড়ি-বরগার অবস্থাও ভালো নয়। ও-বাড়ির ছাদের সাউথ-ওয়েস্টের দিকটায় মেঝেতে বড় একটা ফাটল আছে। তা ছাড়া, ওদিকটার পাঁচিলও ছিল ধসে পড়া। চারুমা সাধারণত ছাদে উঠতেন না। তবু হয়তো কোনও কারণে ভুল করে ওদিকটায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর...।'

মাথা নিচু করে আবার চোখ মুছলেন দীপ্তিমান।

'পুলিশের কী আইডিয়া?' প্রশ্নটা করল রঘুপতি যাদব।

কপালে হাত রেখে মাথা নাড়লেন দীপ্তিমান 'সরাসরি কোনও আইডিয়া পাইনি। আবছাভাবে যা শুনেছি তাতে পুলিশ ব্যাপারটাকে অ্যাক্সিডেন্টই ভাবছে।'

'আবছাভাবে শুনেছেন কেন?' কৌতূহলী হলেন এসিজি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দীপ্তিমান। কফির কাপে ছোট চুমুক দিয়ে বললেন, 'লুকোছাপা না করে একটা কথা আপনাকে খুলে বলি, ডক্টর গুপ্ত। ও-বাড়ির মানুষজন আমাকে ঠিক পছন্দ করে না। বিশেষ করে আমার মামিমা—প্রভাবতী তো বছরদুয়েক ধরে আমাকে দেখতেই পারেন না।'

'প্রভাবতী মানে?'

বিষণ্ণ হাসলেন দীপ্তিমান, বললেন, 'মনোহর রায়ের বিধবা স্ত্রী। বয়েস প্রায় সত্তর। প্যারালিসিস হয়ে অনেকটাই কাবু। তবে তিনিই রায়বাড়ির শেষ কথা। সবাইকে সবসময় পায়ের আঙুলের ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। ও-বাড়িতে চারুমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মামিমা যেভাবে আমাকে কথা শোনাতেন তাতে

আমার খুব খারাপ লাগত। তাই প্রায় বছরখানেক হতে চলল, আমি ও-বাড়িতে ক্বচিৎ-কদাচিৎ যেতাম। বিশেষ করে চারুমার অসুখ-টসুখের খবর পেলে তখন মামিমার অপমান সইতে হবে জেনেও যেতাম।'

'আপনাকে এরকম ডিসলাইক করার পজিটিভ কোনও কারণ ছিল?'

আবার মলিন হাসলেন দীপ্তিমান : 'থাকতে পারে—তবে আমার সেটা জানা নেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে বললেন, 'হয়তো ভেবে থাকবেন, চারুমা ওঁর শেষ সম্বল আমাকে দিয়ে যেতে পারেন।'

'চারুবালাদেবীর শেষ সম্বল কি অনেক কিছু ছিল?' অশোকচন্দ্র সিগারেটে টান দিয়ে লম্বা শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'তেমন কিছু আর কোথায়! ওই চল্লিশ হাজার টাকা...আর, গলার একটা সোনার হার...চার-সাড়ে চারভরি মতন হবে...। চারুমা সবসময় ওটা গলায় পরে থাকতেন। কিছুতেই কাছ-ছাড়া করতেন না।' মাথা নামিয়ে আলতো গলায় দীপ্তিমান আরও বললেন, 'পাগলামির সময়েও হারটার কথা চারুমার খেয়াল থাকত। ক'বছর ধরেই খালি আমাকে বলতেন, 'দীপ্তিরে, তর বউরে এটা আমি দিয়া যামু। আর কাওরে দিমু না।' আমি হেসে বলতাম, 'চারুমা, বিয়া করলে তয় না বউ আইব।' দীপ্তিমান হাসলেন আপনমনে, বললেন, 'দু-বছর ধরে চারুমা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে একেবারে খেপে উঠেছিলেন। আমার সামান্য আয়...তার ওপরে শরীরে খুঁত আছে। আমায় কে বিয়ে করবে বলুন!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দীপ্তিমান 'কিন্তু চারুমা কোনও কথা শুনতে চাইতেন না। যাকে সামনে পেতেন তাকেই আমার পাত্রী দেখার জন্যে রিকোয়েস্ট করতেন। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগত না। কিন্তু চারুমা কষ্ট পাবেন এই ভেবে তেমন করে কিছু বলতে পারিনি। যাক, এখন নিয়তিই সব সমস্যার সমাধান করে দিল।'

এসিজি চোখ ছোট করে কী যেন ভাবছিলেন। একটু ফাঁক পেতেই দীপ্তিমানকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'প্রভাবতীদেবীর সঙ্গে আপনার কখনও কথা-কাটাকাটি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?'

একটু চিন্তা করে তারপর দীপ্তিমান জবাব দিলেন, 'না, কখনও হয়নি।'

'স্ট্রেঞ্জ!' আপনমনেই মন্তব্য করলেন এসিজি। তারপর 'আচ্ছা, প্রভাবতী তো জানতেন চারুবালার শেষ সম্বল কতটুকু। তা হলে তার জন্যে আপনার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করবেন কেন? আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন—নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে।'

ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে মাথার ভেতরে হাতড়াতে শুরু করলেন দীপ্তিমান বসাক। এসিজি আর রঘুপতি চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর দীপ্তিমান মাথা নামালেন। এসিজির দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'রায় পরিবারের অনেকেরই আমি কোষ্ঠীবিচার করেছি। পাথর-টাথরও অনেক সময় দিয়েছি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, কখনও ওঁদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে দাম নিইনি, কিংবা ঝুটো পাথর দিয়ে ঠকাইনি। তবে মনোহরবাবুর—মানে, আমার মামার সবসময়েই একটা পেটের যন্ত্রণা হত। সেটা কমানোর জন্যে আমি একবার যজ্ঞ করেছিলাম, আর মামাকে পাথর দিয়েছিলাম। কিন্তু মামা শেষ পর্যন্ত ক্যান্সারে মারা যান। এখন মনে পড়ছে...তারপর থেকেই প্রভাবতী আমার সঙ্গে একটু কোল্ড বিহেভিয়ার শুরু করেন। ধীরে-ধীরে সেটা আরও খারাপের দিকে গেছে। হয়তো আমি মামাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি, এটাই আমার অপরাধ...।' হাত উলটে হতাশার একটা ভঙ্গি করলেন দীপ্তিমান।

এসিজি একবার কাশলেন। এ-বছর শীত যাই-যাই করেও অন্তত বারদুয়েক ফিরে এসেছে। তাতেই এসিজির একটু ঠান্ডা লেগে গেছে। দীপ্তিমানের কথা তিনি যেমন মন দিয়ে শুনছেন তেমনই মনোযোগ দিয়ে ওঁর প্রতিটি অভিব্যক্তি লক্ষ করছেন। ভদ্রলোককে এসিজির বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল।

এইবার এসিজি লাখ টাকার প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন দীপ্তিমানের দিকে।

'চারুবালার ব্যাপারটা আপনি অ্যাক্সিডেন্ট বলে মেনে নিতে পারছেন না কেন?'

এই প্রশ্নে দীপ্তিমান কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। ওঁর মুখ যে খানিকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেটা এসিজি ও রঘুপতি দুজনেরই চোখে পড়ল।

রঘুপতি জিগ্যেস করল, 'আপনি তা হলে কী ভাবছেন? সুইসাইড, না মার্ডার?'

একটু সময় নিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন দীপ্তিমান। তারপর ভেতরে-ভেতরে কোনও গোপন শক্তি সঞ্চয় করে বললেন, 'সুইসাইডের তো কোনও প্রশ্নই নেই! চারুমা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এ-অবস্থায় কেউ সুইসাইড করে না। তা ছাড়া, ওঁর গলার হারটা ক'দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা হঠাৎ পাওয়া গেল চারুমা মারা যাওয়ার দিন। ছাদের ভাঙা জায়গাটার কাছেই পড়ে ছিল। কে ওটা চুরি করেছিল, কেন চুরি করেছিল, কেনই বা ওটা চারুমার মারা যাওয়ার দিন ছাদে ফিরে এল—এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই...।'

'ফির ভি, অ্যাক্সিডেন্ট তো হতে পারে।' রঘুপতি বলল।

রঘুপতির দিকে তাকালেন দীপ্তিমান 'হ্যাঁ, হতে পারত—যদি না চারুমার শেষ একটা কথা আমার কানে বাজত...।'

'কী কথা?' এসিজি জানতে চাইলেন।

দীপ্তিমান একটু ইতস্তত করলেন। ভুরু উঁচিয়ে দু-চোখে হাত ঘষলেন। যেন কোনও কারণে তিনি ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারপর দু-একটা টুকরো শব্দ করে একটু সময় নিয়ে বললেন, 'আগেই তো বলেছি, মামিমাদের বাড়িতে আমার যাতায়াতের অসুবিধে ছিল। চারুমা আশ্রমে এলে তবেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ হত। তবে ওঁর বয়েস হয়েছিল, একা-একা আসতে পারতেন না। পাড়ার একটি সাদাসিধে ছেলে—নাম, রতন—ওকে সঙ্গে করে আসতেন। কোনও খবর দেওয়ার থাকলে রতনকে দিয়ে বলে পাঠাতেন। মোটামুটি রতনই আমাদের মধ্যে অনেকটা টেলিফোনের কাজ করত।' হাসলেন দীপ্তিমান 'আর দরকার পড়লে আমি চারুমাকে ও-বাড়িতে ফোন করতাম। সে-নিয়েও অবশ্য চারুমাকে কথা শুনতে হত। প্রভাবতী নাকি বলতেন : ''দিদি, আপনার এত ফোন আসে কেন? এ-বয়েসে এত ফোন আসা ভালো না।'' অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন!...যাই হোক, চারুমা বোধহয় কিছু একটা দেখে ফেলেছিলেন। এমন কিছু, যেটা ভালো কাজ নয়। তাই মারা যাওয়ার দিনদশেক আগে থেকেই একটা কথা ওঁর মুখে শুনতাম : ''ছি ছি ছি, এই অন্যায় আমি সইহ্য করুম না! কিয়ের লেইগ্যা সইহ্য করুম? সারাটা জীবন সংসার আমারে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া খাইল। পাঁচকান কইর‍্যা দিলে বুঝব'অন ঠ্যালা! আমারে চিনে না।'' '

'কী অন্যায় তিনি পাঁচকান করে দেওয়ার কথা বলছিলেন সেটা আপনি জানতে চাননি?'

'আমি অনেকবার চারুমাকে জিগ্যেস করেছি—কিন্তু চারুমা কোনও স্পষ্ট জবাব দেননি। বরং পাগলামির তোড়ে ভেসে গেছেন। পরে কখনও জানতে চাইলে বলতেন, ''কী কস? কুন কথা পাঁচকান করুম? আমি কইসি!'' মানে, ওঁর ব্যাপারটা আর মনে পড়ত না। ও-বাড়ির সকলেই বোধহয় চারুমার এ-কথা শুনেছে। হয়তো পাগলের পাগলামি বলে উড়িয়েও দিয়েছে...' একটু থামলেন দীপ্তিমান। তারপর সিরিয়াস গলায় বললেন, '...শুধু একজন ছাড়া। যে সেই অন্যায়টা করেছিল। সে ব্যাপারটাকে মোটেই পাগলের পাগলামি বলে উড়িয়ে দেয়নি। বরং ভয় পেয়েছে। ভেবেছে, পাগল বিধবাটা এই বোধহয় ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল। আর প্রভাবতী একবার জানতে পারলেই সর্বনাশ! চরম শাস্তি দিয়ে ছাড়বেন। ওঁকে সবাই যমের মতো ভয় পায়। তাই সেই লোকটা হয়তো ভয় পেয়েই পাগল বিধবাটাকে কিছু একটা...' দীপ্তিমানের গলা বুজে গেল। মুখে হাত চাপা দিয়ে জড়ানো গলায় তিনি কোনওরকমে বললেন, 'ওই পাগল বিধবাটাকে আমি ''মা'' ডেকেছিলাম। ঈশ্বর জানেন, ওঁর গয়না বা টাকাপয়সার জন্যে কোনও লোভ আমার ছিল না। ঈশ্বর জানেন, চারুমা মারা যাওয়ায় আমি কী কষ্ট পেয়েছি। আমি...আমি...।'

আর বলতে পারলেন না দীপ্তিমান। মাথা নিচু করে বাচ্চাছেলের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

এসিজি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। দীপ্তিমানকে সান্ত্বনা দিতে বললেন, 'আপসেট হবেন না, দীপ্তিমানবাবু...প্লিজ। যিনি চলে গেছেন তিনি তো আর ফিরবেন না!'

রঘুপতি যাদব চুপচাপ নোট নিচ্ছিল। দীপ্তিমানের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে আবার কাজে মন দিল।

হাতের সিগারেট কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এসিজি সেটা অ্যাশটেতে ফেলে দিয়ে বারকয়েক কাশলেন। মেয়ে ঊর্মিলা সামনে থাকলে নির্ঘাত সিগারেট হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিত। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে শাসন করার মতো কেউ আর কাছে নেই। যে সবচেয়ে কাছাকাছি থাকত, সবসময় থাকত, সে চলে গেছে বছরদশেক আগে। আকাশে। সেখানে গিয়ে আকাশের তারা হয়ে গেছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ খুললেন দীপ্তিমান। ভাঙা গলায় বললেন, 'ফোনে আপনাকে এসব কথা বলতে পারিনি। বুঝতেই তো পারছেন, বলা সম্ভব ছিল না। আপনি যদি কাইন্ডলি চারুমার মৃত্যুর ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করে দেখেন তা হলে আমি শান্তি পাব। চারুমার জন্যে আমি কর্তব্য করতে পারিনি। এমনকী মুখাগ্নিও ওরা করতে দেয়নি আমাকে। হয়তো শ্রাদ্ধের সময়েও ডাকবে না। তাই আমার খুব ইচ্ছে, ওঁর মৃত্যুতে যে শুধুমাত্র নিয়তির হাত ছিল না, সেটা প্রমাণ হোক। তা হলেই আমার শান্তি। আপনি আমাকে ফেরাবেন না...প্লিজ। আপনার ফিজ আমি দেব...হয়তো খুব বেশি পারব না...।' জল-ভরা চোখে এসিজির হাত চেপে ধরলেন দীপ্তিমান।

'এ কী করছেন! শান্ত হয়ে বসুন।' এসিজি বললেন, 'ফিজের কথা আপনাকে এখন ভাবতে হবে না। বরং ও-বাড়ির লোকজন সম্পর্কে আর যা-যা জানেন সেগুলো আমাকে বলুন। কাজে নামার আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যতটা ডিটেলে জানা যায় ততই কাজের সুবিধে। আর আপনার খোলাখুলি মতামতও বলবেন কিন্তু...।'

এরপর দীপ্তিমান বলে চললেন, আর অশোকচন্দ্র গুপ্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে আধবোজা চোখে সব শুনতে লাগলেন। রঘুপতি যথারীতি কাগজ-কলম নিয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যস্ত হল।

বিশু ফরমাশ পেয়ে আর-একদফা কফি দিয়ে গেল।

এসিজির আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়তে লাগল। আর ঘড়ির কাঁটাও ঘুরতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দীপ্তিমানের কথা শেষ হল।

এসিজি ওঁকে মামুলি কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, 'সম্ভবত আমি রোববার প্রভাবতীদের বাড়িতে যাব। তার আগে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ও. সি.-র সঙ্গে কথা বলে রঘুপতি ফরমালিটিগুলো সেরে রাখবে। তা না হলে ইনভেস্টিগেশানে প্রবলেম হতে পারে। আপনাকে খবর পাঠিয়ে দেব। সেদিন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'তাতে মাসিমা হয়তো মাইন্ড করতে পারেন।' দীপ্তিমান বললেন।

'মাইন্ড করলেই হল!' বলল রঘুপতি যাদব, 'আপ বেফিকর রহিয়ে, মিস্টার বসাক। দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম। কী বলেন, গুপ্তাসাব?'

রঘুপতির শেষ প্রশ্নটা প্রাক্তন স্যার এসিজিকে লক্ষ করে।

এসিজি হাসলেন। রঘুপতির মেজাজ যখন-তখন হারিয়ে যায়। তাই এসিজি প্রায়ই ওকে সাবধান করে বলেন, 'রঘুপতি, ডোন্ট লুজ ইয়োর টেম্পার। ওটা খুব দামি জিনিস।'

দীপ্তিমান চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আরও একদফা অনুরোধ করে গেলেন অশোকচন্দ্রকে।

রঘুপতি জিগ্যেস করল, 'স্যার, রঙ্গলালবাবুকে কি ইনফর্ম করতে হবে?'

প্রশ্নটা শুনে এসিজির হাসি পেয়ে গেল। আজকাল এমন একটা বাজে অভ্যেস হয়ে গেছে যে, তদন্তের সময় স্বভাবকবি রঙ্গলাল গোস্বামী পাশে-পাশে না থাকলে তিনি যেন ঠিক মেজাজ পান না। 'লালমহল'-এর চুনিলালবাবুর দামি পাথর খুঁজে বের করতে গিয়ে তাঁর ভাই রঙ্গলাল গোস্বামীর সঙ্গে এসিজির প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে স্বভাবকবি রঙ্গলাল এসিজির গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। রঙ্গলালের প্রশংসার দুটি অভিনব নমুনা

মনে পড়ল এসিজির 'আমি আপনার গুণমুগ্ধ/আপনি যেন খাঁটি দুগ্ধ', আর 'গোয়েন্দা, পক্ষিবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী/অমর, আকবর এবং অ্যান্টনি'। এই স্বভাব-কবি কখনও এসিজির 'তদন্তরসে' বঞ্চিত হতে চান না।

সুতরাং, হাসতে-হাসতেই অশোকচন্দ্র গুপ্ত রঘুপতিকে বললেন, 'ওঁকে ইনফর্ম অবশ্যই করবে, রঘুপতি। তা না হলে, ওঁর মতো স্বভাব-কবিতায় বলি—তোমার আমার মুন্ডুপাত/হয়ে যাবে অকস্মাৎ।'

রঘুপতি ঠোঁটের কোণে হাসল। তারপর এগিয়ে গেল প্রাক্তন স্যারের টেলিফোনের দিকে।

এসিজি পায়ে-পায়ে চলে এলেন জানলার গা ঘেঁষে রাখা একটা টেবিলের কাছে। এটা তাঁর পাঁচমিশেলি কাজের টেবিল। টেবিলে বই, পেন, কাগজপত্র সব এলোমেলোভাবে ছড়ানো। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা রুবিক কিউব।

রঙিন কিউবটা হাতে নিয়ে তার একটা থাক মোচড় দিতে শুরু করলেন অশোকচন্দ্র। সাজানো রংগুলো ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল।

আপনমনে বিড়বিড় করে এসিজি বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্ট, সুইসাইড, না মার্ডার?'

'...কে দেবে তার কারেক্ট আনসার।'

প্রভাবতীদের পুরোনো পলেস্তারা-খসা বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে আগের দিনের বিড়বিড় করে বলা কথাটাই জোরে-জোরে উচ্চারণ করেছিলেন অশোকচন্দ্র। প্রশ্নটা তিনি ছুড়ে দিয়েছিলেন সঙ্গী রঙ্গলালবাবুর দিকে। ব্যস!

রঙ্গলাল তৎক্ষণাৎ ওঁর স্বভাব-কবিতা রচনার তীব্র প্রতিভা কাজে লাগিয়ে ছন্দ মিলিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

এসিজি হেসে বললেন, 'উত্তর দিতে হবে আমাকেই। কোনও উপায় নেই। আমাকে নিয়ে রঘুপতির অনেক গর্ব। ওর মানটা তো বাঁচাতে হবে!'

প্রভাবতীদের বাড়িটা দেখামাত্রই ফিটন গাড়ি, ভোরবেলা গঙ্গার জল দিয়ে রাস্তা ধোওয়া, ভিস্তিওয়ালা—এসব পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়। একটা ভাঙা শ্বেতপাথরের ফলকে শুধু '...নিবাস' টুকু পড়া যাচ্ছে। তিনতলা বাড়ির এখানে-সেখানে বট-অশ্বত্থের চারা মাথাচাড়া দিয়েছে। হালকা শীতের বাতাসে তাদের রোদ-চকচকে পাতা নড়ছে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ও. সি. বিজন শর্মার সঙ্গে রঘুপতি কথা বলে নিয়েছিল। কেসের ফাইলের একটা কপিও রঘুপতি পৌঁছে দিয়েছে এসিজিকে। তারপর জরুরি একটা তদন্তের কাজে ওকে আচমকা ভুবনেশ্বর চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তার আগে ও সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে।

প্রভাবতীদের বাড়িতে বিজন শর্মা জানিয়ে দিয়েছেন যে, একজন ইনভেস্টিগেটর দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে রবিবার সকাল ন'টায় প্রভাবতীদের বাড়িতে আসবেন। বাড়ির প্রত্যেকে যেন তাঁর সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কো-অপারেট করেন। তা না হলে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াতে পারে।

সুতরাং, রবিবার সকালে এসিজি, রঙ্গলাল ও দীপ্তিমান, পৌঁছে গেছেন প্রভাবতীদের বাড়িতে।

বিশাল সদর দরজায় বিশাল মাপের কড়া। বোঝাই যায়, কলিংবেলের ব্যাপারটা আধুনিক সংযোজন।

বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। বছর পঞ্চাশের একজন টাক-মাথা ভদ্রলোক বিগলিত হেসে এসিজিদের অভ্যর্থনা জানালেন। তবে দীপ্তিমানকে দেখামাত্রই তাঁর ফরসা কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল।

'আসুন, আসুন, ডক্টর গুপ্ত।' রঙ্গলালবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বললেন তিনি, 'থানা থেকে আমাকে সবকিছু জানিয়ে আগাম খবর দিয়ে দিয়েছে। আমার নাম অজয়েন্দ্র—অজয়—আমারই পিসিমণি অ্যাক্সিডেন্টালি ছাদ ধসে পড়ে মারা গেছেন।'

এসিজি কিছু বলার আগেই রঙ্গলাল গোস্বামী ভুল ধরিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি হলেম রঙ্গলাল স্বভাব-কবিবর/উনি হলেন এসিজি গোয়েন্দাপ্রবর।'

কবিতার আকস্মিক দাপটে অজয়েন্দ্র কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলেন রঙ্গলালের কীর্তনীয়াগোছের চেহারার দিকে।

এসিজি সামান্য হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, মিস্টার রায়—আমরা ওই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে এসেছি। মানে...ব্যাপারটা তো সুইসাইডও হতে পারে। পুলিশ ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলটা এক্সপ্লোর করে দেখেনি।'

অস্বস্তির হাসি হাসলেন অজয়েন্দ্র : 'মানে, কেউ কি পুলিশে কোনও নালিশ-টালিশ করেছে?'

অশোকচন্দ্র লক্ষ করলেন, অজয়েন্দ্রর চোখ চট করে দীপ্তিমানকে ছুঁয়ে গেল।

'না, নালিশ-টালিশ কেউ করেনি। পুলিশই ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে।' তারপর একটু শক্ত গলায় বললেন, 'হঠাৎ আপনার নালিশের কথা মনে হল কেন?'

'মা বলছিল এই সাধারণ ব্যাপারটাকে নিয়েই হয়তো জল ঘোলা হবে—তাই।' গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বোলালেন অজয়েন্দ্র।

বসবার ঘরে ওঁদের বসাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এসিজি বাদ সাধলেন 'কিছু মনে করবেন না, আমরা আগে ছাদে যাব। জায়গাটা ভালো করে দেখব। তারপর আপনাদের সঙ্গে কিছু জরুরি কথা সেরে নেব।'

'সামান্য একটু চা-টা না খেলে কি চলে...।' ইতস্তত করলেন অজয়বাবু।

'সে পরে হবেখ'ন—' জবাব দিলেন রঙ্গলাল, 'থিতু হয়ে বসব যখন।'

ছন্দের গন্ধ পেয়ে এসিজি আড়চোখে তাকালেন রঙ্গলালের দিকে। কবিবর কাঁচুমাচু মুখ করে আকর্ণবিস্তৃত হাসলেন। দীপ্তিমান কিছু বললেন না, তবে রঙ্গলালের স্বভাব-কবিতা উপভোগ করছিলেন।

'মা জানতে পারলে খুব রেগে যাবেন...' বিড়বিড় করে এই কথা বলতে-বলতে অজয়েন্দ্র ওঁদের নিয়ে চললেন ওপরে।

সবসময়েই অশোকচন্দ্র গুপ্ত প্রথম অকুস্থল দেখাটা পছন্দ করেন। ওঁর মতে, আগে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরে অকুস্থল দেখলে দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক নিরপেক্ষ থাকে না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে এসিজি বাড়িটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

ঢালাই লোহার রেলিং, মেঝেতে সাদা-কালো পাথর বসানো, দেওয়ালের খানিকটা পর্যন্ত সাদা টালি, লাল-নীল-সবুজ-হলদে কাচের শার্সি, বারান্দার সিলিং এর কার্নিশে গোলা পায়রার আস্তানা। তবে শুধু গোলা পায়রাগুলোই চকচকে-ঝকঝকে নতুন—বাকি সবই ময়লা, চিড় ধরা, ভাঙা।

বাড়ির ভেতরটায় যেরকম অন্ধকার-অন্ধকার ভাব ছিল, ছাদে পা দিতেই ছবিটা বদলে গেল। অকৃপণ রোদ সেখানে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বিশাল ছাদ। সেখানে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে তা হল, কাপড় ছড়ানোর গোটা সাত-আট দড়ি নানান কায়দায় এ-মাথা ও-মাথা বাঁধা রয়েছে। কোনওটা নাইলনের দড়ি, কোনওটা সাদা কাপড়ের তৈরি, আর কোনওটা নিতান্তই পুরোনো শাড়ির পাড়।

ছাদের ডানদিকে প্রচুর টব। সেখানে সাধারণ সস্তার গাছ। কেউ কখনও টবগুলোর যত্ন নেয় বলে মনে হয় না। টবের সারির পিছনের পাঁচিলে দুটো কাক বসে আছে।

ছাদের মেঝেতে কম করেও তিন-চার জায়গায় ফাটল ধরেছে। আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটায় পাঁচিল ভাঙা, মেঝের খানিকটা অংশ নেই।

এসিজির নজর লক্ষ করে অজয়েন্দ্র বললেন, 'পিসিমণি ওখানটা দিয়েই পড়ে গেছেন।'

এসিজি পায়ে-পায়ে সেদিকটায় এগিয়ে গেলেন। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই অজয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর যাবেন না! আর যাবেন না!'

এসিজি থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালেন।

সে-চাউনিতে প্রশ্ন ছিল। তার উত্তরে ছাদের মেঝের দিকে আঙুল দেখালেন অজয়েন্দ্র 'ওই দেখুন, দাগ দিয়ে সাবধান করা আছে। ওই দাগের ও-পাশে আমরা কেউ কখনও যাই না। করপোরেশান দুবার নোটিশ দিয়ে গেছে। বাচ্চাদের তো ছাদে ওঠাই বারণ—।'

এসিজি লক্ষ করে দেখলেন। সত্যিই সাদা তেল রং দিয়ে অপটু হাতে একটা চওড়া দাগ টানা আছে। দাগের ও-পাশে বেশ বড় মাপের একটা ফাটল—দেখলে ভয় হয়। সেই ফাটল ফুট তিনেক যাওয়ার পরই বড় হাঁ হয়ে গেছে। ছাদের সেই অংশটা চারুবালাকে নিয়ে ধসে পড়েছে নীচে। খোঁদল দিয়ে দোতলার একটা ঘরের অংশ নজরে পড়ছে।

এসিজিদের নজর লক্ষ করে অজয়েন্দ্র বললেন, 'ও-ঘরটায় কেউ থাকে না। এমনই স্টোররুম মতন—।'

একটা সিগারেট ধরালেন এসিজি। ধোঁয়া ছাড়লেন কয়েকবার। মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন।

বাড়ির কেউ ওই দাগের ও-পাশে যেত না। সবাই ব্যাপারটা জানত। তা হলে চারুবালা গেলেন কেন? সে কি ওঁর মাথায় ছিট ছিল বলেই?'

'দাগটা কবে আঁকা হয়েছে, অজয়বাবু?'

'প্রায় সাত-আট বছর আগে। রং চটে গেলে আমিই আবার লাগিয়ে দিই।'

'লাস্ট কবে রং লগিয়েছেন?'

'তা প্রায় বছরখানেক হবে।' একটা ছোট ঢেঁকুর তুললেন অজয়েন্দ্র, পেটে বারকয়েক হাত বোলালেন।

দীপ্তিমান বলেছেন, চারুবালার মাথায় ছিট দেখা দেয় চার-পাঁচ বছর ধরে। দাগ দেওয়ার ব্যাপারটা তারও আগের—চারুবালা যখন সুস্থ ছিলেন। তা ছাড়া, ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়ার পরেও এতদিন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। নাকি চারুবালা প্রায়ই ছাদের ওই বিপজ্জনক অংশে যাতায়াত করতেন? তারপর হঠাৎ একদিন ওই অংশটা ওঁকে নিয়ে ধসে পড়েছে?

'আপনার পিসিমা ছাদে কি প্রায়ই উঠতেন?'

'না, না।' ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন অজয়েন্দ্র, 'বরং বলতে পারেন ন'মাসে ছ'মাসে কখনও-কখনও রোদ পোয়াতে উঠতেন। পিসিমণির অনেক বয়েস হয়েছিল। হাঁটুতে গেঁটে বাত ছিল। ওই শনিবার...মানে, যেদিন অ্যাক্সিডেন্টটা হয়...কেন উঠেছিলেন কে জানে?'

এসিজি বেশ অবাক হয়ে গেলেন। যে-মানুষটা ছাদে বলতে গেলে প্রায় আসতই না, সে হঠাৎ ছাদে উঠতে গেল কেন? আত্মহত্যা করার জন্য?

সুস্থ অবস্থা থেকেই লক্ষ্মণের গণ্ডি ওই সাদা দাগ দেখে এসেছেন চারুবালা। অসুস্থ অবস্থায় ওঁর কি সেসব কিছুই মনে ছিল না?

সাদা দাগটাকে ধরে ছাদের পাঁচিলের কাছে চলে গেলেন এসিজি। লক্ষ করলেন, পাঁচিলের গায়েও সরু-সরু ফাটল। গলা বাড়িয়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে নীচের গলির দিকে তাকালেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে অজয়বাবুকে ডাকলেন এসিজি 'অজয়বাবু, আপনার পিসিমার বডিটা কোন জায়গায় পড়েছিল দেখান তো—।'

অজয়েন্দ্র এসিজির পাশে চলে এলেন। আঙুল দিয়ে ইশারায় দেখিয়ে দিলেন জায়গাটা 'ওই যে—ওইখানটায়...।'

এখান থেকে পড়লে কারও পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। কিন্তু চারুবালা যদি আত্মহত্যাই করে থাকেন তা হলে ছাদের ওই ভাঙা জায়গাটাকেই বা বেছে নিলেন কেন! অন্য বহু জায়গা দিয়েই তো নীচে লাফ দেওয়া যেত!

'আপনি জানেন, আপনার পিসিমার ডানহাতের মুঠোয় একটা ক্লিপ পাওয়া গিয়েছিল?' অজয়েন্দ্রর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন এসিজি।

'ক্লিপ!' অজয়েন্দ্র কেমন হকচকিয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ—' সিগারেটে আয়েসী টান দিয়ে এসিজি বললেন 'কাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ। লাল রঙের।'

ক্লিপের তথ্যটা এসিজি কেস-ফাইল থেকে পেয়েছেন। পুলিশ এটা নিয়ে আর এগোয়নি কেন কে জানে!

'ন-না, আমি তো শুনিনি।' থতমত খেয়ে অজয়েন্দ্র বললেন, 'জানলে মা হয়তো জানবে।'

'আপনার পিসিমা কি কখনও-কখনও কাপড় ছড়াতে ছাদে উঠতেন?'

'আগে হয়তো উঠতেন—এখন আর বয়েসের জন্যে পারতেন না। আরতিই মা আর পিসিমার সব কাজ করে দেয়।'

দীপ্তিমানের কাছে সব শুনেছেন অশোকচন্দ্র। সেরিব্রাল হেমারেজের পর প্রভাবতী প্রায় পঙ্গু হয়ে যান। তারপর ফিজিয়োথেরাপি, আকুপাংচার, আরও বহুরকম চেষ্টাচরিত্র করে ওঁর শরীর অনেকটা সচল হয়। এখন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটা-চলা করতে পারেন। তবে সিঁড়ি ভাঙতে একেবারেই পারেন না। আরতি নামে একটি অল্পবয়েসি মেয়ে প্রভাবতীর রাত-দিনের সঙ্গী।

এমনসময় একজন ভদ্রমহিলা ছাদে এলেন। ময়লা রং, বেঁটেখাটো চেহারা। ছাদের দরজার কাছ থেকেই তিনি বললেন, 'অ্যাই, তোমাকে মা ডাকছে—।'

অজয়েন্দ্র ওঁর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'যাও, যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি বললে হবে না—মা এক্ষুনি যেতে বলেছে।' বলে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

এসিজি অনুমান করলেন, ইনি অজয়েন্দ্রর স্ত্রী মনীষা।

'আমি যাই—' অজয়েন্দ্র এসিজিকে বললেন, 'আপনারা কাজ সেরে দোতলায় মায়ের ঘরে আসুন।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন এসিজি। তাতে ছাদের ভাঙা জায়গাটার একটা স্কেচ আঁকা ছিল। সেটা সামনে ধরে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে লাগলেন।

একটু পরে বললেন, 'সোনার চেনটা ওইখানটায় পড়ে ছিল।'

উৎসুক দীপ্তিমান ও রঙ্গলাল এসিজির কাছে এলে ওঁর হাতের কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। স্কেচের একটা জায়গায় একটা কাটা চিহ্ন আঁকা ছিল। সেটাতে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে অশোকচন্দ্র বললেন, 'ধসে পড়া পোরশানটার ঠিক পাশেই হারটা পাওয়া গেছে। চারুবালা ওটা হাতে তুলে নেওয়ারও সময় পাননি।'

'হারটা হারানোর পর কী করে এখানে আবার ফিরে এল বলুন তো!' দীপ্তিমান যেন আপনমনেই বললেন।

ছাদটা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দেখার পর এসিজি বললেন, 'চলুন, নীচে যাই।'

হাতের শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা ছাদে ফেলে পায়ে রগড়ে দিলেন। মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে নিয়ে অস্পষ্ট গলায় বললেন, 'সে-কথাই তো ভাবছি...।'

রঙ্গলাল গোস্বামী আচমকা মন্তব্য করলেন, 'এসিজি স্যার, এ-বাড়িতে মোট চারটে ফ্যামিলি থাকে।'

'কী করে বুঝলেন?' এসিজি জানতে চাইলেন।

'অ্যান্টেনা গুনে।' হেসে বললেন রঙ্গলাল, 'ফ্যামিলি পিছু একটা করে অ্যান্টেনা—চারটে অ্যান্টেনা, চারটে ফ্যামিলি।'

'দারুণ বলেছেন।' বলেই কী যেন ভাবলেন এসিজি। তারপর দীপ্তিমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি বলেছিলেন, প্রভাবতীর দু-ছেলে—অজয়েন্দ্র, বিজয়েন্দ্র। দুটো ফ্যামিলি, দুটো অ্যান্টেনা, আর-একটা অ্যান্টেনা ধরে নিচ্ছি প্রভাবতীর। তা হলে চার নম্বরটা কার? চারুবালার?'

'কী যে বলেন!' হেসে ফেললেন দীপ্তিমান 'চারুমার জন্যে আলাদা টিভি! তা ছাড়া, দোতলার গলির দিককার একটা বড় ঘরে মামিমা আর চারুমা একসঙ্গে থাকতেন। তবে ঘরের টিভিটা অন-অফ হত মামিমার কথায়। ওই বাড়তি অ্যান্টেনাটা মামিমার বড় মেয়ে সুনন্দাদির। আপনাকে সেদিন বোধহয় বলিনি—মামিমার মেয়ে-জামাই এ-বাড়িতেই থাকেন। ঘরজামাইগোছের বলতে পারেন। সুনন্দাদির হাজব্যান্ড অমলেশদা কন্সস্ট্রাকশনের কীসব বিজনেস করেন। তবে চারুমা বলতেন, সে বিজনেসে নাকি সবসময়েই লস হত।

প্রায়ই নাকি ছেলেদের লুকিয়ে অমলেশদা মামিমার কাছ থেকে টাকা নিতেন। মামিমার সব পুঁজি তো এভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'চলুন, এবার নীচে যাওয়া যাক। সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে—বিশেষ করে আপনার মামিমার সঙ্গে।'

দীপ্তিমান কাঁচুমাচু মুখ করে তাকালেন এসিজির দিকে 'মামিমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি সামনে না থাকলে হয় না? উনি একদম শিওর ভাববেন আমি আপনাদের ডেকে এনে অকারণে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছি...।'

এসিজি আলতো হেসে বললেন, 'মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন কেন! উনি কিছুই বলবেন না...।'

ওঁরা তিনজনে নীচে নামছিলেন। দীপ্তিমানের নামতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। ছাদে রোদে ঘুরে যেটুকু তেতে উঠেছিলেন, বাড়ির ছায়ায় ঢোকামাত্রই ঠান্ডা আমেজ ওঁদের ঘিরে ধরল। ড্যাম্প-ধরা, পুরোনো বাড়ির বাড়তি শীত ওঁরা টের পেলেন।

কোথাও বকবকম করে গোলাপায়রা ডাকছিল। হঠাৎই সে-আওয়াজ ছাপিয়ে ঝগড়ার রুক্ষ চিৎকার ওঁদের কানে এল।

অজয়েন্দ্র কাউকে বলছিলেন, 'পিসিমণির ওই টাকার আবার শেয়ার কী! পিসিমণি ঠিক করেছিল টাকাটা আমাকেই দিয়ে যাবে—তাই আমার সঙ্গে জয়েন্ট ফিক্সড ডিপোজিট করেছিল। মা বললেই তোদের ভাগ দিতে হবে নাকি!'

উত্তরে কোনও মহিলার চাঁচাছোলা গলা শোনা গেল।

'অজু, বুঝেশুনে কথা বল। তোর সঙ্গে জয়েন্ট নামে রাখা মানেই সব তোর হয়ে গেল! ওই টাকা দিয়ে পিসিমণির কাজ হবে। ও-টাকার ভাগ আমার দরকার নেই।'

দীপ্তিমান চাপা গলায় বললেন, 'সুনন্দাদি—অজুদা-বিজুদার বড়দি।'

অজয়েন্দ্র তখন বলছেন, 'তোর আবার ভাগ দরকার হবে কেন! তুই আর অমলেশদা তো যা পেরেছিস এর মধ্যেই গুছিয়ে নিয়েছিস। ভাবিস, কিছু টের পাই না, জানি না! মা-কে বশ করে আমাদের এগেইনস্টে লেলিয়ে দেওয়া! আমি বিজুকে সব বলব। তারপরে...।'

'অজু, কী হচ্ছে! চুপ কর বলছি!' এক বৃদ্ধার তেজী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সুনন্দা, তুই নিজের ঘরে যা। বাড়িতে এখন বাইরের লোক এসেছে। নিজেদের মধ্যে গোলমাল যা কিছু পরে মেটানো যাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সব চুপচাপ। ভয় অথবা ভক্তি ছাড়া এ-ধরনের 'জো হুজুর' ছেলেমেয়ে আজকের দিনে পাওয়া মুশকিল।

'বুঝতে পারলেন তো...মামিমা!' দীপ্তিমান চাপা গলায় আবার বললেন।

এসিজি মাথার চুলের গোছায় দু-বার টান মেরে বললেন, 'আমাদের প্রভাবতীদেবীর কাছে নিয়ে চলুন।'

দীপ্তিমান চমকে ঘুরে তাকালেন বৃদ্ধ গোয়েন্দার দিকে। বোধহয় 'দেবী' শব্দটা ওঁর কানে লেগেছে।

রঙ্গলাল এতক্ষণ গুম মেরে সব শুনছিলেন। হঠাৎই বললেন, 'লোভ অতি সর্বনাশা/চেঙ্গিস খাঁ, কামাল পাশা।'

এসিজি স্বভাব-কবিবরের দিকে তাকালেন বটে, কিন্তু কিছু বললেন না। ওঁর স্বভাব-কবিতায় উপমা, প্রতীক ইত্যাদি এতই অদ্ভুত যে, প্রথম-প্রথম শ্রোতারা একটু ধাক্কা খায়।

দীপ্তিমান হাসি চাপছিলেন, ছোট্ট করে বললেন, 'এ-বাড়িতে লোভ একটা মেজর জায়গা নিয়ে আছে। কারণ, টাকাপয়সা, সম্পত্তি সবকিছুর কন্ট্রোল মামিমার হাতে।'

'তা হলে সোনার হারটা ছাদ থেকে চুরি গেল না কেন?' রঙ্গলাল এসিজিকে প্রশ্ন করলেন।

'ওটাই তো আমার আসল খটকা।' আনমনাভাবে অশোকচন্দ্র বললেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে বসালেন।

ওঁরা প্রভাবতীর ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওষুধ আর ফিনাইলের হালকা একটা গন্ধ সকলের নাক ছুঁয়ে গেল।

বৃদ্ধা একটা লম্বা সোফায় বসে ছিলেন। সামনে দুটো টেবিল। তাতে দুটো ছোট রেডিয়ো, কিছু ম্যাগাজিন, বইপত্তর, আর একটা দম দেওয়া কলিংবেল।

ঘরটা মাপে বেশ বড়। মেঝেতে পুরোনো দিনের মার্বেল পাথর। দু-প্রান্তে দুটো খাট। দেখে বোঝা যায়, একটা প্রভাবতীর—অন্যটায় চারুবালা শুতেন। দুটো আলমারি। একটা ছোট টিভি। আর একটা ড্রেসিং টেবিল।

প্রভাবতীর রোগা শরীরে সাদা শাল জড়ানো। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। মাথায় ঘোমটা। সামনের দিকের চুলে এখনও কালো ছোপ রয়েছে। হাতে সরু-সরু দু-গাছা চুড়ি। আর ডানহাতে একটা লাঠি।

ঘরে একটি অল্পবয়েসি মেয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। এসিজি অনুমানে বুঝলেন, আরতি।

দীপ্তিমান পরিচয় করিয়ে দিলেন। এবং দেওয়ামাত্রই প্রভাবতী ওঁকে অনেকটা হুকুমের সুরে বললেন, 'তুমি এবার যেতে পারো। আমাদের কথাবার্তার সময় তোমার থাকার দরকার নেই।' তারপর আরতির দিকে ফিরে : 'ওদিকের জানলাটা খুলে দে। আর টেবিলের ওই ঘটি থেকে আমাকে আধগ্লাস জল দে।'

প্রভাবতীর কাছাকাছি চারুবালার খাটের কিনারায় এসিজিরা বসেছিলেন। এসিজি সূক্ষ্ম নজরে রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধাকে দেখছিলেন। সারা মুখে অহঙ্কারের ছাপ। এমনকী বলিরেখাগুলোও সেই অহঙ্কারী ঢঙে সামিল হয়েছে।

এসিজির গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সিগারেটের জন্য। কিন্তু এখানে সিগারেট মানায় না। একটু কেশে নিয়ে তিনি বললেন, 'মিসেস রায়, দীপ্তিমানবাবু আমাদের সঙ্গে থাকাটা খুব জরুরি।'

'তার মানে! কী বলতে চান আপনি! আমাদের ফ্যামিলির কথা বাইরের কোন এক দু-পয়সার জ্যোতিষীর সামনে বলতে হবে!' ঘাড় কাত করে ওপরওয়ালার ভঙ্গিতে এসিজির দিকে দেখলেন প্রভাবতী : 'আপনার কাছে ও জরুরি হতে পারে, আমার কাছে নয়।'

এরপর আর কোনও কথা চলে না।

দীপ্তিমান মুখ নিচু করে বসেছিলেন। এসিজির দিকে 'আপনাকে বলেছিলাম না!' এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

'চারুবালা কীভাবে মারা গেছেন বলে আপনার মনে হয়?' এসিজি সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

'সবাই যা জানে তাই—' আরতির দেওয়া জলের গ্লাসে চুমুক দিলেন 'অ্যাক্সিডেন্ট।' তারপর আরতিকে : 'তোকে আধগ্লাস বললাম, এতটা দিলি! যা বাকি জলটা ঘটিতে ঢেলে রাখ। ঘটিটা ঠিকমতো ঢাকা দিবি। কোনও কাজের একটা ছিরি নেই।'

আরতি কোনও জবাব না দিয়ে হুকুম তামিল করল।

'যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হয় তবে আর কীভাবে চারুবালা মারা যেতে পারেন?'

বিরক্তির একটা শব্দ করে বৃদ্ধা বললেন, 'সুইসাইড হতে পারে। পাগলের খেয়াল—কী করে বলব বলুন!'

'খুনও হতে পারে।'

'তার মানে! খুনের প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে! তখন তো ছাদে আর কেউ যায়নি!'

'আপনি কী করে জানলেন?' এসিজি হেসে প্রশ্ন করলেন। তারপর 'আপনি শুধু আপনারটা বলতে পারেন।'

'না, আমি জানি। দিদি যখন ছাদে যায়—ছাদ থেকে পড়ে যায়—তখন এ-ঘরে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি কতকগুলো জরুরি কথা বলছিলাম। অমলেশ বাড়ি ছিল না। আপনারা যেখানে বসে আছেন, অজু-বিজু, ওদের দু-বউ, ওখানে বসেছিল। আর সুনন্দা আমার বিছানায়। আরতি নীচে কলতলায় গিয়েছিল। এরপর বাকি রইল বাচ্চারা। ওরা নিশ্চয়ই তাদের ''দিদু''কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়নি!'

অশোকচন্দ্রের মনে হল তিনি কোনও জজসাহেবের এজলাসে বসে আছেন। প্রভাবতীর কথা শুনে মনে হল, সব প্রশ্নের উত্তর তিনি যেন আগেভাগেই জেনে তৈরি করে নিয়েছেন।

রঙ্গলাল এসিজিকে দেখছিলেন। থিঙ্কিং মেশিনকে খানিকটা যেন নাজেহাল দিশেহারা লাগছে।

'আপনার দিদির হাতে কাপড় ছড়ানোর একটা ক্লিপ ছিল। উনি কি তখন কাপড় ছড়াতে গিয়েছিলেন, না তুলতে গিয়েছিলেন?'

'পাগলের কখন কী খেয়াল হয়, আমি কী করে জানব!'

এসিজি দু-হাতের দশ আঙুল মাথায় ঠেকালেন। একটু সময় নিয়ে তারপর বললেন, 'পুলিশ এসে ছাদে কিন্তু কোনও কাপড় পায়নি।'

'বললাম তো, পাগলের খেয়াল! হয়তো ক্লিপ হাতে এমনই ছাদে ঘুরতে গিয়েছিল।'

'ওঁর সোনার হারের ব্যাপারটা জানেন তো!'

'জানাজানির আবার কী আছে! ওটা হয়তো দিদির কোমরেই বরাবর গোঁজা ছিল—ছাদে কোনওভাবে খসে পড়েছে।'

'মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে চারুবালা কারও একটা গোপন অন্যায় দেখে ফেলেছিলেন। সেটার কথা উনি মাঝে-মাঝেই বলতেন। আপনি কখনও শুনেছেন?'

'না তো!' তারপর আরতিকে : 'বেলা হয়ে গেছে। তুই গিয়ে আমার স্নানের গরম জল বসিয়ে দে। কালকের মতো বেশি গরম করিস না।'

আরতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ভালো করে মনে করে দেখুন, মিসেস রায়। কোনও কিছু একটা জেনে ফেলার ব্যাপারে...।'

'আপনি কার থেকে এসব আজেবাজে কথা শুনেছেন বলুন তো!'

এসিজি ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন। এও বুঝলেন, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাই প্রভাবতীর কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন।

প্রভাবতী সঙ্গে-সঙ্গে রেডিয়োর এফ. এম. চ্যানেল চালিয়ে শুনতে শুরু করলেন। গলা তুলে বললেন, 'যাওয়ার আগে একটু চা-টা খেয়ে যাবেন—।'

একতলার দিকে নেমে-যাওয়া সিঁড়ির পাশে দীপ্তিমান অপাংক্তেয়র মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসিজি ওঁর কাছে এসে বললেন, 'সরি, কিছু মনে করবেন না। এবারে ছোটভাই আর দু-ভাইয়ের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলব।'

'হ্যাঁ, ও-ঘরে চলুন। বিজুদার ঘরে আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে।'

বিজয়েন্দ্রর ঘরে বসে চা খেতে-খেতে কথাবার্তা সেরে নিলেন এসিজি।

আলোচনাটা টাকাপয়সা আর বিষয়-সম্পত্তির দিকে চলে গেল।

এই বাড়িটা মনোহর রায়ের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে সেটা আইনমাফিক গিফট করে যান। টাকাপয়সার সবরকম দায়িত্বও প্রভাবতীর ওপরে। ফলে বিরাট বিষয়আশয়ের মালিক হয়েও ছেলেমেয়েরা মালিক নন। সবটাই মা-নির্ভর। প্রভাবতী যাঁকে পছন্দ করেন তাঁরই বাড়বাড়ন্ত। যেমন, এখন সুনন্দা আর অমলেশ প্রভাবতীর দু-নয়নের মণি। কিছুদিন পরই হয়তো অজয়েন্দ্র কিংবা বিজয়েন্দ্রর পালা আসবে। কলকাতার আশেপাশে জমিজিরেত অনেক ছিল। কিন্তু তার প্রায় সবটাই বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রির টাকা প্রভাবতী অমলেশকে দিয়েছেন—কন্সট্রাকশানের ব্যবসা দাঁড় করাতে।

এসিজি বুঝলেন, মা-কে নিয়ে দু-ছেলে আর তাঁদের স্ত্রীদের ক্ষোভের শেষ নেই। অথচ কিছু করারও নেই—কারণ, প্রভাবতীই এ-বাড়িতে শেষ কথা।

এরপর সুনন্দার সঙ্গে কথা বলে উলটো ছবি পাওয়া গেল। বড় মেয়ে মায়ের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। সারা জীবন ধরে প্রভাবতী যে কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কত কষ্ট সয়েছেন সেগুলো বিস্তারিত বললেন

সুনন্দা। মায়ের স্নেহ-মমতা-দয়া সম্পর্কেও এত বলতে লাগলেন যে, এসিজির মনে হচ্ছিল তিনি ভগিনী নিবেদিতা অথবা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবনী শুনছেন।

অমলেশ বাড়িতে নেই। তিনি দু-দিন আগে ব্যবসার কাজে ভাইজাগ গেছেন—পরশু ফিরে আসবেন। তবে অমলেশ থাকলেও বোধহয় কোনও লাভ হত না। কারণ, সুনন্দার কথারই প্রতিধ্বনি বোধহয় শুনতে পাওয়া যেত।

এসিজির মনটা কেমন যেন খচখচ করছিল। চারুবালা ছাদে গেলেন কাপড় ছড়াতে অথবা কাপড় তুলতে। অথচ ছাদে কোনও কাপড় পাওয়া গেল না। দীপ্তিমান, অজয়েন্দ্র—দুজনেই বলেছেন চারুবালা সাধারণত ছাদে যেতেন না। তা হলে সেদিন হঠাৎ গেলেন কেন! অন্যান্য দিন ওঁর কাপড়খানা কে ছড়াত, কে তুলত? নিশ্চয়ই আরতি! আরতির সঙ্গে একবার আলাদা কথা বলা দরকার।

বিজয়েন্দ্রকে ডেকে এসিজি বললেন, 'বিজয়বাবু, আরতিকে একবার ডেকে দেবেন? নীচে বসবার ঘরে ওর সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলব। তবে কেয়ারফুলি ডাকবেন—আপনার মা যেন টের না পান। টের পেলেই হয়তো রাগারাগি করবেন...।'

বিজয়েন্দ্র ওঁর স্ত্রী তুলিকাকে ডেকে চাপা গলায় কী যেন বললেন। তুলিকা চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

'আপনারা নীচে যান—ও আসছে। তবে বেশিক্ষণ ওকে আটকে রাখবেন না। একটু পরেই মা চান করতে যাবে। তখন আরতিকে ডেকে না পেলে পরে তুলোধোনা করে ছাড়বেন।' কথা শেষ করে অদ্ভুত হাসলেন বিজয়েন্দ্র।

নীচের বসবার ঘরে ওঁরা তিনজন সবে গুছিয়ে বসেছেন, আরতি দরজায় এসে দাঁড়াল। পরনে ছাপা শাড়ি, আঁচল কোমরে গোঁজা।

'আমায় ডেকেছেন, দাদাবাবু?'

'তুমি তো জানো আমরা পুলিশের লোক—' গম্ভীর চালে কথা শুরু করে এখন একটা সিগারেট ধরালেন এসিজি। গায়ের শালটা বাঁ-হাতের ওপরে ঝুলে পড়েছিল, সেটা কাঁধের দিকে টেনে নিলেন।

আরতির শ্যামলা মুখ পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শুকনো গলায় বলল, 'হ্যাঁ, দাদাবাবু, জানি—।'

'তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব। একদম ঠিক-ঠিক জবাব দেবে। উলটোপালটা চালাকি করলে...।'

'মা কালীর দিব্যি—সত্যি বই মিথ্যে কইব না।'

'চারুবালা—মানে, তোমার পিসিমার শাড়ি-জামাকাপড় রোজ কে ছাদে শুকোতে দিয়ে আসত, আর কে তুলে নিয়ে আসত?'

'আ-আমি?'

'অন্য কেউ কখনও যেত না?'

'না। তবে কিছুদিন হল মা মাঝে-মাঝে বড়দিকে পাঠাতেন। কখনও বা পিসিমাকে পাঠাতেন।'

'পিসিমা যেদিন মারা যান সেদিন পিসিমার কাপড় কে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিল?'

একটু চিন্তা করে আরতি বলল, 'বড়দি।'

'শনিবার, পিসিমা যখন ছাদ ভেঙে পড়ে যান, তখন সত্যি-সত্যি বড়দি, দাদাবাবুরা, বউদিরা—সবাই মায়ের ঘরে ছিল?'

আবার সময় নিল আরতি। তারপর 'হ্যাঁ। তবে তারপরই বড়দি আবার ছাদের দিকে গেছল। আমরা তখন বারান্দা দিয়ে গলিতে দেখছি কী পড়ল, কীসের ওরকম আওয়াজ হল।'

'পিসিমার গলার চেনটা চুরি হয়েছিল তুমি জানো?'

'মা কালীর দিব্যি, ও-হার আমি নিইনি, দাদাবাবু।' আরতি আর একটু হলেই এসিজির পায়ে পড়ে আর কী!

'না, না—তুমি নাওনি আমরা জানি। তবে হারটা ক'দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। হয়তো কোথাও হারিয়ে গিয়ে থাকবে...। তারপর—পিসিমা মারা যাওয়ার দিন—ছাদে পাওয়া গেছে।'

আরতি ঠোঁট কামড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'হারটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তুমি জানো?' আবার প্রশ্ন করলেন এসিজি।

'মনে হয় হারায়নি কোথাও। হয়তো মায়ের কাছটিতেই রেখে দিয়ে পিসিমা পাগলামির খেয়ালে ভুলে গেছে।'

এসিজির ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি একবার দীপ্তিমানের দিকে দেখলেন। দুজনে চোখাচোখি হল।

'হারটা সত্যি-সত্যি হারালে মা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলত। দোকান-ফেরত সামান্য চার আনা আট আনার গণ্ডগোল হলেই আমায় যেরকম মুখ করে!'

এসিজির কোঁচকানো ভুরু সোজা হচ্ছিল না। মনে-মনে নতুন একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলেন তিনি। মনে হচ্ছিল, চারুবালাকে শুধু নিয়তির অদৃশ্য হাত পিছন থেকে ধাক্কা দেয়নি, তারও পিছনে হয়তো মানুষেরও হাত ছিল।

এসিজি আনমনা হয়ে গেলেন। মাথার পিছনে হাত নিয়ে সাদা চুলের গোছায় টান মারতে শুরু করলেন।

তারপর হঠাৎই আরতিকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমার সঙ্গে যেসব কথা হল কাউকে বলবে না। বললে তোমারই বিপদ হবে।'

আরতি ফ্যাকাসে মুখে মাথা নেড়ে চলে গেল।

কাজের লোকরা সত্যি-সত্যিই কাজের লোক। এটাকে কি যমক অলঙ্কার বলা চলে? আপনমনেই হাসলেন বৃদ্ধ হুনুর। তারপর বললেন, 'গোস্বামী রঙ্গলাল / বাদ বাকিটা হবে কাল।'

'কী বুঝলেন, ডক্টর গুপ্ত?' দীপ্তিমান ইতস্তত করে জিগ্যেস করলেন।

'মোটামুটি বোধহয় বুঝতে পারছি। আপনার সন্দেহ সত্যি হলেও হতে পারে। কাল আমি আর রঙ্গলালবাবু এ-বাড়িতে আর-একবার আসব। কী, রঙ্গলালবাবু, সময় হবে তো আপনার?'

আকর্ণ হাসলেন রঙ্গলাল 'প্রশ্নটি অতি অবান্তরম/সময় হইবে সুনিশ্চিতম।'

দিনের আলোয় যে-বাড়িটাকে জীর্ণ অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল, রাতের আঁধারে সেটাকে ভুতুড়ে বলে মনে হল।

অশোকচন্দ্র ও রঙ্গলাল বাড়িতে ঢুকতেই সুনন্দার সঙ্গে দেখা হল। টেলিফোনে আগাম বলা ছিল। সুতরাং অপছন্দ মুখে সুনন্দা ওঁদের দোতলায় মায়ের ঘরে নিয়ে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় এসিজি টিভি চলার শব্দ পাচ্ছিলেন, বাচ্চাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলেন। প্রভাবতীর ঘরে ঢুকতেই টিভির শব্দ ওঁদের কানে ধাক্কা মারল।

গতকালের গন্ধটা আরও উগ্রভাবে এসিজির নাকে এল।

প্রভাবতী সম্রাজ্ঞীর ঢঙে সেজেগুজে সোফায় বসে ছিলেন। শরীর টান-টান। মুখে প্রসাধনের সামান্য আস্তর।

আরতি ওঁর পাশে মেঝেতে বসে টিভি দেখছিল। এসিজিদের দেখেই উঠে দাঁড়াল।

প্রভাবতী ওকে বললেন, 'টিভির আওয়াজটা একদম কমিয়ে দে।'

হুকুম তামিল হল। টিভিতে মূকাভিনয় শুরু হল।

'বলুন, ডক্টর গুপ্ত, কী ব্যাপারে দেখা করতে চেয়েছেন?' প্রভাবতী মাপা গলায় প্রশ্নটা করলেন। অনুমতির অপেক্ষা না করেই এসিজি রঙ্গলালকে নিয়ে চারুবালার খাটের কিনারায় বসে পড়লেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে প্রাইভেট কিছু কথা ছিল।'

সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম হল : 'আরতি, তুই এখন যা। আমি ডাকলে তবে আসবি।'

আরতি তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে গেল। যেন পালিয়ে বাঁচল।

সুনন্দাও চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এসিজি ওঁকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার পিসিমা যেদিন মারা যান সেদিন আপনি ওঁর কাপড় ছড়াতে ছাদে গিয়েছিলেন? পরে, পিসিমা ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পরেও আপনি আবার ছাদে গিয়েছিলেন। অথচ তখন তো সকলের গলির দিকে ছুটে যাওয়ার কথা। এটা একটু এক্সপ্লেইন করবেন?'

সুনন্দা দিশেহারা চোখে মায়ের দিকে তাকালেন।

প্রভাবতী স্থির গলায় বললেন, 'তুই যা। আমি কথা বলছি।'

সুনন্দা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এসিজির দিকে তাকিয়ে বোকা-বোকা হেসে চটপট চলে গেলেন।

'যা বলার আমাকে বলুন, ডক্টর গুপ্ত। ওরা সব ছেলেমানুষ—।'

প্রভাবতীর গলায় সামান্য চ্যালেঞ্জের ছোঁওয়া ছিল। ঘরের জোড়া টিউব লাইটের আলোয় ওঁর বলিরেখাগুলো নিষ্ঠুর দেখাল।

এসিজির ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। মাথার চুলের গোছায় টান মেরে তিনি বললেন, 'ম্যাডাম, আপনাকে একটা গল্প শোনাই। গল্পে হয়তো অনেক ফাঁকফোকর থাকবে—সেগুলো আপনাকেই ভরাট করতে হবে...।'

প্রভাবতীর মুখ পাথরের মতো। চোখ টিভির দিকে।

কাল সারাটা রাত ধরে বহু ভেবেছেন বৃদ্ধ হুনুর। মনে-মনে এমন একটা গল্প তৈরি করতে চেয়েছেন যেটা প্রতিটি সূত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সোনার হার, কাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ, সুনন্দার ছাদে যাতায়াত—আর, সবশেষে চারুবালার নিয়তি। এখন সেই গল্পই শোনাতে এসেছেন প্রভাবতীকে।

সামান্য কেশে নিয়ে এসিজি বলতে শুরু করলেন 'আপনি একটা চান্স নিয়েছিলেন, মিসেস রায়। চারুবালাকে আপনি নানান ছল-ছুতোয় ছাদের ওই বিপজ্জনক জায়গাটায় পাঠাতে চেয়েছিলেন। তাই ওঁর ভেজা কাপড় ইদানীং ওই বিপজ্জনক জায়গাতেই ছড়ানো হত। কে ছড়াতেন জানি না। তবে আপনি নন। সুনন্দা হতে পারে, আরতি হতে পারে। হয়তো ছড়ানোর জন্যে ওরা লাঠি বা অন্য কিছু ব্যবহার করত—যাতে ওই লক্ষ্মণের গণ্ডির ভেতরে ঢুকে পড়তে না হয়। তা ছাড়া, আমি দেখেছি, দড়িটা লাঠি দিয়ে টেনে এনেও নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে কাপড় ছড়ানো যায়, ক্লিপ আঁটা যায়। আপনি সেই শনিবার চারুবালাকে বকাঝকা করে ওঁর শুকনো কাপড় তুলে আনতে পাঠিয়েছিলেন—আমার সেরকমই মনে হয়।

'কিন্তু চারুবালা ছিলেন কিছুটা ছিটগ্রস্ত। তাই সবসময় হয়তো ছাদে গিয়েও ওই জায়গাটায় পা দিতেন না। হয়তো সাদা দাগটা ওঁকে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিত—উনি সাবধান হয়ে যেতেন।

'আপনি তখন খানিকটা সমস্যায় পড়লেন। তখন সোনার হারের টোপটা আপনার মাথায় এল। ওটা আপনি চারুবালার কাছ থেকে কোনও অজুহাতে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। তারপর ছাদের ওই বিপজ্জনক জায়গায় হারটা রেখে দিয়ে এলেন। না, আপনি নন—আপনার হয়ে অন্য কেউ। আপনি যে সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না তা আমি জানি।

'এইবার কাজ হল। চারুবালা ছাদে গেলেন। সোনার চেনটা দেখতে পেলেন। তারপর ঠিক কী হয়েছে জানি না। উনি শাড়ি থেকে ক্লিপটা আগে খুলেছেন, নাকি চেনটা আগে কুড়িয়ে নিয়েছেন কে জানে! চেনটা আগে নিয়ে থাকলে ওটা হয়তো আবার ওঁর হাত থেকে খসে পড়ে গেছে ছাদেই। কিন্তু ক্লিপটা হাতে থেকে গিয়েছিল...।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এসিজি। তারপর আবার খেই ধরলেন : 'নিয়তি তার কাজ করল। চারুবালা পড়ে গেলেন। আর আপনার এ-ঘর থেকে সুনন্দা সঙ্গে-সঙ্গে ছাদে চলে গেল পিসিমণির শাড়িটা তুলে আনতে...।'

এসিজি থামলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রভাবতী। টিভির দিকে তখনও তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু ওঁর দু-চোখ থেকে ভাঙা গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। টিভির আলোয় জলের রেখা চকচক করছিল।

চাপা খসখসে গলায় বললেন, 'হারটা আমি দিদির কাছ থেকে নিইনি। দিদিই আমাকে ওটা গলা থেকে খুলে রাখতে দিয়েছিল—পরে ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য চাইলে আমিও অস্বীকার করতাম।

'আপনার একটা গোপন অন্যায় চারুবালা দেখে ফেলেছিলেন। সেটা কী আমি আঁচ করতে পারিনি—।'

নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক গলায় প্রভাবতী বললেন, 'এই বাড়িটা আমি সুনন্দার নামে উইল করে গেছি। অমলেশ যেদিন কাগজপত্র সই করিয়ে নেয় দিদি সেদিন দেখেছিল। তারপর থেকেই আমাকে জ্বালিয়ে মারত। বলত, ''এ তুমি ঠিক করলা না। অজু-বিজু ভিটা ছাইরা কই যাইব!'' কিন্তু কী করব! সুনন্দা-অমলেশের জন্যে যতটা আমার মন টানে অজু-বিজুর জন্যে ততটা না। ওরা অনেক পেয়েছে—।'

চোখের জল তখনও গড়িয়ে পড়ছিল—।

প্রভাবতীকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে তারপর এসিজি বললেন, 'মিসেস রায়, এখন আপনি কী করবেন ভাবছেন? আপনি দু-দুটো অন্যায় করেছেন—তার মধ্যে একটা এখনও শুধরে নেওয়ার সময় আছে। আমি হলে শুধরে নিতাম...।'

'আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে?' বৃদ্ধা মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করলেন।

'না—' হেসে মাথা নাড়লেন এসিজি 'প্রমাণ নেই। প্রমাণই কি সব! একটা কথা আপনাকে বলি। ঈশ্বর কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ—এইসব পাংচুয়েশান মার্ক আমাদের হাতে দেন—তবে দাঁড়িটা নিজের হাতে রাখেন। সময় হলেই আমাদের জীবনে দাঁড়ি টেনে দেন। সেই দাঁড়িটা নিজের হাতে তুলে নেওয়া মানে ঈশ্বরকে অসম্মান করা। আপনি সেটাই করেছেন। প্রমাণ না থাকুক, যে-অন্যায়টা এখনও শোধরানো যায় আপনি সেটা অন্তত শুধরে নিন...।'

'দিদিকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু কী করব...সুনন্দাদের জন্যে পাগল-পাগল টান। কেন এমন টান কে জানে! আমার জন্যে দিদি...ছিল শুকতারা, সন্ধ্যাতারা হয়ে গেল। আমার জন্যে...।'

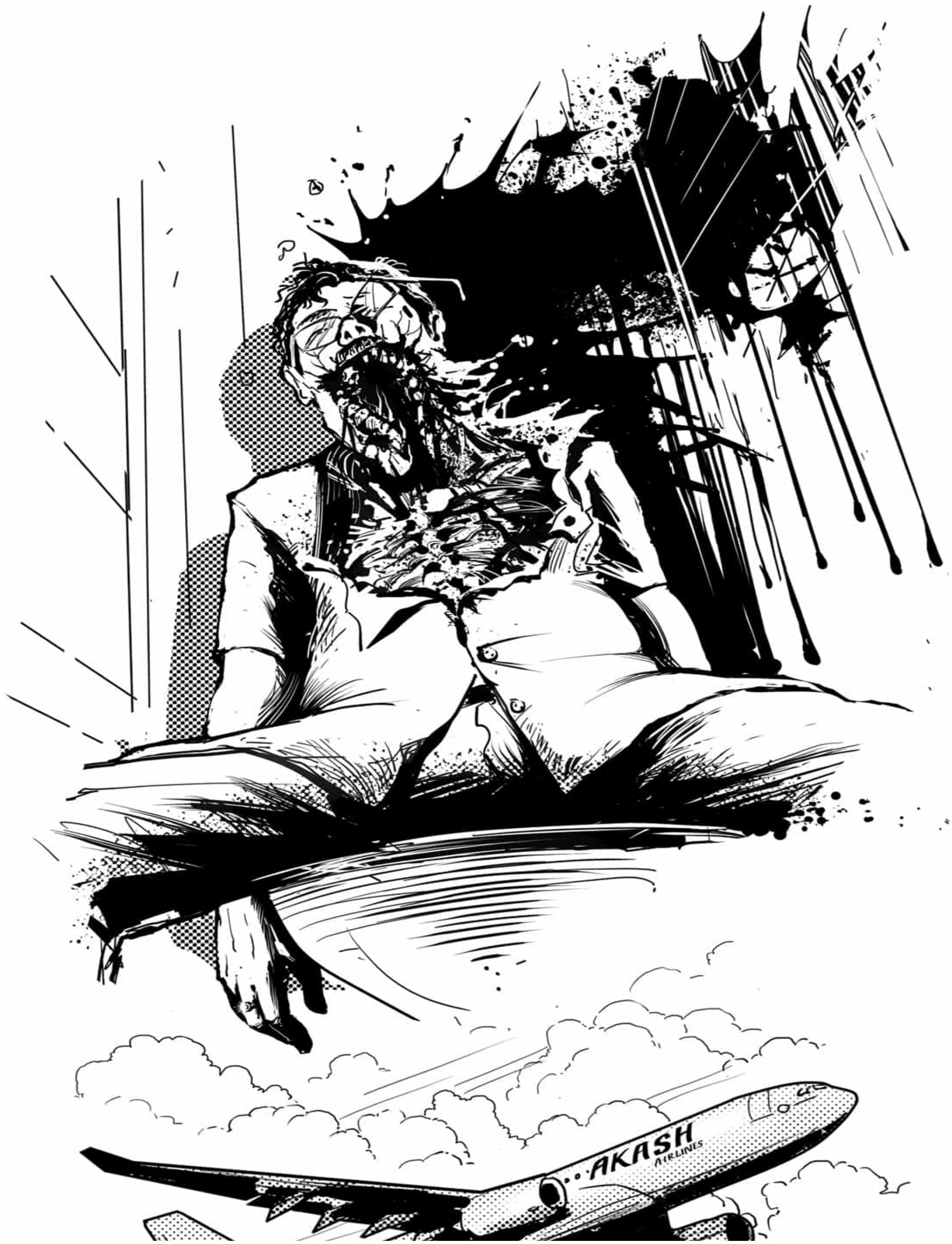
বৃদ্ধার মুখ ভেঙেচুরে গেল। জলভরা কাতর চোখে এসিজির দিকে তাকালেন তিনি। কিছু একটা বলতে চাইলেন।

এসিজি উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'এসব কথা আমি কাউকে বলব না।'

একজন সর্বস্বান্ত রানিকে তাঁর মেকি সিংহাসনে বসিয়ে রেখে এসিজি আর রঙ্গলাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

টিভিতে তখনও মূকাভিনয় চলছিল।

আকাশঘুম





'খুন অতি জঘন্য কাজ—খুনি ধরার কাজ আরও জঘন্য।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই দামি মন্তব্যটা করেছেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি। রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করার সময় এই সংক্ষিপ্ত নামটাই বেশি চালু ছিল। কিন্তু রিটায়ার করার পর কেউ এ-নামে ডাকলে এবং তার সঙ্গে 'স্যার' যোগ করলে কানে যেন কেমন লাগে—বিশেষ করে সে যদি পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ না হয়।

রঙ্গলাল গোস্বামী সেই দলেরই একজন। তিনি হঠাৎ এসিজিকে প্রশ্ন করে বসেছেন, 'এসিজি স্যার, খুন অতি জঘন্য, খুনি ধরা আরও/ সেই কাজে আপনার কেন পোয়াবারো?'

স্বভাবকবি রঙ্গলাল ছন্দ তৈরি করেন কথায়-কথায়। এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে সঙ্কুচিতভাবে মাথা নিচু করে জবাব দেন, 'আমি একজন স্বভাবকবি/ কবিতায় কথা বলা আমার হবি।'

এসিজির গুণমুগ্ধ এই ব্যাচিলার কবিমানুষটি সবসময় এসিজির সঙ্গী হতে ভালোবাসেন। আর সুযোগ পেলেই ছাত্রের মতো প্রশ্ন করেন এসিজিকে।

মাথার সাদা চুলের গোছায় কয়েকবার টান মেরে এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'পোয়াবারো কথাটার আসল মানে জানেন?'

রঙ্গলাল অবাক হয়ে তাকালেন বৃদ্ধ হুনুরের দিকে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন 'না, জানি না।'

'পোয়াবারো মানে হল পাশাখেলার একটা দান। তো ধরে নিন, খুনির সঙ্গে বুদ্ধির পাশা খেলতে আমার ভালো লাগে। তাই খুনি ধরার কাজটা খুনের চেয়েও জঘন্য জেনেও আমার খুনি ধরতে ভালো লাগে। আপনার স্বভাব-কবিতার নেশার মতো এটাও একটা নেশা।'

'স্বভাব-কবিতা' শব্দটা মোটেই এসিজির আবিষ্কার নয়, ওটা রঙ্গলাল গোস্বামীর সম্পত্তি। ওঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম 'স্বভাব-কবিতা সমগ্র'।

ব্যাঙ্গালোর এয়ার টার্মিনালে বসে অশোকচন্দ্র আর রঙ্গলাল কথা বলছিলেন। ইন্দিরানগর ছাড়িয়ে এইচ.এ.এল. এরিয়ার এই এয়ার টার্মিনালে ওঁরা এসেছেন পাক্কা দু-ঘণ্টা। কিন্তু কলকাতার উড়ান ফ্লাইট নম্বর-এইট ডব্লিট ফাইভ ওয়ান এইট ছাড়তে এখনও অনেক দেরি। আবহাওয়ার কী একটা যেন গোলমাল হয়েছে—বোধহয় কুয়াশা কিংবা ধোঁয়াশা।

রঙ্গলাল বারবার বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'এসিজি স্যার, আজ বোধহয় কপালে কলকাতা পৌঁছোনো নেই।'

স্পিকারের নানারকম ঘোষণা চলছিল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রঙিন মনিটরগুলো রাজ্যের উড়ান-সংবাদ অক্লান্তভাবে পেশ করছিল। মোল্ডেড প্লাস্টিকের আর্গোনমিক চেয়ারে বসে বহু যাত্রী অপেক্ষা করছিলেন। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর আধুনিক আলোকসজ্জা সবজায়গায় হিসেবমতো আলো পৌঁছে দিয়েছে। মার্বেল পাথরের গ্রানাইট পালিশ করা মেঝেতে আয়নার মতো প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। অনেক যাত্রীই ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছিলেন। কেউ-বা ট্রলিবোঝাই মালপত্র ঠেলে নিয়ে চলেছেন টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে।

এসিজি ও রঙ্গলালের বোর্ডিং পাস নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন ওঁরা সিকিওরিটি চেক শুরু হওয়ার ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কলকাতার একটা স্মাগলিং-এর কেসের ব্যাপারে অশোকচন্দ্র গুপ্ত ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন। কতকগুলো জেমস্টোনের স্পেক্ট্রাল ক্যারেকটারিস্টিকস খতিয়ে দেখার জন্য রমন রিসার্চ ইন্সটিটিউট আর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স-এ ওঁর জরুরি কাজ ছিল। তিনদিনেই সবকাজ ঠিকমতো মিটে যাওয়ায় আজ হালকা মনে বাড়ির পথে রওনা হয়ে পড়েছেন।

রঙ্গলাল গোস্বামী বাগবাজারের 'লালমহল'-এর বাসিন্দা। বছরতিনেক আগে ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত ওঁর দাদার একটা হারানো চুনি খুঁজে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে এসিজির আলাপ।

এসিজি লক্ষ করেছেন, লাউঞ্জে অনেকেই রঙ্গলাল গোস্বামীকে লক্ষ করছেন। আর খানিকটা নজর কাড়ছেন এসিজিও। কারণ, বোধহয় ওঁদের দু'জনের পোশাক।

এসিজির পরনে পাজামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার ওপরে জড়ানো সাদা শাল। ভেতরে অবশ্য লুকোনো একটা উলের স্যান্ডো গেঞ্জিও রয়েছে। আর রঙ্গলালবাবুর পরনে সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, তার ওপরে মেরুন রঙের এক বিচিত্র জহরকোট। আর গলায় সবুজ রঙের একটা মাফলার।

এসিজির সঙ্গে রঙ্গলালের এই একটি জায়গাতেই বেশ মিল : দু'জনেই শীতকাতুরে। নইলে ব্যাঙ্গালোরে সেরকম শীত কোথায়!

রঙ্গলাল গোস্বামীর রং শ্যামলা। ডানহাতের তিন আঙুলে রুপোয় বাঁধানো তিনটে পাথরের আংটি। মাথার তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুলের ঠিক মাঝখান দিয়ে সিঁথি। কপালের বাঁ-দিকে একটা ছোট্ট আঁচিল। নাকটা বেশ জম্পেশ। দাড়ি-গোঁফ সুন্দর করে কামানো। গা থেকে পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে। বোঝাই যায়, বেশ শৌখিন মানুষ।

রঙ্গলালকে অনেকেই দক্ষিণ ভারতীয় ভেবে ভুল করছিল। তাদের দক্ষিণী কথার জবাবে রঙ্গলাল আকর্ণ হাসছিলেন এবং 'থ্যাঙ্ক য়্যু' বলছিলেন।

এসিজি একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। এরপর প্রায় আড়াই ঘণ্টা সিগারেট ছেড়ে থাকবে হবে। প্লেন ওড়ার সময় 'স্মোকিং প্রহিবিটেড'-এর আইন জারি হয়ে গেছে।

'পোয়াবারো' মানে যে পাশা খেলার একটা দান এ-কথা শোনার পর রঙ্গলাল সমঝদারের মতো মাথা নাড়ছিলেন। তখন সময় কাটানোর জন্য গোয়েন্দাপ্রবর পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে নিয়েছেন একটা রুবিক কিউব—এবং শুরু করে দিয়েছেন রং-মেলান্তির খেলা।

এই বিচিত্র রঙিন কিউবটা রঙ্গলাল আগেও এসিজির কাছে দেখেছেন। দু-একবার ওঁর কাছ থেকে কিউবটা চেয়ে নিয়ে রং মেলানোর চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা দেখে সহজ মনে হলেও আসলে যাচ্ছেতাইরকম কঠিন।

এই সদা-চুল মানুষটি রঙ্গলালকে সবসময় অবাক করে দেন। কোনওরকম সমস্যা পেলেই হল—এসিজি তার সমাধান করতে মনে-মনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজেকে যখন তিনি 'থিঙ্কিং মেশিন' বলেন, তখন মোটেই নিজেকে জাহির করেন না—যা সত্যি তাই বলেন। তাঁর কথায় সি. অগাস্ত দুপাঁ, শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারো থেকে শুরু করে পরাশর বর্মা, ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলু মিত্তির সকলেই থিঙ্কিং মেশিন। আসল কথা হল, গোয়েন্দাদের থিঙ্কিং মেশিন না হলে চলে না।

এখন বসে-বসে তিনি কী ভাবছিলেন কে জানে। হঠাৎই একজন ফরসা, বেঁটে এবং মোটাসোটা ভদ্রলোক অনেকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে এসিজির বাঁ-পাশের খালি চেয়ারটায় ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর নিভাঁজ বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'কলকাতার ফ্লাইট ক'টায় ছাড়বে কিছু বলল?'

এসিজি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'এটুকু বলেছে, যে-কোনও সময় সিকিওরিটি চেক-এর জন্যে ডাক পড়তে পারে।'

এরপর ভদ্রলোক অশোকচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বললেন, তিনি পেশায় ডাক্তার। নাম ভবানীপ্রসাদ দে। লেক প্লেসে থাকেন। ওঁর একমাত্র মেয়ে ব্যাঙ্গালোরের একটা মেডিকেল কলেজে এ-বছরের মাঝামাঝি অ্যাডমিশন নিয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

পরিচয় বিনিময় করার সময় এসিজি নিজের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু রঙ্গলাল গোস্বামী—যিনি এসিজির এমন গুণমুগ্ধ যে, ওঁকে নিয়ে স্বভাব-কবিতা লিখেছেন : 'আমি আপনার গুণমুগ্ধ/ আপনি যেন খাঁটি দুগ্ধ'—তিনি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। এসিজির পদার্থবিজ্ঞানে দক্ষতা, পাখির নেশা, অপরাধবিজ্ঞান চর্চা, খুনি ধরার নেশা, রুবিক কিউব সমাধানের 'অলৌকিক ক্ষমতা'—সবই সবিস্তারে পেশ করলেন ডক্টর দে-র কাছে।

এই বিস্তারিত পরিচয়ে এসিজি লজ্জা এবং সঙ্কোচ ছাড়াও ভয় পাচ্ছিলেন। ভবানীপ্রসাদবাবু ভেবে না বসেন যে, রঙ্গলাল গোস্বামী এসিজির প্রচারসচিব। আজকাল নানা মহলে এই পদটির বেশ চল হয়েছে।

অশোকচন্দ্রের 'জীবনী' জানার পর ভবনীপ্রসাদ একেবারে বিগলিত হয়ে পড়লেন। জানা গেল, ভদ্রলোক গোয়েন্দাকাহিনির অন্ধ ভক্ত। এসিজির দু-একটি কীর্তিকলাপ যে পড়েছেন সেটা ওঁর বেশ মনে পড়ছে।

'সত্যি, আমি খুব লাকি। আপনার মতো জিনিয়াসের সঙ্গে এরকম আচমকা পরিচয় হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।'

আজকাল 'জিনিয়াস' আর 'জিনিস'—দুটো শব্দ প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। বেপরোয়া অতিব্যবহারে বিশেষণের ক্ষয় হয়। যেরকম হয়েছে 'শহিদ' শব্দটার। মনে মনে ভাবছিলেন এসিজি।

ভবানীপ্রসাদ এসিজির হাত চেপে ধরলেন। একগাল হেসে বললেন, 'এয়ারবাসে তো অনেক সিট খালি থাকবে...এয়ারহোস্টেসকে ম্যানেজ করে আপনার পাশে বসব। তারপর দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে আপনার সব থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স শুনতে-শুনতে যাব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

এসিজি হেসে বললেন, 'আপত্তি কেন, বরং ভালোই লাগবে। কী বলেন, রঙ্গলালবাবু?'

রঙ্গলাল গোস্বামী মাথা হেলিয়ে বললেন, 'ডাক্তার, ডক্টর, কী বা মিশ্রণ/ অনাবিল স্বাদে মোর ভরিবে ভ্রমণ।'

স্বভাবকবির উত্তর শুনে ভবানীপ্রসাদ হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসির দমক থামলে চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'মশাই আপনিও তো দেখছি আর-এক ধরনের জিনিয়াস!'

রঙ্গলাল গোস্বামী সলজ্জভাবে নিজের পরিচয় দিলেন।

আর ঠিক তখনই অডিয়ো সিস্টেমে ঘোষণা করা হল, কলকাতাগামী উড়ান এইট ডব্লিউ ফাইভ ওয়ান এইট-এর যাত্রীদের সিকিওরিটি চেক-এর জন্য এগোতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এসিজি চটপট উঠে দাঁড়ালেন। হাতের সিগারেটটা একটু দূরে রাখা লিটারবিন-এ ফেলে দিলেন। তারপর রুবিক কিউবটা পাঞ্জাবির পকেটে চালান করে দিয়ে রঙ্গলালকে তাগাদা দিলেন : 'চলুন, রঙ্গলালবাবু, শেষ পর্যন্ত তা হলে আমরা কলকাতা পৌঁছোতে পারব।'

রঙ্গলাল নির্মল হাসি হেসে ওঁর ট্র্যাভেল ব্যাগটা তুলে নিলেন। এসিজিও ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালেন ওঁর ব্রিফকেসের হাতলের দিকে।

দীর্ঘকায় এসিজির হাতে ব্রিফকেসটা অনেকটা খেলনাগোছের দেখাচ্ছিল। এপাশ-ওপাশ নজর বুলিয়ে তিনি ডক্টর দে-কে বললেন, ডাক্তারবাবু চলুন—।'

তখই তিনি খেয়াল করলেন, ডক্টর দে বেশ মনোযোগ দিয়ে একজন লম্বা ভারী চেহারার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাট কি বাষট্টি হবে। পরনে গাঢ় নীল রঙের সাফারি সুট। ডানহাতের মধ্যমায় একটা বড় হিরের আংটি জ্বলজ্বল করছে। মাথা ভারতি কাঁচাপাকা চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের আধুনিক ডিজাইনের চশমা। পুরুষ্ট গোঁফ। দু-গালে এবং চিবুকের নিচে চর্বির থাক।

ডক্টর দে চাপা গলায় বললেন, 'ওই ভদ্রলোককে চিনতে পারছেন?'

এসিজি আর রঙ্গলাল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন।

মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হল এসিজির। এই মুখের ছবি কোথায় যেন দেখেছেন?

রঙ্গলাল ঠোঁট উলটে মাথা নাড়লেন! 'দেখে মনে হয় নাকো চিনি উহারে...।'

'মদনমোহন চ্যাটার্জি—' ছোট্ট করে বললেন ভবানীপ্রসাদ।

ব্যস! তক্ষুনি সব মনে পড়ে গেছে এসিজির।

মদনমোহন চ্যাটার্জি। বিখ্যাত বিজনেস টাইকুন। খবরের কাগজের পাতায় প্রায়ই নানান কারণে ওঁর ছবি ছাপা হয়ে থাকে। এই তো মাসখানেক আগে কাগজে খবর ছিল, হলদিয়াতে মদনমোহন চ্যাটার্জি দু-হাজার

কোটি টাকা দিয়ে একটা স্টিল প্ল্যান্ট শুরু করতে চলেছেন। আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলসে ওঁর শিপিং কোম্পানি রয়েছে। আমেরিকাতে একবছর—বোধহয় ১৯৯৮ কি ১৯৯৯ সালে—'ম্যান অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন।

এসিজি লক্ষ করলেন, মদনমোহন চ্যাটার্জি একা নন। ওঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।

'আপনি মিস্টার চ্যাটার্জিকে চেনেন নাকি?' এসিজি ভবানীপ্রসাদকে জিগ্যেস করলেন।

ভবানীপ্রসাদ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, একসময়ে...মানে, বছরদশেক আগে...আমি ওঁর ট্রিটমেন্ট করেছিলাম।'

'কীসের ট্রিটমেন্ট?'

'অ্যাজমার। মিস্টার চ্যাটার্জির হাঁপানির প্রবলেম আছে।'

'এখন আপনার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই?'

হাসলেন ডক্টর দে। মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'নাঃ। কী করে আর থাকবে! আমি মশাই সস্তার ডাক্তার। আমি যখন ওঁর ট্রিটমেন্ট করতাম তখন উনি এত বড়লোক ছিলেন না। এখন আমাকে দেখে হয়তো চিনতেই পারবেন না।'

এসিজি সায়ে দিয়ে মাথা নাড়লেন : 'হ্যাঁ—পয়সা অনেকসময় মানুষকে বদলে দেয়...।'

রঙ্গলাল এসিজির সঙ্গে তাল দিয়ে বললেন, 'ধন বড় বিচিত্র/ বদলে দেয় চরিত্র।'

'ইকনমিক টাইমস', 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, 'মানি ম্যাটারস', 'ইয়োর শেয়ার' ইত্যাদি পত্রিকায় মদনমোহন চ্যাটার্জিকে নিয়ে প্রায় লেখালিখি হয়। ব্যবসায়ীদের দুনিয়ায় ওঁর ডাকনাম হজমমোহন চ্যাটার্জি। কারণ, উনি নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের জ্যান্ত গিলে খেয়ে হজম করেন। লোকে বলে, বহু ইন্ডাস্ট্রিকে উনি প্যাঁচ কষে সিক হওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তারপর সেই সিক ইন্ডাস্ট্রি কিনে নিয়েছেন। অন্তত চারজন ইন্ডাস্ট্রির মালিক ভাগ্যের ফেরে এখন মদনমোহন চ্যাটার্জির নানান কোম্পানিতে ম্যানেজার কি ডেপুটি ম্যানেজারের চাকরি করছেন।

মদনমোহনের চলাফেরার ভঙ্গি আর হাবভাবে পয়সা ফুটে বেরোচ্ছিল। তিনি আঙুল তুলে ইশারা করেছিলেন আর ওঁর সঙ্গী চারজন পড়ি-কি-মরি করে সেই হুকুম তামিল করছিলেন।

সিকিওরিটি চেকের পর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। স্পিকার ঘোষণা শুনে যাত্রীরা রওনা হলেন প্লেনের দিকে।

প্লেনটা এয়ারবাস-এ থ্রিটোয়েন্টি। এতে প্রায় শ'আড়াই কি তার বেশি সিট থাকলেও এসিজি লক্ষ করলেন, প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বেশ কম। এই শীতের সময়, বিশেষ করে শনিবারে, হয়তো রাশ কম থাকে—কে জানে! আর সেইজন্যই ডক্টর দে এসিজি আর রঙ্গলালের সঙ্গে বসার সুযোগ পেলেন।

রঙ্গলাল উইন্ডো সিট নিয়েছিলেন। এটা ওঁর জীবনের দ্বিতীয় প্লেন জার্নি। প্রথমটা কয়েকদিন আগে এখানে আসার সময়। তখনও বাচ্চাছেলের মতো উইন্ডো সিট নিয়েছিলেন।

প্লেনের সিটের ব্যবস্থা দুই-চার-দুই ঢঙে সাজানো। দুই আর চারের মাঝে দুটো অলিপথ সমান্তরালভাবে প্লেনের লেজের দিক থেকে নাক পর্যন্ত চলে গেছে। সামনের দিকে এক্সিকিউটিভ ক্লাস—পরদার আড়াল দিয়ে সেটাকে ইকনমি ক্লাস থেকে আলাদা করা হয়েছে।

ইকনমি ক্লাসের মাঝামাঝি জায়গায় বাঁ-দিকের দুটো সিটে পরপর বসলেন রঙ্গলাল ও এসিজি। তারপরই অলিপথ। অলিপথের পরের সিটটাতে ভবানীপ্রসাদ বসলেন। ফলে এসিজির সঙ্গে কথা বলতে ওঁর তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না।

এসিজি লক্ষ করলেন, মদনমোহন চ্যাটার্জি ওঁর সঙ্গী একজন সুন্দরী মাঝবয়েসি মহিলা ও একজন পুরুষকে নিয়ে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ঢুকে গেলেন। অন্য দু'জন ইকনমি ক্লাসে, এসিজিদের কাছ থেকে একটু দূরে, ডানদিকের সিটে বসে পড়লেন।

মদনমোহনের এক্সিকিউটিভ ক্লাসের সঙ্গী দু'জন কি তা হলে ওঁর আত্মীয়? ভাবলেন এসিজি...আর ইকনমি ক্লাসের এই দু'জন কি কর্মচারী?

ডক্টর দে একমনে মদনমোহন ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের লক্ষ করছিলেন। এসিজিও একপলকে ওঁদের দেখে নিয়েছিলেন। তাতে এসিজির ধারণা হয়েছে, ওঁরা কেউই অন্তর থেকে মদনমোহন চ্যাটার্জির হুকুম তামিল করছেন না। কে জানে, এসিজির ধারণা হয়তো ভুলও হতে পারে।

রঙ্গলাল হঠাৎই বললেন, 'এসিজি স্যার, ফিরে গিয়ে ভাবছি আমার সেই লেখাটায় হাত দেব...।'

'কোন লেখাটায়?' ভুরু কোঁচকালেন এসিজি।

'ওই যে, বলেছিলাম না, আমি স্বভাব-কবিতায় আপনার জীবনী লিখব...।'

হাসি পেয়ে গেল এসিজির। সত্যি, রঙ্গলালের খেয়ালের কোনও জুড়ি নেই! এসিজির জীবনী—তাও আবার কাব্যে!

এমনসময় ঘোষণা শুরু হল।

বিপদ দেখা দিলে কীভাবে অক্সিজেন-মাস্ক ব্যবহার করতে হবে সেটা ঘোষণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূকাভিনয় করে দু'জন হোস্টেস হাতে-কলমে দেখিয়ে দিল। ধূমপান না করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ করা হল। অনুরোধ করা হল মোবাইল ফোন অফ করে রাখার জন্য। এবং যাঁর-যাঁর সিটবেল্ট বেঁধে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

সবশেষে জানানো হল, এই উড়ানে যাত্রাপথ দু-ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে সম্পন্ন করা হবে।

শেষ কথাটি শুনে নিয়তি বোধহয় মুচকি হেসেছিল।

সিনিয়ার এয়ারহোস্টেস ইরিনা বিশ্বাস যখন এক্সিকিউটিভ ক্লাসের গ্যালিতে এসে ঢুকল তখন ওর ফরসা কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ। মনে হল যেন বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে।

চিফ স্টুয়ার্ড কুমারমঙ্গলম সেটা লক্ষ করল। ইরিনা সবসময় হাসিমুখে কাজ করে—সহজে ঘাবড়ে যাওয়ার মেয়ে নয়। তাই কুমারমঙ্গলম মুড ফেরানোর চেষ্টায় ওকে বলল : 'হোয়াটস আপ, ইরিনা? এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কোনও খিদে পাওয়া নেকড়ে ঢুকে পড়েছে নাকি—যে তোমাকে দেখে থাবা চাটছে?'

শেষ কথাটা বলে চোখ ঠেরে হাসল কুমারমঙ্গলম। কিন্তু ইরিনার কপালে ভাঁজ সমান হল না। অন্যসময় ঠাট্টা-ইয়ারকিতে ইরিনা যেমন খিলখিল করে হেসে ওঠে, তেমনটাও হল না। বরং গম্ভীর গলায় ও বলল, 'শোনো, টয়লেটের মধ্যে একজন প্যাসেঞ্জার বোধহয় আটকে পড়েছে...।'

'বলছ কী? একজন, নাকি দু'জন? আই মিন...।'

কুমারমঙ্গলম একগাল হেসে আরও কীসব ফাজিল মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, ইরিনা ওকে বাধা দিল : 'ধুত, এসব নয়, আমি সিরিয়াসলি বলছি। কে জানে খারাপ কিছু হল কিনা! ভদ্রলোক টয়লেটে ঢুকেছেন অনেকক্ষণ...অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার। ওঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন ওঁরাই আমাকে বললেন চেক করতে। আমি টয়লেটের দরজায় বারকয়েক টোকাও দিয়েছি, কিন্তু নো রেসপেন্স—কেউ সাড়া দেয়নি।'

কুমারমঙ্গলম বিরক্তির শব্দ করল একটা। প্যাসেঞ্জারের টয়লেটে আটকে পড়ার কেস সাধারণত দেখা যায় না—তবে একেবারে যে হয় না তা নয়। বছর পাঁচেক আগে একশো পাঁচ কি দশ কেজি ওজনের এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোককে একরকম টেনে-হিঁচড়ে টয়লেট থেকে বের করতে হয়েছিল। সে-কাজ করতে গিয়ে যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে আর বলার নয়—বরং ভুলে যাওয়াই ভালো।

'এই হতভাগা প্যাসেঞ্জারটার নাম কী?'

'প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করে দেখেছি—মিস্টার মদনমোহন চ্যাটার্জি! তা হলে তো বুঝতেই পারছেন!'

কুমারমঙ্গলম সোজা কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠল, 'মাই গুডনেস! ওঁর নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছি! লোকটা রাইভাল বিজনেসম্যানদের জ্যান্ত চিবিয়ে খায়—তা হলে তোমার-আমার মতো চুনোপুঁটির কী হাল করবেন কে জানে! শিগগির চলো, গিয়ে দেখা যাক কেসটা কী! দেরি হলে তো উনি আমাদের এয়ারলাইনের চোদ্দোটা বাজিয়ে ছাড়বেন। চলো, চলো...।'

কুমারমঙ্গলম চটপট পা চালাল এক্সিকিউটিভ ক্লাসের টয়লেটের দিকে। ইরিনাও দেরি না করে ওর পিছন-পিছন রওনা হল।

টয়লেটের আশেপাশে আর কেউ ছিল না। টয়লেটের দরজায় 'এনগেজড' ফ্ল্যাগটা কুমারমঙ্গলমের চোখে পড়ল। দরজার কাছে গিয়ে ও চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি! ইজ এভরিথিং ওকে, স্যার?'

কোনও সাড়া নেই।

আরও একবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল কুমারমঙ্গলম, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

তখন ও তাকাল ইরিনার দিকে। তারপর নক করল টয়লেটের ধাতব জায়গায়।

না, কোনও উত্তর এল না ভেতর থেকে।

কুমারমঙ্গলম ইরিনার দিকে ফিরল : 'তুমি শিয়োর, ইরিনা, মিস্টার চ্যাটার্জি আধঘণ্টার ওপর টয়লেটে ঢুকেছেন?'

'ওঁর সঙ্গের লোকরা তো তাই বলেছে।'

'আর কোনও উপায় নেই। মে বি সামথিং ইজ রং উইথ দ্য লক।' ইরিনার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার খুব কাছে মুখ নিয়ে গেল কুমারমঙ্গলম। গলা সামান্য তুলে বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, স্যার, আপনি বোধহয় কোনও প্রবলেমে পড়েছেন। ডোন্ট য়ু উয়ারি, স্যার। আমি দরজা ভাঙছি। আপনি যতটা পারেন দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ান, স্যার।'

তারপরই কুমারমঙ্গলম খানিকটা পিছিয়ে দাঁড়াল। বুট-পরা ডান পা-টা উঁচিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি বসিয়ে দিল দরজার লকের কাছটায়। প্লেনের টয়লেটের দরজাগুলো তেমন মজবুত কিচ্ছু নয়। তাই এক লাথিতেই লকের কয়েকটা স্ক্রু বেরিয়ে পড়ল, দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ঢুকে গেল ভেতরে।

কুমারমঙ্গলম আর-একবার লাথি কষাল।

লকটা ভেঙে গিয়ে দরজাটা প্রায় ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল।

'স্যার...?' দরজায় ফাঁক-হয়ে যাওয়া জোড়ের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল কুমারমঙ্গলম। ও দরজাটা ঠেলে খুলতে চাইলেও দরজাটা আর খুলছিল না—কোথাও একটা আটকে যাচ্ছিল।

ধাক্কাধাক্কির শব্দ পেয়ে আর-একজন হোস্টেস সাবরিনা এক্সিকিউটিভ ক্লাসের গ্যালিতে চলে এল।

ইরিনা, কুমারমঙ্গলম এবং টয়লেটের ফাঁক-হয়ে-থাকা দরজার দিকে তাকিয়ে সাবরিনা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। ইরিনাকে জিগ্যেস করল, 'হোয়াটস, আপ, ইরিনা? এনি প্রবলেম?'

ইরিনা সংক্ষেপে ওকে জানাল, প্রবলেম'টা কী।

ততক্ষণে কুমারমঙ্গলম দরজাটা ঠেলেঠুলে আরও খানিকটা ফাঁক করে ফেলেছে। এবং সেই ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছে ভেতরে।

পরক্ষণেই কুমারমঙ্গলমের মাথা বেরিয়ে এসেছে বাইরে। এবং ওর মুখের চেহারা এখন দেখবার মতো।

শ্যামলা মুখ থেকে রক্ত সরে যাওয়ায় ছাইরঙা ফ্যাকাসে লাগছে। ছোট-ছোট বুদ্ধিদীপ্ত চোখে বুদ্ধির দীপ্তির বদলে ভয় আর অবিশ্বাসের কুয়াশা। ওর ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না।

ইরিনা আর সাবরিনা একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে কুমারমঙ্গলমের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওরা বেশ বুঝতে পারছিল, কুমারমঙ্গলম ওদের খারাপ কিছু শোনাতে চলেছে।

বেশ কয়েকমিনিট জিভ আর ঠোঁট নিয়ে ধস্তাধস্তির পর কুমারমঙ্গলমের মুখ দিয়ে কয়েকটা মারাত্মক শব্দ বেরিয়ে এল। চাপা অস্পষ্ট গলায় ও বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি ইজ ডেড। আই থিং হি হ্যাজ বিন শট।'

তার মানে!—অবাক হয়ে ভাবল ইরিনা আর সাবরিনা : বন্ধ টয়লেটের ভেতরে মিস্টার চ্যাটার্জিকে কেউ গুলি করেছে। ইমপসিবল! এ হতেই পারে না!

টয়লেটের দরজাটা আবার টেনে ভেজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কুমারমঙ্গলম ইরিনাকে দিয়ে ক্যাপ্টেনকে খবর পাঠিয়েছিল যে, একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করেছে। ক্যাপ্টেন যদি একবার আসেন তা হলে খুব ভালো হয়।

খবরটা পাওয়ামাত্রই ক্যাপ্টেন অর্জন সুখানি চলে এসেছেন এক্সিকিউটিভ ক্লাসের টয়লেটের কাছে।

অর্জন সিনিয়ার পাইলট। 'আকাশ এয়ারলাইনস'-এ আছেন প্রায় পাঁচবছর। শক্তসমর্থ পেটানো শরীর। ঠান্ডা চোখ আর চৌকো চোয়াল যেন বলে দিচ্ছে অর্জন সুখানিকে টলানো বড় সহজ ব্যাপার নয়।

ফ্লাইট ডেক থেকে অর্জন যখন এক্সিকিউটিভ ক্লাসের অলিপথ দিয়ে হেঁটে আসছিলেন, তখন ওঁর ঠোঁটে ছিল পেশাদারি স্মিত হাসি, আর একই সঙ্গে প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ করে ছোট-ছোট 'নড' করছিলেন।

বাইরের ভাবটা এরকম বজায় রাখলেও অর্জনের মনে ছিল বিরক্তি। কারণ, উড়ান সময়ের একঘণ্টা পার হয়ে গেছে...এখন এই ঝামেলার জন্য যদি কোনও এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে হয় তা হলে প্রচুর সময় নষ্ট হবে। কলকাতায় পৌঁছতে কত দেরি হবে কেউ বলতে পারে না। আর কাছাকাছি এয়ারপোর্ট বলতে বিশাখাপত্তনম। সুতরাং, সেখানকার কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলতে হবে 'আকাশ এয়ারলাইনস'-এর চিফ ফ্লাইট ম্যানেজারের সঙ্গেও। আবার, যদি তিনি বলেন তা হলে হয়তো চেয়ারম্যান কি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে অর্জনকে কথা বলতে হবে।

ইতিমধ্যে কুমারমঙ্গলম এক্সিকিউটিভ ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য এক্সিকিউটিভ ক্লাসের টয়লেট ব্যবহার করা যাবে না। প্যাসেঞ্জাররা যেন ইকনমি ক্লাসের টয়লেট ব্যবহার করেন। এই অপ্রত্যাশিত অসুবিধে তৈরি হওয়ার জন্য 'আকাশ এয়ারলাইনস' দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

এক্সিকিউটিভ ক্লাসের গ্যালিতে পৌঁছে ক্যাপ্টেন সুখানি বুঝলেন, পরিস্থিতি ভালো নয়। কারণ, কুমারমঙ্গলম, ইরিনা এবং সাবরিনার মুখের চেহারা সেরকম ইঙ্গিতই দিচ্ছে। কুমারমঙ্গলমকে অর্জন বেশ ভালো করেই জানেন। ছেলেটা বছরদুয়েক ধরে অর্জনের সঙ্গে ফ্লাই করছে। চটপটে, ঠাট্টা-রসিকতার সমঝদার, বুদ্ধিমান। কিন্তু এখন ওকে দেখে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। আর ইরিনা, সাবরিনা যেন দুই যমজ বোন—কারণ, দু-জনেরই মুখ ফ্যাকাসে, বিহ্বল, ভয়ে দিশেহারা।

অর্জন ওদের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে টয়লেটের লক-ভাঙা দরজার দিকে তাকালেন : 'এই টয়লেটটায়?'

'হ্যাঁ—।' কুমারমঙ্গলম জবাব দিল।

নিজের শরীরের ভার দরজাটার ওপরে ছেড়ে দিয়ে চাপ দিলেন ক্যাপ্টেন। দরজাটা ফাঁক হল আবার। সেই ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলেন।

মদনমোহন চ্যাটার্জির দেহটা টয়লেট-সিটের ওপরে এলিয়ে রয়েছে। পোশাক-আশাক ফিটফাট। দুটো হাত অসাড় হয়ে দু-পাশে ঝুলছে। পাদুটো ছড়িয়ে রয়েছে সামনের দিকে। পায়ে আটকে যাওয়ার জন্যই দরজাটা পুরোপুরি খোলা যাচ্ছে না।

নিস্পন্দ দেহটার বাকি অংশের চেহারা যাচ্ছেতাইরকমের বীভৎস।

মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্ত-মাংস-হাড় তালগোল পাকিয়ে ছড়িয়ে আছে। দু-গাল থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মাংসের টুকরো ঝুলছে। রক্ত ছিটকে লেগেছে দু-পাশে দেওয়ালে। ঠিক মনে হচ্ছে, একটা স্কন্ধকাটা মূর্তি টয়লেট-সিটের ওপরে শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে।

অর্জন সুখানির শরীরের ভেতরটা কেমন পাক দিয়ে উঠল। বমির দমক উথলে উঠতে চাইল গলা দিয়ে। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় তিনি সেটা রুখে দিলেন।

কুমারমঙ্গলম আগেই ওঁকে বলেছিল যে, মিস্টার চ্যাটার্জিকে কেউ মুখে গুলি করেছে। সেইজন্যই অর্জন টয়লেটের মেঝেতে জরিপ নজর বুলিয়ে নিলেন। না, কোনও পিস্তল কিংবা রিভলভার চোখে পড়ছে না। ব্যাপারটা একটু অবাক করার মতো। তাই আরও একবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন সুখানি। এমনকী, বডির দু-পাশে শিথিলভাবে ঝুলে-থাকা দুটো হাতের মুঠোও ভালোভাবে নজর করে দেখলেন।

না, মুঠোয় কোনও অস্ত্র ধরা নেই।

মিস্টার চ্যাটার্জি যখন সুইসাইড করেছেন তখন অস্ত্রটা নিশ্চয়ই টয়লেটের কোথাও-না-কোথাও পড়ে থাকবে। সেটা দেখতে না পেয়ে অর্জন সুখানির ভুরু কুঁচকে গেল। এছাড়াও কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে। কিন্তু গরমিলটা সুখানিকে বারবার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল।

জরিপের কাজ সেরে অর্জন সুখানি কুমারমঙ্গলমের মুখোমুখি হতেই ও রুমাল দিয়ে মুখ মুছল, টেনশন কমানোর চেষ্টায় আলতো করে বলল, এইরকম সিচুয়েশানের কথা আমাদের কোম্পানির ইমার্জেন্সি ম্যানুয়ালে লেখা নেই। লোকটা সুইসাইড করার আর জায়গা পেল না—একেবারে আকাশে, টয়লেটের মধ্যে!'

অর্জন মাথা নেড়ে বললেন, 'সুইসাইড বলছেন? কিন্তু টয়লেটের মধ্যে তো কোনও ফায়ার-আর্মস চোখে পড়ল না!'

কুমারমঙ্গলম, ইরিনা আর সাবরিনা বড়-বড় চোখে তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে।

'প্যাসেঞ্জারদের এদিকটায় আসতে বারণ করেছেন ভালোই করেছেন। কিন্তু এখন কী করবেন কিছু ভেবেছেন?' ক্যাপ্টেন সুখানি কুমারমঙ্গলমকে জিগ্যেস করলেন।

'দুদিকে পরদা লাগিয়ে এই সেকশানটা আইসোলেট করে দেব। তারপর বোধহয় বডিটাকে বাইরে বের করতে হবে।'

'ভদ্রলোক শুনলাম খুব বিগ শট?'

ইরিনা এবার জবাব দিল, 'তার চেয়েও বেশি। মিস্টার মদনমোহন চ্যাটার্জি। ওঁর কথায় শেয়ার মার্কেট ওঠানামা করে।'

'তার ওপর পলিটিক্যাল কানেকশানের ব্যাপারটা তো আছেই!' কুমারমঙ্গলম যোগ করল, 'এই কেসটা ঠিকমতো হ্যান্ডল করতে না পারলে পার্লামেন্টে আমাদের এয়ারলাইনস কোম্পানির পিণ্ডি চটকানো হবে।'

'ওঁর সঙ্গে আর যাঁরা আছেন তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে? ওঁর সঙ্গে কে যেন আছেন বললেন না?' শেষ প্রশ্নটা ইরিনাকে লক্ষ করে ছুড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন সুখানি।

ইরিনা মাথা নেড়ে সায় দিল : 'হ্যাঁ—এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ওঁর সঙ্গেই দু'জন ট্রাভেল করছেন। সিটে বসানোর সময়ে খেয়াল করেছিলাম, উনি তাঁদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা বলছিলেন, ঠাট্টা করছিলেন...।'

'তাঁদের ইনফর্ম করেছেন?'

'করেছি। তবে শুধু বলেছি, একটা প্রবলেম হয়েছে—ব্যস, এইটুকুই।'

ক্যাপ্টেন সুখানি কুমারমঙ্গলমের দিকে তাকালেন : 'প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করে দেখুন কোনও ডক্টর আছে কি না। বডি রিমুভ করার আগে একটা ফরম্যাল মেডিক্যাল ওপিনিয়ান খুব জরুরি। আমাদের কোম্পানির মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি রুটিনের যা গাইডলাইন আছে আমরা সেটাই ফলো করব। আর আমি হেড অফিসে ব্যাপারটা ইনফর্ম করছি।

কুমারমঙ্গলম সায় দিয়ে ঘন-ঘন মাথা নাড়ল।

ক্যাপ্টেনের কথা শোনামাত্রই সাবরিনা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা ক্যাবিনেটের কাছে গেল। ওটার ছোট্ট পাল্লা খুলে প্যাসেঞ্জার লিস্টটা বের করে নিল। তারপর লিস্টের নামগুলোর ওপরে তাড়াহুড়ো করে চোখ বোলাতে

লাগল।

একটু পরেই ও চোখ তুলে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'ক্যাপ্টেন, ইকনমি ক্লাসে দু'জন ডক্টর আছেন। এক্সিকিউটিভ ক্লাসে কেউ নেই।...'

'সিট নাম্বার কত?' কুমারমঙ্গলম জিগ্যেস করল।

'এম-টু আর কিউ ফোর...।'

'ওঁদের একজনকে চট করে ডেকে নিয়ে আসুন।' হাত নেড়ে বললেন অর্জন সুখানি। তারপর তাকালেন ইরিনার দিকে : 'মেডিক্যাল চেকআপের পর মিস্টার চ্যাটার্জির কম্প্যানিয়নদের যে-কোনও একজনকে এখানে ডাকব। কারণ, ডেডবডির ফরমাল আইডেন্টিফিকেশানটাও খুব ইমপর্ট্যান্ট। উই উইল হ্যাভ টু প্লে দিস স্ট্রিক্টলি বাই দ্য কোম্পানি রুলস। নিয়মের মধ্যে কোনও ফাঁক আমি রাখতে চাই না।'

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন সুখানি খুব টেনশনে রয়েছেন। ওঁর ভুরু এখনও কোঁচকানো, কপালে ভাঁজ। আর আনমনাভাবে নিজের কাঁচাপাকা গোঁফে আলতো করে আঙুল বোলাচ্ছিলেন।

সাবরিনা অলিপথ ধরে পেশাদারি ছন্দে হেঁটে এগিয়ে এল এম-টু সিটটার কাছে।

ভদ্রলোকের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির ওপরে কাশ্মীরি কাজ করা সাদা শাল। মাথায় ধবধবে সাদা চুল, চোখে কার্বন ফ্রেমের চশমা। বয়েস ষাট-পঁয়ষট্টি কি তার একটু বেশি। ভদ্রলোক একটা অদ্ভুতরকমের রঙিন কিউব নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

এই ভদ্রলোক ডাক্তার! কে জানে!

ঝুঁকে পড়ে সাবরিনা নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত?'

ভদ্রলোক হাসিমুখে চোখ তুলে তাকালেন সাবরিনার দিকে।

বয়কাট চুল। শ্যামলা রং। টানা-টানা চোখ। পরনে আকাশ-নীল সিল্কের শাড়ি। মেয়েটি বেশ লম্বা হওয়ায় শাড়িটা দারুণ লাগছে। হাওয়াসখি হিসেবে শতকরা একশো ভাগ মানানসই।

'ইয়েস মিস,' বললেন এসিজি, 'হাউ ক্যান আই হেল্প য়ু?'

'ডক্টর, আই অ্যাম অ্যাফ্রেইড দ্যাট উই হ্যাভ আ মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি। আমাদের এক্সিকিউটিভ ক্লাসের একজন প্যাসেঞ্জারের একটু মেডিক্যাল প্রবলেম হয়েছে। যদি আপনি এসে একটু দেখেন তা হলে ক্যাপ্টেন খুব খুশি হবেন। প্লিজ, স্যার।'

কোম্পানির ম্যানুয়ালের মুখস্থ করা ফরমুলার মতো সাবরিনা কথাগুলো বলল। ট্রেনিং-এর সময়ে যেরকম যান্ত্রিক ঢং ওদের শেখানো হয়েছে তার বাইরে ও যেতে পারেনি। এবং কথার শেষে ট্রেনিং-এ শেখানো নিয়ম মেনে ও একচিলতে হাসি জুড়ে দিল।

সাবরিনার কথায় এসিজির হাসি একটু চওড়া হল : 'সরি মিস, আমি ফিজিক্সের ডাক্তার—আই মিন ডক্টরেট। নট মাচ হেল্প টু য়ু। মনে হয় আপনি আমার এই বন্ধুকে চাইছেন। ডক্টর ভবানীপ্রসাদ দে। হি ইজ আ মেডিক্যাল ডক্টর...অ্যাকচুয়ালি হোয়াট য়ু নিড।' কথা বলতে-বলতে ভবানীপ্রসাদের দিকে ইশারা করে দেখালেন অশোকচন্দ্র।

সাবরিনা ওর ঠোঁট আঠা দিয়ে সাঁটা যান্ত্রিক হাসি নিয়ে ঘুরে তাকাল ডক্টর দে-র দিকে। তাকিয়েই ও ভদ্রলোককে খেয়াল করতে পারল। কিউ-ফোর থেকে সিট চেঞ্জ করে এখানে এসে বসেছেন।

ভবানীপ্রসাদ সাবরিনার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। তাই ওকে আর ফরমুলা মুখস্থ বলতে হল না। তার আগেই ভবানীপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'চলুন, মিস, তবে আমার সঙ্গে কোনও মেডিক্যাল ব্যাগ নেই। আমি একটু পার্সোনাল কাজে ব্যাঙ্গালোর এসেছিলাম। যদি সেরকম...।'

'আমাদের প্লেনে ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল কিট আছে, ডক্টর। কিন্তু আমার মনে হয় না ওসবের আর দরকার হবে।'

ভবানীপ্রসাদ একটু অবাক হলেন, ভুরু কুঁচকে তাকলেন সাবরিনার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে সাবরিনা এক্সিকিউটিভ ক্লাসের দিকে হাঁটা দিয়েছে।

রঙ্গলাল এসিজির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

উত্তরে এসিজি ঠোঁট ওলটালেন। তারপর মন দিলেন রুবিক কিউবের দিকে।

ডক্টর ভবানীপ্রসাদ দে টয়লেট কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ক্যাপ্টেন সুখানি এবং কুমারমঙ্গলমের দিকে তাকালেন। তারপর চোখ ফেরালেন হাতঘড়ির দিকে।

'রক্ত যেভাবে জমাট বেঁধেছে তাতে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা হয়েছে আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে...এই ধরুন সাড়ে আটটা কি পৌনে নটা নাগাদ।'

ক্যাপ্টেন সুখানি ছোট্ট করে 'হুম' শব্দ করলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কীভাবে মারা গেছেন?'

ডক্টর দে মাথা চুলকোলেন, ঠোঁট কামড়ালেন বারকয়েক। খানিক সময় নিয়ে ইতস্তত করে বললেন, 'বডিটা বাইরে বের করার ব্যবস্থা করুন। ডেফিনিট কিছু বলতে হলে আগে ফুল ইন্সপেকশান হওয়ার দরকার। তবে তার আগে একটা সাজেশান আছে...।'

'কী সাজেশান?'

'আমার সঙ্গেই একজন বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিস্ট ট্র্যাভেল করছেন। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপারে রিমার্কেবল জিনিয়াস...ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত...। ওঁর সঙ্গে আচমকা এই ফ্লাইটে দেখা। উনি একবার বডিটা দেখে যদি একটা ওপিনিয়ান দিতেনে তা হলে ভালো হত।'

অর্জন সুখানি কিংবা কুমারমঙ্গলম কেউই অশোকচন্দ্র গুপ্তের নাম শোনেনি। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ডক্টর দে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, এটা আমার সিরিয়াস রিকোয়েস্ট। য়ু হ্যাভ গট নাথিং টু লুজ...।'

সত্যিই তো! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। ডক্টর গুপ্তকে একবার ডেডবডি ইন্সপেক্ট করতে দিলে কী আর ক্ষতি হবে! কিন্তু...।

ক্যাপ্টেন সুখানি ভবানীপ্রসাদ দে-র মুখের দিকে তাকালেন। খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন ওর কথার আড়ালে কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কি না। তা ছাড়া...।

অর্জন বললেন, 'ডক্টর, কেসটা যদি প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল সুইসাইড হয় তা হলে একজন ক্রিমিনোলজিস্ট সেখানে...।'

'ক্যাপ্টেন, আপনি অযথা হয়রান হচ্ছেন!' একটু বিরক্ত হয়েই ভবানীপ্রসাদ বললেন, 'অ্যাজ আই সেইড, য়ু হ্যাভ গট নাথিং টু লুজ।'

অগত্যা কী আর করা যায়!

একটু পরেই ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত টয়লেটের কাছে এলেন। তাঁর খানিকটা পিছনেই দাঁড়িয়ে রঙ্গলাল। ভদ্রলোক হতভম্ব চোখে একবার তার মুখের ওপরে চোখ বোলালেন।

ক্যাপ্টেন ভুরু কুঁচকে রঙ্গলালকে দেখে ডক্টর দে-র দিকে তাকিয়ে ইশারায় প্রশ্ন করলেন, 'ইনি কে?'

ভবানীপ্রসাদ দেখলেন বিশদ ব্যাখ্যায় গেলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে যেতে পারে। তাই হেসে বললেন, 'ওঁর খুব ক্লোজ। সাম সর্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

রঙ্গলাল ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আকর্ণ হাসলেন।

অশোকচন্দ্র টয়লেটের ভেতরটায় উঁকি মারলেন। মাত্র কয়েকমিনিট। তারপরই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

মাথায় ধবধবে সাদা চুলের গোছায় বারতিনেক টান মেরে ধীরে-ধীরে বললেন, 'ভারি অদ্ভুত!'

'কী অদ্ভুত?' জানতে চাইলেন অর্জন সুখানি।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। এসিজি। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে হেসে বললেন, 'খবর বোধহয় ভালো নয়, ক্যাপ্টেন।' রসিকতার সামান্য ছোঁওয়া টের পাওয়া গেল এসিজির কথায়, 'বডিটা আগে সাবধানে বাইরে বের করে নিয়ে আসুন। ডক্টর দে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বলুন, মিস্টার চ্যাটার্জির মৃত্যুর কারণটা কী? তারপর আমরা বুঝতে চেষ্টা করব, ঠিক কীভাবে ভদ্রলোক দুর্ঘটনাটা ঘটালেন...।'

'দুর্ঘটনা! অ্যাক্সিডেন্ট! সুইসাইড নয় বলছেন...।' এসিজির মুখের দিকে বিভ্রান্তভাবে তাকালেন ক্যাপ্টেন সুখানি।

'আমি এখনও কিছু বলিনি...' হাসলেন এসিজি : 'যা বলার ডক্টর দে আগে বলবেন...তারপর আমি।'

নার্ভাসভাবে ঘাড়ে হাত বোলালেন ক্যাপ্টেন, বললেন, 'ডক্টর গুপ্ত, আমাদের চেয়ারম্যানকে এক্ষুনি রেডিয়ো মেসেজ পাঠাতে হবে। এরকম ভাসা-ভাসা বললে উনি খুব বিরক্ত হবেন। হি ইজ লাইক টু হ্যাভ সামথিং মোর স্পেসিফিক! যদ্দূর মনে হয়, মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে ওঁর হয়তো আলাপ থাকলেও থাকতে পারে। ওঁদের অনেক কমন সার্কল আছে। আমাদেরই হয়েছে যত জ্বালা!'

'কমন সার্কল আছে নয়, ছিল। আপনি আপনাদের চেয়ারম্যানসাহেবকে অনায়াসে বলতে পারেন যে, মিস্টার মদনমোদন চ্যাটার্জি এক্সিকিউটিভ ক্লাসের টয়লেটে...যতদূর মনে হচ্ছে...মার্ডার্ড হয়েছেন।'

অর্জন সুখানি একটা জোরালো ধাক্কা খেলেন।

মার্ডার! বন্ধ টয়লেটের মধ্যে সেটা কেমন করে সম্ভব! কিন্তু এটাও তো তিনি লক্ষ করেছেন যে, টয়লেটের মধ্যেও কোনও রিভলভার কি পিস্তল নেই।

ক্যাপ্টেন সুখানির সবকিছু কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল।

সুইসাইড হলেও ব্যাপারটার ঠিক হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, আবার মার্ডার হলেও তাই।

এমন সময় ইরিনা হন্তদন্তভাবে এসে হাজির হল। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ক্যাপ্টেন, মিস চ্যাটার্জি...মানে, মিস্টার চ্যাটার্জির বোন...ওঁর সঙ্গে ট্র্যাভেল করছেন...উনি খুব উতলা হয়ে পড়েছেন। এখানে আসতে চাইছেন...।'

'ওঃ হো,' বেশ বিরক্ত হলেন অর্জন সুখানি। হাত নেড়ে ইরিনাকে বললেন, 'ওঁকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করুন। বলুন, ব্যাপারটা আমরা হ্যান্ডল করছি। আর এদিকটায় যেন কেউ না আসে। দিস ইজ অ্যান অর্ডার। অ্যাড্রেস সিস্টেমে এটা অ্যানাউন্স করে দিন—এক্ষুনি।'

ইরিনা চটপটে পায়ে চলে গেল এক্সিকিউটিভ ক্লাসের দিকে।

ভবানীপ্রসাদ দে এসিজির কথাগুলো ভাবছিলেন। বৃদ্ধ গোয়েন্দার কথাগুলো একটু অতিনাটকীয় শোনাচ্ছে না কি? সুতরাং তিনি ছোট্ট করে কেশে গলা পরিষ্কার করে একটু চাপা গলায় এসিজিকে বললেন, 'ডক্টর গুপ্ত, এত তাড়াহুড়ো করে ডিসিশান নেওয়ার দরকার কী? আসলে আমার মনে হচ্ছিল...।'

বৃদ্ধ হুনুর আপত্তি করে মাথা নাড়লেন, শান্ত গলায় বললেন, 'ডক্টর দে, লক্ষ করেছেন, কী বীভৎসভাবে ভদ্রলোকের মুখের নীচের দিকের অংশটা ছত্রখান হয়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে। চোখের নীচটায়...বিশেষ করে নাক আর মুখের জায়গাটা কিছু আর নেই। মুখের ভেতরে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে গুলি করলে এরকম হওয়া সম্ভব। নাঃ, মিস্টার চ্যাটার্জি ডায়েড ইনস্ট্যান্টলি...নো ডাউট অ্যাবাউট ইট...।'

অর্জন সুখানি ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। যে-গরমিলটা অনেকক্ষণ ধরে ওঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল সেটা এখন হঠাৎই মনে পড়ে গেল। টয়লেটের ভেতরে পিস্তল কিংবা রিভলভার ফায়ার করলে...।

ক্যাপ্টেন সুখানি অশোকচন্দ্রের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের কোণে তেরছা একটা হাসির ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'ডক্টর গুপ্ত, আপনার থিয়োরিতে এমনিতে কোনও ফাঁক নেই—শুধু একটা পয়েন্ট ছাড়া। টয়লেটের ভেতরে কোনও লো ক্যালিবারের ফায়ার আর্মসও যদি ফায়ার করা হয়ে থাকে...মানে, মুখে রিভলভারের নল ঢুকিয়ে...তা হলে মাথা ফুটো করে গুলিটা সোজাসুজি গিয়ে লাগবে টয়লেটের দেওয়ালে।

ওটা যে-ফোর্সে গিয়ে লাগবে তাতে দেওয়াল অনায়াসে ফুটো হয়ে যাবে। দ্যাট উইল কজ ডিকম্প্রেশান। বুঝতেই পারছেন, এই তেত্তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে একটা বুলেট যদি এয়ারক্র্যাফটের দেওয়াল ফুটো করে দেয়, তা হলে কী প্রবলেম হতে পারে?'

রঙ্গলাল সুখানির কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ইজ ডিকম্প্রেশান, ক্যাপ্টেন?'

ক্যাপ্টেন সুখানি বিরক্ত হয়ে কুমারমঙ্গলমের দিকে কড়া চোখে তাকালেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারায় ওঁকে সরিয়ে নিতে বললেন।

কুমারমঙ্গলম রঙ্গলাল গোস্বামীকে একপাশে টেনে নিয়ে বলল, 'আসুন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি...।'

ক্যাপ্টেনের কথার সুরে একটা বাঁকা ভাব এসিজি লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তাতে বৃদ্ধ হুনুর কিছু মনে করেননি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড থাকতে হবে এই চাহিদা বড্ড বাড়াবাড়ি। আর আই. কিউ. লেভেলও সকলের উঁচু তারে বাঁধা থাকতে হবে এমন কোনও মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। শরীরের ব্যায়াম না করলে কখনও শরীর চোস্ত হয় না। মগজের বেলাতেও ঠিক তাই। থিঙ্কিং মেশিনটার কলকবজায় নিয়মিত তেল দিলে তবে না মেশিন কাজ করবে! ক্যাপ্টেন সুখানিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোম্পানির হোমরাচোমরাদের তেল দিতেই বেশি ব্যস্ত। ফলে ওঁর জং-ধরা মগজটা যেমন থাকার কথা তাই-ই আছে।

সুতরাং নরম হেসে মোলায়েম গলায় এসিজি বললেন, 'একটা বোধহয় ভুল হচ্ছে, ক্যাপ্টেন। আমি কখনও বলিনি যে, মিস্টার চ্যাটার্জি বুলেট ফায়ারিং-এই খুন হয়েছেন। আমি বলেছি, মুখের ভেতরে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে গুলি করলে এরকম হওয়া সম্ভব...।

কুমারমঙ্গলম তখন হাত-পা নেড়ে রঙ্গলালকে ডিকম্প্রেশান বোঝাচ্ছিল।

'...গ্রাউন্ড লেভেল থেকে অ্যাবাউট থার্টি থ্রি থাউজ্যান্ড ফুট হাইটে অ্যাটমসফিয়ার খুব থিন হয়ে যায়। মানে, বাতাস এত পাতলা যে, তার প্রেসার নেগলিজিবলি স্মল হয়ে যায়। এই পাতলা বাতাসে মানুষ বাঁচতে পারে না...।'

ঘাড় নেড়ে রঙ্গলাল বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেইজন্যেই সবাই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে পাহাড়ে ওঠে।'

'অ্যাবসলিউটলি রাইট।' কুমারমঙ্গলম বলল, 'সেইজন্য প্লেনের ভেতরে গ্রাউন্ড লেভেলের অ্যাটমসফেরিক প্রেসারে বাতাস ভরা থাকে। যদি কোনও কারণে প্লেন ফুটো হয়ে যায়...খুব ছোট ফুটো হলেও চলবে...তা হলে আলপিন ফোটানো বেলুন যেমন হাওয়া বেরিয়ে চুপসে যায় সেরকম আমাদের প্লেনের ভেতরকার বাতাসও ফুস করে বাইরে বেরিয়ে যাবে। তখন শ্বাসকষ্টে প্যাসেঞ্জার, ক্রু—সবাই কাহিল হয়ে পড়বে। সেইজন্যেই ডিকম্প্রেশানকে আমরা ভয় পাই।'

'বুঝেছি, বুঝেছি—' মাথা নেড়ে বললেন রঙ্গলাল, 'যদি না থাকে বায়ুচাপ/ বলবে সবাই বাপরে বাপ।'

কুমারমঙ্গলম রঙ্গলালের স্বভাব-কবিতার কী বুঝল কে জানে! তবে একগাল হেসে ঘন-ঘন মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওরা এসিজিদের কাছে এসে দাঁড়াল আবার।

এসিজি মাথার চুলে হাত বোলালেন। তারপর সামান্য কেশে ক্যাপ্টেনকে লক্ষ করে বললেন, 'আসলে আমি বলতে চাইছি, ক্যাপ্টেন, ব্যাপারটা বেশ মিস্টিরিয়াস। উন্ডটা গানশটের মতো, অথচ টয়লেটের দেওয়াল ফুটো হয়নি...।'

এসিজিকে বাধা দিয়ে কুমারমঙ্গলম বলল, 'ব্যাপারটা সুইসাইড হতে বাধা কোথায়, মিস্টার গুপ্ত? ভদ্রলোক টয়লেটের ভেতরে দরজা লক করে বসেছিলেন। সেখানে বাইরে থেকে...ওঃ, ইমপসিবল।'

এসিজি চোখ ফেরালেন চিফ স্টুয়ার্ডের দিকে : 'আপনার পয়েন্টটা আমি বুঝতে পারছি। তবে নেচার অফ উন্ড দেখে মনে হচ্ছে মিস্টার চ্যাটার্জি ইনস্ট্যানটেনিয়াসলি মারা গেছেন। তা হলে সুইসাইড করার পর তাঁর পক্ষে অস্ত্রটা কি লুকিয়ে ফেলা সম্ভব? সুতরাং, সুইসাইড যদি হয়, তা হলে অস্ত্রটা কোথায় গেল? আর

মার্ডার যদি হয়, তা হলে মার্ডারার টয়লেটের দরজাটা ভেতর থেকে লক করল কীভাবে? এখন এই দুটোই হচ্ছে আমাদের কাছে মোস্ট ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন। সেইজন্যেই বলেছি, ব্যাপারটা বেশ মিস্টিরিয়াস। কী বলেন, ডক্টর দে?'

ভবানীপ্রসাদ দে কেমন যেন ধন্দে পড়ে গিয়েছিলেন। সেটা সামলে নিয়ে ক্যাপ্টেন এবং কুমারমঙ্গলমের দিকে একবার দেখলেন। তারপর এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, 'ওই ফান্ডামেন্টাল প্রশ্নের উত্তর তো আপনাকেই দিতে হবে, ডক্টর গুপ্ত।'

'হুঁ...হুঁ...' বলে সহাস্যে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ হুনুর।

ক্যাপ্টেন সুখানি অবিশ্বাসের চোখে দীর্ঘকায় বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকালেন। এঁকে ডেকে এনে আরও ঝামেলা হল দেখছি। আমতা-আমতা করে তিনি বললেন, 'মার্ডার ওয়েপনটা একবার ভালো করে খুঁজে দেখলে হয় না? হয়তো দরজার আড়ালে বা টয়লেট সিটের পেছনে আনাচে-কানাচে কোথাও একটা পড়ে আছে...।'

অশোকচন্দ্র এ-কথার কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না।

অর্জন সুখানি মরিয়া হয়ে অন্তত একটা খড়খুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন। কারণ, লকড রুম প্রবলেম বড় বিচ্ছিরি জিনিস।

এসিজির দিকে আকুল চোখে তাকিয়ে তিনি একটা নতুন থিয়োরির প্রস্তাব দিলেন, 'আপনার কী মনে হয়, ডক্টর গুপ্ত? মিস্টার চ্যাটার্জিকে কোথাও খুন করে তারপর টয়লেটে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

এসিজি বোধহয় ক্যাপ্টেনের মনের কথা আঁচ করতে পারলেন। তিনি বললেন, 'সেটা হলেও তো লকড রুম প্রবলেমটাকে এড়ানো যাচ্ছে না, ক্যাপ্টেন। কারণ, ডেডবডিটা টয়লেটে সিটের ওপরে বসিয়ে দিয়ে মার্ডারার হয়তো সটকে পড়ল...ভালো কথা। কিন্তু টয়লেটের দরজাটা সে ভেতর থেকে লক করবে কী করে? তা ছাড়া, টয়লেটের ওয়ালে যেভাবে রক্ত ছিটকে লেগেছে তাতে এটা খুবই স্পষ্ট যে, মিস্টার চ্যাটার্জি যখন মারা যান তখন তিনি টয়লেট সিটেই বসেছিলেন এবং টয়লেটের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল।'

কুমারমঙ্গলমের দিকে ঘুরে তাকালেন এসিজি : 'কী, মিস্টার কুমারমঙ্গলম, ঠিক বলছি তো?'

ঠোঁট চেপে অস্বস্তির চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে একবার তাকাল কুমারমঙ্গলম, তারপর এসিজির দিকে ফিরে বলল, 'ঠিকই বলেছেন—টয়লেটের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল।'

'তা হলে কী করে...।'

উত্তেজিত ক্যাপ্টেনকে বাধা দিলেন এসিজি : 'সেটাই আমাকে বের করতে হবে...যদি আপনি আমাকে দয়া করে অনুমতি দেন...।'

'কীসের অনুমতি?'

'ওই যে বললাম...মোস্ট ফান্ডামেন্টাল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অনুমতি।'

ক্যাপ্টেন সুখানি দোনামনা হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমি তা হলে আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলছি। আমার চেয়েও ওঁর পারমিশান নেওয়াটা জরুরি। ওঁকে বলি, প্লেনে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে। এক্সিকিউটিভ ক্লাসের একজন প্যাসেঞ্জার...ওয়েলনোন বিজনেস টাইকুন মিস্টার মদনমোহন চ্যাটার্জি হ্যাজ...।'

'বিন মার্ডার্ড।' ক্যাপ্টেনের কথা স্পষ্ট গলায় শেষ করলেন এসিজি : 'আপনি আপনাদের চেয়ারম্যানকে আমার কথাও বলতে পারেন। এম.পি. মিস্টার পরেশ সান্যাল আমাকে পার্সোনালি জানেন। দরকার হলে সেকথাও আপনি জানাতে পারেন। এ ছাড়া আমার মনে হয়, ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপারটা আমাদের প্লেনের মধ্যেই যতটা সম্ভব সেরে ফেলা উচিত। তাতে আমাদের সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভানটেজ আছে। কারণ, মার্ডারার প্লেনে বন্দি থেকে আনসেফ ফিল করবে। হি অর শি উইল বি আন্ডার এক্সট্রিম টেনশান। ফলে আমরা সহজে তাকে চিনে নিতে পারব। দেন পুলিশ ক্যান টেকওভার।'

ক্যাপ্টেন হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কলকাতা পৌঁছোতে তো আর একঘণ্টাও বাকি নেই! সেখানে এয়ারক্র্যাফট ল্যান্ড করলে প্যাসেঞ্জারদের কিছুতেই আর প্লেনে আটকে রাখা যাবে না। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বিগ শট। ওঁরা আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বেন...।'

হাত তুলে ক্যাপ্টেনকে অভয় দিলেন এসিজি। হেসে বললেন, 'এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ক্যাপ্টেন। প্যাসেঞ্জারদের বলুন যে, প্লেনে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম দেখা দিয়েছে। সেটা ঠিক করার জন্যে বিশাখাপত্তনম এয়ার টার্মিনালে আমাদের ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে হবে। আশা করি দু-একঘণ্টার মধ্যে রিপেয়ারের কাজটা মিটে যাবে। অ্যান্ড দ্য ইনকনভেনিয়েন্স কজড ইজ রিগ্রেটেড।' শেষ কথাটা এসিজি বেশ নাটকীয়ভাবে ঘোষণার ঢঙে বললেন।

ক্যাপ্টেন সুখানির মুখে পলকে হাসি ফুটে উঠল। তিনি হাত বাড়িয়ে এসিজির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন : 'দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েল বিউটি, ডক্টর গুপ্ত। নাউ আই বিলিভ য়ু ক্যান ন্যাব দ্য কিলার। থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ।'

ক্যাপ্টেনের নির্মেঘ মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পেল কুমারমঙ্গলম। কারণ, ক্যাপ্টেন সুখানি লোক চিনতে ভুল করেন না। তা ছাড়া, কুমারমঙ্গলমের কেন জানি না মনে হচ্ছিল, বৃদ্ধ এই লোকটা পারলেও পারতে পারে।

ফ্লাইট ডেকের দিকে রওনা হওয়ার আগে ক্যাপ্টেন ডক্টর গুপ্তকে জিগ্যেস করলেন, 'আমাদের এম.পি-র নামটা কী বললেন যেন?'

'মিস্টার পরেশ সান্যাল। কিন্তু চেয়ারম্যানসাহেবকে এতসব কি বলার দরকার আছে?'

'আছে। এম.পি-টেম.পি. শুনলে ওঁরা একটু বেশি ভরসা পান। আর আমি এখুনি অ্যানাউন্সমেন্টেরও ব্যবস্থা করছি। ধরে নিন, আমরা ভাইজাগের দিকে রওনা হয়ে গেছি। কুমারমঙ্গলমের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন সুখানি : 'কুমারমঙ্গলম, য়ু প্লিজ লুক আফটার দিস অড কাপল অফ ডক্টরস। ওঁরা যা-যা বলেন কো-অপারেট করুন। নাউ দে আর দ্য বস। আমি এক্ষুনি আমাদের চেয়ারম্যান মিস্টার সুরেশ ওয়ালিয়ার সঙ্গে কথা বলে সব ক্লিয়ারেন্স নিয়ে নিচ্ছি।'

তড়িঘড়ি পা ফেলে ক্যাপ্টেন অর্জন সুখানি পরদা সরিয়ে চলে গেলেন।

এসিজি ডক্টর দে-র দিকে ফিরে বললেন, 'ডক্টর' দে, আসুন, এবারে বডিটা সাবধানে বের করে ফেলা যাক।'

কুমারমঙ্গলম একেবারে হাঁ-হাঁ করে এসিজিকে বাধা দিল, বলল, 'আপনি কেন হাত লাগাবেন, ডক্টর গুপ্ত! আপনি এপাশটায় দাঁড়ান...আমি আর ডক্টর দে ম্যানেজ করে নিচ্ছি।'

সরে এলেন এসিজি। হাসলেন মনে-মনে। এম.পি.-র নাম নেওয়ার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে! এইসব নাম-টাম নেওয়া ওঁর অভ্যেস নয়। এখানে এরকম একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয়েছে বলে বাধ্য হয়ে পরেশ সান্যালের নামটা বলতে হয়েছে। বছরতিনেক আগে মিস্টার সান্যালের একটা চুরি-যাওয়া সোনার হাতঘড়ি এসিজি উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই পরিচয়টা গাঢ় হয়েছে।

এসিজি খেয়াল করেননি, কখন যেন রঙ্গলাল ওঁর খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। ওঁর কানের কাছে মুখ এনে রঙ্গলাল যখন চাপা গলায় বললেন, 'আকাশে মার্ডার/ প্রবলেম হার্ডার', তখনই এসিজি ওঁকে খেয়াল করলেন। এবং হেসে ফেললেন।

মিনিট-পনেরোর মধ্যেই অর্জন সুখানি ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে এলেন। ততক্ষণে মদনমোহন চ্যাটার্জির দেহটা টয়লেট স্পেস থেকে বের করে বাইরে মেঝেতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং ভবানীপ্রসাদ দে ওঁর প্রাথমিক পরীক্ষা সেরে ফেলেছেন।

পরীক্ষা করে এসিজির সঙ্গে একমত হয়েছেন ভবানীপ্রসাদ। পিস্তল কিংবা রিভলবার, যা-ই ব্যবহার করা হয়ে থাকুক না কেন, সেটা ফায়ার করা হয়েছে মুখের মধ্যে নল ঢুকিয়ে। এবং মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষণাৎ।

অর্জন সুখানি ডেডবডির দিকে একবার তাকালেন। তারপর এসিজির মনোযোগ পাওয়ার আশায় ছোট্ট করে বারদুয়েক কাশলেন।

এসিজি কপালে ভাঁজ ফেলে মুখ তুলে তাকালেন ক্যাপ্টেনের দিকে।

'ডক্টর গুপ্ত, আমাদের চেয়ারম্যানকে গোটা ব্যাপারটা জানিয়েছি। উনি আপনাকে এই কেসটা ইনভেস্টিগেট করার পুরো অথরিটি দিয়েছেন। মনে হয়, মিস্টার পরেশ সান্যালের সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে—কারণ, উনি মিস্টার সান্যালের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছেন। আমরা আশা করছি, ভাইজাগেই ব্যাপারটা মিটে যাবে। তখন লোকাল অথরিটির কাছে কেসটা হ্যান্ডওভার করে দিতে হবে। মিস্টার ওয়ালিয়ার কথা মনে হল, হি ইজ কনভিন্সড অ্যান্ড ইমপ্রেসড অ্যাবাউট ইয়োর এবিলিটি। হয়তো মিস্টার সান্যাল কিছু বলে থাকবেন। ওয়েল...' দু-পাশে হাত ছড়িয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'নাউ ইটস ইয়োর গেম।'

'আমাদের প্লেন এখন তা হলে বিশাখাপত্তনমের দিকে যাচ্ছে?' ভবানীপ্রসাদ জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ। চেয়ারম্যানসাহেব বললেন, মিস্টার চ্যাটার্জি যখন মারাই গেছেন তখন অযথা তাড়াহুড়ো করে প্লেন ডাইভার্ট করে ডাক্তার-নার্সিং হোম খোঁজার কোনও মানে হয় না। আপনি কাজ শুরু করুন, ডক্টর গুপ্ত।'

'গুড। তাহলে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে যেখানে বেশ কিছু সিট ফাঁকা আছে সেরকম একটা জায়গা আমাদের দিন, ক্যাপ্টেন। মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে যাঁরা ট্র্যাভেল করছেন তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। তবে অন্য প্যাসেঞ্জাররা যেন অযথা ভয়-টয় না পেয়ে যায় সেটাও খেয়াল রাখবেন। তা হলে আমাদের কাজের অসুবিধে হবে।'

'কুমারমঙ্গলম, আপনি এক্সিকিউটিভ ক্লাসে একটু স্পেসের ব্যবস্থা করুন।' চিফ স্টুয়ার্ডকে নির্দেশ দিলেন অর্জন, 'দেখবেন, ডক্টর গুপ্তদের ওয়ার্কিং স্পেসের কাছাকাছি যেন কোনও প্যাসেঞ্জার না থাকে। অনেক সিট তো খালি আছে—সেরকম হলে তাদের একটু শিফট করিয়ে দেবেন।'

কুমারমঙ্গলম 'ইয়েস, স্যার' বলে বেরিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন এবার হালকা গলায় এসিজিকে প্রশ্ন করলেন, 'কাকে আপনার সন্দেহ হয়, মিস্টার গুপ্ত? নরমালি দ্য কিলার ইজ সামওয়ান রিলেটেড টু দ্য ভিকটিম...।'

সাদা চুলের গোছায় কয়েকবার টান মারলেন এসিজি। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে চারজন ট্রাভেল করছিলেন। দু'জন ওঁর সঙ্গেই বসেছেন—এক্সিকিউটিভ ক্লাসে। আর বাকি দুজনে আছেন ইকনমি ক্লাসে।'

সুখানি বললেন, 'হ্যাঁ মদনমোহন চ্যাটার্জির বোন তো খেপে লাল! ইরিনাকে যা-তা ভাষায় অ্যাটাক করেছেন। তারপর আমি গিয়ে ওঁকে অনেক কষ্টে ঠান্ডা করেছি। কিন্তু ইকনমি ক্লাসে কোন দু'জন ওঁর গ্রুপের?'

'ডক্টর দে বোধহয় এ-ব্যাপারে আপনার হেলপ করতে পারবেন...।' কথা বলতে-বলতে ভবানীপ্রসাদের দিকে ফিরলেন এসিজি।

কিন্তু রঙ্গলাল গোস্বামী তৎপরভাবে বলে উঠলেন, 'আমার সঙ্গে কেউ চলুন...আমি ওঁদের চিনিয়ে দিচ্ছি।'

ক্যাপ্টেন চট করে এগিয়ে গেলেন পরদার কাছে। পরদা সরিয়ে উঁকি মারতেই সাবরিনাকে দেখতে পেলেন। ওকে ইশারায় ডাকলেন।

সাবরিনা আসতেই রঙ্গলালকে বললেন, 'আপনি কাইন্ডলি হোস্টেসের সঙ্গে যান। যতটা ইনকন্সপিকুয়াসলি পারেন ওই দু'জন প্যাসেঞ্জারকে চিনিয়ে দিন...।'

'ইনকন...কী বললেন?' রঙ্গলাল প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ক্যাপ্টেনের চোখে।

এসিজি হেসে রঙ্গলালকে বললেন, 'এমনভাবে চেনাবেন যেন কেউ বুঝতে না পারে।'

ওঁরা দু'জন চলে যেতেই এসিজি ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জির বোনের সঙ্গে প্রথম কথা বলা যাক। উনি তো শুনলাম বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া, ডেডবডির ফরমাল আইডেন্টিফিকেশানটা এখন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।'

এমনসময় কুমারমঙ্গলম ফিরে এল। বলল যে, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এক্সিকিউটিভ ক্লাসে একটা কর্নার স্পেসে বসে ডক্টর গুপ্ত সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে প্যাসেঞ্জাররা বেশ রেস্টলেস হয়ে পড়েছে একজন রেগুলার প্যাসেঞ্জার তো বলেই বসেছে, প্লেন হঠাৎ কোর্স চেঞ্জ করে ভাইজাগের দিকে যে যাচ্ছে তার আসল কারণটা কী? সত্যিই কোনও টেকনিক্যাল প্রবলেম, নাকি অন্য কিছু? কুমারমঙ্গলম তাকে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে শান্ত করেছে।

ক্যাপ্টেন কুমারমঙ্গলমকে বললেন, 'ডক্টর গুপ্তদের কাজের সময় প্যাসেঞ্জাররা এদিক-ওদিক চলে-ফিরে বেড়ালে প্রবলেম হবে। আপনি ইরিনাকে বলুন পি. এস. সিস্টেমে অ্যানাউন্স করে দিক, সব প্যাসেঞ্জার যেন নিজের-নিজের সিটে বসে সিট বেল্ট বেঁধে নেয়। কারণ, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই টারবুলেন্স আশা করছি। একে তো কুয়াশার জন্যে ফ্লাইট লেট হয়েছে, ফলে প্যাসেঞ্জাররা ধরে নেবে আজ প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে নেই।' ডক্টর গুপ্তর দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন সুখানি : 'এবার তা হলে মিস চ্যাটার্জিকে খবর দেওয়া যাক?'

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন এসিজি। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেনের মনে হল বৃদ্ধ হুনুরের মন পড়ে আছে অন্য কোথাও—গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছেন তিনি।

কুমারমঙ্গলমকে ইশারায় নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। অর্থাৎ মিস চ্যাটার্জিকে পাঠিয়ে দিন।

কুমারমঙ্গলম ব্যস্তভাবে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন ভুরু উঁচিয়ে তাকালেন এসিজির দিকে। পুরোনো প্রশ্নটাই করলেন আবার : 'কী বুঝছেন, ডক্টর গুপ্ত? হু কুড বি দ্য পসিবল কিলার? মিস্টার চ্যাটার্জির চেনা-জানা কেউ? না কি...।'

উত্তরে হাসলেন অশোকচন্দ্র : 'এখনই কিছু বলা অসম্ভব। তবে, ক্যাপ্টেন, আপনার প্লেন চালানোর যেমন কিছু রুলস আছে, থিয়োরি আছে, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশানেও ঠিক তাই। যারা সাসপেক্ট তাদের মধ্যে একজনকে খুঁজে বের করুন যার খুন করার উদ্দেশ্য আছে, সুযোগ আছে, আর সাহস আছে...।'

'ইজ ইট সো?' মজা করে জিগ্যেস করলেন অর্জন সুখানি।

'ইয়েজ, ক্যাপ্টেন—মোটিভ, অপারচুনিটি অ্যান্ড গাটস—দ্য রুল অফ থ্রি ফর আ কিলিং।'

'উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট, ডক্টর। আমি ফ্লাইট ডেক-এ যাচ্ছি। কিপ মি ইনফরমড অফ এনি ডেভেলাপমেন্টস।'

ইরিনার সঙ্গে যে-ভদ্রমহিলা এসিজিদের কাছে এলেন ওঁকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল উনি যথেষ্ট বড়লোক এবং বিরক্ত।

বয়েস পঁয়তাল্লিশ পেরোলেও মেকাপ সেটাকে প্রাণপণে পিছনদিকে টানছে। ছিপছিপে ফরসা চেহারা, পানপাতার মতো মুখ। বয়েসে সুন্দরী ছিলেন অবশ্যই—ফলে এখনও যে কেন মিস থেকে গেছেন সেটাই আশ্চর্যের।

ভদ্রমহিলার কপালে টিপ, চোখের পাতায় মাসকারা, চোখের ঢাকনায় আইলাইনার, আরও কত কী! ওঁকে ঘিরে থাকা পারফিউমের হালকা গন্ধ মনটা ভালো করে দিচ্ছিল। পরনে সোনালি পাড়ের এক অদ্ভুত রঙের শাড়ি—যেন কেউ স্প্রে করে কয়েকটা আবছা রং মোলায়েমভাবে শাড়িতে বুলিয়ে দিয়েছে। আর কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা কালো চকচকে শৌখিন লেডিজ ব্যাগ। ভদ্রমহিলার পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এখন শীতকাল।

ওঁর শরীরে গয়না বলতে মাত্র তিনটি। হাতে আংটি এবং ব্রেসলেট। আর গলায় সরু সোনার চেনে বসানো লকেট। তবে তিনটে গয়নাতেই যথেচ্ছভাবে হিরে বসানো।

এসিজি জোরে নাক টানলেন। হয়তো পারফিউমের গন্ধ ছাপিয়ে টাকার গন্ধ পাওয়া যায় কি না দেখতে চাইছিলেন।

'এসব কী শুনছি! দাদার নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে! কোথায়, দাদা কোথায়? সেই কখন টয়লেটে গেছে! তখন থেকে এই অকর্মা মেয়েগুলোকে বলছি খোঁজ নিতে। কী করে যে এরা হোস্টেসের চাকরি পায় কে জানে! হোপলেস! এদিকে সিটে বসে আমি আর রমেশ দুশ্চিন্তায় মরছি—সেদিকে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি রমেশকে বললাম...।'

'ম্যাডাম—' ভদ্রমহিলার কথাপ্রপাতে বাধা দিলেন অশোকচন্দ্র : 'আপনার নামটা প্লিজ আমাদের বলবেন—।'

এতক্ষণ ভদ্রমহিলা ভবানীপ্রসাদ দে-কে লক্ষ করে কথা বলছিলেন—হয়তো ওঁর কম বয়েসটাই তার কারণ। এখন চমকে ঘুরে তাকালেন পঁয়ষট্টি পেরোনো বৃদ্ধের দিকে। কয়েকপলক তাচ্ছিল্যের চোখে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন ওঁর নাম না জানাটা এসিজির পক্ষে অপরাধ। তারপর বোধহয় এসিজির সাদা চুলের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধকে ক্ষমা করতে পারলেন।

দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, 'শ্রাবণী—শ্রাবণী চ্যাটার্জি। আমি মদনমোহন চ্যাটার্জির বোন। তার আবার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না কি!'

এসিজি উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন। শ্রাবণীর চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, একসময় এই চোখে তির ছিল। কত যুবক সেই তিরে বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আজ তূণ খালি—তবুও সোনার দিনটা আন্দাজ করা যায়। 'না, মিস চ্যাটার্জি, কোনও সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে না। বরং আমরাই আপনার কাছে সার্টিফিকেট চাইছি।' এসিজি নরম গলায় বললেন।

'তার মানে!'

'আপনি ডক্টর দে-র সঙ্গে ওই পরদার আড়ালে একবার যান। ওখানে একটা ডেডবডি আছে। প্লিজ, এর পরের কথাটা শুনে হঠাৎ করে যেন চেঁচিয়ে উঠবেন না—কারণ, অন্য প্যাসেঞ্জাররা এখনও জানে না, এই প্লেনে একটা মার্ডার হয়েছে। আপনি কাইন্ডলি গিয়ে আপনার দাদার ডেডবডিটা আইডেন্টিফাই করুন। হি প্রব্যাবলি হ্যাজ বিন শট ইন দ্য মাউথ।'

সঙ্গে-সঙ্গে শ্রাবণী একটা অদ্ভুত শব্দ করে টলে পড়ে গেলেন। ইরিনা সময়মতো ওঁকে ধরে না ফেললে হয়তো মাথায় কিংবা ঘাড়ে চোট লাগতে পারত।

ইরিনা শ্রাবণীকে একটা সিটে বসিয়ে দিল। তারপর ছুটে গিয়ে একগ্লাস জল নিয়ে এল।

ওর হাত থেকে জলের গ্লাসটা শ্রাবণীর চোখে-মুখে সামান্য ছিটিয়ে দিলেন এসিজি। ভবানীপ্রসাদ চটপট শ্রাবণীর বাঁ-হাতের কবজি চেপে ধরে পালস রেট মাপতে চাইলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্রাবণীর চেতনা ফিরে এল। ধীরে-ধীরে চোখ খুললেন। অশোকচন্দ্র ওঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'প্লিজ, একটু শক্ত হোন, ম্যাডাম। আপনার সামনে এখন অনেক কাজ। এসময়ে ভেঙে পড়বেন না।'

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে শ্রাবণী বললেন, 'সরি। ইট ওয়াজ আ গ্রেট শক। দাদাকে খুব ভালোবাসতাম আমি...' সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিলেন : 'ওয়েল, হু ডিড ইট?'

অশোকচন্দ্র ঘাড়ের কাছে হাত নিয়ে সাদা চুলের গোছায় টান মেরে বললেন, 'সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি, মিস চ্যাটার্জি।'

'আপনি কি পুলিশের লোক নাকি? সন্দেহে ভুরু কুঁচকে গেল ম্যাডামের।

এসিজি কিছু বলে ওঠার আগে ভবানীপ্রসাদ গলাখাঁকারি দিলেন। তারপর শ্রাবণীর কাছে এসে হেসে বললেন, 'ইনি ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত—দ্য গ্রেট ইনভেস্টিগেটর। থিঙ্কিং মেশিন। দ্য বেস্ট ইন দ্য গেম।'

এসিজি এত প্রশংসার ওজন সামলাতে মাথা নিচু করলেন।

শ্রাবণী চ্যাটার্জির ভুরু কুঁচকেই ছিল। এবার ঠোঁটের কোণাটা সামান্য বেঁকে গেল : 'য়ু মিন ডিটেকটিভ?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমি একজন হুনুর—হুনুরি করে আনন্দ পাই।' এসিজি অপ্রস্তুভাবে হেসে বললেন, 'যাঁকে সহজ কথায় বলে গোয়েন্দা...।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এসিজিকে খুঁটিয়ে দেখলেন শ্রাবণী। তারপর বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'ডিটেকটিভ? আপনি? দেখে তো মনেই হয় না!'

'ওটা আমার ছদ্মবেশ, ম্যাডাম।' হাত নেড়ে একটা ভঙ্গি করে এসিজি বললেন, 'আসলে কী জানেন? চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়—সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারের মতো মোমের পালিশ দেওয়া ছুঁচলো গোঁফ আমার নেই। দেবেন্দ্রবিজয়, হুকা-কাশি, রবার্ট ব্লেক কিংবা ব্যোমকেশের মতো প্রতিভা আমার নেই। কোনও ক্যারিশমা নেই—আমার মাথার পেছন থেকে জ্যোতি বেরোয় না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এসিজি : 'তবে আমার মতো গোয়েন্দা—রিয়েল লাইফ ডিটেকটিভরা—জোড়াতালি দিয়ে যা-হোক করে কাজ চালিয়ে নেয়। মানে, শেষ পর্যন্ত খুনিকে ধরে ফ্যালে। ইন সিম্পল টার্মস, উই আর এফেক্টিভ।

'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, ম্যাডাম, আর নয়। প্লিজ, দাদার বডিটা আইডেন্টিফাই করে আপনি জলদি এখানে চলে আসুন। আই নিড ইয়োর হেলপ। ডক্টর দে, আপনি মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে যান।' কথা শেষ করে ইরিনাকেও সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন এসিজি। যদি ডেডবডি দেখে শ্রাবণী আবার অজ্ঞান-টগগান হয়ে যান!

ওঁরা তিনজন চলে গেলেন।

রঙ্গলাল অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসিজি স্যার, আমার কিন্তু শ্রাবণী চ্যাটার্জিকে সন্দেহ হয়।'

চোয়ালে আলতো টোকা মারতে-মারতে এসিজি বললেন, 'সন্দেহ হয় খুব ভালো কথা। এবারে বলুন তো, মিস চ্যাটার্জি ওঁর দাদাকে কীভাবে খুন করলেন?'

কাঁচুমাচু মুখ করে রঙ্গলাল বললেন, 'সে কি ছাই জানি? ওটা বের করবেন আপনি।'

অশোকচন্দ্র এই ছড়া-কাটা উত্তর শুনে মোটেই হাসলেন না। শুধু আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন, 'প্রথমে বুঝতে হবে হাউ, তারপর হোয়াই, আর সবশেষে হু।'

'তার মানে?'

'মানে তো সিম্পল! প্রথমে বুঝতে হবে ঠিক কীভাবে মদনমোহন চ্যাটার্জি খুন হলেন—হাউ। তারপর বের করতে হবে, কেন উনি খুন হলেন—হোয়াই। এ-দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলেই শেষ প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে : কে ওঁকে খুন করেছে—হু।'

ফ্যাকাসে মুখে শ্রাবণী চ্যাটার্জি ফিরে এলেন। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, বয়েস অনেকটা বেড়ে গেছে। ইরিনা ওঁকে ধরে-ধরে নিয়ে আসছিল।

অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ভবানীপ্রসাদ ইশারা করে বোঝালেন, ঠিকঠাকভাবে আইডেন্টিফিকেশানের ব্যাপারটা মিলে গেছে।

শ্রাবণীকে একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে ইরিনা চলে গেল। প্লেনের ক্রুদের সেরকমই নির্দেশ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন সুখানি : জিজ্ঞাসাবাদের সময় কেউই এসিজির কাছে থাকবে না—অবশ্য যদি এসিজি কাউকে ডেকে পাঠান তা হলে আলাদা কথা।

সুতরাং এসিজি, ভবানীপ্রসাদ, আর রঙ্গলাল ছাড়া শ্রাবণীর সামনে আর কেউ নেই।

'মিস্টার চ্যাটার্জির ওয়ার্থ কত ছিল?' শ্রাবণীর পাশের সিটটায় বসে অশোকচন্দ্র প্রথম প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন।

'ওয়ার্থ মানে?' ক্লান্ত গলায় জানতে চাইলেন শ্রাবণী।

'মানে, স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে ওঁর সম্পত্তি কীরকম দাঁড়াবে?'

বিষণ্ণভাবে হাসলেন শ্রাবণী, অনেকটা আপনমনেই বললেন, 'ঠিক জানি না, তবে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা তো হবেই। টাকার নেশা দাদাকে পাগল করে দিয়েছিল। টাকার পেছনে ছুটতে কী ভালোবাসত! আমি বাড়াবাড়িরকম ঝামেলা করলে দাদা বলত, ''শানু, কী করে তোকে বোঝাব এটা একটা দারুণ নেশা—অনেকটা মোটর রেসের মতো—থামলে কোনও মজা নেই, ছুটলেই বরং মজা।'' কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামতে তো হলই! কী প্যাথেটিক...।' গলা ভেঙে গেল শ্রাবণীর, চোখের কোণে জল এসে গেল। ব্যাগ থেকে ছোট্ট লেডিজ রুমাল বের করে চোখের কোণ মুছে নিলেন।

'এখন...মানে, উনি চলে যাওয়ার পর...এই বিশাল সম্পত্তির মালিক কে হবেন?'

'অনেকটাই আমার কপালে এসে জুটবে।' তেতো গলায় শ্রাবণী বললেন, 'কী করব আর বলুন...একেই বলে নিয়তি।'

'কেন, আপনি সম্পত্তি ভালোবাসেন না?'

ধারালো চোখে তাকালেন এসিজির দিকে : 'ভালোবাসি অবশ্যই—তবে দাদার জীবনের বদলে নয়।'

এসিজি বেশ বুঝতে পারছিলেন, শ্রাবণী চ্যাটার্জির ইমোশানের পোটেনশিয়াল ক্রমেই চড়ছে। সত্যি, মানুষের ভেতরকার আবেগগুলো অনেকটা ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের মতো। বাড়তে-বাড়তে হঠাৎই বাজ পড়ার ঢঙে ডিসচার্জ করে যায়। তখন বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো মনের খুব গভীরের ভাবনাগুলো চট করে বেরিয়ে আসে। মানুষটাকে ঠিকঠাক চেনা যায়।

দাদাকে সত্যিই কি এতটাই ভালোবাসতেন ভদ্রমহিলা!

'আপনি ছাড়া মিস্টার চ্যাটার্জির ফ্যামিলি বলতে আর কারা আছেন?'

'আমি ছাড়া দাদার আর কেউ ছিল না...কেউ না। তেমনি আমারও যা কিছু ছিল দাদা। এখন...এখন আমি একা হয়ে গেলাম। একেবারে একা...।'

কথা বলতে-বলতে শ্রাবণীর চোখের পাতা ভারী হয়ে গিয়েছিল, সেইসঙ্গে গলাও। রুমালটা আর-একবার ব্যবহার করলেন তিনি।

এসিজি ওঁকে বেশ খুঁটিয়ে জরিপ করছিলেন। ওঁর মনে হল, দুঃখটা মিথ্যে নয়।

শ্রাবণীকে একটু সময় দিয়ে তারপর কিছু একটা জিগ্যেস করতে যাবেন, অলিপথের ওপারের একটা সিটে বসেছিলেন ডক্টর দে—তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন, ম্যাডাম, মিস্টার চ্যাটার্জি তো ম্যারেড ছিলেন—ওঁর ওয়াইফকে আমি দেখেছি...।'

ডক্টর দে-র দিকে তাকালেন শ্রাবণী : 'দেখতেই পারেন—দাদার সঙ্গে বহু প্রোগ্রামেই বউদি যেত—কাগজেও একবার ছবি বেরিয়েছিল। তবে সবই ছ-বছর আগের কথা। নাইনটি সেভেনে বউদি সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গেছে। তারপর দাদা আর বিয়ে করেনি—যদিও আমি বহুবার দাদাকে রিকোয়েস্ট করেছি। আর...' এসিজির দিকে চোখ ফেরালেন শ্রাবণী : 'দাদা-বউদির কোনও ইস্যু ছিল না।'

তারপর ভবানীপ্রসাদের দিকে তাকালেন : 'বউদিকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন? কোনও অনুষ্ঠানে?'

'না, আপনাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে...প্রায় বছরদশেক আগে। মিস্টার চ্যাটার্জির অ্যাজমার প্রবলেম ছিল। আমি ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন অবশ্য আপনাকে দেখিনি।'

'না, আমি তখন ও-বাড়িতে থাকতাম না।' ঠোঁট টিপে বললেন শ্রাবণী। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে দিলেন : 'ঠিকই বলেছেন, দাদার হাঁপানির প্রবলেমটা ভীষণ ভোগাত। বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে ওটা খুব বেড়ে গিয়েছিল।'

এরপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলেন। এবার মুখ খুললেন।

'যদি কিছু মাইন্ড না করেন তাহলে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব, ম্যাডাম?'

ভুরু কুঁচকে এসিজির দিকে তাকালেন শ্রাবণী। এসিজি দেখলেন, সত্যি, ওঁর চোখদুটোর একফোঁটা বয়েস বাড়েনি।

শ্রাবণী বললেন, 'দাদার এই ব্রুটাল মার্ডার কেসটা সলভ করার জন্যে যদি পার্সোনাল প্রশ্ন করাটা জরুরি হয় তা হলে অবশ্যই করবেন। আই ওন্ট মাইন্ড।'

'আপনি বিয়ে করেননি কেন?' প্রশ্নটা করেই হাত তুলে ইশারা করলেন এসিজি : 'ম্যাডাম, ইচ্ছে করলে আপনি জবাব না-ও দিতে পারেন।'

'না, সেরকম কিছু নয়।' মাথা সামান্য নিচু করলেন শ্রাবণী : 'বিয়ে করেছিলাম। ওই যে, ডক্টর দে যখন দাদাকে চেক-আপ করতে গিয়েছিলেন, তখন আমি হাজব্যান্ডের সঙ্গে সল্টলেকে থাকতাম। পরে...পরে বিয়েটা নষ্ট হয়ে যায়...।'

'সরি ম্যাডাম।' ছোট্ট করে বললেন অশোকচন্দ্র।

'না, ঠিক আছে।' মুখ তুলে তাকালেন শ্রাবণী চ্যাটার্জি।

মাথা হেলিয়ে ঘাড়ে হাত বোলালেন এসিজি : 'এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আপনারা মোট চারজন ট্র্যাভেল করছিলেন...আপনি ছাড়া বাকি তিনজন কে-কে একটু বলবেন...?'

শ্রাবণী রুমালটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'আমি ছাড়া রমেশ—রমেশ শর্মা, ব্রজেন দাস, আর শাওনি রাঘবন। রমেশ আমার সঙ্গে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে আছে। আর বাকি দু'জন ইকনমি ক্লাসে।'

'এদের একটু-আধটু ইনট্রো দিলে সুবিধে হয়...।'

'রমেশ শর্মা লাস্ট পাঁচবছর ধরে দাদার পারসোনাল সেক্রেটারি। এমনিতে প্রায় দশবছর কাজ করছে দাদার কাছে। প্রথমে ''চ্যাটার্জি মাইনিং করপোরেশন''-এ—এম.পি-র কোরবাতে দাদার দুটো কপার মাইন আছে। শুনেছি ভালো প্রফিট হয়। সেখানে রমেশ জুনিয়ার ম্যানেজার ছিল। পরে দাদার ওকে ভালো লেগে যায়। তাই ওকে পার্সোনাল সেক্রেটারি করে নেয়। হি ইজ আ জেম অফ আ ওয়ার্কার। দিন-রাত কাজ করতে ভালোবাসে। এই তো, প্লেনে বসেই ব্রিফকেস খুলে দাদা কীসব কাগজপত্র বের করে রমেশের সঙ্গে ডিসকাস করছিল।'

এমনসময় কুমারমঙ্গলম এসিজিদের কাছে এল। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ থাকায় বেচারি দূর থেকেই ইশারায় কাছে আসার অনুমতি চেয়েছে। এসিজি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই ও চটপট করে চলে এসেছে ভবানীপ্রসাদের কাছে। ঝুঁকে পড়ে ডক্টর দে-র কানে-কানে কী যেন বলে কুমারমঙ্গলম চলে গেল।

অশোকচন্দ্র প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ভবানীপ্রসাদের দিকে।

ভবানীপ্রসাদ একবার শ্রাবণীর দিকে দেখে নিয়ে এসিজিকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন জিগ্যেস করছেন, আইডেন্টিফিকেশান যখন হয়ে গেছে তখন ওঁদের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল কিট নিয়ে আমি বডিটা যতটা সম্ভব থরো চেকআপ করে একটা রিপোর্ট লিখে দেব কি না—তাতে ''আকাশ এয়ারলাইনস''-এর সুবিধে হবে। ওঁদের চেয়ারম্যান তাই চাইছেন—বলছেন, ইটস পার্ট অফ রুটিন প্রসিডিয়োর।'

'আমিই সে-কথা আপনাকে বলব ভাবছিলাম। বুলেট যদি না হয় তা হলে মিস্টার চ্যাটার্জির মুখে কী হিট করল? আর অত মারাত্মক ইমপ্যাক্টের ফোর্স জিনিসটা পেল কোথা থেকে? তবে ডক্টর দে, কুড য়ু ওয়েট ফর আ ফিউ মিনিটস? মিস চ্যাটার্জিকে আমি এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি...তারপর...।'

'ও. কে.—আই ক্যান ওয়েট।'

'তারপর, মিস চ্যাটার্জি?' এসিজি শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন।

'এরপর ব্রজেন দাস। ওকে কম্বাইড হ্যান্ড বলতে পারেন। অড জব ম্যান। সবরকমের কাজই একটু-একটু পারে। এই তো, লাস্ট উইকে আমাদের কর্ডলেস ফোনটা খারাপ হয়েছিল, ব্রজেন কীসব খুটখাট করে সেটা সারাই করে দিল। আমাদের বাড়ির টিউব লাইট কেটে গেলে সেটা পালটাতেও ব্রজেন, আবার ডাইনিং

টেবিলের গ্রানাইট পাথরটা ঝকঝকে তকতকে করে রাখার ব্যাপারেও ব্রজেন। ওর ওপরে আমরা খুব ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু দাদা ওকে বাড়াবাড়িরকম আশকারা দিত, বিশ্বাসও করত। আমি মাঝে-মাঝেই দাদাকে অ্যালার্ট করতাম। বলতাম, ''বিশ্বাস করার একটা লিমিট আছে। তুমি কিন্তু সেটা প্রায়ই ভুলে যাও।'' কিন্তু কে শোনে কার কথা!'

'আর শাওনি রাঘবন?'

'ও স্টেনো কাম টাইপিস্ট। বছরখানেক হল জয়েন করেছে। ওকে ঠিক বোঝা যায় না। তবে দাদা ওকে লাইক করত। ওকে তো এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ফ্লাই করাতে চেয়েছিল, আমি বারণ করেছি! সামান্য একটা দু-পয়সার স্টেনো-টাইপিস্ট—সে চড়বে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে! প্লেনে চড়ছে তাই না কত! দাদার সেই এক প্রবলেম! ওকে ভীষণ স্নেহ করত। শাওনিও সেটা বুঝত—তাই ঢং করত। নাঃ, ডক্টর গুপ্ত, দাদার মিসহ্যাপের ব্যাপারে আমাকে যদি কাউকে সন্দেহ করতে বলেন সে ওই শাওনি রাঘবন। এবার আপনি ইনভেস্টিগেট করে দেখুন...। ক্যাপ্টেন আমাকে বলেছেন যে, উনি আপনার ওপরে খুব ডিপেন্ড করছেন...আপনাকে পুরো অথরিটি দিয়েছেন...।'

'মিস চ্যাটার্জি, থ্যাঙ্ক য়ু সো মাচ।'

এসিজি উঠে দাঁড়ালেন। সেই সঙ্গে শ্রাবণীও।

রঙ্গলাল গোস্বামী কিছু একটা বলবেন-বলবেন করছিলেন। ওঁর উসখুসুনি দেখে অশোকচন্দ্র বললেন, 'কিছু বলবেন, রঙ্গলালবাবু?'

বিনয়-গদগদ ঢঙে ঘাড় কাত করে রঙ্গলাল বললেন, 'ম্যাডাম, একটা স্বভাব-কবিতা রচনা করেছি...অধমের অপরাধ নেবেন না...।'

এসিজি উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'বলুন, বলুন, রঙ্গলালবাবু—মিস চ্যাটার্জি কিছুই মনে করবেন না।'

'বলি তা হলে?' ঘাড় কাত করে জানতে চাইলেন রঙ্গলাল।

শ্রাবণী হেসে ঘাড় নাড়লেন : 'স্বভাব-কবিতা! সেটা আবার কী! যা হোক, বলুন—।'

'শ্রাবণী ও শাওনিতে দ্বন্দ্ব যথেষ্ট/ একই নাম দুই রূপ কৃষ্ট ও খ্রিস্ট।'

শ্রাবণীর মুখটা পলকে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু তারপরই চট করে মেঘ সরিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'য়ু আর অ্যাজ অ্যামেজিং : অ্যাজ রিডিকিউলাস। লাইক য়ু।' তারপর এসিজির দিকে তাকিয়ে : 'দারুণ মজার মানুষ, তাই না?'

শ্রাবণী চ্যাটার্জি অহঙ্কারী পা ফেলে নিজের সিটের দিকে চলে গেলেন।

ডক্টর দে পরদা সরিয়ে টয়লেট কিউবিকলের সামনে এলেন। ভাবছিলেন ইরিনা কিংবা সাবরিনাকে বলবেন প্লেনের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল কিটটা নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু ঠিক তখনই একটু চেঁচামেচি শোনা গেল যেন।

এসিজি, রঙ্গলাল এবং ভবানীপ্রসাদ—তিনজনেই শব্দ লক্ষ করে চোখ ফেরালেন। দেখলেন, ইরিনা এবং একজন যুবক কথা-কাটাকাটি করতে-করতে এক্সিকিউটিভ ক্লাসের টয়লেট স্পেসের সামনে চলে এসেছে।

ইরিনা ছেলেটিকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা।

'বলছি তো, আমি স্যারের বাড়ির কাজের লোক। স্যারের বিপদ শুনলে আমাকে তো ছুটে আসতেই হবে। আমাকে এভাবে...।' বেশ গলা চড়িয়েই কথা বলছিল ছেলেটি।

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে চাইছেন না, স্যার। এটা এক্সিকিউটিভ ক্লাস। আপনি ইকনমি ক্লাসের টিকিট নিয়ে এখানে আসতে পারেন না।'

'বিপদের সময় আবার ক্লাস কী!' একরকম তেড়ে উঠে বলল ছেলেটি, 'আমার স্যারের—মানে, মিস্টার মদনমোহন চ্যাটার্জির যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলে আমাকে অ্যালাউ করতেই হবে, দিদি।'

এয়ারহোস্টেসকে দিদি!

এই ডাক শুনে ইরিনা আর থাকতে পারল না—ঠোঁট টিপে হেসে ফেলল। আড়চোখে তাকাল এসিজির দিকে : কী করা যায় এখন?'

এসিজি চট করে ব্রজেন দাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মদনমোহন চ্যাটার্জির বাড়ির কাজের লোক হলেও ব্রজেনকে কাজের লোক বলে ঠাহর করা মুশকিল।

লম্বা ফরসা চেহারা। কাটা-কাটা মুখ-চোখ। তেল মাখানো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। নাকের নীচে পুরু গোঁফ। চোখের তারা বেশ চঞ্চল। গায়ে সাদা ফুলহাতা শার্ট, তার ওপরে ছাই আর কালো রঙের ডোরাকাটা হাফ সোয়েটার। প্যান্টের রং হালকা নীল—তবে সামান্য ময়লা।

'আপনার নাম কি ব্রজেন দাস?'

এসিজির প্রশ্নে পলকে সব ছটফটানি থেমে গেল। বৃদ্ধের দিকে সন্দেহের ঠান্ডা চোখে তাকাল ব্রজেন : 'আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?'

ডক্টর দে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এসিজি হাত তুলে ওঁকে ক্ষান্ত করলেন। তারপর মোলায়েমভাবে হেসে ব্রজেনকে বললেন, 'উত্তেজিত হবেন না, ব্রজেনবাবু। এখানে এসে ঠান্ডা হয়ে বসুন, সব বলছি...।'

ব্রজেন দাস এসিজির অনুরোধ মেনে নিল। এসিজিদের কাজের জায়গায় একটা সিট বেছে নিয়ে বসে পড়ল। ওর নজর কিন্তু বারবার ছিটকে যাচ্ছিল টয়লেটের কাছে পলিথিন শিট ঢাকা দেওয়া ডেডবডিটার দিকে। বোধহয় ভাবছিল, মেঝেতে ওটা কী ঢাকা দেওয়া রয়েছে!

হঠাৎ অশোকচন্দ্রের দিকে ঘুরে তাকিয়ে ব্রজেন বলে উঠল, 'স্যার কোথায়? স্যারের কী হয়েছে?'

ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেশ ধীরে-ধীরে সময় নিয়ে এসিজি টয়লেট স্পেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই পলিথিন শিটের নীচে আপনার স্যারের ডেডবডি আছে। ওঁকে কেউ খুন করেছে।'

'খুন!' তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল ব্রজেন। ওর হাত সামান্য কাঁপছিল, 'কী করে হল এসব? কে খুন করল স্যারকে? আমি স্যারকে একবার দেখব...প্লিজ...।'

এসিজি ভবানীপ্রসাদকে ইশারা করলেন। তারপর ব্রজেনকে বললেন, 'আপনি যান, স্যারকে শেষ দেখা দেখে আসুন। ডক্টর দে আপনাকে বডি দেখাবেন।'

ব্রজেন ডক্টর দে-র সঙ্গে পা বাড়াল।

ইরিনা চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে এসিজি নিচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'ব্রজেন দাস মিস্টার চ্যাটার্জির ব্যাপারটা জানল কী করে?'

হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে ইরিনা বলল, 'হয়তো আমার দোষে জেনেছেন। আমি আর সাবরিনা ব্যাপারটা ডিসকাস করছিলাম, তখন এই ভদ্রলোক আমাদের পাশ দিয়ে ইকনমি ক্লাসের টয়লেটে যাচ্ছিলেন। তখনই ওভারহিয়ার করেছেন।'

'ঠিক আছে,' বলে ঘাড় নেমে ইরিনাকে বিদায় দিলেন বৃদ্ধ।

আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রজেন দাস চোখ মুছতে-মুছতে ফিরে এল এসিজির কাছে। কান্না-ভাঙা গলায় বলল, 'স্যারই যখন আর নেই তখন আমার আর বেঁচে থেকে কী হবে! কোন হতভাগ্য আমার দেবতার মতো স্যারকে এইভাবে খতম করল! এবার আমার কী হবে? কোথায় যাব আমি?'

এসিজির ইশারায় রঙ্গলাল গোস্বামী ব্রজেন দাসের কাছে এলেন। ওকে ধরে যত্ন করে একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'খুনি ধরতে ভাই/ আপনার হেলপ চাই। খুনির পেলে পাত্তা/ জুড়োবে স্যারের আত্মা।'

ব্রজেন দাস পলকে শোক ভুলে কবিমানুষটির দিকে এমনভাবে তাকাল যে, মনে হল স্যারের মৃত্যুর শকের চেয়ে রঙ্গলালের কবিতা ওকে আরও বেশি শক দিয়েছে। কিন্তু রঙ্গলাল অবিচলিতভাবে আকর্ণ হেসে

একটা সিটে গিয়ে বসে পড়লেন।

'মিস্টার দাস, আপনি জানলেন কী করে যে, মিস্টার চ্যাটার্জির বিপদ হয়েছে?' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি জিগ্যেস করলেন।

ব্রজেন দাস চোখ মুছে ইরিনার কথাটাই বলল। তারপর জিগ্যেস করল, 'স্যারের সারা মুখে-বুকে এত রক্ত কেন? কীভাবে খুন হয়েছেন স্যার?'

'আমরা তো সেটাই জানার চেষ্টা করছি।' এসিজি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন, 'আপনি ওঁর কাছে কাজ করছেন কতদিন?'

'তা চারবছরের বেশি হবে।'

'ঠিক কী ধরনের কাজ করতেন একটু বলবেন?'

'সবরকম। টাই বেঁধে দেওয়া, জুতোর ফিতে বাঁধা, গাড়ি চালানো, টুকটাক এটা-সেটা সারিয়ে দেওয়া, এমনকী দরকার পড়লে স্যারকে রান্না করেও খাওয়াতাম। স্যার একবার ''ব্রজ'' বলে হাঁক দিলেই হল—আমি সটান গিয়ে হাজির হতাম। আমি বলতে গেলে স্যারের ছায়া ছিলাম—এখন আমার কপালে কী আছে কে জানে!'

'শুনলাম, গত সপ্তাহে আপনি মিস্টার চ্যাটার্জির কর্ডলেস ফোন সারিয়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। তবে শুধু কর্ডলেস কেন, আমি স্যারের টেপ-ডেক সারিয়েছি, স্যারকে একটা এফ. এম. ট্রানজিস্টার রেডিয়ো বানিয়ে দিয়েছি...।'

'একজন সাধারণ কাজের লোকের পক্ষে এসব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কাজ জানাটা একটু আনকমন—মানে সাধারণত দেখা যায় না, তাই না?'

হাসল ব্রজেন। মাথার তেল-চকচকে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমি সাধারণ কাজের লোক এটা আপনাকে কে বলল? দিদি?'

'দিদি মানে?'

'শ্রাবণীদি—স্যারের বোন।'

'না-না, উনি কিছু বলেননি। উনি আপনার খুবই প্রশংসা করেছেন।' ব্রজেনের ইমোশন্যাল পোটেনশিয়ালটা পরখ করবেন বলে এসিজি একটু মিথ্যে বললেন।

'হুঁঃ—' তেতো হাসল ব্রজেন : 'স্যার আমাকে যেরকম বিশ্বাস করতেন, দিদি সেরকম করেন না। কী আর করা যাবে! সবার তো মন রাখা সম্ভব নয়!'

'আপনি মাইনে কীরকম পান?'

'সেটা কি বলতেই হবে?' এসিজির দিকে বিদ্রোহী চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ব্রজেন।

'ঠিক আছে, বলতে হবে না। আপনার স্যারের কোনও শত্রু ছিল?'

'বড়লোকদের শত্রু থাকবে না এ কখনও হয়! বরং বলতে পারেন স্যারের চারপাশে প্রচুর শত্রু কিলবিল করত। তবে হ্যাঁ, তারা কেউ থাকত বন্ধুর ছদ্মবেশে, আর কেউ-বা ছিল কর্মচারীর ছদ্মবেশে।'

কথাটায় একটা ইঙ্গিত ছিল। এসিজি সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেই ইঙ্গিতটাই ধরার চেষ্টা করলেন।

'আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন, ব্রজেনবাবু?'

মাথা নিচু করল ব্রজেন, আলতো করে বলল, 'আমি বি. এসসি. পাশ।' তারপর একটু সময় নিয়ে বলল, 'কী করব বলুন! বহু চেষ্টা করেও তেমন কোনও চাকরি-বাকরি জোটেনি। তাই লজ্জা-টজ্জা ঝেড়ে ফেলে বড়লোকের চাকরের কাজ করছি—ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করছি। তো এখানে স্যারের কাছে বেশ ভালোই ছিলাম...।'

ব্রজেনের কাছে ঝুঁকে এলেন এসিজি। গলা নিচু করে বললেন, 'কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?'

'কীসের সন্দেহ?' অনেকটা যেন চমকে উঠল ব্রজেন। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'আমি ছোটমানুষ—সন্দেহ কাকে করব! তবে স্যার যে-ই খুন করে থাকুক টাকার লোভে করেছে। স্যারের টাকাপয়সা সম্পত্তির তো কোনও হিসেব ছিল না...আশপাশের অনেকেই তক্কেতক্কে ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এসিজি। তারপর হাতে হাত ঘষে বললেন, 'ঠিক আছে...অনেক ধন্যবাদ, ব্রজেনবাবু। আপনি আপনার সিটে গিয়ে বসুন...সেরকম কোনও খবর হলে আপনাকে জানাব।'

ব্রজেন উঠে দাঁড়াল। যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলে গেল, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল...আমার লাইফটা শেষ হয়ে গেল...।'

এসিজি ব্রজেনের আগের কথাটা ভাবছিলেন : 'আশপাশের অনেকেই তক্কেতক্কে ছিল...।'

তার মানে?

ডক্টর ভবানীপ্রসাদ দে এসিজিকে বললেন, 'ডক্টর গুপ্ত, একজন হোস্টেস ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল কিটটা গ্যালিতে দিয়ে গেছে। বলছে, তাড়াতাড়ি চেক আপের কাজটা সেরে ফেললে ভালো হয়...।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত আনমনাভাবে কী যেন চিন্তা করছিলেন। ঘোর ভেঙে চমকে উঠে ভবানীপ্রসাদের দিকে তাকালেন, বললেন, 'আপনি বরং চেক আপটা সেরেই নিন। আমি ততক্ষণে এদিককার কাজ এগিয়ে নিই। আপনি যখন টয়লেটের ওখানে যাচ্ছেন তখন একজন হোস্টেসকে ডেকে একটু বলে দিন মিস্টার চ্যাটার্জির পারসোনাল সেক্রেটারিকে এখানে পাঠিয়ে দিতে...প্লিজ।'

'উইথ প্লেজার—' বলে ডক্টর দে উঠে গেলেন।

রঙ্গলাল অলিপথের ওপারে একটা সিটে চোখ বুঝে বসেছিলেন। ভবানীপ্রসাদ চলে যেতেই চোখ খুলে তাকালেন এসিজির দিকে : 'স্যার, কাকে আপনার সন্দেহ হয়?'

এসিজি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'এখনও বলা সম্ভব নয়।'

বৃদ্ধের ছড়া-কাটার দুষ্টুমিটা ধরতে পেরে হেসে ফেললেন রঙ্গলাল।

রমেশ শর্মাকে অশোকচন্দ্রের কাছে নিয়ে এল ইরিনা।

পারসোনাল সেক্রেটারির পারসোনালিটি কম নয়। অন্তত রমেশকে দেখে এসিজির তাই মনে হল।

ফিটফাট স্যুটেড-বুটেড স্মার্ট চেহারা। চোখে মেটাল ফ্রেমের ছোট্ট চশমা। মাথার চুল পাতলা হয়ে কপালটা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে ব্যক্তিত্ব বেড়েছে বই কমেনি।

রমেশ শর্মার বয়েস খুব বেশি হলে চল্লিশের ওপাশে। তবে মুখে কেমন একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব আছে। বেবিফেস বোধহয় একেই বলে!

'মিস্টার রমেশ শর্মা, ডক্টর গুপ্ত', বলল ইরিনা, 'উনি মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে ট্র্যাভেল করছিলেন।'

রমেশকে এসিজির কাছে বসিয়ে ইরিনা চলে গেল।

এসিজি লক্ষ করলেন, রমেশ মাঝে-মাঝেই নার্ভাসভাবে গালে হাত বোলাচ্ছে।

এসিজি চুপ করে বসে রইলেন। রমেশের টেনশনকে বেড়ে ওঠার সময় দিলেন। দেখা যাক ও কী বলে!

অনেকগুলো সেকেন্ড-মিনিট পার হয়ে যাওয়ার পর রমেশ আর থাকতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, 'শেষ পর্যন্ত মিস্টার চ্যাটার্জি মার্ডার্ড হলেন...।'

'আপনি জানলেন কী করে?' সঙ্গে-সঙ্গে তির ছুড়লেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

'আমি জানলাম মানে...শ্রাবণী...মানে, মিস চ্যাটার্জি আমাকে বললেন। ভেরি স্যাড।'

'স্যাড তো বটেই—ব্যাডও।' বললেন এসিজি, 'কে ওঁকে খুন করতে পারে? কাউকে সন্দেহ হয় আপনার? এনি আইডিয়া?'

হাত আর ঠোঁট একসঙ্গে ওলটাল রমেশ : 'কী করে বলব! তবে যার মনে রাগ আছে, লোভ আছে, সে-ই এমন কাজ করতে পারে। কীভাবে মার্ডার্ড হয়েছেন স্যার? মিস চ্যাটার্জি বলছিল—মানে, বলছিলেন, বুলেট-ফুলেট কিচ্ছু। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, মার্ডারার এয়ারপোর্ট সিকিওরিটির এক্স-রে আইকে ফাঁকি দিয়ে একটা রিভলভার কী করে স্মাগল করে নিয়ে আসবে। দ্যাটস আ ভেরি টাফ ডিল, ইজনট ইট?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন এসিজি : 'ঠিকই বলেছেন। এই পয়েন্টটা আমাকে গোড়া থেকেই ডিসটার্ব করছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমেশ, বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জিকে মার্ডার করার কোনও দরকার ছিল না। এমনিতে বয়েস হয়েছিল...তার ওপর অসুস্থ ছিলেন...।'

'ষাট-বাষট্টি আর এমনকী বয়েস! তবে অসুখ-বিসুখ থাকলে...কী অসুখের কথা বলছেন আপনি?'

'অ্যাজমা। টান ধরলে স্যারের ভীষণ ব্রিদিং প্রবলেম হত। আর যখন খুব টেনশান বাড়ত...বুঝতেই পারছেন, কোটি-কোটি টাকার বিজনেস, টেনশান তো থাকবেই...ফলে তখনই টানটা বেড়ে যেত। ওঁর সঙ্গে তো খুব ক্লোজলি কাজ করছি, তাই ব্যাপারটা জানি।'

'উনি আপনার কোলিগের মতো ছিলেন, কী বলেন?'

'কোলিগ!' সরাসরি এসিজির চোখে তাকাল রমেশ, বিষণ্ণ হেসে বলল, 'উনি আমার বস ছিলেন। সেটা উনি সবাইকে সবসময় মনে করিয়ে দিতেন—কিছুতেই আমরা ভুলতে পারতাম না যে, মিস্টার চ্যাটার্জি আমাদের ভাগ্যবিধাতা, অন্নদাতা...অবশ্য ওঁর মন বেশ উদার ছিল...কারণে-অকারণে আমাদের বাড়তি টাকাপয়সা দিতেন। কিন্তু ওই যে বললাম, ওঁর কথাই ছিল শেষ কথা—এটা কোম্পানির দারোয়ান থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাইকে উনি সমানভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আপনার ওপরে কোনও কারণে বিরক্ত হলেই চাকরি থেকে ছুটি—আপনি ওঁর কোম্পানিতে কতবছর কাজ করেছেন, কত কী স্যাক্রিফাইস করেছেন সেসব তখন আর মাথায় থাকত না।'

এসিজি বেশ অবাক হচ্ছিলেন। মেঘ না চাইতেই জল! এক্সাইট করার আগেই ইমোশন্যাল পোটেনশিয়ালের প্রদর্শনী! রমেশ শর্মার কথায় বেশ তেতো ভাব টের পাওয়া যাচ্ছিল।

'আপনাকে কখনও জবাব দিতে চেয়েছিলেন না কি?'

ঠোঁটে হাসল রমেশ। সিটের হাতলে নখের আঁচড়ে কাটতে-কাটতে বলল, 'বারদুয়েক সেরকম অবস্থা হয়েছিল। তবে কোনওরকমে বেঁচে গেছি। আমি বোধহয় খুব লাকি।'

'মিস্টার চ্যাটার্জির তা হলে তো অনেক শত্রু থাকার কথা...।'

'ওঁর বন্ধু বলেই কেউ ছিল না—শুধু দু-চারজন ছাড়া...।'

ব্রজেনের কথাটা মনে পড়ল এসিজির। তাই জিগ্যেস করলেন, 'সেই দু-চারজনের মধ্যে কি আপনি পড়েন?'

'অবশ্যই—' জোর গলায় বলল রমেশ, 'অন্তত আমি তাই মনে করি। এছাড়া ব্রজেন দাসের ওপরেও স্যার বেশ ভরসা করতেন। আর শ্রাবণী চ্যাটার্জি তো স্যারের ফ্যামিলি মেম্বার।'

'শাওনি রাঘবন?'

'ও তো বেশিদিন আসেনি। তবে ও স্যারের বেশ পছন্দের ছিল।'

আপনি তো বছরদশেক মিস্টার চ্যাটার্জির কাছে কাজ করছেন। যাকে পছন্দ করেন না তাঁর সঙ্গে এতবছর কাজ করাটা নেহাত মামুলি ব্যাপার নয়।'

'এর সঙ্গে স্যারের মার্ডারের কী কানেকশান আছে জানতে পারি?' একটু রুক্ষভাবে জানতে চাইল রমেশ।

'সেরকম ডায়রেক্ট কানেকশান কিছু নেই। শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বুঝতে চাইছি।' হাতের একটা ভঙ্গি করে বললেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তারপর 'মিস্টার চ্যাটার্জি হার্টের কোনও প্রবলেম ছিল?'

'যদ্দূর জানি, ছিল না। শ্রাবণী—মানে, মিস চ্যাটার্জি হয়তো আরও ভালো বলতে পারবেন।'

'আপনি নাকি জেম অফ আ ওয়ার্কার? এসিজি আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন ইমোশন্যাল পোটেনশিয়ালের খোঁজে।

রমেশ অবাক হয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে। চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপরে বসিয়ে বলল, 'আর য়ু মেকিং ফান অফ মি?'

'না-না মোটেই না।' হাত নেড়ে রমেশকে ম্যানেজ করলেন এসিজি 'মিস চ্যাটার্জি আপনার প্রশংসা করে এ-কথা বলেছেন।'

রমেশ চট করে নরম হয়ে গেল। বিনয়ে মাথা নামাল।

'আপনি তো পারসোনাল সেক্রেটারি, মিস্টার শর্মা—আপনার জানা উচিত। এই ট্রিপে মিস্টার চ্যাটার্জির টেনশান কেমন ছিল?'

'হাই টেনশান। তবে এটা নতুন কিছু নয়। কোটি-কোটি টাকার কারবার। সবসময়ে ওঁকে হাই টেনশনেই চলতে হত। যেমন, এই যে আমরা কলকাতা যাচ্ছিলাম...কাল সকালেই আমাদের হলদিয়া রওনা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে একটা হাই টেনশান মিটিং ছিল—আমাদের নতুন স্টিল প্ল্যান্টের প্রজেক্ট নিয়ে। এসব ওঁর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল...।'

'প্লেন ফ্লাই করার পর আপনি ওঁর বিহেভিয়ারে অ্যাবনরম্যাল কিছু নোটিস করেননি?'

'না। সেই একইরকম জেদি, একরোখা, অহঙ্কারী একজন মালটিমিলিয়নেয়ার। কলকাতায় গিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জি ছ'জনকে ছাঁটাই করবেন ঠিক করেছিলেন। কাউকে ছাঁটাই করার ব্যাপার হলে উনি করতেন কি একেবারে পাবলিক নোটিস দিয়ে আর সব স্টাফকে জানিয়ে রীতিমতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তারপর ছাঁটাইয়ের চিঠি ধরাতেন। ইউনিয়ন কিছু করতে পারত না। কারণ, টাকা দিয়ে ইউনিয়নের মুখ বন্ধ করার সহজ পথ উনি জেনে গিয়েছিলেন। বোঝেনই তো, সব ইউনিয়নই তো আর সমান নয়!'

মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিল রমেশ। তারপর বলল, 'এসব করে মিস্টার চ্যাটার্জি কেমন একটা স্যাডিস্টিক আনন্দ পেতেন। তো ব্রিফকেস খুলে-নানান কাগজপত্র দেখছিলেন আর আমার সঙ্গে মাঝেমধ্যেই এটা-সেটা ডিসকাস করছিলেন...হঠাৎ...।'

একটু থামল রমেশ, ওর চোখে কেমন একটা দ্বিধা খেলে গেল। তারপর বেশ ধীরে-ধীরে বলল, '...হঠাৎই ওঁর টান শুরু হল—ওই টেনশান থেকে ওঁর যেমন হত আর কী!'

'টান শুরু হলে মিস্টার চ্যাটার্জি কী করতেন, ওষুধ খেতেন?'

'না, ইনহেলার ব্যবহার করতেন। উনি ভাবতেন আমরা কেউ ব্যাপারটা জানি না। আসলে মিস্টার চ্যাটার্জি খুব দাম্ভিক ছিলেন—এই টাইপের লোকেরা যেমন হয় আর কী! এরকম একজন বিখ্যাত মানুষ...সে হাঁপানির টানের কাছে কাবু হয়ে পড়েছে...এটা পাবলিক জানুক তিনি চাননি। তাই টান ধরলেই উনি ইনহেলার পকেটে নিয়ে উধাও হয়ে যেতেন—দু-চারবার পাম্প নিয়ে আবার ফিরে আসতেন আমাদের কাছে। আমি সবই জানতাম, কিন্তু না জানার ভান করতাম।'

'আপনি ইনহেলারের ব্যাপারটা জানলেন কী করে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রমেশ বলল, 'ব্রজেন আমাকে একদিন কথায়-কথায় বলেছিল।'

'ব্রজেন দাস জানল কী করে?'

'ও স্যারের সবই জানত। ওকে দিয়েই তো স্যার ইনহেলার কেনাতেন। ব্রজেন আমাকে একবার নামটা বলেছিল...''বেকলেট-ফিফটি'' না কী যেন।'

'মিস্টার চ্যাটার্জি তা হলে টয়লেটে গিয়েছিলেন ইনহেলারের পাম্প নিতে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। তারপর অনেকক্ষণ ধরে উনি ফিরছেন না দেখে মিস চ্যাটার্জি এয়ারহোস্টেসকে ডেকে বলেন...।'

'উনি ফিরছেন না দেখে আপনার চিন্তা হয়নি?'

'হয়েছিল—মালিকের জন্যে একজন এমপ্লয়ির যতটুকু চিন্তা হয় ঠিক ততটুকু—তার বেশি নয়। কারণ, মদনমোহন চ্যাটার্জি যে আমার মালিক সেটা আমি কখনও ভুলতে পারতাম না। তা ছাড়া, আপনাকে তো বললাম, উনি সেটা ভুলতে দিতেন না...।'

'মিস্টার চ্যাটার্জিকে আপনি একদমই পছন্দ করতেন না...।'

মাথা নাড়ল রমেশ। এসিজির দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ব্যাপারটা পছন্দ-অপছন্দের নয়। একটা কাজ করার জন্যে উনি মাসে-মাসে আমাকে মাইনে দিতেন—আমি সেই কাজটা দিতাম, মাইনে নিতাম। এসব ব্যাপারে আমি খুব প্রফেশন্যাল।'

রমেশ শর্মাকে হঠাৎই থামিয়ে দিয়ে এসিজি রঙ্গলালকে বললেন, 'রঙ্গলালবাবু, আপনি আমাকে একটু হেলপ করুন। মিস শ্রাবণী চ্যাটার্জির কাছে একটু যান—মিস্টার চ্যাটার্জির ব্রিফকেসটা নিয়ে আসুন—বলবেন আমি চেয়েছি।'

রঙ্গলাল গোস্বামী রওনা হয়ে যেতেই রমেশ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে, মিস্টার গুপ্ত?'

এসিজি হেসে বললেন, 'প্লিজ, উত্তেজিত হবেন না, মিস্টার শর্মা। প্লেনের ক্যাপ্টেন অর্জন সুখানি আমাকে এই অথরিটি দিয়েছেন। কিলিং ইজ নট আ ম্যাটার অফ জোক। খুনিকে খুঁজে বের করতে গেলে কত কাঠখড় পোড়াতে হয় জানেন!'

রমেশ চুপ করে গেল বটে, কিন্তু উসখুস করতে লাগল।

একটু পরেই রঙ্গলাল ফিরে এলেন—হাতে বাদামি রঙের একটা ছোট ব্রিফকেস।

ওটা নিয়ে কোলের ওপরে বসালেন এসিজি। আঙুলের চাপ দিয়ে খুলতে যাবেন, রমেশ আলতো করে অনেকটা অনুরোধের ঢঙে বলল, 'মিস্টার গুপ্ত, এটা কি না খুললেই নয়?'

থেমে গেলেন এসিজি : 'কেন বলুন তো? কী আছে এতে?'

'কোম্পানির সব কনফিডেনশিয়াল কাগজপত্র...।'

হাসলেন এসিজি...'য়ু আর রিয়েলি আ জেম অফ আ ওয়ার্কার। ড্যাম ডেডিকেটেড। বাট ম্যান, উই আর ডিলিং উইথ আ কিলিং। এর গুরুত্ব আপনি কেন বুঝতে পারছেন না কে জানে!'

কথা বলতে-বলতেই ব্রিফকেস খুলে ফেললেন এসিজি, এবং ভেতরের কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন।

হঠাৎই একটা কাগজ দেখে তিনি চমকে উঠলেন। কাগজটা বের করে নিলেন। কয়েকবার চোখ বুলিয়ে রমেশ শর্মাকে দেখালেন।

'অ্যাজমার টান শুরু হওয়ার আগে মিস্টার চ্যাটার্জি কি এই কাগজটা দেখছিলেন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। হতে পারে। এরকমই কী একটা কাগজ দেখছিলেন—এর চেয়ে ডেফিনিট কিছু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

এসিজি যে-কাগজটা দেখছিলেন সেটা একটা কবিতার বইয়ের একটি পৃষ্ঠার জেরক্স কপি। সেই পৃষ্ঠায় মাইকেলের বিখ্যাত কবিতা 'আত্মবিলাপ'-এর পুরোটা এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার প্রায় অর্ধেকটা রয়েছে। আর পৃষ্ঠার মাথায় হেডিং দেওয়া আছে 'গীতিকবিতা'।

কিন্তু অশোকচন্দ্রের চমকে ওঠার কারণ অন্য। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার দুটি লাইন লাল কালি দিয়ে কেউ আন্ডারলাইন করে দিয়েছে। এবং সেই লাইন দুটি হল 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।'

'এর অর্থ কী বলতে পারেন?' এসিজি কপালে ভাঁজ ফেলে রমেশ শর্মাকে জিগ্যেস করলেন।

এমনভাবে হাসল রমেশ যেন এসিজির বোকামিতে বেশ মজা পেয়েছে। তারপর বলল, 'মিস্টার গুপ্ত, বেঙ্গলি আমার মাদার টাং নয়—আমি কী করে এই কবিতার মানে বুঝব!'

এসিজি মিথ্যের বাণ ছুড়লেন। বেশ সিরিয়াস মুখ করে বললেন, 'মিস চ্যাটার্জি বলছিলেন যে, আপনি একটু-আধটু বাংলা পড়তে পারেন...।'

চোখ পিটপিট করল রমেশ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা ইংরেজিতে ট্রানস্লেট করার চেষ্টা অবশ্যই অডাসিটি। তবে তদন্তের স্বার্থে একটা খোঁড়া তর্জমা আপনাকে করে শোনাচ্ছি : ''ইফ যু আর বর্ন, যু আর টু ডাই/ ইমমরটালিটি ইজ অ্যান ইটারনাল লাই। তো এই লাইনদুটোর তলায় লাল কালি দিয়ে কেন দাগ দেওয়া হয়েছে বলতে পারেন? এই দাগের মানেটাই আমি জানতে চাইছিলাম।''

'হতে পারে, এটা হয়তো খুনের হুমকি। মিস্টার চ্যাটার্জিকে কেউ ভয় দেখাচ্ছিল।'

'একজ্যাক্টলি! কিন্তু কে ওঁকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল?'

'আপনি কি ভাবছেন আমি?' রুক্ষভাবে পালটা প্রশ্ন করল রমেশ।

'হতে পারে।' নির্বিকারভাবে বললেন বৃদ্ধ হুনুর, 'আবার অন্য কেউও হতে পারে। ওঁর তো শত্রুর অভাব ছিল না!'

রমেশ বাঁকাচোখে এসিজির দিকে একবার তাকাল শুধু—কোনও মন্তব্য করল না।

'কী করে এটা মদনমোহন চ্যাটার্জির ব্রিফকেসে গিয়ে পৌঁছল বলুন তো?'

'কী করে আবার, কেউ রেখেছে।' তাচ্ছিল্যের ঢঙে বলল রমেশ।

'হ্যাঁ, ঠিকই—কিন্তু রাখার চান্সটা তো পেতে হবে!'

'আপনি কি ইনডিরেক্টলি আমাকে অ্যাকিউজ করতে চাইছেন? ওহ ইয়েস, আই হেটেড হিম। কিন্তু সেজন্যে গলায় ফাঁসির দড়ি পরতে আমি রাজি নয়। মিস্টার চ্যাটার্জি শকুনের মতো ঠোকরাতেন বটে, কিন্তু সোনার ডিমও পাড়তেন। এরকম একজনকে সরানোর চেষ্টা করে আমার কী লাভ!'

'হুঁ...ঠিকই বলেছেন।' বিড়বিড় করে বললেন বৃদ্ধ। তিনি মনে-মনে ভাবছিলেন, লাল দাগ দেওয়া এই কবিতার পাতাটা চারজনের যে-কেউ মদনমোহন চ্যাটার্জির ব্রিফকেসে রাখতে পারে।

কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আরও একটা জিনিস পাওয়া গেল।

একটা সুন্দর রাইটিং প্যাড। তার একটা পৃষ্ঠায় বড়-বড় হরফে লেখা, ইমডিয়েট ডিসমিসাল। তার নীচে ছ'জনের নাম—নাম ঠিক নয়, নামের আদ্যক্ষর। আর পৃষ্ঠার নীচের দিকে আগামীকালের তারিখ দেওয়া।

রমেশ বেশ অস্বস্তি নিয়ে এসিজির কাজকর্ম লক্ষ করছিল। এসিজি হঠাৎই ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এই হাতের লেখাটা কার? মিস্টার চ্যাটার্জির?'

'হ্যাঁ, আপনাকে বলছিলাম না, উনি ছ-জনকে ছাঁটাই করার ডিসিশান নিয়েছিলেন। এই লিস্টটায় যেসব নাম আছে সেগুলো কিছুদিন আগেই মিস্টার চ্যাটার্জি আমাকে বলেছিলেন।'

নামের আদ্যাক্ষরগুলোর ওপরে বারবার চোখ বোলাচ্ছিলেন এসিজি। একটি নাম ছাড়া আর কোনওটাই চেনা হল না। নামটার নীচে তিনবার দাগ দেওয়া এবং পাশে লেখা : 'কালসাপ। নো পে অফ।'

সেই নামটায় আঙুল দিয়ে এসিজি রমেশকে জিগ্যেস করলেন, 'এই বি. ডি. মানে কি ব্রজেন দাস। নাকি একই ইনিশিয়ালের অন্য কোনও স্টাফ আছে?'

রমেশ শর্মার মাথা ঝুঁকে পড়ল, হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিকই ধরেছেন...ব্রজেন দাস। এই ইনিশিয়ালের আর কোনও স্টাফ নেই। খুব স্যাড ডিসিশান।'

'ব্রজেন এই ডিসিশানের কথা জানত?'

'না বোধহয়। ভুলে যাবেন না, মিস্টার গুপ্ত, আমি ছিলাম স্যারের পারসোনাল সেক্রেটারি—তাই অনেক কিছু আমি একাই জানতাম...এমনকী শ্রাবণী, মানে, মিস চ্যাটার্জিও সেগুলো জানতেন না।'

'ব্রজেন দাস জানলে পরে ওর হুমকি দেওয়ার এবং খুন করার একটা পজিটিভ মোটিভ তৈরি হতে পারে...।'

'হাউ ডু আই নো?' কাঁধ ঝাঁকাল রমেশ : 'যু আর দ্য স্লুথ।'

'আচ্ছা, ওর নামের পাশে কালসাপ কথাটা লেখা কেন?'

রমেশ শর্মা নখ খুটতে শুরু করল। বলবে-কি-বলবে না ভেবে কয়েকবার মাথা ওঠাল-নামাল। তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'চেপে রেখে লাভ নেই...আপনি পরে তো জানতেই পারবেন। ব্রজেন দাস স্যারের বিশ্বাসী লোক হয়ে ওঠার পর থেকে রেগুলার টাকা চুরি করত। এইভাবে ও কয়েকলক্ষ টাকা সরানোর পর স্যার ব্যাপারটা ধরতে পারেন। সপ্তাহদুয়েক আগে আমাকে বলেছিলেন। এটা আর কেউ জানে না। মিস চ্যাটার্জিও না।

অশোকচন্দ্রের কপালে ভাঁজ পড়ল, চোখ ছোট হয়ে গেল চিন্তায়। ওঁর চশমার কাচে আলো চকচক করছিল। রহস্যের জায়গাগুলো কি ধীরে-ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে?

একসময় ডক্টর ভবানীপ্রসাদ দে পরদার আড়াল সরিয়ে টয়লেট স্পেসের দিক থেকে বেরিয়ে এলেন। কিছু একটা দেখাবেন বলে ইশারায় এসিজিকে ডাকলেন।

এসিজি ভুরু উঁচিয়ে প্রশ্ন করতেই ডক্টর দে তৃপ্তির সুরে বললেন, 'বোধহয় খুনের কায়দাটা আমি বুঝতে পেরেছি, ডক্টর গুপ্ত। বলব, কী করে মদনমোহন চ্যাটার্জিকে টয়লেটের ভেতরে মার্ডার করা হয়েছে?'

হাসলেন বৃদ্ধ হুনুর। উঠে দাঁড়িয়ে দু-পা সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা হাত শূন্যে তুলে ডক্টর দে-কে বাধা দিলেন, 'না, আমি বলছি। ভুল হলে শুধরে দেবেন, ও. কে.? অ্যাজামার অ্যাটাক হতেই মিস্টার চ্যাটার্জি ইনহেলার নিয়ে ওই টয়লেটে গিয়ে ঢুকেছিলেন। ইনহেলারের মাউথপিস কভার খুলে ক্যানিস্টারের স্প্রে বেরোনোর দিকটা মুখে ঢুকিয়ে অভ্যাসমতো পেছনদিকটায় চাপ দিয়েছিলেন...এবং সঙ্গে-সঙ্গে গুড়ুম...!' মুখে পিস্তল ছোড়ার শব্দ করতে চাইলেন এসিজি : 'ব্যস, সব শেষ।'

হেসে কাঁধ ঝাঁকালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

আবিষ্কারের কৃতিত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভবানীপ্রসাদকে বেশ হতাশ দেখাল। অবাক হয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী করে বুঝলেন বলুন তো?' তারপর এসিজির পাশ দিয়ে রমেশ শর্মার দিকে সন্দেহের চোখে একবার তাকালেন।

রমেশ মাথা নিচু করে আঙুল খুঁটছিল, উসখুস করছিল, আর মাঝে-মাঝেই ডক্টর দে-র দিকে তাকাচ্ছিল।

ভবানীপ্রসাদ এসিজির চোখে চোখ রেখে রমেশের দিকে ইশারা করে বললেন, 'মার্ডারার কি কনফেস করেছে? সব বলে দিয়েছে আপনাকে?'

হেসে ফেললেন এসিজি, মাথা নেড়ে বলনে, 'ধুস, কী যেন বলেন!' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর : 'যাগগে, এবার বলুন দেখি, আমি ঠিক বলেছি কি না...।'

তারিফ করে মাথা নাড়লেন ভবানীপ্রসাদ : 'ঠিক বলেছেন, তবে কনফার্ম করতে গেলে ল্যাবরেটরির হেলপ দরকার। এতক্ষণ ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজে আমি ডেডবডির মুখের গর্তে বেশ কয়েক জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম আর প্লাস্টিকের পার্টিকল পেয়েছি। মনে হচ্ছে, ইনহেলারের পুশটায়...মানে, ক্যানিস্টারের পেছনটায়...চাপ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা এক্সপ্লোশান হয় এবং একটা ছোট্ট স্টিলের বুলেট এত জোরে টাকরার দিকে ছুটে যায় যে, ওটা টাকরা ফুটো করে সোজা ব্রেনে গিয়ে লাগে। আপনি গোড়াতেই যা আন্দাজ করেছিলেন—মিস্টার চ্যাটার্জি ওয়াজ কিলড ইনস্ট্যান্টলি। আর বুলেটটাকে কী কায়দায় ট্রিগার করা হয়েছে সেটা বলা একটু মুশকিল—কারণ, সেই মেকানিজমটা ওই হাই ইমপ্যাক্টে বলতে গেলে ধুলো হয়ে গেছে। সেইজন্যেই ডেডবডির শুধু মুখে আর গালে কয়েকটা ছোট-ছোট টুকরো গেঁথে ছিল...আর সেরকম কোনও এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। তবে টয়লেট কিউবিকলে অ্যালুমিনিয়াম আর প্লাস্টিকের কিছু টুকরো পাওয়া গেছে। ওঃ, এককথায় ডায়াবলিক্যাল! নৃশংস!'

রমেশ শর্মা হাঁ করে ভবানীপ্রসাদ দে-র কথা শুনছিল। ওর চোখজোড়া যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

রঙ্গলাল গোস্বামীও নিপাট কৌতূহলে দুই ডক্টরের কথাবার্তা প্রায় গিলে খাচ্ছিলেন।

এসিজি মাথার পিছনে হাত নিয়ে চুলের গোছায় বারকয়েক টান মারলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মদনমোহন চ্যাটার্জির ইনহেলার ব্যবহারের অভ্যেসের কথা খুনি অবশ্যই জানত। এও জানত, তিনি সকলের চোখের আড়ালে গিয়ে ইনহেলার ইউজ করেন। প্লেনে আড়াল বলতে এই টয়লেট। সুতরাং, খুনিকে যা করতে হয়েছিল সেটা হল মিস্টার চ্যাটার্জির ইনহেলারটাকে কোনও একফাঁকে বদলে দেওয়া—আসল ইনহেলারের বদলে ইনহেলার-বন্দুক। ব্যস, তারপর শুধু অপেক্ষা...।'

'ঘটনাটা ঘটে যেতেই আমরা ভাবলাম, বন্ধ টয়লেটের ভেতরে মদনমোহন চ্যাটার্জিকে কেউ গুলি করেছে। লকড রুম প্রবলেম—যার সমাধান মোটেই সহজ নয়। কিন্তু এখন "হাউ" বোঝার পর "হোয়াই" আর "হু" টাও বোঝা যাচ্ছে।'

রঙ্গলাল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শাবাস, এসিজি স্যার, শাবাশ! স্বভাব-কবিতায় বলতে ইচ্ছে করছে : হাউ হোয়াই হু/ হু ক্যান ডু/ এরকম খুন/ মুখ সবার চুন/ জানে শুধু এসিজি/ খুনির সব ঠিকুজি! মিস্টার চ্যাটার্জিকে কে খুন করেছে, এসিজি স্যার?'

রমেশ শর্মা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখ-চোখ লাল, হাত অল্প-অল্প কাঁপছে।

এসিজিকে লক্ষ করে রমেশ বলল, 'ডক্টর গুপ্ত, আমি বোধহয় মার্ডারারকে চিনতে পেরেছি...।'

'প্লিজ, মিস্টার শর্মা—এ-বিষয়ে একটি কথাও নয়।' প্রায় আদেশের সুরে বললেন অশোকচন্দ্র, 'আপনি সিটে ফিরে যান। আমি এখন শাওনি রাঘবনের সঙ্গে কথা বলব। দরকার হলে আপনাকে আবার ডাকব।'

রমেশ শর্মা যেন গালে একটা থাপ্পড় খেল। ওর মুখে লালচে ছোপ দেখা দিল। দু-একবার ইতস্তত করে ও হাঁটা দিল।

এসিজি রঙ্গলালবাবুকে বললেন, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর একটু পরে দিচ্ছি। সবদিক বিচার না করে হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। আপনি, প্লিজ, একটু শাওনি রাঘবনকে খবর দিন...।'

শাওনি রাঘবনের বয়েস বাইশ কি তেইশ। মাজা রং। মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। চোখে রিমলেস চশমা। চিবুকে বিউটি স্পট। সরু-সরু আঙুলে দীর্ঘ নখ—তাতে চকোলেট রঙের নেলপলিশ। ঠোঁটে একই রঙের লিপস্টিক। গায়ে কালো চুড়িদারের ওপরে গোলাপি কার্ডিগান। কানে চকচকে দুল। কপালে টিপ। চোখের দৃষ্টি গভীর—মনে হয় যেন অতলান্তিক।

এসিজির মনে হল, অসংখ্য চৌম্বক বলরেখা শাওনিকে ঘিরে রেখেছে। তার আওতায় এসে পড়লে একটা চোরাটান টের পাওয়া যাবে।

মিস্টার চ্যাটার্জির খবরটা শোনার পর শাওনি তেমন একটা মুষড়ে পড়ল না। শুধু বলল, 'হোয়াট আ ফেটফুল এন্ড। হি সার্টেইনলি ডিডন্ট ডিজার্ভ ইট।'

'মিস্টার চ্যাটার্জি' আপনাকে পছন্দ করতেন শুনলাম—।' এসিজি বললেন।

'ঠিকই শুনেছেন,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে জবাব দিল শাওনি, 'কিন্তু সেটা মিস চ্যাটার্জি পছন্দ করতেন না।'

'কেন বলুন তো?'

'উনি খুব স্ট্যাটাস কনশাস। ওঁর কথাবার্তায় চালচলনে বড়লোকের দুর্গন্ধ বেরোয়। সেইজন্যেই গরিবদের অপছন্দ করাটা ওঁর অভ্যোসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'রমেশ শর্মা বা ব্রজেন দাসের বেলাতেও তাই?'

'ব্রজেন দাসের বেলা ওঁর অ্যাটিটিউডটা সেরকম বোঝা যেত না। তবে রমেশ শর্মার বেলায় বোঝা যেত। আর জানবেন, মেয়েরা সহজে মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। আমরা চোখের নজর রিড করতে পারি। বাট রমেশ ইজ আ ভেরি নাইস চ্যাপ।'

এসিজি ইমোশন্যাল পোটেনশিয়ালের সমীকরণগুলো বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। কী বলতে চাইছে শাওনি?

'মিস্টার চ্যাটার্জি আপনাকে ঠিক কী চোখে দেখতেন? ফাদারলি অ্যাফেকশান? না কি...।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে খিলখিল করে হাসল শাওনি। জলতরঙ্গের বাজনা বেজে উঠল যেন।

'আমার কাছে কি অ্যাফেকশানের কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি মাপার যন্ত্র আছে নাকি যে, মেপে দেখব ওটা ফাদারলি, ব্রাদারলি...নাকি লাভারলি!' আবার খিলখিল করে হাসি। তারপর : 'সোজা কথা হল, মিস্টার চ্যাটার্জি ওয়াজ আ নাইস গাই। আই লাইকড হিম আ লট। আই উইল মিস হিম।'

'ওঁর হাঁপানি রোগ—মানে, অ্যাজমা ছিল জানতেন?'

'না—।'

'মিস্টার চ্যাটার্জিকে কে মার্ডার করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'দ্যাট ভেনমাস লেডি, আর কে! উনি এখন কত কোটি টাকার মালিক হলেন আপনার কোনও ধারণা আছে!'

'মালিক হিসেবে মিস্টার চ্যাটার্জি কেমন ছিলেন?'

'গুড—কোয়াইট গুড। খুব সফট হার্টেড ছিলেন। ছোটবোনকে খুব ভালোবাসতেন—মানে, ব্রাদারলি...।' আবার হাসিতে ভেঙে পড়ল শাওনি, 'লাস্ট উইকে আমাকে বলেছিলেন যে, একটা দারুণ নিউজ দেবেন। দারুণ আনন্দের খবর।'

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এসিজি : 'খবরটা কি পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী খবর?'

'শ্রাবণী চ্যাটার্জির বিয়ে—রমেশ শর্মার সঙ্গে। রমেশ খুব লাকি। ইট ওয়াজ গুড নিউজ ফর মিস চ্যাটার্জি, বাট আই থিংক ব্যাড নিউজ ফর রমেশ।'

এসিজির মুখে সামান্য অবাকভাব দেখে শাওনি বলল, 'কেন, ওরা আপনাকে বলেনি? শুনলাম তো আপনি ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছেন...।'

'আচ্ছা, মিস রাঘবন, আপনি ব্যাড নিউজ ফর রমেশ বললেন কেন?'

হাসল শাওনি : 'বিয়েটা টিকবে বলে মনে হয় না—সেইজন্যে।'

এসিজি আনমনা হয়ে চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিলেন। শাওনি 'ডক্টর গুপ্ত' বলে তিনবার ডাকার পর ওঁর হুঁশ ফিরল।

'থ্যাংক য়ু সো মাচ, মিস রাঘবন। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু য়ু।'

'কেন জানতে পারি?' চোখের কোণ দিয়ে তাকাল শাওনি।

'এখুনি জানতে পারবেন—একটু অপেক্ষা করুন।'

এসিজি উঠে দাঁড়ালেন। গল্পটা কি ঠিক-ঠিক খাড়া করা যাচ্ছে? ক্যাপ্টেনকে কি খবর দেওয়া যায় এখন?

ভবানীপ্রসাদ একটা সিটে চোখ বুজে শরীর এলিয়ে ছিলেন। এসিজি ওঁকে ডেকে বললেন, 'ডক্টর দে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

ভবানীপ্রসাদ চোখ মেলে তাকালেন।

'উঠে পড়ুন—আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে পৌঁছে গেছি। আমি ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আর মিস্টার চ্যাটার্জির বাকি সঙ্গী-সাথীদেরও ডাকছি। আর-একটু পরেই আমরা ভাইজাগে নেমে পড়ব।'

এসিজির কথা শুনে ভবানীপ্রসাদের ঘুম চটকে গেল। সাততাড়াতাড়ি মুখ-টুখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন। লজ্জা পেয়ে বললেন, 'সরি, ভীষণ টায়ার্ড লাগছিল...।'

রঙ্গলাল গোস্বামীকে দিয়ে খবর পাঠাতেই ক্যাপ্টেন সুখানি মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে চলে এলেন।

এসিজির কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, ডক্টর গুপ্ত, আর য়ু থ্রু?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন। আই থিংক দ্য গেম ইজ ওভার। আপনি কাউন্ডলি মিস্টার চ্যাটার্জির বাকি তিনজন কম্প্যানিয়ানকে ডেকে পাঠান। সকলের সামনেই তাস খুলে দেখাতে চাই আমি।'

বৃদ্ধ মুচকি-মুচকি হাসছিলেন—অনেকটা দুষ্টুমির হাসি। ক্যাপ্টেন চলে গেলেন টয়লেট স্পেসের দিকে। পরদা সরিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে। আর-একটা পরদা সরালেই ওপাশে ইকনমি ক্লাস—সেখানে সাবরিনাকে দেখতে পেলেন। ওকে ডেকে নিচু গলায় এসিজির নির্দেশটা জানিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন এসিজির কাছে ফিরে আসার মিনিটখানেকের মধ্যেই মদনমোহন চ্যাটার্জির বাকি তিনসঙ্গী এসে হাজির হল : ব্রজেন দাস, রমেশ শর্মা এবং শ্রাবণী চ্যাটার্জি।

এসিজি লক্ষ করলেন, শ্রাবণী ধারালো দৃষ্টিতে শাওনিকে একঝলক দেখলেন। রমেশও একবার তাকাল শাওনির দিকে। আর ব্রজেন দাস নির্বিকার।

এসিজির অনুরোধে সবাই বসে পড়ল। ক্যাপ্টেন সুখানি বসলেন এসিজির পাশের সিটটায়।

মাথার পিছনের সাদা চুলের গোছায় কয়েকবার টান মেরে উঠে দাঁড়ালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত, বললেন, 'এটা গোয়েন্দাকাহিনির খুব বিখ্যাত শেষ দৃশ্য। আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা প্রত্যেকে মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনবেন। যদি কোথাও আমার ভুল হয়, তা হলে দয়া করে ভুল ধরিয়ে দেবেন।'

উঠে দাঁড়ানোর ফলে এসিজি সবাইকে কম-বেশি দেখতে পাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল, ওরা এক-একটি রংবেরঙের পাখি। তার মধ্যে আসল পাখিটাকে খুঁজে বের করতে হবে। দুষ্টু পাখি।

এসিজি বলতে শুরু করলেন, 'মিস্টার মদনমোহন চ্যাটার্জিকে আপনারা সকলেই মোটামুটি জানতেন। দাম্ভিক একরোখা ক্ষুরধার বুদ্ধির বিজনেসম্যান। কাউকে কোম্পানি থেকে ছাঁটাই করতে হলে তিনি হাটে হাঁড়ি ভেঙে তারপর তাকে বরখাস্ত করতেন। আগামীকাল তিনি ছ-জনকে ছাঁটাইয়ের চিঠি ধরাবেন ঠিক করেছিলেন। এই কাগজটায় সেই ছ-জনের নাম লেখা আছে...।'

ঝুঁকে পড়ে মিস্টার চ্যাটার্জির ব্রিফকেস থেকে নামের লিস্টটা তুলে নিলেন অশোকচন্দ্র। সেইসঙ্গে মাইকেলের কবিতার জেরক্স করা পৃষ্ঠাটাও। তারপর : '...ছ-জনেরই নামের তলায় তিনবার দাগ দেওয়া এবং পাশে লেখা : ''কালসাপ। নো পে অফ।'' আমার মনে হয়...।'

ব্রজেন দাস কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'বিনা কারণে স্যার আমাকে বরখাস্ত করছিলেন। স্যারকে আমি হাতে-পায়ে ধরে অনেক রিকোয়েস্ট করেছি, কিন্তু উনি শুনতে চাননি। বলেছি, ঘরে আমার সাতবছর আর দু-বছরের দুটো বাচ্চা রয়েছে—কিন্তু স্যারকে কিছুতেই টলাতে পারিনি—।'

'সেইজন্যেই তুমি দাদাকে মার্ডার করলে!' ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন শ্রাবণী চ্যাটার্জি, 'ছোটলোকের এতবড় সাহস!'

'প্লিজ ম্যাডাম—' শ্রাবণীকে হাত তুলে ইশারা করলেন এসিজি : 'দয়া করে একটু শান্ত হোন—আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি।' এসিজি ব্রজেনের দিকে ফিরলেন : 'ব্রজেনবাবু, এই কাগজটা একবার দেখুন তো! চিনতে পারেন?'

মাইকেলের কবিতার পাতাটা ব্রজেন দাসের মুখের সামনে ধরলেন অশোকচন্দ্র। ব্রজেন দাসের মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলকে।

' ''বঙ্গভূমির প্রতি'' কবিতাটার দুটো লাইনের তলায় লাল কালিতে দাগ দিয়েছেন আপনি : ''জন্মিলে মরিতে হবে,/ অমর কে কোথায় কাবে''। এইভাবে মদনমোহন চ্যাটার্জিকে খুনের হুমকি দিয়েছেন আপনি। ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিক মদনমোহনবাবু কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, এটা আপনারই কীর্তি—তাই আপনার বরখাস্তের সিদ্ধান্তটা আরও পাকা করেছিলেন। সেটাই আপনি মেনে নিতে পারেননি। আক্ষেপের ব্যাপারটা কী জানেন? আপনি ''জন্মভূমির প্রতি'' কবিতা পড়েছেন বটে, কিন্তু ওই একই পৃষ্ঠায় ছিল আর-একটি কবিতা—''আত্ম-বিলাপ''—সেটা আপনি পড়েননি।' এসিজি আবৃত্তির ঢঙে ধীরে-ধীরে বললেন, 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়...।'

ভবানীপ্রসাদ জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু মিস্টার দাসকে স্যাক করার ডিসিশান নেওয়া হয়েছিল কেন?'

একবার রমেশ শর্মার দিকে তাকালেন এসিজি, তারপর বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জির বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ব্রজেনবাবু নিয়মিতভাবে টাকা সরাতেন। এভাবে কয়েকলক্ষ টাকা তিনি চুরি করেছিলেন...।'

'মি-মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রজেন দাস।

দূরে বসা প্যাসেঞ্জাররা বিরক্ত এবং কৌতূহলী চোখে এসিজিদের দিকে তাকালেন।

ক্যাপ্টেন সুখানি ব্রজেন দাসকে বসতে বললেন। তারপর চাপা গলায় যোগ করলেন, 'প্লিজ কন্ট্রোল ইয়োর টেম্পার। কথাবার্তা আস্তে আস্তে বলুন, নইলে অন্য প্যাসেঞ্জাররা ইরিটেটেড হবে।'

এসিজি হেসে বললেন, 'চিন্তা করার কোনও কারণ নেই, দাসবাবু, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে সেটা পুলিশ তদন্ত করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে। যখন আপনি দেখলেন, বাঁচার আর কোনও পথ নেই তখন মিস্টার চ্যাটার্জির মরার পথ বেছে নিলেন। আপনাকে উনি ভীষণ বিশ্বাস করতেন। আপনার কথায়, একবার ''ব্রজ'' বলে হাঁক দিলেই হল—আপনি সটান গিয়ে হুকুম তামিল করতে হাজির হতেন। আপনি জানতেন, মিস্টার চ্যাটার্জির অ্যাজমার প্রবলেম—উনি ইনহেলার ব্যবহার করেন। এও জানতেন, উনি সবার সামনে ইনহেলার ব্যবহার করেন না—করেন আড়ালে। প্লেনে সেই আড়াল বলতে একমাত্র টয়লেট। সুতরাং, আপনার প্ল্যান তৈরি হল। এবার দরকার মারণাস্ত্র—মার্ডার ওয়েপন।' একটু থামলেন এসিজি। তারপর বললেন, 'ব্রজেনবাবু, কর্ডলেস ফোন যে সারাতে পারে, টেপ-ডেক সারাতে পারে, এফ. এম. ট্রানজিস্টার তৈরি করতে পারে, সে একটা ইনহেলারকে অবশ্যই মারণাস্ত্রে বদলে দিতে পারবে। আপনি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, টেকনিক্যাল কাজ জানেন, আপনি কেন লোকের বাড়ি চাকরের কাজ করবেন! করবেন এই কারণে যেহেতু আপনি—আপনারই কথায়—ভাগ্য ফেরাতে চান। সত্যিই তো! নিয়মিতভাবে হাজার-হাজার টাকা চুরি করে আপনি তো ভাগ্যই ফেরাচ্ছিলেন!'

ব্রজেন দাস বসে পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। এবার ওর মাথা ঝুঁকে পড়ল। ফোঁপানির আওয়াজ শোনা গেল মুখ থেকে। তারই মাঝে ও কীসব কথা বলছিল, কিন্তু কান্নাজড়ানো কথার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

শ্রাবণী চ্যাটার্জি জিগ্যেস করলেন, 'ইনহেলারটাকে ওই শয়তানটা মার্ডার ওয়েপনে কনভার্ট করলে কী করে?'

'কাজটা কঠিন—তবে ব্রজেন দাসের মতো টেকনিশিয়ানের কাছে অবশ্যই ততটা কঠিন নয়। ইনহেলারের যে-জায়গা দিয়ে ওষুধের স্প্রেটা বেরোয় ঠিক সেই জায়গা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা স্টিলের বুলেট। মিস্টার চ্যাটার্জির বডি পোস্টমর্টেম করার সময় নিশ্চয়ই ওটা খুঁজে পাওয়া যাবে। তো ওই বুলেটটাকে নিশ্চয়ই ছিটকে দিয়েছে কোনও জোরালো স্প্রিং অথবা বারুদ। আমার খুব বিশ্বাস, ব্রজেন দাসের আস্তানা সার্চ করলে বেশ কয়েকটা খালি ইনহেলার পাওয়া যাবে—চাই কি মার্ডার ওয়েপনের একটা ডুপ্লিকেট মডেলও পাওয়া যেতে পারে। কারণ, বারকয়েক টেস্ট না করে ব্রজেন দাস এ-ঝুঁকি কিছুতেই নেবেন না—কী, ঠিক বলেছি তো, দাসবাবু?' ঠাট্টার সুরে এসিজি বললেন, 'এই হল আমার মোটামুটি গল্প।'

এসিজি থামার পর অনেকেই অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। জানতে চাইল, ঠিক কীভাবে খুনটা হয়েছে, এসিজি প্রথম কখন ব্রজেন দাসকে সন্দেহ করলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসিজি এতটুকু বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধরে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললেন।

ক্যাপ্টেন সুখানি উঠে দাঁড়িয়ে অশোকচন্দ্রের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, বললেন, 'থ্যাংকু য়ু, ডক্টর, ফর সলভিং অ্যান অ্যাপারেন্টলি ইমপসিবল ক্রাইম।'

আর সবাই ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু শ্রাবণী চ্যাটার্জি মাথা নিচু করে চোখ মুছছেন।

সকলের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে এসিজি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'একমিনিট। আপনারা কেউ যাবেন না। আমার গল্প এখনও একটু বাকি আছে।'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল বৃদ্ধ গোয়েন্দার দিকে।

শাওনি বলল, 'তার মানে!'

হাসলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত : 'তার মানে আসল খুনির নাম আমি এখনও বলিনি।'

পলকে সবাই চুপ করে গেল। কয়েক সেকেন্ড। তারপরই শুরু হল গুঞ্জন।

'আসল খুনি?' শ্রাবণী কান্না ভুলে মুখ তুলে তাকালেন।

'বলেন কী, এসিজি স্যার!' রঙ্গলাল গোস্বামী।

'ইজ দিস আ জোক?' ক্যাপ্টেন অর্জন সুখানি।

'আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, ডক্টর গুপ্ত।' ডক্টর ভবানীপ্রসাদ দে।

এসিজি বললেন, 'একটা কথা আপনারা কেউই আমার কাছে জানতে চাননি।' একটু থামলেন বৃদ্ধ হুনুর। তারপর 'ব্রজেন দাস কী করে জানলেন যে, ওঁকে ছাঁটাই করা হবে? মিস্টার চ্যাটার্জি যে-ধরনের মানুষ ছিলেন তাতে এ-কথা ব্রজেনবাবুকে তিনি কিছুতেই আগে জানাতেন না। আমার ধারণা...।'

ব্রজেন দাস চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল এসিজির দিকে।

এসিজি ওকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনাকে ছাঁটাইয়ের খবরটা কে দিয়েছিল? রমেশ শর্মা?'

ব্রজেন দাস সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

হাসলেন এসিজি, বললেন, 'অবস্থাটা আপনারা সবাই বুঝে দেখুন। ব্রজেনবাবুর চাকরি গেলে উনি যে খেপে যাবেন এটা স্বাভাবিক। তারপর মিস্টার চ্যাটার্জি ও ব্রজেন দাসের মাঝখানে থেকে ঠিকমতো একটু খেলতে পারলে ব্রজেন দাসকে দিয়ে খুনটা করানো সম্ভব। ব্রজেন দাসের খুনের অস্ত্র ছিল স্পেশাল ইনহেলার, আর রমেশ শর্মার নিখুঁত খুনের অস্ত্র ছিল ব্রজেন দাস। কিন্তু তারপর?

'তারপর তো পথ পরিষ্কার! মিস্টার চ্যাটার্জি মারা গেলে শ্রাবণী চ্যাটার্জি সবকিছুর মালিক হচ্ছেন। সুতরাং, শ্রাবণীদেবীর সঙ্গে যদি রমেশ শর্মার বিয়ে হয়—এই খবরটা শাওনি আমাকে দিয়েছেন, আর শাওনিকে খবরটা দিয়েছিলেন মদনমোহন চ্যাটার্জি নিজে—হ্যাঁ, যা বলছিলাম...বিয়েটা হয়ে গেলে রমেশ শর্মা সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক। যদি কোনও কারণে বিয়ে পরে ভেঙেও যায়, তা হলেও সম্পত্তির অনেকটা বাগিয়ে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া...।'

'য়ু ওল্ড ফুল! আপনমনে কীসব বকে চলেছেন? ক্যাপ্টেন সুখানির নির্দেশ ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রমেশ শর্মা, 'কোনও প্রমাণ আছে আপনার কাছে?' শ্রাবণীর দিকে ফিরে 'তুমি একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, শ্রাবণী। দিস ওল্ড বাগার ইজ লায়িং লাইক আ সিঙিং ক্যানারি। আই উইল—।'

এসিজি রমেশকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এখানে আমার ছাত্র ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব হাজির থাকলে আপনার কপালে অনেক দুঃখ ছিল। এনি ওয়ে, প্রমাণের কোনও দরকার নেই। দোষ স্বীকার করার পর ব্রজেন দাস যদি পুলিশকে শুধু বলে যে, এর মধ্যে আপনিও ছিলেন, তা হলেই আপনি ফেঁসে যাবেন—জাল কেটে আর বেরোতে পারবেন না। আপনার কথাবার্তা খুবই ইনটেলিজেন্ট। কায়দা করে ব্রজেন দাসের ব্যাপারে আমাকে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সব সূত্র দিয়ে গেছেন। যাতে কখনওই মনে না হয় যে, আপনি ইচ্ছে করে ব্রজেন দাসকে ফাঁসাচ্ছেন, সেজন্যে দরকারমতো অভিনয়ও করে গেছেন। হ্যাটস অফ টু য়ু, মিস্টার শর্মা!'

শ্রাবণী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, রমেশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'রমেশ, এসব কী শুনছি! তুমি...তুমি সত্যি এরকম! আমি...আমি...।'

ব্রজেন দাস হঠাৎ চেঁচিয়ে এসিজিকে লক্ষ করে বলল, 'স্যার! ডক্টর গুপ্ত! শর্মাজি আমাকে চাকরি খোয়ানোর খবর তো দিয়েছেন—এ ছাড়াও আমাকে সবসময় মিস্টার চ্যাটার্জির এগেইনস্টে ওসকাতেন। বলতেন, ''এই গোঁয়ার লোকটা আমাদের সবার সর্বনাশ করবে।'' আমি, স্যার, ওঁকে ছাড়ব না!'

এসিজি শ্রাবণীকে বললেন, 'ম্যাডাম, যদি মনে করেন, তা হলে এই বুড়ো লোকটার একটা পরামর্শ নিতে পারেন।' নিজের মাথার চুলে হাত দিলেন এসিজি : 'রমেশ শর্মাকে আপনি বিয়ে করবেন না। মিস্টার শর্মা খুব লোভী, অ্যামবিশাস এবং ধূর্ত বটে। উনি ঠিক মানুষ নন, মানুষের চেয়ে একটু কম...।'

এমনসময় কুমারমঙ্গলম এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন সুখানির কাছে। নিচু গলায় বলল, স্যার, ভাইজাগ এসে গেছে—প্লেন এখন ল্যান্ড করবে।'

ক্যাপ্টেন সুখানি সকলের মুখের ওপরে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, 'আমরা আর কয়েকমিনিটের মধ্যেই ভাইজাগে ল্যান্ড করছি। পুলিশের কাছে এখনই রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যার-যার সিটে বসে সিট-বেল্ট বেঁধে নিন। প্লিজ, মেক ইট কুইক।'

সবাই যখন চলে যাচ্ছে তখন অর্জন সুখানি এসিজিকে আর-একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'ডক্টর গুপ্ত, আই থ্যাংক য়ু এগেইন অন বিহাফ অফ ''আকাশ এয়ারলাইনস''। আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে রেডিয়ো মেসেজে সব জানাচ্ছি।'

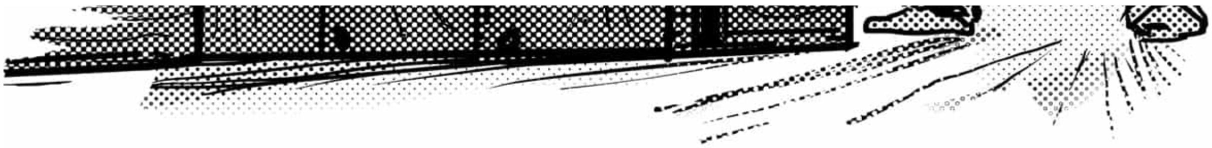
ক্যাপ্টেন চলে যাওয়ার পর রঙ্গলাল গোস্বামী গুটিগুটি পায়ে এসিজির কাছে এসে দাঁড়ালেন, চাপা গলায় বললেন, 'এসিজি স্যার, দেখা গেল আপনার প্রতিভার লাইটনিং/ আকাশপথে খুনির সঙ্গে আপনার ফাইটনিং।'

এসিজি ভুরু কুঁচকে তাকালেন কবিবরের দিকে : 'লাইটনিং না হয় বুঝলাম, রঙ্গলালবাবু, কিন্তু ফাইটনিংটা কী কেস?'

হাত কচলে বিনয়ে মাথা নোয়ালেন রঙ্গলাল, বললেন, 'ওটা কবিতার আবেগ—মানে, ভেলোসিটি, এসিজি স্যার। ফাইট শব্দটাকে নিপাতনে সিদ্ধ করে ফাইটনিং করে দিয়েছি। স্বভাব-কবিতার এটাই তো বিউটি, স্যার...।'

এক ইঞ্চির গরমিল





কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম 'এসিজি'। বয়েসকালে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করার সময় এই সংক্ষিপ্ত নামে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এখন এই নামে কেউ উল্লেখ করলে বেশ অস্বস্তি হয়। কলিংবেলের সঙ্গে-সঙ্গে সেই নামেই কেউ ডেকেছেন বাইরে থেকে 'এসিজি স্যার আছেন?'

কলিংবেল সাতসকালে বেজে ওঠা মানেই অতিথি ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব—এসিজির প্রাক্তন ছাত্র। সময় পেলেই সে চলে আসে স্যারের এই শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে। এসিজির পাখির শখ নিয়ে নানারকম কৌতূহল দেখায়। সেইসঙ্গে খুন-জখম-রাহাজানি নিয়ে বিস্তর আলোচনা।

একটু আগেই ব্রেকফাস্ট শেষ করেছেন এসিজি। তারপর এককাপ কফি খেয়ে উইলস ফিলটার ধরিয়েছেন। সকাল-সন্ধের কাজের বউ 'ললিতের মা' বাথরুমে কাপড় কাচছে—এখান থেকে জল পড়ার শব্দ আর কাপড় আছড়ানোর শব্দ দিব্যি কানে আসছে।

দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে দরজা খুলে দিয়েছেন অশোকচন্দ্র। আর সঙ্গে-সঙ্গেই শোনা গেছে অতিথির প্রশংসাবাণী : 'আমি আপনার গুণমুগ্ধ/আপনি যেন খাঁটি দুগ্ধ—।'

খাঁটি দুধের সঙ্গে তুলনা করে এসিজিকে আজ পর্যন্ত কেউ প্রশংসা করেনি। সুতরাং অতিথিকে দেখে তিনি যতটা অবাক হয়েছিলেন, তার অদ্ভুত প্রশংসায় ঠিক ততটাই বেসামাল।

কিন্তু অতিথিকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হল না। 'লালমহল'-এর রঙ্গলাল গোস্বামী—যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন এই কথা বলে : 'আমি একজন স্বভাব-কবি/কবিতায় কথা বলা আমার হবি।'

গতবছর পুজোর সময় এসিজি রঘুপতি যাদবের সঙ্গে রঙ্গলালবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন—বাগবাজার গঙ্গার ঘাটের কাছে দু-মহলা বাড়ি 'লালমহল'। সেখানে রঙ্গলালবাবুর দাদার একটা হারানো চুনি খুঁজে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার কী রহস্য দেখা দিল 'লালমহল'-এ?

সে-কথা জিগ্যেস করতে আকর্ণবিস্তৃত হেসে রঙ্গলাল বললেন, 'না, না, না—সেসব কিছু নয়/করতে এসেছি গভীর পরিচয়। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, এসিজি স্যার। শুনে আপনার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছি।'

পাছে রঙ্গলাল আবার 'খাঁটি দুগ্ধের' উপমা দেন সেই আতঙ্কে অশোকচন্দ্র তড়িঘড়ি অতিথি-সৎকারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রঙ্গলালবাবুকে ড্রইংরুমের সোফায় বসতে বলে এসিজি ললিতের মা-কে অতিথির খবর দিতে গেলেন।

একটু পরে ফিরে এসে দেখেন রঙ্গলালবাবু ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর অবাক চোখে ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছেন। অশোকচন্দ্রকে দেখেই ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'গোয়েন্দা, পক্ষিবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী/অমর, আকবর এবং অ্যান্টনি।'

হাসি চাপতে পারলেন না এসিজি। কোনওরকমে হাসি থামিয়ে জানতে চাইলেন, 'অমর, আকবর, অ্যান্টনির মানে?'

রঙ্গলাল সোফায় বসে বিনীতভাবে বললেন, 'তিনটি বিচিত্র গুণের সমাহার। আসলে আমার উপমাগুলো একটু বেশি সিম্বলিক। কিন্তু জানেন তো, কবিতায় সিম্বলের ব্যবহার একটা আর্ট।'

অশোকচন্দ্র নতুন চোখে মানুষটাকে দেখছিলেন।

শ্যামলা রং। ডানহাতের তিন আঙুলে রুপো দিয়ে বাঁধানো তিনটে পাথরের আংটি। পরনে ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। মাথায় তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুল। ছোট-ছোট উজ্জ্বল চোখ। কপালের বাঁ-দিকে একটা ছোট আঁচিল। নাকটা মাপে সামান্য বড়। দাঁড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। আর ভদ্রলোকের শরীর ঘিরে পারফিউমের হালকা সুবাস।

অন্য কেউ এরকম প্রশংসা করলে ব্যাপারটাকে চাটুকারিতা বলা যেত। কিন্তু রঙ্গলালবাবুর সবকিছুই এমন স্বাভাবিক আর আন্তরিক যে, ওঁর মুখে এ-ধরনের কথা শুনলে বেশ মজা পাওয়া যায়। তা ছাড়া, একজন

কবিকে বন্ধু হিসেবে পেলে মন্দ কী!

সোফায় বসে রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন এসিজি। সিগারেটের ধোঁয়ার রেখা ওঁর মাথার সাদা চুলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

গল্পের মাঝেই আবার বেজে উঠল কলিংবেল। ঘণ্টির ছন্দ শুনেই অশোকচন্দ্র এবার চিনে নিতে পারলেন নতুন অতিথিকে। তাই রঙ্গলালের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'রঘুপতি যাদব—।'

'হরি হে মাধব!' পাদপূরণ করলেন রঙ্গলাল। তাঁর মুখে সামান্য আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল।

দরজা খুলতেই দেখা গেল এসিজির অনুমান সঠিক। ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে—অনেকটা পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো। ওর হাতে বেশ বড় মাপের সবুজ প্লাস্টিকের কভার দেওয়া একটা ফাইল। এই মুহূর্তে ওকে যতটা না ইন্সপেক্টর তার চেয়ে ঢের বেশি ছাত্র-ছাত্র দেখাচ্ছে।

'আরে, এসো ইন্সপেক্টর সাহেব, এসো—এসো। মুখটা যেরকম বাংলার পঞ্চান্নর মতো করে রেখেছ তাতে মনে হচ্ছে পাখি নিয়ে সমস্যায় পড়েছ।'

মজা করে প্রাক্তন ছাত্র রঘুপতিকে আহ্বান জানালেন এসিজি।

রঘুপতি যাদব ঘরে ঢুকল। বয়েস চল্লিশের এপিঠে। ছোট করে ছাঁটা চুল। কাঁচাপাকা চওড়া গোঁফ। ফরসা মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। হাতের শিরা এবং পেশি দুই-ই চোখে পড়ার মতো।

রঘুপতি চাপা গলায় গজগজ করে বলল, 'আপ তো মজাক কর রহে, স্যার—লেকিন মেরা তো নিদ খরাব হো গই।'

'কেন, কেন, ঘুম শিকেয় উঠল কেন?' চোখ থেকে কার্বন ফ্রেমের চশমাটা খুলে অশোকচন্দ্র ঠাট্টার সুরেই প্রশ্ন করেছেন প্রাক্তন ছাত্রকে।

'স্রেফ এক ইঞ্চির জন্যে—' রুক্ষভাবে বলল রঘুপতি। তারপর যেন এই প্রথম দেখতে পেল রঙ্গলাল গোস্বামীকে।

রঙ্গলাল প্রায় বিগলিত হয়ে রঘুপতি যাদবকে আকর্ণবিস্তৃত হাসি উপহার দিয়ে বললেন, 'মনে পড়েছে মহললাল? আমি সেই রঙ্গলাল।'

রঘুপতি অসন্তুষ্ট চোখে তাকাল অশোকচন্দ্রের দিকে : 'কী ব্যাপার, গুপ্তাসাব? আবার কি পান্না-চুনির প্রবলেম, নাকি হাস্যকবি সন্মেলন?'

'রঘুপতি, রঘুপতি—' ওর কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলেন এসিজি। আদরের গলায় বললেন, 'তোমার মেজাজটাকে একটু ডাউন করো, প্লিজ। কর্পূরের মতো ভোলাটাইল মেজাজ নিয়ে কখনও মিস্ট্রি সলভ করা যায়! নাও বোসো—একটু কফি-টফি খাও, তারপর তোমার এক ইঞ্চির গরমিল নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।'

রঙ্গলাল গোস্বামী রঘুপতির আচরণে খানিকটা হকচকিয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। অশোকচন্দ্রের 'কফি-টফির' প্রস্তাবে গলা বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'কফি আমার প্রিয় নয়/টফি হলেই ভালো হয়—।'

রঘুপতি সোফায় বসতে গিয়ে হেসে ফেলল, দেখল রঙ্গলালের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি এই বয়েসেও টফি খান?'

রঙ্গলাল লজ্জায় মুখ নিচু করে বললেন, 'কী করব, ভালো লাগে। ভালো লাগার কি কোনও বয়েস আছে?' তারপর রঘুপতিকে সৌজন্যের নমস্কার জানিয়ে, 'আমি বাগবাজারের লালমহলের রঙ্গলাল গোস্বামী। স্যারের সঙ্গে গভীর পরিচয় করতে এসেছি—।'

এমনসময় দরজা ঠেলে ঢুকল বিশু। বছর বারো-তেরোর কিশোর। এসিজির কাছেই থাকে, ফাইফরমাশ খাটে। বিশুর হাতে পলিথিনের ক্যারিব্যাগ—তাতে ঠোঙা আর বাক্স।

এসিজি ওকে বললেন, 'ললিতের মা-কে বল দুজন গেস্ট আছে। আর কফি তিনকাপ।' তারপর রঙ্গলালকে লক্ষ করে, 'সরি, রঙ্গলালবাবু, আজ আপনাকে টফি খাওয়াতে পারলাম না। আজ কফি দিয়ে কাজ চালান—অন্য আর-একদিন টফি খাওয়াব।'

এরপর রঘুপতির সঙ্গে রঙ্গলালের 'গভীর' পরিচয় করিয়ে দিলেন এসিজি।

সব শুনে রঙ্গলাল চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ফিজিক্সের লোক, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর! এই কম্বিনেশান বড় সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর।'

এসিজি হেসে বললেন, 'আবার অমর, আকবর, অ্যান্টনি—কী বলুন!'

রঘুপতি অবাক হয়ে তাকাল স্যারের দিকে 'অমর, আকবর, অ্যান্টনি মানে? আপনি আজকাল হিন্দি পিকচার-টিকচার দেখছেন নাকি, গুপ্তাসাব?'

এসিজি আবার হাসলেন। চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে বললেন, 'ও এক মজার ব্যাপার—তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেব। এবারে তোমার এক ইঞ্চির গরমিলের গল্পটা বলো—।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। ওঁর চোখ বুজে এল। বোঝা গেল, 'থিঙ্কিং মেশিন' নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে।

সোফায় বসে ফাইলটা ঠিক পাশেই রেখেছিল রঘুপতি। সেটা হাতে তুলে নিয়ে খুলতে-খুলতে বলল, 'গুপ্তাসাব, ব্যাপারটা ঠিক সুইসাইড নয়—তবে সুইসাইডের মতো—।'

এসিজি চোখ খুললেন। রঙ্গলাল গোস্বামীকে লক্ষ করে বললেন,

'রঙ্গলালবাবু, এবার একটু খুন-জখমের গল্প শুনুন। আপনি কবি মানুষ, এসব গল্পে হয়তো বোর হয়ে যাবেন...তবু—।'

দু-হাত তুলে এসিজিকে থামিয়ে দিলেন রঙ্গলাল, খানিকটা সুর করে বললেন, 'রঘুপতি যাদব এবং আপনি/ তৎসহ কিঞ্চিৎ খুন কিংবা খুনি/ সুগভীর পরিচয়ের অঙ্গ বলে মানি/ ইন্টারেস্ট তীব্র মম শুনিতে কাহিনি।' স্বভাব-কবিতা শেষ করে বিনয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে আকর্ণবিস্তৃত হাসলেন রঙ্গলাল।

অশোকচন্দ্র পালটা হেসে রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, তুমি ননস্টপ তোমার কাহিনি বলে যাও। আমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছি। খুঁটিনাটি কিচ্ছু বাদ দেবে না।'

রঘুপতি বলতে শুরু করল, 'ওই যে বললাম, ব্যাপারটা ঠিক সুইসাইড নয়—সুইসাইডের মতো। কেসটা প্রথম এসেছিল মানিকতলা থানায়—সুইসাইডের কেস হিসেবে। ব্যাপারটা বেশ স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ছিল। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ধুতি বেঁধে খুদকুশি। কিন্তু পরে দেখা গেল, সবকুছ ঠিকঠাক হ্যায়, লেকিন সিরফ এক ইঞ্চির গরমিল। আর সুইসাইড নোটেও থোড়াবহত গড়বড় আছে।'

এরপর রঘুপতি যাদব ওর জগাখিচুড়ি ভাষায় যা বলে গেল তা মোটামুটি এই। ব্যাপারটা হয়েছে দিন কুড়ি আগে, লালাবাগানে—মানিকতলা থানা এলাকায়। গুরুদাস কলেজের বাংলার অধ্যাপক ডক্টর রণতোষ দত্ত আত্মহত্যা করেছেন। ভদ্রলোকের বয়েস চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন মতো হবে। সুন্দর, লম্বা, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান চেহারা ছিল—তবে কে জানে কেন বিয়ে-থা করেননি। দোতলা বাড়ির ছাদের একটা ঘরে দিনরাত বইপত্র নিয়ে ডুবে থাকতেন। সেই ঘরেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন—সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ধুতি বেঁধে। প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা ঠিকই ছিল, কিন্তু পরে একটা গরমিল দেখা দেয়। বাড়িতে আরও লোকজন থাকেন। একতলায় একঘর ভাড়াটে। আর দোতলায় থাকেন রণতোষবাবুর ভাই পরিতোষ দত্ত, ভাইয়ের স্ত্রী অন্তরা দত্ত আর ওঁদের একটা বছর চারেকের মেয়ে টুসি। বাড়ির মালিক পরিতোষ দত্ত আর রণতোষ দত্ত। ওঁদের বাবা বছর কুড়ি আগে মারা গেছেন। তবে এই ঘটনার পর এখন মালিক পরিতোষ দত্ত। পরিতোষবাবু স্টেটব্যাঙ্কের বউবাজার ব্রাঞ্চে চাকরি করেন—বেশ ভালো পোস্টেই। ভদ্রলোকের চাকরির রেকর্ড একদম পরিষ্কার—কোনও গন্ডগোল নেই।

'রঘুপতি রঘুপতি—' হাত তুলে রঘুপতিকে থামতে ইশারা করলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত : 'তোমাকে তো বহুবার বলেছি, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। তুমি এত তাড়াহুড়ো করে গল্পটা বোলো না—গাড়ির স্পিড একটু স্লো করো। এবার বলো দেখি, রণতোষবাবুর সুইসাইডে

গন্ডগোলটা কোথায়, আর সুইসাইড নোটের কেসটাই বা কী? তারপর পরিতোষবাবুর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট শুনব।'

রঘুপতি যাদব ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রণতোষ দত্তের বডিটা সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছিল। আর তাঁর বডির ঠিক নীচেই মেঝেতে উলটে পড়ে ছিল একটা চেয়ার। মানিকতলা থানার এ. এস. আই. মজুমদার কেসটা ইনভেস্টিগেট করছিলেন—প্রথমে তিনি ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। পরে মাপজোখ করে পতা চলা কে হ্যাঙিং বডি আর ওই চেয়ারের মধ্যে এক ইঞ্চি মতো ফাঁক থেকে যাচ্ছে। লেকিন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট একদম ও. কে.—ক্লিন সুইসাইড বাই হ্যাঙিং—মানে, সেরকম হলে যেরকম হয় আর কী। তবে স্টমাকে সামান্য একটু ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি প্রশ্ন করলেন, 'রণতোষ দত্ত ধুতি পরতেন।'

'হ্যাঁ—'

এমনসময় বিশু ট্রে-তে করে খাবার-দাবার আর কফি নিয়ে এসে টি-টেবিলে রাখল।

এসিজির অনুরোধে রঙ্গলাল আর রঘুপতি খেতে শুরু করল। এসিজি নিজে কফির কাপ তুলে নিলেন। কফিতে চুমুক দিয়ে মাথার সাদা চুলের গোছা ধরে টান মারলেন কয়েকবার।

রঘুপতি ফাইলের একটা পৃষ্ঠায় চোখ রেখে খেতে-খেতে জড়ানো গলায় বলল, 'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা বলছে তাতে সন্দেহ হওয়ার কোনও কারণ নেই। সিক্সথ সার্ভিকাল ভার্টিব্রা মেডালা, পন্স, আর মিডব্রেইনে গিয়ে হিট করেছে। নতিজা রেসপিরেশন আর কার্ডিয়াক ফাংশানের ভাইটাল কন্ট্রোল সেন্টার ড্যামেজ হয়ে ডেথ—।'

কফিতে বারতিনেক লম্বা চুমুক দিয়ে অশোকচন্দ্র বললেন, 'বুঝেছি। কিন্তু তুমি সুইসাইড নোটের কথা কী যেন বলছিলে—।'

ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করে কফি শুরু করেছে রঘুপতি। কফির কাপ টেবিলে রেখে ফাইল থেকে একটা চিরকুট বের করে এগিয়ে দিল এসিজির দিকে : 'দেখিয়ে গুপ্তাসাব, ইয়ে রহা আপকা সুইসাইড নোট।'

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন এসিজি। তারপর প্রাক্তন ছাত্রের হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে ভালো করে দেখলেন। রণতোষ দত্তের লেখা সুইসাইড নোট। রুলটানা কাগজে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে লেখা।

> *'কোনও ব্যক্তির আত্মার সর্বনাশ হওয়া কেমন ভয়ানক ও গুরুতর বিষয়, তাহা বলা অসাধ্য; কিন্তু ধিক ২! মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিয়ম জানিয়াও মনে করে, যদ্যপি আমরা পাপ করি, তথাপি তিনি দয়ালু হইয়া পরলোকে আমাদিগকে অবশ্য ভালো স্থান দিবেন।'*
>
> *—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*

এটাকে কি সুইসাইড নোট বলা যায়? সিগারেটে গভীর টান দিলেন এসিজি। এরকম পুরোনো ধাঁচের বাংলায় কি কেউ সুইসাইড নোট লেখে! তা ছাড়া, শেষে ওই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ব্যাপারটাই বা কী? এটা কোনও লেখা থেকে কোট করা হয়নি তো!

সেটা রঘুপতিকে জিগ্যেস করতেই ও বলে উঠল, 'আমরা ইনভেস্টিগেট করে দেখেছি, স্যার। এটা পুরোনো একটা স্টোরি থেকে নেওয়া—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—রাইটারের নাম হানা ক্যাথেনিন ম্যালেন্স। বাংলার প্রফেসররা এসবের খোঁজখবর রাখেন।'

কাগজটা দেখতে-দেখতে মাথার সাদা চুলের গোছা ধরে টান মারলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত! আনমনাভাবেই বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, রঘুপতি, সুইসাইড নোটটা যেন কেমন-কেমন। তা ছাড়া, কাগজটা কোনও বড় পৃষ্ঠা থেকে সাবধানে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। যদি রণতোষবাবু এই অদ্ভুত সুইসাইড

নোটের ব্যবস্থা করে গিয়ে থাকেন, তা হলে বলতে হয়, তাঁর আত্মার সর্বনাশ হয়েছিল, তিনি কোনও একটা পাপ কাজ করে সেই অনুতাপে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এখানে আর-একটা খটকা লাগছে : 'যে-ভদ্রলোক অনায়াসে নিজের পাপ স্বীকার করেন তাঁর পক্ষে স্পষ্ট সুইসাইড নোট লিখতে অসুবিধে কোথায়!'

'ঠিকই বলেছেন স্যার—' গম্ভীরভাবে সায় দিল রঘুপতি যাদব, 'ওই সুইসাইড নোট আর এক ইঞ্চির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা থোড়াসা মুসিবতে পড়ে গেছি। রণতোষবাবু মহল্লায় বেশ পপুলার আদমি ছিলেন। তো এসব কী করে জানাজানি হয়ে গিয়ে লোকাল থানায় পাবলিকের প্রেসার এসেছে। তাতে এই কেস ঘুরেফিরে এখন আমার হাতে—।'

'আর তুমি সেই রিলে রেসের লাঠিটা এখন আমার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছ!' বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

রঘুপতি না হেসে সিরিয়াস মুখে বলল, 'আপ জো ভি সমঝে, গুপ্তাসাব, এই কেস আপনাকে সেটল করতে হবে—নো আদার অলটারনেটিভ।'

এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'তা হলে চলো, স্পটে একবার যাওয়া যাক। জায়গাটা কোথায় যেন বললে, লালাবাগান?'

'হ্যাঁ। আমি একবার ওখানে ঘুরে এসেছি। তার রিপোর্ট এই ফাইলেই আছে। যু ক্যান গো থ্রু ইট। এখন বলুন, আপনি কবে যেতে পারবেন—।'

ভুরু উঁচিয়ে চোখ কপালে তুললেন অশোকচন্দ্র কবে মানে! আজ—এখনই! তোমার কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'আমার অসুবিধে! এটাই এখন আমার সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট। আপনি তা হলে রেডি হয়ে নিন, নীচে আমার গাড়ি আছে।'

রঙ্গলাল গোস্বামী এতক্ষণে মুখ খুললেন, এসিজিকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'আপনার তদন্তরসে হব কি বঞ্চিত/লালাবাগানে রঙ্গলাল সঙ্গী অবাঞ্ছিত?'

রঙ্গলালের কাব্যের সুড়সুড়িতে এসিজি হেসে ফেললেন, বললেন, 'ছি, ছি, কী যে বলেন! আপনি সঙ্গী হলে আমাদের দারুণ ভালো লাগবে।'

তৈরি হয়ে ওঁরা তিনজনে নেমে এলেন রাস্তায়। তারপর উঠে পড়লেন রঘুপতির নিয়ে আসা গাড়িতে।

কোনও-কোনও সৌন্দর্য এমন হয় যা পুরুষকে স্থবির করে দেয়। তার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। সে সেই সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ হতে চায়, তাকে অপলকে দেখতে চায়, স্পর্শ করতে চায়—তার মাঝেই সবরকম পাওয়া পূর্ণ হয়।

একতলার একফালি বারান্দায় মেয়েটিকে দেখার পর অশোকচন্দ্র গুপ্তের সেইরকমই মনে হল।

বয়েস সাতাশ/আটাশ, সুঠাম শরীর, ফরসা রং, মাথায় ঘন কালো চুল। নাকের ডানপাশে—ঠোঁটের কাছাকাছি একটা স্পষ্ট তিল। চোখের রং সামান্য কটা। শরীরে বাড়তি মেদের আভাস। সিঁথিতে সিঁদুরের কোনও রেখা নেই।

এসিজির পিছন থেকে রঘুপতি যাদব চাপা গলায় বলল, 'সুমিতা নিয়োগী। রণতোষবাবুদের ভাড়াটে। ওঁর হাজব্যান্ড বছরতিনেক আগে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। একটা বছর আটেকের লেড়কি আছে—নাম বকুল। এ ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন—।'

পুরোনো বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে অশোকচন্দ্র রঘুপতির চাপা গলার ধারাবিবরণী শুনছিলেন। ও সুমিতা নিয়োগী, তার শ্বশুর জলধর নিয়োগী, শাশুড়ি পারুল নিয়োগী সম্পর্কে টুকরো-টুকরো খবর বলছিল।

অবশ্য তথ্যগুলো এতই সাদামাটা যে, সেগুলোকে ঠিক খবর বলা যায় না।

সুমিতার স্বামী শশধর নিউ আলিপুরে একটা প্রাইভেট ফার্মে স্টোর অফিসারের চাকরি করতেন। খুব সরল-সোজা মানুষ ছিলেন। সুমিতার সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে । সুমিতার বাপের বাড়ি বাগনান। সেখানকার অবস্থা তেমন একটা সচ্ছল নয়। শশধর প্রায়ই ওদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। অবশ্য বাবা-মাকে লুকিয়ে।

দোতলায় উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে এসিজি রঘুপতিকে জিগ্যেস করলেন, 'এত হাঁড়ির খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?'

রঘুপতি বলল, 'সুমিতা নিয়োগীর সঙ্গে আলাদা কথা বলেছি। আর শশধরবাবুর দফতরে খোঁজ নিয়েছিলেন মানিকতলা থানার অফিসার মজুমদার।'

রঙ্গলাল গোস্বামী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তবে বেশ কৌতূহল নিয়ে চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছিলেন, আর কান পেতে এসিজি ও রঘুপতির কথাবার্তা শুনছিলেন। ওঁর মুখে একটা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাব ফুটে উঠেছিল।

দোতলায় পৌঁছতেই তিনি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জীর্ণ বাড়ির অজীর্ণ রোগ/বাড়ির গন্ধে মৃত্যুযোগ—।'

অশোকচন্দ্র একবার রঙ্গলালবাবুর দিকে শুধু দেখলেন, কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, রঙ্গলালবাবুর কথা বুঝি একেবারে মিথ্যে নয়। বাড়িটা যে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, বাড়িটায় ঢোকার পর থেকেই কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ তাঁর নাকে আসছে। গন্ধটার মধ্যে সাবান অথবা ডিটারজেন্টের গন্ধের ধরন আছে।

ওঁদের তিনজনকে প্রথম দেখতে পেলেন অন্তরা দত্ত। একটু মোটাসেটা গিন্নি-গিন্নি চেহারা। চোখে বুদ্ধির ছাপ। মহিলা বোধহয় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আর-একটা ঘরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তিনজন অতিথিকে দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রঘুপতি যাদবকে চিনতে পেরে মুখে একচিলতে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

'মিসেস দত্ত, রণতোষবাবুর সুইসাইডের ব্যাপারে আমরা একটু বাতচিত করতে এসেছি। ইনি আমার স্যার, ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত। আর ইনি মিস্টার রঙ্গলাল গোস্বামী—পোয়েট।'

রঙ্গলালবাবু ঘাড় হেলিয়ে বিনীত হেসে বললেন, 'পোয়েট নয়, ন্যাচারাল পোয়েট। মানে, স্বভাব-কবি।'

অন্তরা দত্ত শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ওঁদের ভেতরে আসতে বললেন। ছিমছামভাবে সাজানো ছোট মাপের বসবার ঘরে ওঁদের বসিয়ে মিসেস দত্ত চলে গেলেন। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন পরিতোষ দত্ত। লম্বা রোগাটে চেহারা। চোখে চশমা। রং মাঝারি। কপালে কয়েকটা ভাঁজ।

পরিতোষ দত্ত যে চেষ্টা করে বিরক্তির ভাব লুকিয়ে রেখেছেন সেটা বুঝতে এসিজির কোনও অসুবিধে হল না। পোশাক দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক অফিসে বেরোচ্ছেন।

'কী ব্যাপার, ইন্সপেক্টর যাদব, দাদার সুইসাইডের ইনভেস্টিগেশান এখনও শেষ হয়নি! আমি এখন অফিসে বেরোচ্ছি—।'

রঘুপতি যাদব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর চোয়ালের রেখা দেখে কিছুটা বিপদ আঁচ করেছিলেন অশোকচন্দ্র। তাঁর অনুমান মিথ্যে হল না।

পরিতোষ দত্তর চোখে সরাসরি তাকিয়ে রঘুপতি বলল, 'আপনি আজ অফিসে যাচ্ছেন না, পরিতোষবাবু। আর আপনার বড়া ভাই সুইসাইড করেননি—মে বি ইট ওয়াজ মার্ডার।'

পরিতোষ দত্তর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলকে। আর তখনই দেখা গেল, দরজার পরদার পাশটিতে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছেন অন্তরা দত্ত। ওঁর মুখেও এখন রক্তের অভাব।'

'মার্ডার!' পরিতোষবাবু ভীষণ চমকে গেলেন। হতবুদ্ধিভাবে তিনজনের দিকে পালা করে দেখলেন : 'কেন, আপনারাই তো বললেন, ব্যাপারটা প্লেন সুইসাইড!' একটু থেমে ইতস্তত করে তারপর : 'তা ছাড়া, আমরা তো জানি, দাদা বেশ ক'দিন ধরে ডিপ্রেশানে ভুগছিল।'

'আপনি এত এক্সাইটেড হয়ে পড়ছেন কেন জানি না, মিস্টার দত্ত—' শক্ত গলায় বলল রঘুপতি, 'ইনভেস্টিগেশান করার সময় আমাদের যা-যা মনে হয়েছে বলেছি। লেকিন কে আপনাকে বলল যে, ইনভেস্টিগেশান খতম হয়েছে!' পরিতোষ দত্তর হাত ধরে একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে দিল রঘুপতি 'আইয়ে, বয়েঠ যাইয়ে। আমার স্যার আপনার সঙ্গে থোড়াবহত বাতচিত করবেন।'

স্কুল ছুটির পরে জোর করে আটকে রাখা ছাত্রের মতো গোমড়া মুখ করে পরিতোষ দত্ত একটা চেয়ারে বসলেন। সন্দিহান চোখে তাকিয়ে রইলেন শুভ্রকেশ হুনুরের দিকে।

অশোকচন্দ্র শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন, হেসে বললেন, 'আমি এক হুনুর, এখানে হুনুরি, মানে, গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি। ইন্সপেক্টর যাদব কলেজ-জীবনে আমার ছাত্র ছিল—।'

রঘুপতি বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'এখনও তাই।'

রঙ্গলাল গোস্বামীর সঙ্গেও পরিতোষ দত্তর পরিচয় করিয়ে দিলেন এসিজি। তারপর গলা তুলে বললেন, 'মিসেস দত্ত, আপনি ভেতরে আসুন। আপনি এখানে এসে বসলে আমাদের কাজের কোনও অসুবিধে হবে না।'

অন্তরা দত্ত একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। তারপর কুণ্ঠিত পায়ে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন। ভদ্রমহিলার মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। পরনে সামান্য অগোছালো ছাপা শাড়ি। বোঝা যায়, রান্নাবান্নার কাজে সাময়িক ইস্তফা দিয়ে কৌতূহল মেটাতে চলে এসেছেন এ-ঘরে।

স্ত্রীকে দেখে পরিতোষ দত্ত যেন অকূল পাথারে খড়কুটো খুঁজে পেলেন। সাততাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'দ্যাখো না, এনারা এখন বলছেন দাদা আত্মহত্যা করেনি, ব্যাপারটা খুনও হতে পারে...।'

অন্তরা দত্ত বেশ শান্ত গলায় বললেন, 'খুন হোক আর আত্মহত্যা হোক, যে-মানুষটা চলে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না।'

এসিজি বেশ অবাক হয়ে অন্তরাকে দেখলেন। ওঁর চেহারার সঙ্গে এই ধীর স্থির মন্তব্য যেন একেবারেই বেমানান।

অন্তরা এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, 'আমাদের যা-যা বলার পুলিশকে বহুবার বলেছি। নতুন কিছু আর বলার নেই। তবু যদি কিছু আপনাদের জিগ্যেস করার থাকে তা হলে বলুন...।'

ক'দিন ধরে বেশ গুমোট চলছে। আকাশে মেঘ আছে, কখনও-কখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছে। কিন্তু থার্মোমিটারের পারা তাতে নড়ছে বলে মনে হয় না।

ছোট্ট ঘরটার একজোড়া জানলা দিয়ে আকাশ দেখা না গেলেও তার চেহারা-চরিত্র স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছিল। ঘরের সিলিং ফ্যানের ব্লেডগুলো ক্রমাগত ঘুরপথে ছুটে-ছুটে এখন যেন হাঁফাচ্ছে। সেইসঙ্গে সামান্য ক্যাঁচকোঁচ শব্দও তুলছে।

এসিজি স্বামী-স্ত্রীকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন।

পরিতোষ দত্ত বেশ সচকিত। সাপের ঝাঁপির ডালা আচমকা খুললে সাপ যেরকম সতর্ক হয়ে যায়। অথচ অন্তরা দত্ত অবিচলিত—অন্তত দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একেই বোধহয় পরিভাষায় বলে 'কুল-কাস্টমার।'

'রণতোষবাবু আপনাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করতেন?' অন্তরাকে লক্ষ করে প্রথম প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন এসিজি।

'হ্যাঁ। আমার হাতের রান্না দাদা খুব পছন্দ করতেন।'

'মারা যাওয়ার আগে বেশ ক'দিন ধরে উনি ডিপ্রেশানে ভুগছিলেন শুনলাম। এর কারণ কিছু আঁচ করতে পারেন?'

পরিতোষ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁকে বাধা দিয়ে অন্তরা বললেন, 'সেরকম কিছু না। তবে দাদা ইদানীং পাপ, শাস্তি, মৃত্যু—এসব নিয়ে খুব পড়াশোনা করছিলেন...।'

অশোকচন্দ্র আড়চোখে রঘুপতির দিকে তাকালেন।

পরিতোষ দত্ত আলতো গলায় বললেন, 'দাদা এমনিতে খুব ইমোশনাল ছিল। যে-কোনও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভীষণ সিরিয়াসলি ভাবত।'

'উনি বিয়ে করেননি কেন?'

'সংসারের নানান কর্তব্য করতে গিয়ে নিজের বিয়েটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি।'

পরিতোষ দত্তর উত্তর শুনে অশোকচন্দ্র গুপ্ত তেমন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। শাকের আড়ালে কোথায় যেন মাছের গন্ধ পেলেন। এও লক্ষ করলেন, অন্তরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন—চোখে শাসনের ভ্রূকুটি।

এসিজি মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। কার্বন ফ্রেমের চশমাটাকে নেড়েচেড়ে ঠিক করে বসালেন। তারপর অন্তরার থেকে সৌজন্য অনুমতি নিয়ে নতুন একটা উইলস ফিলটার ধরালেন।

ধোঁয়া ছেড়ে বহুক্ষণ ধরে পরিতোষ দত্তকে দেখলেন এসিজি। সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এমন নার্ভাস মানুষ। রণতোষ দত্তর চেয়ে প্রায় আঠারো-বিশ বছরের ছোট। কিন্তু স্বাস্থ্যের হাল এমনই যে, ওঁর পক্ষে দাদার ওপরে শারীরিক জোর খাটানো অসম্ভব। যদি না কেউ ওঁকে সাহায্য করে থাকে। তা ছাড়া, এখানে আসার পথে রঘুপতি যা বলেছে তাতে মৃতদেহে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। শুধু পাকস্থলীতে সামান্য পরিমাণে ভ্যালিয়াম পাওয়া গেছে। রণতোষ দত্ত যদি সত্যি-সত্যিই খুন হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে বোধহয় আগে থেকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কাবু করে ফেলা হয়েছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'রণতোষবাবুর সঙ্গে কারও কোনও প্রেম—মানে, অ্যাফেয়ার ছিল?'

'এর সঙ্গে সুইসাইডের সম্পর্ক কী?' হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গিয়েই পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন পরিতোষ। তারপর চকিতে একবার তাকালেন অন্তরার দিকে।

অন্তরা চোখ নামিয়ে ফেলেছিলেন।

রঘুপতি অধৈর্য হয়ে বলল, 'ইনভেস্টিগেশান আপ কর রহে হ্যায় ইয়া হম! স্যার যা জানতে চাইছেন তার সহি জবাব দিন—।'

রঙ্গলাল গোস্বামী কপালে ভাঁজ ফেলে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ওঁর মুখের গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাবটা এখনও যায়নি।

একটু ইতস্তত করে অন্তরা দত্ত বললেন, 'দাদার একটা—ইয়ে ব্যাপার ছিল। এটা প্লিজ পাঁচকান করবেন না—ওঁর সুনাম নষ্ট হবে।' কিছুক্ষণ সময় নিলেন অন্তরা। তারপর : 'বছরচারেক আগে দাদার সঙ্গে ওঁর এক ছাত্রীর একটা অ্যাফেয়ার হয়েছিল। ছাত্রীটি ম্যারেড ছিল—তাই একটু-একটু স্ক্যান্ডালও হয়েছিল। মেয়েটি পরে কলকাতার পাট চুকিয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যায়। তখন দাদা খুব শকড হয়েছিলেন—ডিপ্রেশানে ভুগেছিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়...।'

এসিজি স্বামী-স্ত্রীকে লক্ষ করছিলেন।

কখনও কোনও শক পেলে তার জন্য চারবছর পর কেউ সুইসাইড করে না। তা হলে কি রঘুপতির 'মার্ডার' থিয়োরিটাই সত্যি!

এরপর আরও কিছুক্ষণ ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর এসিজি বললেন, 'রঘুপতি, চলো, এবার আসল জায়গায় যাওয়া যাক। রণতোষবাবুর ঘরটা আমি ভালো করে একবার দেখতে চাই।'

দত্ত দম্পত্তির অনুমতি নিয়ে ওঁরা তিনজনে ছাদের দিকে রওনা হলেন।

অগোছালো বই আর কাগজপত্রের স্তূপের কথা বাদ দিলে বলতে হয় ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো।

ছাদের দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে ঘরটা দাঁড়িয়ে। ছাদে উঠে কোনাকুনি চলে যেতে হয় ছাদের অপর প্রান্তে। সেখানেই কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অকুস্থল। একুশ দিন আগে এখানেই ঘটে গেছে দুঃখের ঘটনা।

ঘরের সিলিং বেশ নিচু। সেখান থেকেই ঝুলছে চকোলেট রঙের সিলিং ফ্যান। ঘরের বাঁ-দিক ঘেঁষে মামুলি বিছানা। আর ডানদিকে লেখাপড়ার টেবিল আর একটা চেয়ার। ঘরের দু-দেওয়ালে ছোট মাপের একজোড়া করে জানলা।

বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকায় ঘরে কেমন একটা গুমোট ভাব ছিল। তা ছাড়া সর্বত্র ধুলো ছড়িয়ে আছে। রঘুপতি নাক সামান্য কুঁচকে টেবিলের দিকের জানলা দুটো খুলে দিল।

রঙ্গলালবাবু আলতো গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এসিজি স্যার, আমি কি বিছানায় আসন গ্রহণ করতে পারি?'

এসিজি ঘরটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। রঙ্গলালের প্রশ্নে সামান্য চমকে উঠে বললেন, হ্যাঁ, পারেন—এবং ওখানেই বসে থাকবেন, নইলে আমাদের কাজের অসুবিধা হবে। রঘুপতির দিকে তাকিয়ে : 'ওটাই সেই চেয়ার?'

'হ্যাঁ, গুপ্তাসাব—ওয়ান অ্যান্ড ওনলি চেয়ার।'

এ-কথা শুনে বৃদ্ধ হুনুর তৎপরভাবে চলে গেলেন চেয়ারটার কাছে। ওটা তুলে নিয়ে এসে রাখলেন সিলিং ফ্যানের ঠিক নীচে। তারপর জ্বলন্ত সিগারেট হাতেই উঠে পড়লেন চেয়ারের ওপরে।

মাথা তুলে সিলিং ফ্যানটাকে একবার দেখলেন এসিজি, তারপর হাত বাড়ালেন তার দিকে।

এসিজির হাত ফ্যানে পৌঁছে গেল, কিন্তু তার ডাউন রড পর্যন্ত পৌঁছল না—খানিকটা ফাঁক থেকে গেল।

রঘুপতি বলল, 'রণতোষ দত্ত প্রায় আপনার মতোই লম্বা ছিলেন—পাঁচ-আট।'

ঘরের একমাত্র পাখা বন্ধ থাকায় ওঁরা তিনজনেই দরদর করে ঘামছিলেন। রঙ্গলালবাবু ডানহাতের চেটো নেড়ে নিজেকে বাতাস করার চেষ্টা করছিলেন।

এসিজি চেয়ার থেকে নেমে পড়ে রঘুপতিকে বললেন, 'পাখাটা চালিয়ে দাও—।'

সিলিং ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। অশোকচন্দ্র তার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মাথার ভেতরে নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর তাঁর নজর হেঁটে বেড়াচ্ছিল ঘরের সর্বত্র।

চারিদিকে শুধু বই আর বই। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাতা এবং কাগজপত্র। ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা বাংলা ও একটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার। একটা খাটো টুলের ওপরে বসানো চোদ্দো ইঞ্চি সাদা-কালো টিভি। তার পাশেই মেঝেতে সাদা রঙের জলের জগ।

ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে একটা মাঝারি মাপের আয়না। তার নীচের তাকে চিরুনি, ক্রিম, পাউডার আর ওষুধপত্র। তার পাশে দেওয়ালের হুক থেকে ঝুলছে বেশ কয়েকটা ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জি-লুঙ্গি।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এসিজি হাতের সিগারেট শেষ করলেন। তারপর আনমনাভাবে এগিয়ে গেলেন টেবিলের কাছে। টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিলেন।

মাথার চুলের গোছায় কয়েকবার টান মেরে বৃদ্ধ হুনুর এবার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করলেন।

তারই মাঝে রঘুপতিকে জিগ্যেস করলেন, 'ওঁর কোনও ডায়েরি-টায়েরি পাওয়া যায়নি?'

'না—।' নির্লিপ্ত গলার জবাব দিল রঘুপতি।

রণতোষ দত্ত মানুষটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। রঘুপতির ফাইলে অধ্যাপক দত্তের ছবি দেখেছেন তিনি। নীচের বসবার ঘরে তাঁর দেওয়ালে-টাঙানো ফটোও দেখেছেন—ফটোয় ফুলের

মালা দেওয়া। এখন ফুলের মালাটাকে গলার ফাঁস বলে মনে হচ্ছিল।

গাড়িতে করে এখানে আসার পথে রঘুপতির দেওয়া ধারাবিবরণী এসিজির মনে পড়ছিল।

ঘটনার দিন সকালে রণতোষবাবুর চা দিতে গিয়ে অন্তরা দত্ত মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। তখন প্রায় আটটা বাজে। তিনি ছুটে এসে স্বামীকে দুর্ঘটনার কথা জানাতেই ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়। পরিতোষবাবু সঙ্গে-সঙ্গে মানিকতলা থানায় ফোন করে খবর দেন। ওঁদের এই বিপদের সময় একতলায় ভাড়াটেরাও পাশে এসে দাঁড়ান। বিশেষ করে সুমিতা তো পরিবারের একজন হয়ে প্রতিটি কাজে অন্তরাকে সাহায্য করেছেন।

রণতোষ দত্তর ব্যাপারটা যদি সত্যিই খুন হয় তা হলে কার-কার উদ্দেশ্য এবং সুযোগ থাকতে পারে সেটাই এসিজি মনে-মনে খতিয়ে দেখছিলেন। কিন্তু বারবারই তাঁর হিসেব হোঁচট খাচ্ছিল।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে গভীর টান দিলেন অশোকচন্দ্র। তাঁর মাথা—যাকে তিনি 'থিঙ্কিং মেশিন' বলেন—কি বিগড়ে গেল! সুইসাইড, না মার্ডার? খুন, না আত্মহত্যা?

হাতড়াতে-হাতড়াতে হঠাৎই কতকগুলো কাগজ খুঁজে পেলেন এসিজি। প্রথম কাগজটার মাথায় শিরোনাম লেখা : পাপ ও মৃত্যু।

তারপর পাতার পর পাতা শুধু বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি টোকা রয়েছে। বিখ্যাত-বিখ্যাত মানুষের মৃত্যুর বিষয়ে মন্তব্য—ছোট-বড়, ইংরেজি-বাংলা নানারকম। তারই মধ্যে জন মিলটনের লেখা একটা ইংরেজি লাইন দেখতে পেলেন এসিজি :

‘Death is the golden key that opens the palace of eternity.’

তার নীচে বাংলা তর্জমাও চোখে পড়ল 'মৃত্যু হল সোনার চাবি—যা দিয়ে অনন্তের প্রাসাদের দরজা খুলে যায়।'

প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই রণতোষবাবুর হতে লেখা বেশ কিছু মন্তব্য এসিজি লক্ষ করলেন। একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় বড়-বড় হরফে লেখা : 'মৃত্যু যদি স্বর্গ হয়, জীবন তা হলে নরক। আমি মানুষ বলেই আমার অন্তরে পাপ আছে।'

পৃষ্ঠাগুলো প্রথম থেকে পরপর দেখছিলেন অশোকচন্দ্র। সাধারণ রুলটানা দিস্তে কাগজে লেখা। প্রত্যেক পাতায় পৃষ্ঠার সংখ্যা বসানো।

সুইসাইড নোটটা যে একই ধরনের কাগজে লেখা সেটা এসিজির বেশ মনে ছিল। হঠাৎই একটা ব্যাপার লক্ষ করে তিনি চমকে উঠলেন। পাতাগুলোর মধ্যে দু-নম্বর পৃষ্ঠাটা নেই!

সাদা চুলের গোছায় আলতো করে টান মারলেন এসিজি। তাঁর থিঙ্কিং মেশিনের চাকা বনবন করে ঘুরতে শুরু করল।

মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য। রুলটানা কাগজ। বলপয়েন্ট পেন। সুইসাইড নোট। পাপ ও মৃত্যু।

রণতোষ দত্ত কি কোনও কারণে পাপবোধে কাবু হয়ে পড়েছিলেন? সেইজন্যেই পাপ ও মৃত্যু নিয়ে এতসব কথা ভাবছিলেন? নাকি তিনি নেহাতই পড়াশোনা বা গবেষণার তাগিদে মৃত্যু সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য সংগ্রহ করছিলেন?

আনমনাভাবে সিগারেট টানতে-টানতে চেয়ারটার কাছে চলে এলেন বৃদ্ধ হুনুর। বিড়বিড় করে বললেন, 'মৃত্যু যদি স্বর্গ হয়, জীবন তা হলে নরক...' তারপর চেয়ারে বসে পড়লেন।

মৃত্যু সকলের অপছন্দের, অথচ মৃত্যু অনিবার্য। তাই মৃত্যুকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কতরকম মহিমাই না তার ওপরে আরোপ করেছেন দার্শনিক ও সাহিত্যিকরা! মৃত্যু হল সোনার চাবি! মৃত্যু হল স্বর্গ!

এসিজি মাথা নাড়লেন। না, মৃত্যু অতি জঘন্য, মৃত্যু অত্যন্ত কুৎসিত। বিশেষ করে অস্বাভাবিক মৃত্যু।

মাথা তুলে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকালেন এসিজি। তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, রণতোষ দত্তর কঠোর সুপুরুষ শরীরটা সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে। কোন এক অলৌকিক বাতাসে শরীরটা সামান্য দুলছে। তাঁর পায়ের চেটো অল্পের জন্য এসিজিকে স্পর্শ করছে না।

দরজায় শব্দ হতেই ঘোর ভাঙল এসিজির।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন পরিতোষ দত্ত। তাঁর চোখেমুখে অপ্রস্তুত বিব্রত ভাব। কিন্তু তার সঙ্গে সামান্য কৌতূহলও যে মিশে আছে, সেটা এসিজির নজর এড়াল না।

ঘরের চারপাশে ঝটিতি একপ্রস্থ নজর চালিয়ে নিয়ে পরিতোষ বললেন, 'ভাবলাম... একবার... ইয়ে... দাদার ঘরটা ঘুরে আসি। আপনাদের ইনভেস্টিগেশানে...ইয়ে...ডিসটার্ব করলাম না তো?'

পরিতোষ দত্তর আচমকা হাজির হওয়াটা এসিজি তেমন পছন্দ করেননি। হাতের সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে পরিতোষবাবুর দিকে সরাসরি না তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ভাড়াটের সঙ্গে আপনাদের কেস চলছে?'

পরিতোষ দত্ত স্পষ্ট চমকে উঠলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমতা-আমতা করলেন, কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'না, কেস ঠিক নয়...সবে উকিলের সঙ্গে একটু কথা-টথা বলেছি। আসলে আমাদের ঘরগুলো ভীষণ ছোট-ছোট। তা ছাড়া, অন্তরা...ইয়ে...আমার ওয়াইফ বলছিল একতলাটায় একটা সেলাইয়ের স্কুল খুলবে। ওর সেলাইয়ের হাত খুব ভালো...।'

এসিজি আপনমনেই হেসে ফেললেন। অঙ্কটা যে কত সহজ এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

পরিতোষকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'আপনি যান, আপনার ওয়াইফকে গিয়ে বলুন, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এক্ষুনি আমরা নীচে নামছি।'

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে পরিতোষ চলে গেলেন।

এসিজি এবার রঘুপতিকে লক্ষ করে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু আন্দাজ করতে পারলে, রঘুপতি?'

রঘুপতি যাদবের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। বোধহয় ও কিছু একটা ভাবছিল। অশোকচন্দ্রের প্রশ্নে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল : 'কী, স্যার?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধ হুনুর। হাতের ছোট হয়ে আসা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে চলে গেলেন টেবিলের কাছে। সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর হেসে বললেন, 'আমাদের তদন্ত কেমন চলছে সেটা দেখার জন্যে অন্তরা দত্ত বোধহয় স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন। আর দাদা মারা যাওয়ার পর পরিতোষবাবু বাড়ির মালিক হওয়ামাত্রই ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করার জন্যে কেস করার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। সেটা কার পরামর্শে তা তো আন্দাজ করতেই পারছ—।'

'সব বাড়িওয়ালাই তো টেনান্টের এগেইনস্টে কেস করে—' রঘুপতি সাদামাঠা গলায় বলল।

এসিজি বিড়বিড় করে বললেন, 'সেরকম হলে তো প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল ছিল। কিন্ত সুমিতা নিয়োগীকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে ব্যাপারটা বোধহয় ততটা প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল নয়—।'

রঙ্গলাল গোস্বামী ছোট্ট করে মন্তব্য করলেন, 'একে তো যুবতী তায় এক্সট্রিম সুন্দরী/তাঁকে ঘিরে জমে উঠবে স্যারের হুনুরি।'

কথায়-কথায় জানা গেল, জলধর নিয়োগী দশ বছর হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। কিন্তু মানুষটিকে দেখে তা বোঝায় উপায় নেই। লম্বা, শক্ত কাঠামো। মাথায় টাক পড়েছে। তাকে ঘিরে কাঁচাপাকা চুল। দু-কানেও খানিকটা করে চুল। চোখে কালো ফ্রেমের সাধারণ চশমা। তবে চামড়ার ভাঁজ খুঁটিয়ে দেখলে বয়সের আঁচ করা যায়।

এসিজি জলধর নিয়োগীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। তাঁর ডানপাশে বসা রঙ্গলালবাবু ঘরের ছাদের দিকে মুখ তুলে আনমনাভাবে কিছু একটা আওড়াচ্ছিলেন। তাঁর চায়ের কাপ অনেকক্ষণ আগেই শেষ।

কথাবার্তার সময় সুমিতা দু-একবার ঘরে ঢুকেছিল। কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে ছিল অশোকচন্দ্রের দিকে। তারপর আবার চলে গেছে ঘর থেকে। ওর বছর দশেকের মেয়ে বকুল একবার চলে এসেছিল 'দাদুর' কাছে। সুমিতা 'পড়া শেষ হয়নি এখনও—পড়তে চলো' বলে স্নেহের ধমক দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে।

ঘরটা ছোট মাপের। চেহারায় নিম্ন মধ্যবিত্ত, মলিন। একপাশে ছাপা চাদরে ঢাকা বিছানা। তার পাশে ট্রাঙ্ক, আলনা, ঠাকুরের আসন। সেখান থেকেই বোধহয় হালকা ধূপের গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। জলধরবাবু বিছানায় বসেছেন। অশোকচন্দ্র আর রঙ্গলাল নড়বড়ে চেয়ারে। সামনে যথেষ্ট মেরামত করা একটা টেবিল।

জলধরবাবুর সঙ্গে সহজ-সরল গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন অশোকচন্দ্র। সেই গল্প করতে-করতেই কীভাবে যেন অধ্যাপক রণতোষ দত্তর কথা এসে পড়েছিল।

'দারুণ মানুষ ছিলেন। চাকরিজীবনে বহু লোক চরিয়েছি। লোক চিনি। অন্তরটা বড় পরিষ্কার ছিল।' থেমে-থেমে স্মৃতিচারণের সুরে কথাগুলো বললেন জলধর নিয়োগী। ওঁর চোখ সামান্য ঘোলাটে লাগছিল। কথা থামিয়ে পরনের লুঙ্গি আর হাফহাতা সাদা ফতুয়া টেনেটুনে ঠিকঠাক করলেন। তারপর এসিজির দিকে তাকালেন।

স্থির চোখে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে জলধরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এইরকম একটা মানুষ—হঠাৎ কেন সুইসাইড করল বলুন তো?'

এসিজি হাসলেন। মাথার পিছনে হাত চালিয়ে সাদা চুলোর গোছায় বারদুয়েক টান মেরে বললেন, 'সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তো আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি—।'

'বিরক্ত হওয়ার কী আছে।' বৃদ্ধ মানুষটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন 'কেউ সুইসাইড করলে তার তো একটা কারণ নিশ্চয়ই থাকবে। যদি না অবশ্য অন্য কিছু হয়। আপনার কী মনে হচ্ছে?'

সময় নিতে একটা সিগারেট ধরালেন এসিজি। তারপ লাইটার পকেটে রেখে ঠোঁটে সিগারেট নিয়েই বললেন, 'মনে হওয়ার ব্যাপারটা এখনও ঝাপসা, মিস্টার নিয়োগী—।'

কিন্তু সতিই কি ঝাপসা? রণতোষ দত্ত মানুষটা কি একটু-একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে না? ছবিটা যখন পুরোপুরি স্পষ্ট হবে তখন বোঝা যাবে মানুষটা কেন মারা গেল, কীভাবে মারা গেল। সুইসাইড না মার্ডার?

গত দু-দিন ধরে রঘুপতি যাদবের দেওয়া কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখেছেন এসিজি। প্রতিটি কাগজের প্রতিটি অক্ষর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। তারপরই মনে হয়েছে, বছর পঞ্চান্নর এক সুদর্শন অধ্যাপককে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। অকৃতদার, কর্তব্যপরায়ণ, ভালোমানুষ। কিন্তু মানুষটার মুখটা এখনও অস্পষ্ট, আর চোখ দুটো ঝাপসা।

এসিজি রঘুপতিকে বলেছিলেন, তিনি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চান। রঘুপতি তাতে হেসে বলেছে, স্যার যত খুশি কথা বলুন, ওর আপত্তি নেই। ওর শুধু অঙ্কের উত্তর চাই।

অতএব তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা অশোকচন্দ্র এসে হাজির হয়েছেন লালাবাগানের এই জীর্ণ বাড়িতে। সঙ্গে রঙ্গলাল গোস্বামী। রঙ্গলালবাবুর শখ হয়েছে এসিজির মতো 'প্রতিভাবান' গোয়েন্দার কার্যকলাপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো পর্যবেক্ষণ করবেন। তাই পর্যবেক্ষণের এই সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি।

কিছুক্ষণ একমনে সিগারেটে টান দিলেন এসিজি। তারপর হঠাৎই বৃদ্ধ মানুষটিকে প্রশ্ন করলেন, 'রণতোষবাবুর ভাই পরিতোষবাবু কীরকম লোক?'

বড় মাপের একটা নিশ্বাস ফেললেন জলধর নিয়োগী, তারপর বললেন, 'এমনিতে বোধহয় তেমন খারাপ লোক নন। দোষের মধ্যে বউয়ের কথায় চলেন। দাদার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথা কাটাকাটি হত।'

'কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হত?' শান্ত গলায় জিগ্যেস করলেন অশোকচন্দ্র।

ঠোঁট ওলটালেন জলধর নিয়োগী : 'ঠিক কী নিয়ে তা জানি না। তবে কথাবার্তার মধ্যে ব্যাঙ্ক, টাকাপয়সা, লোন—এসব শুনতাম।'

'আপনাদের বাড়িভাড়ার টাকা কে নিত?'

'প্রথম-প্রথম আমিই দিয়ে আসতাম। রণতোষবাবুর কাছে। বছর দশেক হল আমি গেঁটে বাতে ভুগি। তাই পরের দিকে খোকা—মানে, শশধর দিয়ে আসত—' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধের বুক ঠেলে : 'ও—ইয়ে—চলে যাওয়ার পর থেকে বউমা—মানে, সুমিতা দিয়ে আসে।'

'কাকে? রণতোষবাবুকে?'

'কখনও-কখনও বড়ভাইকে দিয়ে আসত। কখনও ছোটভাইকে। কখনও বা ছোটভাইয়ের বউকে—।'

'বাড়িওয়ালা হিসেবে এঁরা কেমন?'

ফতুয়ার ভেতরে হাত চালিয়ে গায়ে হাত ঘষলেন জলধর, বললেন, 'রণতোষবাবু তো দারুণ মানুষ ছিলেন। খোকা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর থেকে আমাদের জন্যে কী না করেছেন! খোকার অফিসে দৌড়োদৌড়ি করা, ই এস আই অফিসে যাওয়া, এল আই সি, প্রভিডেন্ট ফান্ড—সব ব্যাপারে আমাদের হেল্প করেছেন। সেইজন্যেই তো সংসারটা ভেসে যায়নি। তা ছাড়া, খোকা মারা যাওয়ার পর বাড়িভাড়া সাড়ে চারশো থেকে তিনশো করে দিয়েছিলেন। আজকের যুগে এরকম ভাবা যায়?'

এসিজির কাছে রণতোষ দত্তর মুখটা একটু-একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল। তিনি আচমকা একটা অপ্রীতিকর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন বৃদ্ধের দিকে : 'যদি শোনেন পরিতোষবাবু ভাড়াটে উচ্ছেদ করার জন্যে কেস করার তোড়জোড় শুরু করেছেন, তা হলে আপনার কেমন লাগবে?'

'অবাক লাগবে না। এটাই তো নিয়ম। পারুলকে বলেছি। সুমিতাকেও আমার সন্দেহের কথা বলেছি। দিনদশেক আগে পাড়ার মাদার ডেয়ারির দোকানে খবরটা পেলাম। যাকগে, যা হয় হবে...।'

এসিজি ভাগ্যনির্ভর বৃদ্ধকে দেখছিলেন। দেবতা, ধূপ আর ভাগ্য কখনও দুর্ঘটনাকে রুখতে পারে না।

রঙ্গলাল গোস্বামী বোধহয় অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। কারণ তিনি বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। একফাঁকে এসিজির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'এনাকে নিয়ে অনেক হল, এবার ক্ষান্ত দিন/ তেনাকে ডেকে করুন শুরু, জবানবন্দী নিন।'

অশোকচন্দ্র হাসি চেপে জলধরবাবুকে লক্ষ করে বললেন, 'যদি আপনি অনুমতি দেন তা হলে আপনার বউমা সুমিতাদেবীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

জলধরবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎই যেন চমকে উঠে বললেন, 'ওহ, হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি—।'

উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ট্রাঙ্কের ওপরে রাখা একটা তোবড়ানো সস্তা অ্যাশট্রে তুলে নিয়ে এলেন বৃদ্ধ। সেটা এসিজির সামনে টেবিলে নামিয়ে রেখে বিড়বিড় করে বললেন, 'খোকা খুব সিগারেট খেত...।'

অভিনয় শেষ করে মঞ্চ ছেড়ে বৃদ্ধ অভিনেতা যেমন সহজ ছন্দে উইংসের দিকে এগিয়ে যায়, কথাটা বলে ঠিক সেইভাবে নিষ্ক্রান্ত হলেন জলধর নিয়োগী।

পাশের কোনও বাড়িতে সময়ের ঘণ্টা বাজছিল। অশোকচন্দ্র ঘণ্টা গুনলেন আটটা। তারপর সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতেই সুমিতা এসে ঘরে ঢুকল।

পরনে ওর আটপৌরে ছাপা শাড়ি। কিন্তু সেও যেন কালি লেপে সূর্যদেবতাকে মলিন করার মিথ্যে চেষ্টা। সুমিতার রূপ উষ্ণ তরঙ্গের মতো ঘরের পরিমণ্ডলে জায়গা করে নিল। এ যেন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অমোঘ ভ্রমণ। অশোকচন্দ্রের মনে পড়ে গেল জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের কথা।

'আমাকে ডেকেছেন?'

আড়চোখে রঙ্গলালকে দেখলেন বৃদ্ধ হুনুর। স্বভাবকবি মানুষটি স্তব্ধ বিস্ময়ে অপলকে সুমিতাকে দেখছেন।

সুমিতা বিছানার এককোণে সঙ্কুচিতভাবে বসল।

অশোকচন্দ্র ইতস্তত করে আলতো স্বরে বললেন, 'সবই তো জানেন। আপনাকে বিরক্ত করতে খুবই খারাপ লাগছে। রণতোষবাবুর ব্যাপারেই কয়েকটা কথা বলব...।'

'বলুন—।'

'আপনি ওঁকে কীরকম চিনতেন?'

'ভালো করেই চিনতাম।' সঙ্কোচহীন গলায় উত্তর দিল সুমিতা, 'ওরকম ভালোমানুষ ক'জন হয়! উনি চলে যাওয়াতে আমাদের সবার খুব ক্ষতি হয়ে গেল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামল সুমিতা। তারপর ভুরু কুঁচকে এসিজির দিকে তাকিয়ে হঠাৎই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ওঁর সুইসাইড নিয়ে এতদিন পর আবার খোঁজ করছেন কেন?'

অশোকচন্দ্র কী যেন ভাবলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় জবাব দিলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে ব্যাপারটা সুইসাইড নয়, মার্ডার।'

সুমিতার ফরসা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখ চঞ্চল হয়ে ওকে উদভ্রান্তের মতো দেখাল।

'খুন! অসম্ভব! রণতোষবাবু খুন হতেই পারেন না। ওঁর কোনও শত্রু ছিল না। দেবতার মতো মানুষ ছিলেন। ওঁকে প্রত্যেকে ভালোবাসত—।'

শেষ শব্দটা এসিজির কানে বাজল। দেবতার প্রতি মানুষের ভালোবাসা! সুমিতাকে সামান্য খোঁচা দেওয়ার জন্যই তিনি বললেন, 'ভালোবাসলে কি আর খুন করা যায় না!'

সুমিতা মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'হয়তো যায়। আপনি খুন-জখম-রাহাজানি অনেক দেখেছেন। আপনি ভালো জানবেন। তবে রণতোষবাবুর বেলায় এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।'

সুমিতাকে একটু সহজ হওয়ার সময় দিয়ে এসিজি প্রশ্ন করলেন, 'মাঝে-মাঝে বাড়িভাড়া দিতে যাওয়া ছাড়া আপনার সঙ্গে ওঁর আর কোনও কথা হত না?'

'কেন হবে না! আমার—আমার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর উনি সব ব্যাপারে হেলপ করেছেন। বাবা কিংবা আমি ওসব পেরে উঠতাম না। সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন লিখে দেওয়া, ফর্ম ফিল-আপ করা, দৌড়োদৌড়ি করা—সব রণতোষবাবু করেছেন। কোনওরকম ধকল আমাদের টের পেতে দেননি—'

'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি। কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট আছে—এটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না...।'

সুমিতা মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আলোচনা করার আমার আমার কে-ইবা আছে! আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।'

'শুনেছি বছর-চারেক আগে রণতোষবাবুর সঙ্গে তাঁর এক ছাত্রীর একটা অ্যাফেয়ার হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে একটু-আধটু স্ক্যান্ডালও হয়—' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর এসিজি বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?'

সুমিতা মুখ নিচু করল। ওর চোয়াল শক্ত হল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'না, জানি না। তবে তার সঙ্গে রণতোষবাবুর সুইসাইডের সম্পর্ক কী?'

'না, সেরকম কিছু নয়। আমার মনে হচ্ছিল উনি বোধহয় খুব আবেগপ্রবণ মানুষ।'

'আবেগপ্রবণ হওয়াটা কি অপরাধ?' এসিজির চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রশ্ন করল সুমিতা।

'না, অপরাধ কেন হবে?' হাসলেন অশোকচন্দ্র।

'আসলে গন্ডগোলটা কোথায় জানেন?' সপ্রতিভভাবে বলে উঠল সুমিতা, 'কোনও একটা অ্যাফেয়ার হলেই পুরুষদের দোষটা সকলের আগে চোখে পড়ে। এ-ব্যাপারেও মনে হয়, রণতোষবাবুকে অনেকে দোষী ভাবছে, আর ছাত্রীটিকে নির্দোষ। কে জানে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুমিতা : 'যার-যার বিচার তার-তার কাছে...'

সুমিতা নিয়োগীকে এখন আর মোটেই অসহায় বিধবা মনে হচ্ছিল না। ওর সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের একটা আভা ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটিকে ক্রমশই ভালো লাগছিল এসিজির।

আর কিছু বলে ওঠার আগেই ঘরে এসে ঢুকল বকুল। ফরসা রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, কটা চোখ—একেবারে মায়ের মতো হয়েছে।

বকুল ঘরে ঢুকেই মায়ের কাছে গিয়ে বায়নার সুরে বলল, 'আমার পড়া হয়ে গেছে। এখন ওই ম্যাজিকটা আলমারি থেকে বের করে দাও—।'

এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'কী ম্যাজিক, মা-মণি?'

বকুল চটপট জবাব দিল, 'দুটো প্যাঁচ খাওয়া পেরেকের ম্যাজিক।'

এসিজি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নাড়াচাড়া করে পেরেক দুটোকে আলাদা করতে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ—' মাকে ছেড়ে এসিজির দিকে দু-পা এগিয়ে এল বকুল। চোখ বড় করে জিগ্যেস করল, 'তুমি কী করে জানলে?'

অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, 'আমি অনেক ম্যাজিক জানি। এখুনি তোমাকে একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছি। তুমি আমাকে দু-গ্লাস জল এনে দাও।'

'দু-গ্লাস জল কেন?' অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল বকুল।

'একগ্লাস খাব, আর-একগ্লাস জল দিয়ে ম্যাজিক দেখাব।'

'আমি নিয়ে আসছি—' বলে সুমিতা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল জল নিয়ে আসতে।

দু-গ্লাস জল এসে পড়ল একটু পরেই। এসিজি একটা গ্লাস তুলে নিয়ে সেটার জল দ্বিতীয় গ্লাসে খানিকটা ঢেলে দিলেন। তাতে দ্বিতীয় গ্লাসটা কানায় কানায় ভরতি হল। তখন প্রথম গ্লাসের জল ঢকঢক করে খেয়ে নিলেন তিনি। তারপর একটু দম নিয়ে সুমিতাকে বললেন, 'একটা পুরোনো পোস্টকার্ড দিতে পারেন?'

সুমিতা একটা পোস্টকার্ড খুঁজে এনে দিল।

পোস্টকার্ডটা টইটম্বুর গ্লাসের ওপর চেপে বসিয়ে দিলেন এসিজি। তাতে গ্লাসের মুখটা ঢাকা পড়ে গেল। তখন পোস্টকার্ড সমেত জল ভরতি গ্লাসটাকে সাবধানে ধরে সেটাকে উলটে দিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে নীচের হাতটা সরিয়ে নিলেন। পোস্টকার্ড ঢাকা দেওয়া গ্লাস-ভরতি জল দিব্যি স্থির হয়ে রইল।

এ-দৃশ্য দেখে বকুল খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল।

এসিজি গ্লাসটা আবার সাবধানে সোজা করে রেখে দিলেন টেবিলে।

বকুল এবার চলে এল এসিজির কাছে। আবদার করে বলল, 'আমাকে এর সিক্রেটটা শিখিয়ে দাও—।'

এসিজি ওকে বুঝিয়ে বললেন, বাতাসের চাপ পোস্টকার্ডে চাপ দিয়ে একগ্লাস জলকে কীভাবে সহজে ধরে রাখতে পারে।

বকুল অবাক বিস্ময়ে বৃদ্ধের কথা শুনছিল।

ওকে বোঝানো শেষ করে অশোকচন্দ্র বললেন, 'আমি আরও অনেক ম্যাজিক জানি। তোমাকে সেগুলোর সিক্রেট শিখিয়ে দেব পরে।'

বকুলের গাল টিপে আদর করে অশোকচন্দ্র উঠে পড়লেন। সুমিতাকে বললেন, 'চলি, মিসেস নিয়োগী। আমাকে হেলপ করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এসিজির কথায় ছোট্ট করে হেসে বলল, 'আপনার সামান্য ক'টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি—একে হেলপ বলে না।'

অশোকচন্দ্র কয়েক সেকেন্ড কী ভেবে বললেন, 'আচ্ছা পরিতোষ দত্ত, অন্তরা দত্ত কেমন মানুষ বলুন তো—।'

সুমিতার মুখটা পালটে গেল। নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় নিল, তারপর চোয়াল শক্ত করে বলল, 'মানুষ? আচার-আচরণ দেখে তো মনে হয় না।'

বকুল শাড়ি ধরে ওকে বিরক্ত করছিল। সুমিতা আলতো ধমক দিয়ে মেয়েকে বলল, 'ভেতরে যাও—।'

মেয়েটা একটা জলের গ্লাস আর ভিজে পোস্টকার্ড নিয়ে চলে গেল ভেতরে।

এসিজি একাগ্র ছাত্রের মতো সুমিতার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সুমিতা বলল, 'ভদ্রমহিলা তো প্রায়ই নোংরা ভাষায় চিৎকার করে ঝগড়া করেন। কখনও কাজের বউয়ের সঙ্গে, কখনও স্বামীর সঙ্গে, আর কখনও বা ভাসুরের সঙ্গেও ঝগড়া করতেন। অবশ্য এগুলোকে ঠিক ঝগড়া বলা যায় না, কারণ ব্যাপারগুলো সবসময়েই একতরফা হত। রণতোষবাবু এ নিয়ে আমার কাছে বারকয়েক আক্ষেপও করেছেন।'

'পরিতোষবাবু স্ত্রীকে কখনও বারণ করতেন না?'

'না, ওঁর পক্ষে বারণ করা সম্ভব নয়। সে-ক্ষমতা ওঁর নেই—।'

বিষণ্ণ হাসল সুমিতা : 'ওঁদের সঙ্গে কথা বললেই আপনি সব বুঝতে

পারবেন।' কী খেয়াল হতেই ও আরও বলল, 'আপনি তো ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন—।'

'হ্যাঁ, বলেছি...' চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন এসিজি, 'আবারও বলব।'

রঙ্গলালবাবু অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলেন কিছু একটা বলার জন্য। এখন সুযোগ পেয়ে বলে বসলেন, 'রণতোষবাবু যদি সুইসাইড করে থাকেন তা হলে তার কারণ কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

সুমিতার মুখটা হঠাৎ পালটে গেল। মাথা নিচু করে চোখের কোণ টিপল কয়েকবার। যখন মুখ তুলল তখন ফরসা মুখ খানিকটা লালচে, থমথমে। একটু সময় নিয়ে ও বলল, 'কী জানি, জানি না...' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আরও যোগ করল, 'ওঁর কাছে যেটা যথেষ্ট কারণ বলে মনে হয়েছে সেটা হয়তো অন্য কারও কাছে কোনও কারণই নয়। সুইসাইডটা হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে...।'

'আর মার্ডার হলে?' অশোকচন্দ্র জানতে চাইলেন।

'তা হলেও একই কথা বলব। ওঁকে খুন করারও কোনও যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে না।'

একটু ভাবলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তারপর বললেন, 'রাত বাড়ছে। এবার চলি, মিসেস নিয়োগী। পরে আবার দেখা হবে।'

রঙ্গলাল গোস্বামী সুমিতাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, তা হলে এবার যাই। খুনির যেন দেখা পাই।'

ভাঙাচোরা আলো-আঁধারি অলিপথে পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন দু-জনে।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,

'রঙ্গলালবাবু, খুনির দেখা পাওয়া খুব সহজ নয় বলে মনে হচ্ছে। আর-একদিন এসে অন্তরা দত্তর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

রঙ্গলালবাবু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'রবীন্দ্রনাথের আইডিয়ার ওপরে বেস করে দু-লাইনের একটা ছোট্ট কবিতা শোনাব?'

এসিজি পালটা হেসে বললেন, 'শোনান। আমি বারণ করলে কি আপনি ক্ষান্ত হবেন!'

গলাখাঁকারি দিয়ে রঙ্গলাল বললেন, 'স্যার, আপনার কথার মানে অনেকটা এইরকম। সহজে খুনি ধরতে আমায় কহ যে/খুনি কখনও দেয় না ধরা সহজে।'

'সাধু! সাধু!' শান্তিনিকেতনী ঢঙে স্বভাব-কবিকে বাহবা দিলেন অশোকচন্দ্র।

জানলা দিয়ে বিকেলের আলো দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত ভাবছিলেন, এখনই যদি ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে তা হলে কেমন হয়। অথচ এখনও সন্ধে হতে অনেক দেরি।

রণতোষ দত্তর জীবনে অতর্কিতে সন্ধে নেমে এসেছে। সেই সন্ধের আঁধারে এসিজি পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। অন্তরা দত্তের শেষ কথাটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিল।

রঙ্গলাল গোস্বামীকে সঙ্গী করে বিকেল-বিকেল দত্তবাড়িতে চলে এসেছেন এসিজি। পরিতোষ দত্ত এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। অন্তরার মেয়ে টুসি বোধহয় ভেতরে কোথাও রয়েছে। কলতলার দিক থেকে বাসন মাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

অন্তরা চা-বিস্কুট দিয়ে এসিজি ও রঙ্গলালকে আপ্যায়ন করলেন। তারপর সন্দিহান সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ওঁদের সামনে বসলেন।

চা শেষ করা পর্যন্ত অশোকচন্দ্র মামুলি কথাবার্তা বলছিলেন। তারপর শেষ চুমুক শেষ হতেই অন্তরার কাছ থেকে সৌজন্যের অনুমতি নিয়ে একটা উইলস ফিলটার ধরালেন। রণতোষবাবুর কথা তুলে প্রথম প্রশ্ন করলেন অশোকচন্দ্র, 'ওঁর সুইসাইডের ব্যাপারটা আপনি প্রথম জানতে পারেন?'

অন্তরা সহজ স্বরে সপ্রতিভ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। সকালবেলা চা দিতে গিয়েছিলাম। রোজ সকালে আমিই দাদাকে চা দিয়ে আসি। তো গিয়ে দেখি দরজা ভেজানো। দু-একবার ডাকাডাকি করে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। আর তখনই সব দেখতে পেলাম—মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে যেন শিউরে উঠলেন অন্তরা। চাপা গলায় বললেন, 'বীভৎস দৃশ্য!'

'উনি মারা যাওয়াতে সবাই খুব শকড হয়েছেন। নীচের তলার জলধরবাবু, সুমিতা ওঁর কথা খুব বলছিলেন, খুব প্রশংসা করছিলেন।'

'সে তো করবেই!' বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন অন্তরা, 'ভাড়া না নিলে, বিনিপয়সায় পড়ালে লোকে প্রশংসা তো করবেই।'

এসিজি অবাক হলেন। সিগারেটে গভীর টান দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'রণতোষবাবু বিনি পয়সায় কাকে পড়াতেন, বকুলকে?'

'না, বকুলের মাকে—।'

খবরটা শুনে অশোকচন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সুমিতাকে পড়াতেন রণতোষবাবু! কই, সুমিতা নিয়োগী তো এ-কথা তাঁকে বলেননি!

'সুমিতাকে কী পড়াতেন?'

'বাংলা। ওর নাকি বাংলা নিয়ে পড়াশোনার খুব আগ্রহ। সত্যি-মিথ্যে ও-ই জানে।'

বোঝা গেল, সুমিতার ছাত্রী হওয়াটা অন্তরা মোটেই পছন্দ করেননি। বিশেষ করে পুরোনো এক ছাত্রীর সঙ্গে আবেগতাড়িত সম্পর্কের বিড়ম্বনার পর।

'সুমিতা কোথায় পড়তেন? একতলায় নিজেদের ঘরে, নাকি রণতোষবাবুর ঘরে?'

'কখনও নীচে, কখনও চিলেকোঠার ঘরে—' নিস্পৃহভাবে বললেন অন্তরা, 'তবে দাদা খুব ভদ্র, সংযমী মানুষ ছিলেন।'

'আপনারা ছাড়া ছাদের ঘরে আর কে-কে যাতায়াত করত? সুমিতা দেবী?'

'হ্যাঁ—' একটু থেমে অন্তরা আরও বললেন, 'ওর মেয়েটাও যখন-তখন যেত। বকুলকে দাদা খুব ভালোবাসতেন। কথায়-কথায় নানান গিফট দিতেন। আসলে দাদার ভেতরে কোথায় যেন একটা অভাববোধ ছিল—।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন এসিজি। তারপর অন্তরার চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মিসেস দত্ত, দাদার ঘরে কখনও এমন কিছু আপনার চোখে পড়েছে যা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে?'

ঠোঁটে দাঁত চেপে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন অন্তরা, তারপর বললেন, 'না, সেরকম কিছু দেখিনি।'

'আগের দিন আপনি বলছিলেন আপনার দাদা ইদানীং পাপ, শাস্তি, মৃত্যু—এইসব নিয়ে ভাবছিলেন। এসব উনি কেন ভাবছিলেন আন্দাজ করতে পারেন?'

'জানি না। দাদা এমনিতে খুব নীতিবাগীশ মানুষ ছিলেন। পাপ করার লোক উনি ছিলেন না। তবু কেন ওসব ভাবছিলেন কে জানে!'

এসিজি প্রশ্ন করার মতো আর কিছু ভেবে পেলেন না।

রঙ্গলাল গোস্বামীকে ইশারা করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, অন্তরাকে বললেন, 'চলি—।'

অন্তরা দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। সামান্য উদ্বিগ্ন স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'ঠিক করে বলুন তো, মিস্টার গুপ্ত, ব্যাপারটা কী—সুইসাইড, না মার্ডার?'

অশোকচন্দ্র সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হাসলেন, বললেন, 'খুন হোক আর আত্মহত্যা হোক, যে-মানুষটা চলে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না।'

অন্তরা বুঝতে পারলেন এসিজি ওঁর বলা কথা ওঁকেই ফেরত দিলেন। ওঁর মুখে সামান্য লালচে আভা ফুটে উঠল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঙ্গলাল গোস্বামী বাইরের চাতালে বেরিয়ে এলেন। হাতের সিগারেটের টুকরোটা এককোণে রাখা আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিলেন এসিজি।

রঙ্গলাল গোস্বামী বললেন, 'প্রশ্ন উত্তরের পালা শেষ হল, স্যার / এবারে বলুন সুইসাইড না মার্ডার।'

এসিজি বললেন, 'এখন শুধু আর-একজনের সঙ্গে কথা বলা বাকি—।'

'কে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন রঙ্গলাল।

'বকুল—' হেসে বললেন এসিজি।

দোতলা থেকেই ওঁরা বকুলের গলা পাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, ও ছুটতে-ছুটতে জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে।

সিঁড়ির মুখে দুজনকে দেখেই ফুটফুটে মেয়েটা একগাল হেসে বলল, 'তোমার জন্যে ওয়েট করছিলাম। এখন একটা ম্যাজিক দেখিয়ে তার সিক্রেটটা শিখিয়ে দাও—।'

এসিজি পালটা হেসে বললেন, 'ছাদে চলো, তোমাকে আজ অনেকগুলো ম্যাজিক শিখিয়ে দেব। তবে একটা কন্ডিশান আছে—।'

'কী কন্ডিশান?' বকুল চোখ গোল-গোল করে প্রশ্ন করল।

'ছাদে চলো, বলছি—।'

সরু সিঁড়ি বেয়ে ওরা তিনজন উঠে এলেন ছাদে।

একপাশে কয়েকটা ফুলগাছের টব। এলোমেলোভাবে টাঙানো নাইলনের দড়িতে শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় ঝুলছে। বিকেলের রোদ মরে এসেছে, তবে একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। একটু দূরেই নিষ্পাপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে অকুস্থল।

এসিজি ছাদের সুরকি ওঠা ময়লা মেঝেতে বসে পড়লেন। বকুলকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাকে অনেক ম্যাজিকের সিক্রেট শিখিয়ে দেব। তবে এক্সচেঞ্জে তোমাকেও কিছু সিক্রেট বলতে হবে।'

'কী সিক্রেট, বলো—।'

'রণতোষ জেঠুর সুইসাইডের ব্যাপারে।'

চোখের পলকে বাচ্চা মেয়েটার মুখ পালটে গেল।

বোঝা গেল, এসিজির আন্দাজে ছোড়া ঢিল ঠিক জায়গায় লেগেছে। রঙ্গলালের মনে হয়, বকুল বোধহয় সত্যিই কোনও সিক্রেট জানে।

বকুলকে পিঠ চাপড়ে সাহস দিলেন এসিজি, বললেন, 'বলো, কোনও ভয় নেই। আমরা কাউকে বলব না—।'

একটুক্ষণ কী যেন ভাবল বকুল। তারপর যান্ত্রিক স্বরে বলল, 'রনো আঙ্কলের ঘর থেকে আমি শুধু একটা বাক্স নিয়ে এসেছি—।'

'কীসের বাক্স?' ভেতরে-ভেতরে সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন এসিজি। চেষ্টা করে তাঁকে গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে হল।

'মায়ের বাক্স—' অম্লানবদনে এসিজির প্রশ্নের জবাব দিল বকুল।

'মায়ের বাক্স তোমার আঙ্কলের ঘরে গেল কী করে?' রঙ্গলালবাবু এবার সক্রিয় ভূমিকা নিলেন।

'তা তো জানি না। বোধহয় মা নিজেই আঙ্কলকে দিয়েছে।'

'তুমি ঘরের কোথায় বাক্সটা পেলে?' এসিজি জানতে চাইলেন।

'ফ্লোরে পড়ে ছিল—।'

'বাক্সটা তুমি কবে নিয়ে এসেছে?'

'যেদিন সকালে রনো আঙ্কল সুইসাইড করেছিল, সেদিন।'

'রনো আঙ্কল তখন কী করছিল?'

'ওপরদিকে...অল্প-অল্প দোল খাচ্ছিল...।'

'মাই গড!' শিউরে উঠে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন এসিজি।

রঙ্গলালবাবুও বেশ ঘাবড়ে গিয়ে অবাক চোখে বাচ্চা মেয়েটাকে দেখতে লাগলেন।

বকুলকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানা গেল তার সারমর্ম এই, সুযোগ পেলেই ও রনো আঙ্কলের ছাদের ঘরে চলে যেত। ঘটনার দিন সকালে ও একটা নতুন ওয়াটার বটল আঙ্কলকে দেখাতে গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে, রণতোষবাবু সিলিং পাখা থেকে বিশ্রীভাবে ঝুলছেন। ও ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে চলে আসে মায়ের কাছে। মাকে ফিসফিস করে সব বলতেই মা ভয়ে কেঁদে ফ্যালে। তারপর ওকে চুপিচুপি একটা কাজ করতে বলে। কাজটা হল, রণতোষ দত্তর ঘর থেকে খুঁজে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে আসা। বাক্সটা মায়ের। সবুজ রঙের ওপরে সাদা আলপনা দেওয়া। অনেকটা বাঁধানো বইয়ের মতো দেখতে। বাক্সের ভেতরে কী আছে বকুল জানে না। ও চুপিচুপি আবার চিলেকোঠার ঘরে ফিরে যায়। এদিক-ওদিক একটু নজর দিতেই দেখতে পায় মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে থাকা একটা চেয়ারের পাশে বাক্সটা পড়ে আছে। সেটা বগলদাবা করে ও একছুটে পালিয়ে আসে ওর মায়ের কাছে। মাকে বাক্সটা দিতেই মা সেটা আঁকড়ে ধরে ভীষণ কাঁদতে থাকে। খানিক পরে মা চুপিচুপি ওপরে চলে যায়। একটু পরেই আবার ফিরে আসে। এসে বকুলকে বলে গোটা ব্যাপারটা সিক্রেট রাখতে।

কথার শেষ দিকটায় বকুল বারবার দম নিচ্ছিল, সামান্য হাঁফাচ্ছিল যেন। বক্তব্য শেষ করে এবার ও ওর প্রথম আবদারে ফিরে গেল 'এবার একটা ম্যাজিক দেখিয়ে তার সিক্রেটটা শিখিয়ে দাও—।'

এসিজি পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছোট রুবিক কিউব বের করলেন। কিউবটার এক-একটা পিঠে নানারঙের রঙিন খোপ। অভ্যস্ত হাতে কিউবটাকে বারকয়েক মোচড় দিলেন তিনি। একটু পরেই দেখা গেল কিউবটার ছ'পিঠে তৈরি হয়ে গেছে সুন্দর রঙিন নকশা। সেটা বকুলকে দেখিয়ে এসিজি বললেন, 'এটার নাম হল রুবিক কিউব। প্রমিস করছি, কাল তোমার জন্য এরকম একটা কিউব এনে দেব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা ছোট্ট কাজ করে দিতে হবে। মায়ের বাক্সটা তোমাকে এক্ষুনি লুকিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ওটা দেখেই আমি তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে দেব। ঠিক পারবে তো?'

বেণী দুলিয়ে ঘাড় হেলাল বকুল 'হ্যাঁ, পারব—'

কথা শেষ হতে-না-হতেই ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাল বকুল।

ছুটে চলে যাওয়া মেয়েটিকে দেখতে-দেখতে অশোকচন্দ্র আনমনাভাবে মন্তব্য করলেন, 'দেখা যাক বাক্স-রহস্য থেকে রণতোষবাবুর মৃত্যু-রহস্য ভেদ করা যায় কি না।'

বিকেলের আলো মলিন হয়ে এসেছে। আকাশে দু-একটা পায়রা। রাস্তা দিয়ে ছুটে-চলা গাড়ির শব্দ হালকাভাবে কানে আসছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রণতোষ দত্তর ঘরটা এখন যেন অনেকে বেশি অর্থময়। রুবিক কিউবটা পকেটে রেখে চোখ থেকে কার্বন ফ্রেমের চশমা খুলে নিলেন এসিজি। পাঞ্জাবির কোণ দিয়ে

কাচ দুটো মুছলেন। তারপর চশমাটা ঠিকঠাক করে নাকের ওপরে বসালেন। এখন কি সবকিছু আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে?'

ঠিক সেই মুহূর্তে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছাদে ফিরে এল বকুল। হাতে বইয়ের মাপের একটা সবুজ কাঠের বাক্স।

বাক্সটা বৃদ্ধ হুনুরের হাতে দিয়েই মেয়েটা হাত বাড়াল তাঁর দিকে 'তোমার রুবিক কিউবটা আমাকে একটু দাও, আমি একটু খেলি—।'

এসিজি হেসে কিউবটা পকেট থেকে বের করে বকুলের হাতে দিলেন, বললেন, 'এই নাও। বাক্সটা আনার সময় তোমার মা দেখতে পায়নি তো?'

বকুল মাথা ঝাঁকাল : 'না।'

এসিজি বললেন, 'তুমি এবার নীচে চলে যাও। সন্ধে হয়ে আসছে—তোমার মা চিন্তা করবে। আমি যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

রুবিক কিউবটা হাতে নিয়ে বকুল লাফাতে-লাফাতে চলে গেল।

অশোকচন্দ্র রঙ্গলালবাবুকে বললেন, 'আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন, রঙ্গলালবাবু। নীচে গিয়ে আপনি সুমিতা নিয়োগীকে ডেকে নিয়ে আসুন। জলধরবাবু বা ওঁর স্ত্রীর যেন জানতে না পারেন। বলবেন, খুব জরুরি ব্যাপার—আমি ওঁর সঙ্গে নিরিবিলি একটু কথা বলতে চাই।'

রঙ্গলালবাবু বিহ্বল চোখে অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বৃদ্ধের কথা শেষ হতেই ঠোঁট উলটে বললেন, 'মিস্টিরিয়াস ব্যাপার-স্যাপার বুঝিতে না পারি/খুনি যেন চেনা কিন্তু চিনিতে না পারি।' স্বভাব-কবিতা বলে রঙ্গলাল সুমিতাকে ডেকে নিয়ে আসতে চলে গেলেন।

সুমিতাকে নিয়ে রঙ্গলাল যখন ফিরে এলেন তখন সন্ধের ছায়া মন্থরভাবে নেমে এসেছে।

এসিজি বাক্সটা সুমিতাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এটা আপনার?'

অস্পষ্ট আলোতেও সুমিতা বাক্সটা চিনতে পারল, বলল, 'হ্যাঁ—কিন্তু এটা আপনি কী করে পেলেন?'

'বকুল নিয়ে এসেছে। ও আমাদের সব বলেছে—।'

সুমিতা আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আকাশের কালচে নীল স্লেটে তখন সন্ধ্যাতারাই একমাত্র আলো।

সুমিতার কান্না-একটু স্তিমিত হয়ে এলে অশোকচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, 'বাক্সের ভেতরে কী আছে, মিসেস নিয়োগী?'

সুমিতা কান্না-প্লাবিত চোখে এসিজির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ছোটবেলার সব জিনিস। মা জমিয়ে রেখেছিল—বিয়ের সময় বাক্সটা আমাকে দিয়েছিল। ওতে আমার ছোটবেলার ফটো আছে, চুলের কাঁটা-ফিতে আছে, খেলার পুতুল আছে, হাতের লেখা আছে—দামি কিছুই নেই।'

'বাক্সটা রণতোষবাবুকে আপনি দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। উনি আমার ছোটবেলার ফটো, হাতের লেখা—এসব দেখতে চেয়েছিলেন।'

'কেন?'

এই প্রশ্নে আবার অসহায়ের মতো কেঁদে ফেলল সুমিতা। অনেক কষ্টে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'সবই আমাদের পোড়া কপাল। আমরা এক অদ্ভুত সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। সবসময় একটা চোরা টান টের পেতাম—।'

'সেইজন্যেই কি রণতোষবাবু ইদানীং অপরাধবোধে ভুগছিলেন?'

সুমিতা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তা ছাড়া, আরও একটা ব্যাপার হয়েছিল।'

'কী ব্যাপার?'

'রনোদা...রনোদা...আমাকে পড়াতেন।' ইতস্তত করে বলল সুমিতা।

'জানি—' আলতো করে বললেন এসিজি।

'একদিন বাংলা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে-করতে উনি রবীন্দ্রনাথের ''শেষের কবিতা'' প্রসঙ্গে চলে এসেছিলেন। তারপর হঠাৎই কেমন বেসামাল হয়ে গিয়ে অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ''সুমিতা, কিছুদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে তুমি আমার বন্যা, তুমিই আমার মিতা—'' এ-কথা বলেই রনোদা আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন...' সুমিতা মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল।

অশোকচন্দ্র ওকে কান্নার সময় দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন।

সুমিতা একটু পরে কান্না-ভাঙা গলায় বলল, 'আমি রনোদাকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালোওবাসতাম। তাই ধৈর্য হারানোটা আমার খারাপ লাগেনি। কিন্তু তারপরই দেখলাম আক্ষেপে গ্লানিতে ''ছি-ছি'' করে উনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। বারবার বলতে লাগলেন, ''এ কী অন্যায় আমি করে বসলাম!'' আমি যতই ওঁকে বোঝালাম যে এটা অন্যায় নয়, এমনকী কোনও দুর্ঘটনাও নয়। বরং যা স্বাভাবিক তাই-ই হয়েছে। কিন্তু রনোদা মানতে পারেননি। অপরাধবোধে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। আমি অনেক করে বুঝিয়েও ওঁকে শান্ত করতে পারিনি। পাপ, শাস্তি, মৃত্যু—এসব নিয়ে লিখে-লিখে পাতার পর পাতা ভরতি করে ফেললেন। তারপর...।'

এসিজির মনে পড়ল, 'পাপ ও মৃত্যু' শিরোনামে এই লেখাগুলোই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন।

'তারপর...' আবার বলতে লাগল সুমিতা, 'তারপর সেই ডিপ্রেশন থেকেই সুইসাইড করলেন।'

'সুইসাইড কেমন করে বুঝলেন?'

আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সুমিতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'রনোদার সুইসাইড নোটটা আমার কাছে আছে। বকুল ওই বাক্সটা নিয়ে আসার পর আমি চুপিচুপি রনোদার ঘরে আসি। দেখি সুইসাইড নোটটা রনোদার লেখার টেবিলে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। তাতে লেখা, ''তোমাকে কখন ভালোবেসে ফেলেছি বুঝতে পারিনি। আর বুঝতে পারিনি বলেই বশ হারিয়ে ওই পাপে তোমাকে জড়িয়ে ফেলেছি। তারপর থেকে বারবার লজ্জায় আমি মরে গেছি। এবার সত্যি-সত্যি মরলাম।''

সুমিতা এবার হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল—সর্বস্বান্ত দিশেহারা মানুষ যেভাবে কাঁদে।

এসিজি কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলেন।

অনেকক্ষণ পর সুমিতার কান্না থামল।

ও বলল, ''ওই সুইসাইড নোট পুলিশের হাতে গেলে রনোদাকে জড়িয়ে বাজে একটা স্ক্যান্ডাল হত। সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা খুব কঠিন হত। আমি আমার চিন্তা করিনি—শুধু রনোদার কথাই ভেবেছিলাম...বিশ্বাস করুন...।'

'সেইজন্যেই আসল সুইসাইড নোট সরিয়ে রণতোষবাবুর লেখা থেকে একটা পাতার খানিকটা ছিঁড়ে সুইসাইড নোট হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন?'

সুমিতার শরীর ফুলে-ফুলে উঠছিল। বড় করে শ্বাস টেনে ও বলল, 'হ্যাঁ—রনোদার ওই ''পাপ ও মৃত্যু'' নামে লেখার পাতা থেকে—আপনি হয়তো দেখেছেন...।'

অন্ধকারেই ঘাড় হেলালেন এসিজি।

ভারি গলায় সুমিতা বলল, 'আমাকে যা-খুশি সাজা দিন, কিন্তু দেখবেন, দেবতার মতো ওই মানুষটার কোথাও যেন কালি না লাগে। উনি যে-ভুল করেছিলেন সেটা কোনও ভুলই নয়। কিন্তু ওঁর নীতিবাগিশ মন ভেতরে-ভেতরে ওঁর গলা টিপে ধরেছিল, ওঁকে কুরেকুরে খাচ্ছিল...।'

পাশের কোনও বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল কয়েকবার।

এসিজি নরম গলায় বললেন, 'এবারে নীচে চলুন। ব্যাপারটা যাতে ঠিকমতো মিটে যায় সেজন্যে ইন্সপেক্টর যাদবকে আমি রিকোয়েস্ট করব। আপনি সুইসাইড নোটটা আমাকে দিন।'

'নীচে চলুন, দিচ্ছি—।'

তিনজন ছায়া-ছায়া মানুষ অকুস্থলের পাশ দিয়ে হেঁটে এল সিঁড়ির কাছে। অবসন্নভাবে সিঁড়ি নামতে লাগল।

একতলার কাছাকাছি এসে সুমিতা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'অনেকবার ভেবেছি সুইসাইড নোটটা পুড়িয়ে ফেলব, কিন্তু পারিনি...ওঁর শেষ লেখা...।' সুমিতা আবার কেঁদে ফেলল।

রঙ্গলালবাবু বললেন, মিসেস নিয়োগী, প্লিজ... জলধরবাবুরা শুনতে পাবেন।'

এসিজি বললেন, 'আমরা আর ভেতরে ঢুকব না। আপনি শুধু বকুলকে একবার ডেকে দেবেন। আর...এই নিন আপনার বাক্স...।'

সুমিতা চোখ মুছতে-মুছতে বাক্সটা নিল। তারপর ওঁদের অলিপথে দাঁড় করিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

একটু পরেই সুমিতা ফিরে এল, একটা ভাঁজ করা কাগজ তুলে দিল এসিজির হাতে। এসিজি সেটা না দেখেই পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল বকুল।

ওকে দেখে এসিজি বললেন, 'মা-মণি, আমরা এবার গুডবাই—।'

'আবার যেন দেখা পাই—' সপ্রতিভভাবে বলল বকুল।

এসিজি অবাক চোখে রঙ্গলালবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'স্বভাব-কবিতা কি সংক্রামক ব্যাধি?'

রঙ্গলাল হাসলেন, কিছু বললেন না।

বকুল অশোকচন্দ্রের রুবিক কিউবটা ফেরত দিয়ে বলল, 'আমারটা কাল মনে করে আনবে কিন্তু—।'

এসিজি কিউবটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'অবশ্যই—' তারপর সুমিতাকে বললেন, 'মিসেস নিয়োগী, আপনি কোনওরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। আর আমরা কাল সন্ধেবেলা আসছি। তখন শুধু চায়ে চলবে না, চায়ের সঙ্গে টা-ও চাই।'

সুমিতা ভেজা চোখ মুছে হাসতে চেষ্টা করল, বলল, 'আসবেন কিন্তু—।'

রঙ্গলালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যের কলকাতা গালে-ঠোঁটে রং লাগিয়ে যথারীতি চঞ্চল হয়ে পড়েছে। এসিজি নতুন একটা সিগারেট ধরাতেই রঙ্গলালবাবু প্রশ্ন করলেন, 'সবই তো বুঝলাম, স্যার, কিন্তু ওই এক ইঞ্চির গরমিলের ব্যাপারটা কী হল?'

এসিজি সিগারেটে জম্পেশ টান দিয়ে কুলকুল করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বুঝতে পারেননি! ব্যাপারটা তো খুব সোজা। চেয়ার পেতে তার ওপরে ওই কাঠের বাক্সটা রেখে তবেই সিলিং ফ্যানের ঠিকমতো নাগাল পেয়েছিলেন রণতোষবাবু। তারপর ওঁর পায়ের ছটফটানিতে চেয়ার, বাক্স দুটোই উলটে গিয়েছিল—।'

রঙ্গলালবাবু প্রশংসার উজ্জ্বল চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ হুনুরের দিকে। তারপর সুর করে বললেন, 'দেখে আপনার তীক্ষ্ন বুদ্ধি/হলেম আমি নিহতবুদ্ধি—।'

এসিজি চমকে রঙ্গলালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'নিহতবুদ্ধি মানে?'

রঙ্গলালবাবু বিনীত হেসে বললেন, 'এই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশান, স্যার। নিহতবুদ্ধি মানে হল সাঙ্ঘাতিক হতবুদ্ধি অবস্থা—।'

এসিজি আর হাসি চাপতে পারলেন না।

দরজা বন্ধ ছিল





...কিন্তু তবুও নিলয় মজুমদার খুন হয়ে গেলেন।

যেভাবে তিনি খুন হলেন তাতে খুনির নাম যে কিছুতেই 'করুণাসিন্ধু' হতে পারে না সেটা হলফ করে বলা যায়। কারণ, নিলয়ের মাথার পিছনে ভারী কোনও জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, এবং তার ওপরে গলায় চেপে বসেছিল রবারের মোটা 'দড়ি'-র ফাঁস। চুয়াত্তর বছরের একজন বৃদ্ধকে খুন করার জন্য কখনওই এত আয়োজনের প্রয়োজন হয় না।

রঘুপতির মুখে খুনের ঘটনার বিবরণ শুনতে-শুনতে এসিজি-র অন্তত সেরকমই মনে হল।

মাথার পিছনে ঝুলে থাকা ধবধবে সাদা চুলের গোছায় কয়েকবার টান মারলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝোলালেন। সামনের টেবিলের ওপরে দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালেন।

আর তখনই ঊর্মিলার কথা মনে পড়ল। ও সামনে থাকলে কিছুতেই বাবাকে সিগারেট ধরাতে দিত না। ভাগ্যিস তিনবছর আগে ওর বিয়ে হয়ে গেছে!

সিগারেট খাওয়া নিয়ে এখন অশোকচন্দ্রকে বকাঝকা করার কেউ নেই। স্ত্রী মালিনী প্রায় এগারো বছর হল অসুস্থ কিডনির কাছে ইনিংসে হেরে গিয়ে আকাশের তারা হয়ে গেছে। মালিনী সিগারেট খাওয়া নিয়ে ছোট্ট-ছোট্ট কিন্তু মিষ্টি আপত্তি জানাত। এসিজি ওকে খুশি করতে বহুবার সিগারেটের নেশা ছাড়তে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওই—যা হয়!

মালিনীর তুলনায় ঊর্মিলা ছিল একেবারে জঙ্গি সিগারেটবিরোধী। নেহাত অশোকচন্দ্র ওর বাবা বলে ঊর্মি শারীরিক শাস্তি দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে পারেনি। নইলে কী যে হত কে জানে!

একেবারে ছাড়তে না পারলেও অশোকচন্দ্র সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা পঁচাত্তর পার্সেন্ট কমিয়ে দিয়েছেন। একসময় দিনে তিনি আট প্যাকেট সিগারেট খেতেন, এখন মাত্র দু-প্যাকেট।

সিগারেট ধরিয়ে মনের সুখে গভীর টান দিলেন। ধোঁয়া ছাড়লেন এবং বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলেন। চশমার কাচের ফাঁক দিয়ে রঘুপতি যাদবের মুখের দিকে ভাবনা-বিভোর চোখে দেখলেন একবার। চোখের চশমাটা একটু নেড়েচেড়ে নাকের গোড়ায় ঠিকঠাক করে বসালেন। তারপর তাকালেন খোলা জানলার দিকে। সেই সকাল থেকেই বৃষ্টি চলছে তো চলছেই। এখন বেলা এগারোটা দশ। বৃষ্টি আজ বারোটা বাজাবেই!

নিলয় মজুমদারের খুনের ঘটনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং আর অন্যরকম। এতক্ষণ ধরে ইনস্পেকটর রঘুপতি যাদবের কাছে শোনা বিবরণ আর বর্ণনার কথাগুলো মনে-মনে রিক্যাপ করছিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। এই মার্ডার মিস্ট্রিটা এমন যে, লোকাল থানার পুলিশ বারবার হোঁচট খেয়ে আটকে গেছে। সেইজন্যই ব্যাপারটা গড়িয়ে গেছে লালবাজার পর্যন্ত—মানে, লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াড পর্যন্ত। এবং সবশেষে এই খুনের সমস্যাটা এসে আশ্রয় নিয়েছে রঘুপতি যাদবের কোলে।

নিজের কোল থেকে সমস্যাটা এসিজি স্যারের কোলে ট্রান্সফার করবে বলে রঘুপতি আজ সকাল সাড়ে ন'টার পরপরই এসে হাজির হয়েছে ওর প্রাক্তন স্যারের শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে।

বৃদ্ধ নিলয় মজুমদার খুন হয়েছেন পঁচিশ দিন আগে—গত মাসের বাইশ তারিখে। কিন্তু পুলিশ এই খুনের কিনারা করা তো দূর অস্ত কাউকে অ্যারেস্ট পর্যন্ত করতে পারেনি।

রঘুপতির কোলে খোলা রয়েছে একটা মোটা ফাইল—নিলয় মজুমদারের কেস ফাইল। এতক্ষণ ধরে সেটা কনসাল্ট করেই গোটা কেস হিস্ট্রিটা ও এসিজি স্যারকে শুনিয়েছে।

ফাইলটা পড়ার জন্য রঘুপতি চোখে রিডিং গ্লাস লাগিয়েছে। বয়েসটা চল্লিশ পেরোলেও চেহারা ভীষণ শক্তপোক্ত। চোয়ালের রেখা এবং চোখ বলে দিচ্ছে, নিজের শারীরিক শক্তির ওপরে ওর আস্থা নেহাত কম নয়।

রঘুপতির ঠোঁটের ওপরে কাঁচাপাকা গোঁফ। মুখে বসন্তের দাগ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ফিজিক্স নিয়ে এম. এসসি. পড়ার সময় ও 'স্যার' হিসেবে এসিজিকে পেয়েছিল। তখন থেকেই স্যারের অ্যানালিটিক্যাল বুদ্ধির সঙ্গে ওর সরাসরি পরিচয়।

এখন স্যারের ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে ওরা দুজনে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসে রয়েছে। ওদের মাঝখানে নীচু টি-টেবিল। টেবিলে দুটো খালি কফির কাপ আর স্ন্যাক্সের প্লেট। প্লেটে কয়েকটা লেফট ওভার বিস্কুট পড়ে রয়েছে।

রঘুপতির গায়ে সাধারণ পোশাক—তাতে কোনও পুলিশি ছাপ নেই। ওর প্যান্টের নীচের দিকটা ভেজা। গাড়ি থেকে নেমে স্যারের বিল্ডিং-এ ঢোকার সময় বৃষ্টির ছাট এই কাণ্ডটা করেছে। হাতের ছাতা মাথা বাঁচালেও পা পুরোপুরি বাঁচাতে পারেনি।

রঘুপতি যাদব ওর প্রাক্তন স্যারের দিকে তাকাল। স্যার এখন পুরোদস্তুর 'মিস্টার হোয়াইট'। গায়ে সাদা রঙের পাঞ্জাবি-পাজামা। মাথায় লম্বা-লম্বা সাদা চুল। আর স্যারের মাথা ঘিরে ভেসে বেড়াচ্ছে সিগারেটের সাদা ধোঁয়া।

অশোকচন্দ্র রঘুপতি যাদবের দিকে চোখ খুলে এক-একবার দেখছেন, আবার কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে আপনমনে কী ভাবছেন।

এসিজি রঘুপতির বর্ণনা আর বিবরণের কথাই ভাবছিলেন। শুরু থেকে শুরু করে কেস হিস্ট্রিটা মনে-মনে খতিয়ে দেখছিলেন। রঘুপতি যাদবের কথাগুলো যেন আবার শুনতে পাচ্ছিলেন।

কলকাতার নিউ আলিপুর অঞ্চলে নিলয় মজুমদারের তিনতলা বাড়ি। জায়গাটা নিউ আলিপুর হলেও অঞ্চলটা নিতান্তই মধ্যবিত্ত এলাকা।

নিলয় মজুমদার সেলফ মেড ম্যান। ছোটবেলায় বাবা-মা-কে হারিয়েছেন। কাকার কাছে মানুষ। অনেক কষ্ট সহ্য করে, পরিশ্রম করে, পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন। যাদবপুর ইউনিভারসিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন সসম্মানে, ভালো রেজাল্ট করে। প্রথম জীবনে আট বছর মতন চাকরি করার পর 'নিলয় কনস্ট্রাকশনস' নামে নিজের কনস্ট্রাকশন কোম্পানির শুরুওয়াত করেন। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কোম্পানি ধাপে-ধাপে বড় হয়েছে। অনেক বড়-বড় টাউনশিপ তৈরি করেছেন। রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ নানান প্রজেক্টের দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রায় তিরিশ বছর ধরে রাজ্য সরকারের কনট্রাক্টরদের তালিকায় 'নিলয় কনস্ট্রাকশনস' একজন নামিদামি বিল্ডার।

চৌষট্টি বছর বয়েসে নিলয়বাবুর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়। তখন তিনি একটু ভয় পেয়ে যান। তাই স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়ান। ওঁদের একমাত্র ছেলে তনয় মজুমদার—তাঁর কোনও বোন-টোন নেই। তনয় সাধারণ বি. কম. পাশ। কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস থেকেই নিলয় ওঁকে ব্যবসায় টেনে নেন। তনয়ের ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে নিলয়বাবুর সিরিয়াস অভিযোগ ছিল, বাট উপায় কী—হাজার হলেও ছেলে এবং ওনলি চাইল্ড!

তনয় মজুমদারের বয়েস এখন সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ মতন। বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর নাম টুনি মজুমদার। বিয়ের আগে মডেলিং করতেন। এখনও সেই অভ্যাস ধরে রেখেছেন। ফ্যাশান নিয়ে বেশ ইন্টারেস্ট আছে। বড়লোকের বউ-টউ হলে যা হয়! রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে একটা বুটিক আছে। সেখানে প্রিমিয়াম প্রাইস ট্যাগ লাগানো সব প্রিমিয়াম আইটেম বিক্রি হয়।

একটাই ফাঁকা জায়গা রয়েছে টুনি আর তনয়ের লাইফে—ওঁদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। যদিও দশবছর হল বিয়ে হয়েছে।

নিলয়বাবুর পার্সোনাল দেখাশোনার জন্য কাজের মেয়ে রয়েছে সাবি—মানে, সাবিত্রী। বিয়ে হয়ে গেছে বাট হাজব্যান্ড চারবছর ধরে লাপাতা। সাবির বয়েস তিরিশ-টিরিশ হলেও আরও ইয়াং দেখায়। তা ছাড়া দেখতেও বেশ সুন্দরী—মানে, কাজের মেয়ের পক্ষে। সাবি রাতে নিলয়বাবুর বাড়িতেই থাকে। নিলয়

মজুমদারের ঘরের লাগোয়া লম্বা-চওড়া বারান্দা আছে। বারান্দাটা ওয়েল প্রোটেক্টেড—মোটা গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সাবি রাতে সেখানেই শোয়।

নিলয়ের বাড়িটা তিনতলা। একতলায় রয়েছে দুটো গেস্টরুম আর কমন বাথরুম, তার সঙ্গে কলতলা।

দোতলায় নিলয়বাবুর দুটো ঘর—বেডরুম আর স্টাডি—পাশাপাশি। দুটো ঘরের মাঝে যাতায়াতের দরজা রয়েছে। স্টাডিতে ঢুকতে হলে নিলয়বাবুর বেডরুম দিয়ে ঢুকতে হয়। এ ছাড়া দোতলায় ছোট্ট একটা ড্রয়িংরুম মতন রয়েছে—সেটা কমন, সবাই ইউজ করে। ব্যস, দোতলায় নিলয়বাবু ছাড়া আর কেউ থাকে না। তনয়বাবু অনেকবার এই একা থাকা নিয়ে খিচিরখিচির করলেও নিলয় মজুমদার সেসব কথা কানে ঢোকাননি। তনয় এ নিয়ে কখনও জোরজবরদস্তি করতে পারেননি কারণ, নিলয় মজুমদার ওয়াজ দ্য বস। বয়েস চুয়াত্তর হলেও তাঁর কথাতেই সবাই চলত—মানে, চলতে হত। কারণ, বাড়ির মালিক তিনি, কোম্পানির মালিক তিনি। বরাবরই ওঁর বিহেভিয়ার একটু রুক্ষ, বস টাইপের—তার ওপর বছর দেড়েক আগে ওঁর ওয়াইফ এক্সপায়ার করার পর থেকে উনি আরও বেশি খিটখিটে হয়ে পড়েন। এ-কথা তনয় মজুমদার, টুনি মজুমদার যেমন জানিয়েছেন, তেমনই সাবিত্রীর কাছ থেকেও একই টাইপের কমেন্ট পাওয়া গেছে। মানে, বেসিক্যালি নিলয়বাবু বদমেজাজি ছিলেন। তাই সবাই ওঁকে খুব সমঝে চলত।

এরপর আসছে ও-বাড়ির লাস্ট মেম্বারের কথা। প্রজেন বসু রায়। বয়েস তেতাল্লিশ। ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার। উনি নিলয়বাবুদের কোনও ব্লাড রিলেশান নন, বাট ও-বাড়িতে পারমানেন্টলি থাকতেন—আই মিন, থাকেন।

তিনতলায় তনয় মজুমদার আর টুনি মজুমদার থাকেন। প্রজেন থাকেন ওঁদের পাশের ঘরেই। আর উনি হলেন 'নিলয় কনস্ট্রাকশনস'-এর ম্যানেজার এবং টুয়েন্টি পারসেন্টের পার্টনার। প্রজেনের বাবা-মা নেই। অরফ্যান। ওঁর বাবা ব্রজেন বসু রায় যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে নিলয় মজুমদারের ক্লাস মেট ছিলেন। শুধু ক্লাসমেট নয়, খুব বন্ধু ছিলেন দুজনে।

এ রকম সময়ে রঘুপতি যাদবের কাহিনির স্রোতকে বাধা দিয়েছিলেন অশোকচন্দ্র।

'এই ব্যাপারটা কি ভীষণ আনইউশুয়াল নয়, রঘুপতি?' রঘুপতির দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন এসিজি। ভুরু উঁচিয়ে সেরকম ইশারাও করলেন : 'যতই বন্ধুর ছেলে হোক, যতই অনাথ হোক, তাকে সরাসরি নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে পারমানেন্টলি থাকতে দেওয়াটা বেশ বেসুরো লাগছে...।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'গুপ্তাসাব, এই কাহানিটাই আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। নিলয় মজুমদার যখন নিজের কোম্পানি খোলেন তখন ব্রজেন বসু রায়কে ডেকে নিয়ে এসে এইটি-টুয়েন্টির পার্টনার করে নেন। ওঁদের কাজকর্ম ভালোই চলছিল। কিন্তু বাইশ-তেইশ সাল পহেলে একটা হাদসা হয়। তখন ওঁরা কাশীপুর এরিয়ায় একটা ছোট ফ্লাইওভার বানাচ্ছিলেন। কনস্ট্রাকশন যখন ফিফটি কি সিক্সটি পার্সেন্ট মতন হয়েছে তখন একদিন লগভগ রাত এগারোটার সময় ওটা সাডেনলি ভেঙে পড়ে। ওই অ্যাক্সিডেন্টে তিনজন মারা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রজেন বসু রায়। তিনি সেসময়ে সাইটে ছিলেন। ব্যাড লাক। তখন ওঁর ছেলে প্রজেনের বয়েস অ্যাবাউট টুয়েন্টি ইয়ার্স।

'ওই অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে এফ. আই. আর. হয়েছিল। পুলিশ-কেসও হয়েছিল। কিন্তু নিলয় মজুমদার শেষ পর্যন্ত রিহা হয়ে যান। ইনভেস্টিগেশানে এটা জানা গিয়েছিল যে, ফ্লাইওভার কনস্ট্রাকশনের মেটিরিয়াল ''বি'' গ্রেডের ছিল। বাট সেটার জন্যে নিলয়বাবুর কোম্পানি যে ডিরেক্টলি রেসপনসিবল সেটা প্রূভ করা যায়নি। কারণ, বিল্ডিং মেটিরিয়াল পারচেজের যেসব পারচেজ বিল উনি দেখিয়েছিলেন সেগুলো সবই ছিল ''এ'' গ্রেড মেটিরিয়ালের বিল। কিন্তু পাবলিকের সন্দেহ যায়নি। এর পরেও নিলয় মজুমদারের কোম্পানির নামে কখনও-কখনও কনস্ট্রাকশনে চিটিং-এর রিপোর্ট হয়েছে...।'

'তার মানে, প্রজেন বসু রায়কে এরকম একটা ফেভার দেওয়া হয়েছে অ্যাজ কমপেনসেশান?'

'শুধু কমপেনসেশান নয়, স্যার—তার সাথ-সাথ গিল্ট কমপ্লেক্সও হয়তো আছে। সেটা এখন আর আমরা প্রূভ করতে পারব না। আওয়ার ব্যাড লাক।'

আরও অনেকক্ষণ ধরে রঘুপতির সঙ্গে কথা বললেন এসিজি। রঘুপতি বারবার যেটা ইমপ্রেস করতে চাইল সেটা হল, এই মার্ডার মিস্ট্রিটা বেশ কমপ্লেক্স আর ইন্টারেস্টিং।

'আপনার মতো ''থিংকিং মেশিন''-এর এটা ক্র্যাক করতে বেশ মজা লাগবে, স্যার।' সবকিছুর শেষে রঘুপতি যাদব মন্তব্য করল। তারপর : 'আমার সঙ্গে একদিন চলুন, স্যার। স্পটটা একটু ঘুরেফিরে দেখবেন, ক্যারেকটারগুলোর সঙ্গে বাতচিত করবেন, ওদের নেড়েচেড়ে দেখবেন...।'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে সব শুনে-টুনে ইন্টারেস্টিং বলেই মনে হচ্ছে। তবে স্পট তো এখন আর হট নেই, ক্রাইমের এতদিন পর কোল্ড স্পট হয়ে গেছে।'

'কী করব স্যার—ম্যাটারটা আমার হাতে এলই তো অনেক দেরি করে! এ ছাড়া...।' কথার মাঝে থেমে গেল রঘুপতি।

'এ ছাড়া কী?' প্রশ্ন করলেন এসিজি।

'এ ছাড়া মার্ডারটার মধ্যে একটা ''লকড রুম প্রবলেম'' টাইপের ডায়মেনশন আছে...।'

'বলো কী হে?' অশোকচন্দ্রের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল আগ্রহে।

রঘুপতি জানে, কোন বিষয়ে ওর স্যারের স্পেশাল ইন্টারেস্ট।

'স্যার, এবারে বলুন, কবে আপনার সময় হবে। সেইমতো লোকাল থানার ও. সি-কে আমি ইন্টিমেট করে রাখব।'

এসিজি ঘরের সিলিং-এর দিকে দেখলেন। ঘাড়ের পিছনে হাত নিয়ে ঝুলে পড়া চুলের গোছায় কয়েকবার টান মারলেন।

নিলয় মজুমদার হয়তো খিলখিটে দাপুটে অসৎ ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু ওঁর বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। বরং মার্ডারারের ওঁর লাইফ টার্মিনেট করার অধিকার ছিল না। খুনের পদ্ধতি আর রঘুপতির বর্ণনা শুনে এসিজির মনে হয়েছে, খুনি যেন অহংকারে মদমত্ত হয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছে, 'কাম অন। সলভ দ্য মিস্ট্রি অ্যান্ড ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান।'

এসিজি রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, সামনের রোববার সকাল ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ আমরা মজুমদারদের বাড়িতে যাব। তুমি একটু আগাম খবর দিয়ে রেখো। সবাই যেন বাড়িতে থাকে। অবশ্য সানডেতে সবারই বাড়িতে থাকার কথা...।'

'ও. কে., গুপ্তাসাব। তা হলে সেরকমই অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি।'

রঘুপতি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফাইলটা হাতে নিল।

সেটা দেখে বৃদ্ধ হুনুর বললেন, 'উঁহু, উঁহু—ওই ফাইলটা রেখে যাও, রঘুপতি। ওটা উলটেপালটে দেখে আমি একটু হোমওয়ার্ক সেরে নেব। আমার কাজ হয়ে গেলে তোমাকে ফোন করে দেব। তুমি কাউকে পাঠিয়ে ফাইলটা নিয়ে যেয়ো—।'

'ও. কে., স্যার।' ফাইলটা টেবিলে আবার নামিয়ে রাখল রঘুপতি।

'ওতে মজুমদার-বাড়ির সবার স্টেটমেন্ট আছে তো?'

'বিলকুল হ্যায়, স্যার। সঙ্গে ইচ অ্যান্ড এভরিবডির ফোটোগ্রাফভি আছে।'

'আর ক্রাইম সিনের ফোটো...?'

'সেও আছে, স্যার। একটা-দুটো ফোটো নয়, অনেক ফোটোগ্রাফ। ক্রাইম সিনের নানান অ্যাঙ্গেল থেকে ফোটো। এভিডেন্সের ফোটো। বাড়ির নানান পোরশানের ফোটো। প্রত্যেকটা রুমের পিকচার—সব আছে, স্যার।'

'গুড—ভেরি গুড।'

'তা হলে ওই কথাই রইল, স্যার। নেক্সট সানডে।'

'ইয়েস—নেক্সট সানডে।'

'এই চিড়িয়াটাকে যে করে হোক খাঁচায় ঢোকাতে হবে, স্যার।'

এসিজি খুনি কিংবা অপরাধীকে প্রায়ই পাখির সঙ্গে তুলনা করেন। সেইজন্যই রঘুপতি পাখিকে খাঁচায় ঢোকানোর কথা বলল।

অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, 'সিনসিয়ার চেষ্টা তো করব, রঘুপতি। কিন্তু জানো তো, খুন অতি জঘন্য কাজ—বাট খুনি ধরার কাজটা আরও জঘন্য...।'

নিলয় মজুমদারের বাড়ির নাম যদি 'নিলয় নিবাস' হয় তা হলে টেকনিক্যালি আপত্তি করার কিছু না থাকলেও গ্র্যামাটিক্যালি বোধহয় আছে। তা ছাড়া নামকরণের প্রবণতা দেখে এটা মনে হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয় যে, নিলয় মজুমদার আত্মপ্রচার ভালোবাসতেন। সেইজন্যই ওঁর প্রতিষ্ঠানের নাম 'নিলয় কনস্ট্রাকশনস' এবং বাড়ির নাম 'নিলয় নিবাস'। ভদ্রলোক বোধহয় কম-বেশি মেগালোম্যানিয়াক ছিলেন।

রং চটে যাওয়া লালচে-গোলাপি তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে এসিজি মনে-মনে এইসব কথাই ভাবছিলেন।

বেশ উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা বনেদি ঢং-এর বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া মাঝারি মাপের বাগান। বাগানে কয়েকটা বড়-বড় গাছ অগোছালোভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ ছাড়া ছোট-ছোট দু-চারখানা ফুলগাছ। লাস্ট একমাস ধরে বলতে গেলে রোজই এক-দু পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বাগানের মাটি ভিজে স্যাঁতসেতে। বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে যাওয়ার যে-সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা সেটা বেশ সরু এবং বাটিক প্রিন্টের মতো ফাটল ধরা।

বাগানের একপাশে পাঁচিল ঘেঁষে তিনটে ছাতারে পাখি চঞ্চলভাবে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। এসিজিদের চারজনকে ঢুকতে দেখে চট করে উড়ে পালাল। সেখানে অনেকগুলো গাছের ডাল কেটে লম্বালম্বিভাবে স্তূপের মতো করে সাজিয়ে রাখা ছিল। ছাতারে পাখিগুলোর লাফালাফিতে দুটো ডাল গড়িয়ে পড়ল নীচে। এই ডালগুলো দিয়ে হয়তো বেড়া দেওয়া হবে অথবা ওগুলোকে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানো হবে।

বাড়িটাকে দেখে বেশ শান্ত স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল। রোববারের সকালে যেন ছুটির দিনের আলসেমি গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাউন্ডারি ওয়ালে গাঁথা প্রমাণ মাপের লোহার মেন গেট। তার একদিকের পিলারে সাদা পাথরের ফলক বসানো। তাতে কালো হরফে লেখা 'নিলয় নিবাস'।

মেন গেট পেরিয়ে বাড়ির সদর দরজা। সদর দরজা ভেজানো থাকলেও খোলাই ছিল। তা ছাড়া সেখানে কোনও দারোয়ান বা সিকিয়োরিটি গার্ড মোতায়েন ছিল না। হয়তো সেরকম প্রয়োজন নেই বলেই।

সবার প্রথমে রঘুপতি যাদব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ওর পিছন-পিছন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তারপর ঢুকলেন নিউ আলিপুর থানার ও. সি. নিজামুল হক। আর তাঁর সঙ্গী থানার একজন কনস্টেবল ভগবান মিস্ত্রি।

ভগবান উর্দি পরে থাকলেও রঘুপতি এবং নিজামুল হক সাদা পোশাকে এসেছেন। রঘুপতির হাতে একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডার—তার মধ্যে নিলয় মজুমদারের মার্ডার ইনভেস্টিগেশানের জরুরি কাগজপত্র আর ফোটোগ্রাফ। তবে ও. সি. হকসাহেবের হাত খালি, কারণ, তাঁর কাগজপত্রের ফাইলটি ভগবান মিস্ত্রি বহন করছেন। সেটা দেখে এসিজির মনে হয়েছে, সত্যিই ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়!

গাড়িতে করে আসার সময় নিজামুল হক তাঁর ভিউপয়েন্ট থেকে গোটা কেসটার একটা সংক্ষিপ্ত রিক্যাপ অশোকচন্দ্র গুপ্তকে শুনিয়ে দিয়েছেন। এও বলেছেন, সরাসরি প্রমাণ-টমান না পেলেও তাঁর বিশ্বাস, এই মার্ডারের পিছনে প্রজেন বসু রায়ের ইনভলভমেন্ট আছে।

এ-কথায় অশোকচন্দ্র হেসে মাথা নেড়েছেন, বলেছেন, 'পুলিশের ইনস্টিংট একটা ইমপরট্যান্ট ফ্যাক্টর। আপনার সন্দেহটা আমি মাথায় রাখলাম।' মনে-মনে ভাবলেন, প্রজেন মজুমদার ফ্যামিলির ব্লাডকিন নয়—সেইজন্যই কি এই সন্দেহ?

এসিজিদের রিসিভ করার জন্য তনয় বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। রঘুপতি ওঁকে এই স্পেশাল ভিজিটের দিনক্ষণ আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া আজ গাড়ি থেকে নেমেই ওঁকে ফোন করে জানিয়েছে, 'আমরা এসে গেছি—।'

টুকটাক পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। অশোকচন্দ্র মুখ তুলে গাছের পাতা আর ডালপালার দিকে তাকিয়ে পাখিগুলোকে খুঁজছিলেন। ডাক শুনে অবশ্য কয়েকটাকে চিনতে পেরেছেন তিনি। শালিখ, বসন্তবৌরী আর বুলবুলি।

অশোকচন্দ্রের পাখি খোঁজার আগ্রহ দেখে নিজামুল হক একটু অবাক হচ্ছিলেন। সেটা লক্ষ করে রঘুপতি বলল, 'চিড়িয়া স্টাডি করা স্যারের হবি। ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা না করলে উনি অবশ্যই অরনিথোলজিস্ট হতেন...।'

হকসাহেব ভদ্রতার হাসি হেসে বললেন, 'ভালো, ভালো। ডিটেকটিভদের দু-একটা স্পেশাল হবি থাকা দরকার।'

অশোকচন্দ্র হকসাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জানেন তো, কোনও-কোনও হবি ইনভেস্টিগেশানে খুব হেলপ করে...।'

তনয় মজুমদার এইসব টুকরো কথা চুপ করে শুনছিলেন। ঠোঁটে একচিলতে হাসি। একটু ফাঁক পেতেই নিজের পরিচয় দিয়ে সৌজন্য বিনিময় করলেন। ও. সি. নিজামুল হকের দিকে তাকিয়ে পরিচিতের হাসি হাসলেন। হকসাহেবও পালটা হাসিতে জবাব দিলেন। বোঝা গেল, হকসাহেব তদন্তের খাতিরে এ-বাড়িতে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছেন।

নিজামুল হক উচ্চতায় খাটো গোলগাল মানুষ। মাথায় টাক, গালে কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। গায়ের রং বেশ ময়লা। মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে। ফলে ময়লা রঙের অন্ধকার হাসির আলো দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন।

অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তনয় বললেন, 'আপনার কথা ইনস্পেকটর যাদবের কাছে অনেক শুনেছি। আপনি তো ফিজিক্সের প্রফেসার...রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ছিলেন...।'

'হ্যাঁ—' সায় দিয়ে বললেন এসিজি, 'কয়েকবছর হল রিটায়ার করেছি।'

'ফিজিক্স খুব কঠিন সাবজেক্ট।'

এসিজি মোটেই বিনয় করে বললেন না, 'না, না, কী আর এমন কঠিন!' বরং বললেন, 'হ্যাঁ, একটু কঠিন তো বটেই!' তারপর মনে-মনে ভাবলেন, 'যে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করে বি. কম. পাশ করেছে, তার কাছে ফিজিক্স তো লোহা কিংবা পাথরের মতো কঠিন হবেই!'

এসিজি তনয়কে লক্ষ করছিলেন।

ফরসা। একটু থলথলে চেহারা। বয়েস সাঁইতিরিশ কি আটতিরিশ। চোখে কালো ফ্রেমের আধুনিক চশমা। চশমার কাচের পিছনে থাকা চোখজোড়া যেন কিছু বলতে চায়। রঘুপতির ফাইলে তনয়ের ফোটোগ্রাফ দেখেও এসিজির ঠিক একই কথা মনে হয়েছিল।

তনয়ের পরনে সাদা পাজামা আর গাঢ় নীল রঙের টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকের ওপরে বড়-বড় করে লেখা 'Being Human'।

তনয়ের গা থেকে সিগারেটের হালকা গন্ধ পাচ্ছিলেন এসিজি। মনে-মনে হেসে ভাবলেন, 'তনয় তা হলে আমারই মতো—স্মোকার। কিন্তু ও কোন ব্র্যান্ড খায়?'

এসিজি রঘুপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রঘুপতি, আমি নিলয়বাবুর বেডরুমে প্রথমে যেতে চাই। শুধু তুমি আর আমি। বাকিরা অন্য কোথাও ওয়েট করতে পারে...।'

নিজামুল হেসে বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত, আমাকে একটু আপনাদের সঙ্গে দোতলায় যেতে হবে—নিলয়বাবুর ঘরের দরজার সিলটা খুলে দেওয়ার জন্যে।'

'অবশ্যই। চলুন।' নিজামুলকে কথাগুলো বলে তনয়ের দিকে তাকালেন এসিজি : 'আপনি আপনার রুমে গিয়ে ওয়েট করুন, তনয়বাবু—আমি দরকার মতো আপনাকে ডেকে নেব...।'

তনয় 'থ্যাংক ইউ' বলে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিল।

হকসাহেব ভগবানকে সদর দরজায় মোতায়েন থাকতে বললেন। ওঁর হাত থেকে ফাইলটা চেয়ে নিলেন। রঘুপতির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এটা আমার কাছে থাক। জাস্ট ইন কেস...।'

নিলয়বাবুর ঘরটা থেকে খুনের গন্ধ বেরোচ্ছিল। অন্তত অশোকচন্দ্রের তাই মনে হল।

বেশ বড় মাপের সাজানো-গোছানো ঘর। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে খাট। তার ওপরে বিছানা। এই বিছানাতেই নিলয়বাবুর বডি পড়ে ছিল। বৃদ্ধের পরনে ছিল সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি আর ডোরাকাটা নীলচে পাজামা।

বিছানার চাদর ছিল রক্তমাখা। নিলয়ের গেঞ্জিতেও রক্ত লেগে ছিল। ওঁর মাথার পিছনে ভারী কোনও জিনিস দিয়ে আঘাত করেছিল খুনি। পরিভাষায় যাকে বলে ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। সেটার আঘাতে ওঁর মাথার পিছন থেকে এবং মুখ দিয়ে যথেষ্ট ব্লিডিং হয়েছে।

এ ছাড়া খুনি নিলয়ের গলায় রবারের ফিতের ফাঁস এঁটে মরণটান দিয়েছিল—স্লাইডিং উইন্ডোয় যে-রবারের ফিতের লাইনিং দেওয়া হয়, সেই ফিতে। তার টানে কোনও মানুষের দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়াই স্বাভাবিক।

ফোরেনসিক অ্যানালিসিস আর পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে তাতে মাথার পিছনের আঘাত, নাকি গলার ফাঁস—ঠিক কোনটার জন্য নিলয় মজুমদার মারা গেছেন সেটা শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়নি। দুটোর যে-কোনও একটার জন্যই কোনও মানুষের মৃত্যু হতে পারে। যেমন, স্ট্র্যাংগুলেশানের জন্য হাইঅয়েড বোন ভেঙে গেছে, ল্যারিংস ড্যামেজ হয়েছে। অবশ্য বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে হাইঅয়েড ব্রিটল হয়ে যায় বলে মডারেট প্রেশারেই ভেঙে যায়।

নিলয় খুন হয়েছেন রাত সাড়ে দশটা থেকে একটার মধ্যে। সেই সময় সাবি ঘুমিয়ে ছিল। আর তনয় মজুমদার, ওঁর স্ত্রী এবং প্রজেন বসু রায় তিনতলায় তাস খেলছিলেন। যেদিন নিলয় খুন হন তার পরদিন ভোর ছ'টা নাগাদ সাবি জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পায় যে, নিলয় রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। তখন ওর চেঁচামেচিতে তনয়, টুনি আর প্রজেন তিনতলা থেকে ছুটে আসেন। ওঁদের চেঁচামেচিতে তার পরপরই দু-চারজন প্রতিবেশী এসে জড়ো হন।

অশোকচন্দ্র নিলয়ের ঘরটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন। ঘরে একটা টেবিল, তিনটে চেয়ার। আর একটা ছোট্ট শো-কেস। সবই মামুলি স্ট্যান্ডার্ডের। রঘুপতি হাতের ফোল্ডারটা টেবিলে রেখে ওর স্যারের পাশে-পাশে ঘুরছিল আর খুনের বিষয়ে বকবক করে যাচ্ছিল।

এসিজি প্রথমে বিছানা পরীক্ষা করার পর জানলাগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

ঘরে মোট তিনটে জানলা—দুটো বারান্দার দিকে, একটা বাইরের বাগানের দিকে। তিনটে জানলাই একরকম দেখতে। প্রতিটি জানলায় ঘরের ভেতরদিকটায় স্লাইডিং দুটো কাচের পাল্লা, আর তার বাইরে মোটা লোহার গ্রিল।

ঘরের বাগানের দিকের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো চারটে রঙিন ফোটো ঝুলছে। ফোটোগুলো বেশ পুরোনো, আর তাদের বিষয় একই : মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিলয় মজুমদার পুরস্কার জাতীয় কিছু একটা নিচ্ছেন।

নিলয় মজুমদার জানলা-দরজা সব বন্ধ করে ঘুমোতেন। ঘরে দশ বাই দশ ইঞ্চির তিনটে ভেন্টিলেটর বসানো থাকায় সাফোকেশানের কোনও ভয়-টয় ছিল না।

খুনের পরদিন ভোরবেলা তনয়বাবুরা দরজা ভেঙে নিলয়ের ঘরে ঢোকেন। তনয়, টুনি, প্রজেন এবং সাবিত্রী সবাই এটা কমফার্ম করেছে যে, ঘরের সব জানলা এবং দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

নিলয়বাবুর ঘরের দুটো দরজা। একইরকম দেখতে। শক্তপোক্ত। তার মধ্যে একটা দরজা ভাঙা। সেটা বাইরে থেকে ফিতে দিয়ে সিল করে দিয়েছে পুলিশ। অন্য দরজাটা দিয়ে এসিজি আর রঘুপতি যাদব নিলয় মজুমদারের ঘরে ঢুকেছেন।

রঘুপতি এবার ওর স্যারকে দরজা নিয়ে বলতে শুরু করল।

'জানলার ডেসক্রিপশান তো আপনাকে আগেই দিয়েছি, স্যার।' ভাঙা দরজাটার কাছে এগিয়ে যেতে-যেতে রঘুপতি বলল, 'এবারে দরজার কেসটা দেখুন। যে-দরজাটা ভাঙা হয়েছে সেটা দিয়েই নিলয়বাবু অন্দর-বাহার করতেন। দেখুন, স্যার, এটার ছিটকিনিটা ভাঙা। মানে, রাতে শোয়ার সময় মিস্টার মজুমদার ছিটকিনি দিয়ে শুয়েছিলেন। বাইরে থেকে দরজা ভাঙার সময়ে এই ছিটকিনিটাও ভেঙে গিয়েছে।

'অন্য দরজাটা—মানে, যেটা দিয়ে আমরা এ-ঘরে ঢুকলাম—সেটা মিস্টার মজুমদার ইউজ করতেন না। ওটা সবসময় বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকত। আর সেই তালার চাবি থাকত মিস্টার মজুমদারের কাছে। তো সেকেন্ড দরজাটা অ্যাজ ইউশুয়াল তালা দেওয়া অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছিল। ওটার চাবি পাওয়া গেছে বিছানায়, ডেডবডির পাশে।'

রঘুপতির কথায় সামান্য ফাঁক পেতেই এসিজি জানতে চাইলেন, 'চাবিটা ভিকটিমের পাশে বিছানায় কেন পাওয়া গেল বলতে পারো? পুলিশ কি এর কোনও এক্সপ্ল্যানেশান খুঁজে পেয়েছে?'

'না, স্যার—পায়নি।' ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নড়ল রঘুপতি।

ঘরে ঢোকার সময় অশোকচন্দ্র দেখেছেন, দ্বিতীয় দরজাটার বাইরে হাঁসকল লাগানো। তাতেই সবসময় ভারী তালা ঝোলানো থাকে। এখনও তাই ছিল। তবে সেই বন্ধ তালাটা কাপড় জড়িয়ে গালা দিয়ে সিল করা ছিল। ও. সি. নিজামুল হক একটু আগে সেই সিল ভেঙে দরজাটা এসিজিদের জন্য খুলে দিয়ে গেছেন। এখানকার তদন্তের পাট চুকে গেলে আবার সিল করে দেবেন।

'তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?' এসিজি মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করলেন।

একটা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ—যেটা ভেঙে সবাই ঘরে ঢুকেছে এবং নিলয়বাবুর মৃতদেহের মুখোমুখি হয়েছে।

দ্বিতীয় দরজাটা বাইরে থেকে বরাবর যেরকম হাঁসকল এঁটে তালা ঝোলানো থাকে সেরকমই ছিল। চাবি ছিল নিলয়বাবুর কাছে।

ঘরের তিনটে জানলারই স্লাইডিং কাচের পাল্লা আটকানো ছিল। শুধুমাত্র ঘরের ভেতর থেকে সেগুলো খোলা-বন্ধ করা যায়।

এই অবস্থায় মার্ডারার ঘরে ঢুকল কেমন করে? যদি নিলয়বাবু তাকে দরজা খুলে ঘরে ঢুকিয়ে থাকেন তা হলে ওঁকে খুন করার পর খুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেমন করে? সব জানলা-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রেখে?

এইজন্যই রঘুপতি বলেছিল, খুনটাতে একটা 'লকড রুম প্রবলেম'-এর ডায়মেনশন আছে।

এসিজি মনে-মনে ধাঁধাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন আর একইসঙ্গে ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঘরে একটা বড়সড় স্টিলের আলমারি। তার পাল্লা দুটো সামান্য খোলা। নিলয় মজুমদার মার্ডার হওয়ার পর এই আলমারিটা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ইচ্ছে করে সেই অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে—যাতে ক্রাইম সিন ডিসটার্বড না হয়। এই আলমারি থেকে কিছু খোয়া গেছে বলে বাড়ির লোকেরা দাবি করেননি।

এসিজি পকেট থেকে একটা পেন নিয়ে সেটা দিয়ে খুব সাবধানে আলমারির একটা পাল্লা আরও একটু ফাঁক করলেন।

সেটা দেখে রঘুপতি হেসে বলল, 'অত কেয়ার নেওয়ার দরকার নেই, স্যার। ফোরেনসিকের লোকজন অনেকদিন আগেই ওদের ডাস্টিং আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের কাজ শেষ করে গেছে।'

পেন পকেটে রেখে দু-হাতে আলমারির দুটো পাল্লাই হাট করে খুলে দিলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দা।

ভেতরের দৃশ্য অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক। আর-পাঁচটা আলমারি যেমন হয়! সবক'টা তাকে জামাকাপড় আর কাগজপত্র ঠাসা। তবে একটা তাকে দুটো সাহেবি হ্যাট চোখে পড়ল। নিলয় মজুমদারের হ্যাটের শখ ছিল।

এসিজি একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে খোলা আলমারির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরকমই তিনটে হ্যাট বাইরের বাগানে পাওয়া গেছে। হয়তো মার্ডারার ও-দুটো ছুড়ে দিয়েছে ওখানে। দোতলার বারান্দার মুখ থেকে টুপিগুলো ফ্রিসবির মতো ছুড়ে দিলে ওগুলো বাতাসে ভেসে ওই জায়গায় গিয়ে পড়তে পারে।

এসিজি আলমারির লকের কাছটা একবার দেখলেন। না, আলমারিটা মোটেই জোরজবরদস্তি করে খোলা হয়নি। যে খুলেছে সে চাবি দিয়েই খুলেছে। হয় খুনি, নয়তো নিলয়বাবু নিজেই। খুনি যদি খুলে থাকে তা হলে কেন খুলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না—কারণ, বাড়ির লোকের কথামতো আলমারি থেকে কিছুই খোয়া যায়নি। তা ছাড়া খুনি যে সেখানে কিছু খুঁজেছে আলমারির তাকগুলোর চেহারা দেখে সেরকমটাও মনে হচ্ছে না।

আলমারি ছাড়া ঘরে রয়েছে তিনটে কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল, আর একটা শো-কেস। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে সেগুলো বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন অশোকচন্দ্র।

রঘুপতির দেওয়া ফাইলের কাগজ ঘেঁটেঘুঁটে আর সব দেখেশুনে বৃদ্ধ গোয়েন্দার মনে হল, নিলয় মজুমদার বেশ ভালোরকম বড়লোক ছিলেন এবং ভালোরকম কিপটে ছিলেন। তার সঙ্গে ছিল খিটখিটে মেজাজ এবং বসগিরির দাপট। এসব মানুষকে খুন করার মোটিভ অনেক সময় স্রেফ বিরক্তি আর ঘেন্না থেকে দানা বাঁধে। ফলে যাঁরা ওঁর ক্লোজ এবং সাফারার তাদেরই কেউ হয়তো এই জঘন্য কাজটা করেছে।

খুনি বাইরের লোক হওয়ার পসিবিলিটি যে একেবারে নেই তা নয়। কারণ, এ-বাড়ির চৌহদ্দির পাঁচিল যথেষ্ট খাটো। সেটা টপকে কারও পক্ষে ভেতরে ঢোকা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু তারপর? তাকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, বারান্দা, নিলয়বাবুর ঘর সবকিছু ঠিকঠাক চিনতে হবে। তারপর...তারপর...।

আবার সেই 'লকড রুম পাজল'-এ এসে ঠোক্কর খেলেন অশোকচন্দ্র।

একটা জানলার শার্সি সরিয়ে বাইরে বাগানের দিকে দেখলেন। বাউন্ডারি গেটের খানিকটা অংশ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে। গাছের ডালে দুটো কাঠবিড়ালি ছুটোছুটি করছে।

এসিজি আপনমনে বললেন, 'নিলয়বাবু যে মারা গেছেন সে ব্যাপারে কনফার্মড হওয়ার জন্যে ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট আর গ্যারোটিং। বুঝলে, রঘুপতি—' রঘুপতির দিকে ফিরে তাকালেন এসিজি। ছোট হয়ে আসা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বললেন, 'এই খুন শুধু বিরক্তি আর ঘেন্না থেকে নয়—তার সঙ্গে হয়তো রাগও মিশে ছিল। যদি দেখা যায় যে, এই খুনটার পেছনে মোটিভ শুধু টাকাপয়সা বা বিষয়আশয়, তা হলে আমরা সেই মোটিভটাকে বলি ''মার্ডার ফর গেইন''। কিন্তু আমি সবদিক অ্যানালিসিস করে দেখলাম, তার সঙ্গে ''মার্ডার ফর রিভেঞ্জ'' অ্যাঙ্গেলটাও জড়িয়ে আছে—।'

সিগারেটের টুকরোটা নিভে গিয়েছিল। ঘরে কোনও অ্যাশট্রে না থাকায় সেটা জানলা দিয়ে নীচের বাগানে ফেলে দিলেন এসিজি।

রঘুপতি বলল, 'সবই তো বুঝলাম, স্যার, বাট মার্ডারার?'

'হুঁ—মার্ডারার।' এসিজি জানলার ফ্রেমের দিকে তাকালেন : 'আচ্ছা, গলায় ফাঁস দেওয়া হয়েছে এই রাবার দিয়ে, তাই না?' প্রশ্নটা করার সময় স্লাইডিং উইন্ডোর ফ্রেমের কিনারায় লাগানো রবারের ফিতের গায়ে আঙুল ছোঁয়ালেন।

'হ্যাঁ, স্যার। মার্ডারের ব্যাপারটা হওয়ার রাফলি ফিফটিন ডেজ আগে এ-ঘরের তিনটে খিড়কিতে স্লাইডিং উইন্ডো লাগানোর হুকুম দেন মিস্টার মজুমদার। তো মিস্তিরিরা এসে সেই কাজ করে যায়। তারই স্পেয়ার রাবার টেপ হয়তো এ-ঘরে কোথাও পড়ে-টরে ছিল। তারই একটাকে মার্ডারার ইউজ করেছে...।'

এরপর স্টাডিরুমটা ঘুরেফিরে দেখলেন অশোকচন্দ্র।

ঘরটা মাপে ছোট। একটামাত্র জানলা—বাগানের দিকে। বাইরে বেরোনোর আর কোনও দরজা নেই।

ঘরে তিনটে বুক কেস। তাতে ভরতি বই। বেশিরভাগই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই—কংক্রিট, স্ট্রাকচার, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা। তবে একটা বুক কেস নানান ধর্মগ্রন্থে ঠাসা। তার মধ্যে ভারতের সাধক, কৃত্তিবাসি রামায়ণ, কাশীদাসি মহাভারত ইত্যাদি বই রয়েছে।

রঘুপতির ফাইল থেকে জানা গেছে, নিলয় মজুমদার রোজ রাতে নিয়ম করে রামায়ণ অথবা মহাভারত সুর করে পাঠ করতেন। খুন হওয়ার দিনও তিনি মহাভারত পাঠ করেছিলেন। সাবিত্রী সেটা শুনেছে। ও তখন সারাদিনের কাজ সেরে বারান্দায় বিশ্রাম করছিল। আলো নিভিয়ে নিজের মোবাইল নিয়ে খুটুরখাটুর করছিল, এক তুতো বোনকে ফোন করছিল, এ-কথা সে-কথা বলছিল। তারই মধ্যে ও সেই সুর তুলে পাঠ করা শুনেছে। দাদুবাবা তখন পাশা খেলার জায়গাটা পড়ছিলেন। মাঝখানে পড়া থামিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে আবার পড়ছিলেন। নিলয় মজুমদারকে সাবিত্রী 'দাদুবাবা' বলে ডাকত।

'চলো, রঘুপতি—এ-ঘরে আর দেখার কিছু নেই।' হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে নিলয় মজুমদারের বেডরুমে ফিরে এলেন বৃদ্ধ হুনুর। তারপর বললেন, 'এবারে এ-বাড়ির চার বাসিন্দার সঙ্গে একটু কথা বলা যাক...।'

রঘুপতি বলল, 'লেকিন গুপ্তাসাব, পুলিশ তো চারজনকে ভালোমতন ইনটারোগেট করেছে। সেসব ইনটারোগেশানের হার্ড কপি তো আমার ফাইলে ছিল—আপনি পড়িয়েছেন ভি...।'

'আঃ, রঘুপতি, ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট। আমি বুড়ো মানুষ। ওঁদের সঙ্গে একটু বকবক করতে ইচ্ছে হয়েছে তো করি না কেন?'

স্যারের কথায় রঘুপতি তিনটে চেয়ার আর একটা টেবিলকে বেডরুমের একদিকে সাজিয়ে নিল। তারই একটা চেয়ারে বসে স্যার প্রাক্তন ছাত্রকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, মার্ডার ওয়েপন—মানে, ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা পুলিশ এখনও ট্রেস করতে পারেনি, না?'

'না, স্যার—উও আভি তক মিলা নেহি।' রঘুপতির গলায় হেরে যাওয়া সুর। ও একটু আনমনাভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্যারের পাশে বসে পড়ল।

'অদ্ভুত ব্যাপার!' আপনমনেই বললেন এসিজি, 'রাবারের ফিতেটা নিলয়বাবুর গলায় এঁটে বসে রইল, অথচ মাথা ক্রাশ করার অস্ত্রটা খুনি সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল...!' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন এদিক-ওদিক।

'কিন্তু নিয়ে গিয়ে ওয়েপনটা সে লুকোবে কোথায়?'

'গাছের পাতা লুকোনোর সেরা জায়গা হল বাগান অথবা জঙ্গল।' এসিজি হেসে বললেন, 'বই লুকোনোর সেরা জায়গা হল লাইব্রেরি অথবা বইয়ের দোকান। একটা লোহার রড লুকোনোর ভালো জায়গা হল কনস্ট্রাকশন সাইট।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা একটা লোহার রড? আর তনয় মজুমদার, প্রজেন বসু রায় এঁরা তো কনস্ট্রাকশনের কাজ করে...!'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না, মাই ডিয়ার, রঘুপতি। আই অ্যাম ওনলি থিংকিং লাউডলি। যাকগে, তুমি মিস্টার তনয় মজুমদারকে একবার এ-ঘরে আসতে বলো—একটু কথা-টথা বলি...।'

রঘুপতি যাদব চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাবিত্রী একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। ট্রে-তে দু-কাপ কফি, আর দুটো প্লেটে বিস্কুট, সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ।

কাপ-প্লেটগুলো ট্রে থেকে নামিয়ে টেবিলে সাজিয়ে দিল সাবিত্রী।

'এগুলো আপনারা খেয়ে নেবেন, স্যার।'

এসিজি সাবিত্রীকে দেখছিলেন।

বেশ সুন্দর দেখতে। দেখে 'কাজের মেয়ে' বলে মনেই হয় না। মাঝারি গায়ের রং। চামড়া বেশ সজীব, তেলেতেলে। গোল মুখ। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। চোখ দুটো জ্যান্ত—যেন কথা বলছে।

সাবিত্রী একটা হলদে চুড়িদার পরেছে—তার ওপরে ছাপা রয়েছে ছোট-ছোট সাদা আর কালো ফুল। ওর মাথার চুল বেশ ঘন আর কোঁকড়ানো। তাতে একটা লাল রঙের 'বো' লাগানো রয়েছে।

'তুমি সাবিত্রী?' এসিজি ওকে জিগ্যেস করলেন। রঘুপতির ফাইলে ওর ফোটো আগেই দেখেছিলেন। সত্যিই ছবির মতো মুখ।

'হ্যাঁ, স্যার—' সাবিত্রী এসিজির দিকে সরাসরি তাকিয়ে জবাব দিল। ওর মধ্যে সংকোচের কোনও ছায়া খুঁজে পাওয়া গেল না।

রঘুপতি ওকে বলল, 'আমাদের সঙ্গে যে আরও দুজন এসেছেন...।'

'হ্যাঁ, ওনাদেরকেও কফি, সিঙ্গাড়া এসব দিয়েছি। ওনারা ড্রয়িং-এ বসেছেন।'

'সাবিত্রী, তুমি একটু বোসো—তোমার সঙ্গেই আগে কথা বলি।'

এসিজির কথায় সাবিত্রী সহজভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

অশোকচন্দ্র সিঙ্গাড়ায় কামড় দিলেন এবং চুমুক দিলেন কফির কাপে।

রঘুপতিও 'স্যার'-কে অনুসরণ করল। বিড়বিড় করে বলল, 'পেট মে চুহা দওড় রহা থা...।'

খুনের দিন সন্ধে থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঠিক কী-কী হয়েছিল সেটা এসিজি জানতে চাইলেন সাবিত্রীর কাছে।

উত্তরে সাবিত্রী যা-যা বলে গেল সেসব ইনস্পেকটর যাদবের ফাইলে আগেই পেয়েছেন অশোকচন্দ্র। তবুও ওর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

সাবিত্রী বারান্দায় শুয়েছিল। খুন নিশ্চয়ই হয়েছে অনেক রাতে। তখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। একবার ঘুমিয়ে পড়লে তারপর ওর আর কোনও হুঁশ থাকে না। সকালে উঠে দাদুবাবাকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে ও জানলার শার্সি দিয়ে উঁকি মারে। তখনই ওই ভয়ংকর দৃশ্য ও দেখতে পায়। বিছানায় একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড।

সাবিত্রী কথা বলতে-বলতে শিউরে উঠল।

'তুমি কি এখনও ওই বারান্দাতেই শুচ্ছ?' এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ভূতের ভয় নেই?'

সাবি ঘাড় নেড়ে যেন লজ্জা পেয়ে হাসল : 'হ্যাঁ, স্যার—ওখানেই শুই। আমার কোনওদিনই ভূত-পেতনির ভয়-টয় নেই। তা ছাড়া দাদুবাবা আমাকে খুব ভালোবাসত। আমি আগে বারান্দায় যেমন শুতাম, ওই মার্ডারের পর ছ'দিন শুইনি। পুলিশ বারণ করেছিল। তারপর থেকে আবার ওখানে শুই।'

'আচ্ছা, সাবি, তুমি তো পুলিশকে সবই বলেছ...' স্নেহময় বাবা যেভাবে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক সেই সুরে বলতে শুরু করলেন অশোকচন্দ্র, 'এমন কিছু কি তোমার মনে পড়ছে যেটা তোমার একটু অদ্ভুত মনে হয়েছে? ভালো করে ভেবে দ্যাখো। এমন কোনও ব্যাপার যেটা স্রেফ এলেবেলে মনে হতে পারে, বাট পিকিউলিয়ার...।'

সাবি হেসে বলল, 'ভালো করে ভাবতে হবে না, এমনিই মনে আছে। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় ভেবে পুলিশকে আর বলিনি। আপনি, স্যার, যখন জানতে চাইছেন তখন বলছি...।'

রাত্রি তখন ন'টা কি সওয়া ন'টা হবে। সাবি বারান্দায় শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিল। হঠাৎ ও শুনতে পায় দাদুবাবা মহাভারত থেকে সুর করে পাঠ করছেন। চুপচাপ শুয়ে সেই পাঠ শুনতে বেশ লাগছিল। তারপর, যুধিষ্ঠির

যখন দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় বাজি ধরলেন তখন হঠাৎই দাদুবাবা পাঠ থামিয়ে দুবার হাঁচলেন, তারপর আবার পড়তে শুরু করলেন।

'এবারে, স্যার, পিকুলিয়ার ব্যাপারটার কথা বলি...।'

একটা সময়ে দাদুবাবা মহাভারত পড়া শেষ করেছিলেন। তার পরপরই সাবি ছোটদাদাবাবুকে—মানে, তনয়কে—দাদুবাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দ্যাখে। সাবির দিকে চোখ পড়তেই অপ্রস্তুতভাবে তনয় বলেন, 'বাবা এখন ব্যস্ত। মহাভারত পড়ছেন। তার মাঝে ডিসটার্ব করলেই তো আবার খেপে যাবেন! যা-তা বলতে শুরু করবেন। যাকগে, পরে আসব'খন।'

মহাভারত পড়া শেষ হয়ে গেলে সাবিত্রী বারান্দার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। তখন ও তিনতলা থেকে কথাবার্তা হইচই শুনতে পাচ্ছিল। ছোটদাদাবাবুরা তিনজনে মিলে তাস খেলছিলেন। রোজ রাতে ওঁরা তাসের আসর বসান। কল ব্রে না কী যেন খেলেন। খেলা অনেক রাত পর্যন্ত চলে।

হয়তো এভাবে ঘণ্টাখানেক বড়জোর কেটেছিল, তারপরই সাবির হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ওর মনে হল কে যেন ওকে ডাকল। ঘুম চটে গিয়ে ও শুনতে পায়, দাদুবাবা মহাভারত পড়ছেন এবং ওই পাশা খেলার জায়গাটাই আবার পড়ছেন।

সাবিত্রীর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত লাগে। কিন্তু ও ধরে নেয় যে, ওটা খিটখিটে বুড়োর অদ্ভুত খেয়াল। ও আধোঘুমে মহাভারত শুনতে থাকে।

আলো নেভালেও বারান্দাটা কখনও তেমন অন্ধকার হয় না, কারণ, এদিক-সেদিক থেকে রাস্তার কমলা রঙের আলো ছিটকে এসে দেওয়ালে পড়ে। সেই আবছা আলোয় সাবিত্রী হঠাৎ খেয়াল করে, 'নতুন দাদাবাবু'—মানে, প্রজেন বসু রায়—দাদুবাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, দরজায় নক করবেন কি না ভাবছেন।

সাবি যে জেগে গেছে সেটা বুঝতে পেরে তিনি আপনমনেই বলেন, 'না বাবা, এখন স্যারকে ডিসটার্ব করে লাভ নেই। হয়তো ব্যাপক চটে গিয়ে চেঁচামেচি করে বাড়ি একেবারে মাথায় তুলবেন...। যাই, তাস খেলায় বসি গিয়ে। যা বলার কাল বলব'খন...।'

এই কথা বলতে-বলতে প্রজেন বসু রায় চলে যান।

তখনও মহাভারত পড়া চলছিল। একটু পরেই হাঁচির শব্দ শুনতে পায় সাবি। ও ভাবছিল, দাদুবাবা এই বোধহয় ওকে ডাকবেন, হাঁচি-কাশির ওষুধ দিতে বলবেন।

কিন্তু না, দাদুবাবা ওকে ডাকেননি।

এরপর সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর সকালবেলা...।

প্রজেন বা তনয় ব্যবসার নানান কাজে প্রায়ই নিলয়বাবুর ঘরে আসতেন। কারণ, ওঁকে জিগ্যেস না করে কোনও ডিসিশন নিলে উনি ভীষণ রেগে যেতেন। মুখে যা আসে তাই বলে অপমান করতেন। তাই প্রজেন এবং তনয় সবসময় খুব চাপে থাকতেন।

সেদিন রাতে ওঁরা দুজনে যে দাদুবাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সেটা সাবি পুলিশকে প্রথমেই জানিয়েছিল। পুলিশের রিপোর্টে সে-কথা লেখা আছে। যেটা নেই সেটা হল দুবার মহাভারত পড়ার পিকিউলিয়ার ব্যাপারটা।

এসিজি সেটা নিয়েই একটু ভাবছিলেন।

রঘুপতি আড়চোখে স্যারের দিকে তাকাল। লক্ষ করল, স্যারের ভুরু কুঁচকে গেছে। শূন্য নজরে তাকিয়ে আছেন একটা জানলার দিকে।

সাবিত্রীর আর কিছু বলার ছিল না। তাই এসিজি ওকে বললেন, 'এবারে তুমি এসো, সাবি—।'

সাবিত্রী চলে গেল। যাওয়ার আগে প্লেটগুলোর দিকে ইশারা করে বলে গেল, 'সব খেতে হবে কিন্তু—।'

'গুপ্তাসাব, কিছু বোঝা গেল?' রঘুপতি আলতো গলায় জিগ্যেস করল।

'হুঁ..' আনমনাভাবে বললেন এসিজি, 'কিছু-কিছু তো বোঝা গেল অবশ্যই।'

একটু পরে বললেন, 'আচ্ছা, রঘুপতি, একটা ব্যাপার তুমি নোট করেছ?'

'কী, স্যার?'

'এই মার্ডার কেসটায় বড্ড বেশি ক্লু। আর তার সঙ্গে আনন্যাচারাল সব কাণ্ড।'

'মতলব?'

'মতলব, রঘুপতি, টু মেনি ক্লুজ। টু মেনি পয়েন্টার্স। দ্যাখো, প্রথমেই হচ্ছে, মালটিপল মার্ডার মিনস : গলায় ফাঁস দেওয়া, আর তার সঙ্গে মাথার পেছনে ভারী কিছু দিয়ে জোরে হিট করা। অথচ নিলয়বাবু ওয়জ অ্যান ওল্ড ম্যান—চুয়াত্তর বছর বয়েস ছিল ওঁর। তারপর, রাবার স্ট্রিপটা ডেডবডির গলায় শক্ত করে এঁটে রইল, বাট ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা মার্ডারার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। নেক্সট হচ্ছে, লকড রুম মিস্ট্রি। একটা দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি আঁটা, আর অন্য দরজাটা বাইরে থেকে হাঁসকল এঁটে তাতে প্যাডলক ঝোলানো—সেই প্যাডলকের চাবি আবার নিলয়বাবুর বিছানায়। ঘরের তিনটে জানলাতেই গ্রিল দেওয়া এবং জানলার স্লাইডিং গ্লাস উইন্ডো ঘরের ভেতর দিকে থেকে আটকানো। নিলয় মজুমদারের আলমারি খোলা, কিন্তু কিছু খোয়া যায়নি। শুধু আলমারি থেকে তিনটে টুপি নিয়ে খুনি বাইরের বাগানে ছুড়ে ফেলে গেছে।

'এসবের মানে কী, রঘুপতি? এতগুলো ব্যাপারকে আমরা যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে কোরিলেট করব কেমন করে? তার ওপর তো সাবিত্রীর বলা পিকিউলিয়ার ব্যাপারটা আছেই। নাঃ, কিছু একটা উত্তর বের করতেই হবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এসিজি। মাথার পিছনের সাদা চুলের গোছা ধরে কয়েকবার টান মারলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

রঘুপতি ওর প্রাক্তন স্যারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হাতঘড়ির দিকে একপলক চোখ রেখে স্যারকে জিগ্যেস করল, 'স্যার, তনয় মজুমদারকো বুলায়ে কেয়া?'

'হ্যাঁ, ডাকো—।'

তনয় মজুমদার নিলয়ের ঘরে এলেন মিনিট-পাঁচেক পরেই। সকালে যে-পোশাক পরে তিনি এসিজিদের মুখোমুখি হয়েছেন এখনও সেই পোশাকই পরে আছেন।

তনয় থিতু হয়ে বসার পর এসিজি বললেন, 'সবকথাই তো পুলিশকে আপনি বলেছেন। সেসব রিপোর্ট আমি দেখেছি। আপনার নতুন কিছু বলার থাকলে বলুন...।'

'নতুন কথা আর কী বলব!' একটা লম্বা শ্বাস ফেলে তনয় বললেন। ওঁর কিছু জানা নেই, আর কে ওঁর বাবাকে খুন করতে পারে সে-বিষয়ে ওঁর কোনওরকম ধারণাও নেই। খুনটা যে-সময়ে হয়েছে বলে পুলিশের আইডিয়া, সেসময়ে তিনি তাস খেলায় বিজি ছিলেন। ওই তাসই ওঁর একমাত্র নেশা।

বাইরে থেকে কেউ এসে নিলয়বাবুকে খুন করতে পারে কি না, এ-প্রশ্নের জবাবে তনয় বলেছেন, এ-বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালটা খাটো। বাইরে থেকে কোনও আততায়ী সহজেই পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। না, নিলয়ের কোনও শত্রু ছিল বলে ওঁর জানা নেই। তবে নিলয় খুব মাথাগরম রগচটা মানুষ ছিলেন। হয়তো নিজের ব্যবহারের জন্য কোনও শত্রুর জন্ম দিয়ে থাকতে পারেন।

তনয় আর প্রজেন মিলে 'নিলয় কনস্ট্রাকশনস'-এর কাজ দেখত। তবে নিলয়ের কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল না নিয়ে কোম্পানির একটি কাজও করা যেত না।

'বাবা ব্যবসা ছেড়েও দেবেন, আবার ছেড়েও দেবেন না।'

এটা একটা দম আটকানো অবস্থা ছিল। প্রজেন আর তনয় বলতে গেলে রোজ পালা করে নিলয়ের হাতে অপমানিত হতেন।

না, খুনি ধরা পড়ল কি পড়ল না এ নিয়ে তনয়ের কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তনয়ের কথার ভঙ্গিতে ওঁকে বেশ বিরক্ত বলে মনে হল।

খুনের দিন রাতে নিলয় মজুমদার দুবার মহাভারত পড়েছিলেন কেন সে ব্যাপারে তনয়ের কোনও আইডিয়া নেই। তবে একই অংশ দুবার পড়েছেন শুনে তনয় একটু অবাক হল। তারপর তেতো হেসে বলল, 'বাবার খেয়াল! এ নিয়ে কোনও কথা বলা যাবে না। হি ওয়জ দ্য বস।'

তনয় মজুমদার চলে যাওয়ার পর রঘুপতি প্রজেন বসু রায়কে খবর পাঠাল।

এমন সময় রঘুপতির মোবাইল ফোনে সুরেলা মিউজিক বেজে উঠল : ফোন এসেছে। রঘুপতি পকেট থেকে ফোনটা বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকাল। ওর এক জুনিয়ার সহকর্মীর ফোন। বসুমিত্র জানা।

রঘুপতি কলটা রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো, জানা—আমি আজ একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশানের কাজে নিউ আলিপুরে এসেছি। একটু বিজি আছি। কাল অফিসে গিয়ে তোমার সঙ্গে ডিসকাস করি?'

ওপাশ থেকে বসুমিত্র জানা কী বললেন সেটা শোনা গেল না। তবে রঘুপতি বারদুয়েক মাথা নাড়ল। শেষে 'ও. কে.' বলে রিসেট বোতাম টিপে দিল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত রঘুপতির মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আধুনিক ডিজাইনের স্মার্টফোন। রঘুপতি অল্পসল্প শৌখিন মানুষ।

হঠাৎই এসিজি উত্তেজিত হয়ে রঘুপতিকে কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু প্রজেন বসু রায় ঘরে ঢুকে পড়ায় নিজেকে সামলে নিলেন।

প্রজেনের চেহারা লম্বা-চওড়া, রোদে জলে পোড় খাওয়া। বয়েস চল্লিশের খারাপ দিকে। রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখা নাক, চোখে চশমা, হাতে বেশ বড় মাপের মোবাইল ফোন। সেটা থেকে একটা তার বেরিয়ে ওঁর ডানকানে গিয়ে ঢুকেছে। অন্য কানের ফুটোটা দয়া করে খোলা রয়েছে এসিজিদের কথা শোনার জন্য।

প্রজেনের গায়ে গোলাপি রঙের একটা রাউন্ড নেক টি-শার্ট, পায়ে পাজামা আর প্যান্টের মাঝামাঝি একটা ক্যাজুয়াল উইয়্যার।

ওঁর হাবভাব অথবা চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা উদ্ধত মাত্রা আছে।

এসিজি প্রজেনকে বসতে বললেন। আড়চোখে খেয়াল করলেন, রঘুপতির চোখে-মুখে একটা অপছন্দ অথবা বিরক্তির ছাপ।

ফাইলে দেখা ফোটোগ্রাফের সঙ্গে প্রজেন বসু রায়ের চেহারা মিলে গেলেও এই উদ্ধত ভাবভঙ্গিটা ফোটোগ্রাফে ধরা পড়েনি।

প্রজেন চেয়ারে বসে বললেন; 'এতদিন পরে আবার পুলিশ! বলুন কী বলবেন।'

রঘুপতি বলল, 'পহেলে কান কা তার খোল লিজিয়ে...।'

প্রজেন একটু অবাক হয়ে রঘুপতির দিকে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে গেছে। প্রশ্ন জেগে উঠেছে ওঁর চোখে, যার অর্থ 'হু দ্য হেল আর ইউ?'

রঘুপতি অশোকচন্দ্র গুপ্তর পরিচয় দিল। তারপর নিজের পরিচয় দিল : 'ইনস্পেকটর রঘুপতি যাদব। হোমিসাইড স্কোয়াড, লালবাজার। নাউ টেক দ্য ব্লাডি ইয়ার প্লাগ অফ।'

কথার সুরে এসিজি বুঝলেন, রিখটার স্কেলে রঘুপতির টেম্পার চড়ছে।

এসিজি তাড়াতাড়ি প্রজেনকে বললেন, 'ইনস্পেকটর যাদবের ধৈর্য খুব কম। কানের ছিপিটা জলদি খুলে ফেলুন...নইলে রঘুপতি ওটা টান মেরে খুলে দেবে। সেটা আপনার ভালো লাগবে না।'

এ-কথায় প্রজেন কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি ইয়ার প্লাগটা খুলে ফেললেন।

প্রজেনের স্টেটমেন্ট এবং ইনটারোগেশানের ট্রানস্ক্রিপশান এসিজি রঘুপতির দেওয়া ফাইল থেকে পড়েছেন। খুনের দিন রাতে প্রজেনও সেরকম কিছু দেখেননি বা শোনেননি।

সত্যি, এঁদের সবারই অবস্থা সেই বিখ্যাত তিনটি বানরের মতো : একজনের চোখে হাত চাপা দেওয়া, একজনের ঠোঁটের ওপরে, আর একজনের দু-কানে আঙুল গোঁজা।

এসিজি প্রজেনকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি তো ''নিলয় কনস্ট্রাকশনস''-এর ম্যানেজার এবং টুয়েন্টি পারসেন্টের পার্টনার...?'

প্রজেন চুপ করে রইলেন।

'কী, কিছু বলুন...।'

'এটা কি কনফার্ম করতে হবে নাকি? আগে তো বহুবার বলেছি যে, হ্যাঁ।'

'আপনি যে এই মজুমদার বাড়িতে থাকেন তাতে আপনার অস্বস্তি হয় না, খারাপ লাগে না?'

'কেন? খারাপ লাগবে কেন? এটা তো আমার রাইট—অধিকার। কেন, আপনারা জানেন না, আমার বাবা ব্রজেন বসু রায় কী ভাবে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন? এবং হু ওয়জ রেসপনসিবল ফর দ্যাট ব্লাডি অ্যাক্সিডেন্ট?'

'এখন তো নিলয় মজুমদার মারা গেছেন। হি ডায়েড ভায়োলেন্টলি।' একটু চুপ করে রইলেন এসিজি। তারপর : 'এখন আপনি কী করবেন ভাবছেন? এ-বাড়িতে থাকার ব্যাপারটা কনটিনিউ করবেন, নাকি অন্য কোনও অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা ভাবছেন?'

'হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছেন? অন্য কোনও অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা ভাবতে যাব কেন? এখন তো এ-বাড়িটা অনেক বেশি পিসফুল। সবচেয়ে বাজে লোকটাই তো চলে গেছে।'

'এভাবে কথা বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? একজন বয়স্ক রেসপেক্টেবল মানুষ...ওরকম ব্রুটালি খুন হয়ে গেলেন...।'

'অনেক আগেই ওঁর ব্রুটালি খুন হওয়া উচিত ছিল। আর রেসপেক্টেবল! রেসপেক্ট মাই ফুট! আপনি জানেন, নিলয়বাবু ডেইলি বেসিসে আমাকে কী রেটে ইনসাল্ট করতেন? ছোট-বড় যে-কোনও কাজ করতে গেলেই ওঁর কাছ থেকে আগে পারমিশান নিতে হত!'

রঘুপতি প্রজেনের হাতের দিকে দেখছিল। শিরা বের করা শক্তসমর্থ হাত। এ-হাতে শক্তির কোনও ঘাটতি নেই।

এসিজি প্রজেনকে জিগ্যেস করলেন, 'খুনের দিন রাতে আপনি মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি মহাভারত পড়ছিলেন...।'

'হ্যাঁ, আমাকে উনি দেখা করতে বসেছিলেন। তনয়ের ঘরে বসে আমরা তখন কল ব্রে খেলছিলাম। খেলার মাঝেই আমি দশ মিনিট সময় চেয়ে উঠে যাই। বাট উনি তখন বিজি ছিলেন—ওই রামায়ণ বা মহাভারত কিছু একটা পড়ছিলেন। তাই আমি আর ডিসটার্ব করিনি। যা খ্যাঁচখেঁচে পাবলিক!'

প্রজেনকে আর কিছু জিগ্যেস করার ছিল না। এসিজি ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে-মনে কিছু একটা হিসেব কষছিলেন।

'আমি কি এবার যেতে পারি?' প্রজেন জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—অবশ্যই যেতে পারেন।'

'থ্যাংক ইউ—' বলে প্রজেন উঠে দাঁড়ালেন। রঘুপতি যাদবের দিকে একবার ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেতে-যেতে ডানকানে ইয়ার প্লাগটা আবার গুঁজে নিলেন।

বেলা যে অনেক বেড়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না মেঘের জন্য। এখন জানলার বাইরে তাকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও চোখে পড়ছে।

রঘুপতি মাথার ওপরে ঘুরে চলা সিলিং ফ্যানটার দিকে একবার তাকাল। 'ওর বোধহয় গরম লাগছে,' এসিজি ভাবলেন।

নিজামুল হকসাহেব দরজায় এসে উঁকি দিলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কী, সার, কতদূর? বসে-বসে তো বোর হয়ে গেলাম—।'

এসিজি পালটা হেসে বললেন, 'মনে হয় ব্যাপারটা একটু-একটু ধরতে পেরেছি। আসলে লকড রুম পাজলটা সলভ করার পরই আসল সলিউশানটা আবছাভাবে সামনে চলে এসেছে।'

রঘুপতি উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইল, 'সচমুচ, স্যার?'

এসিজি পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'টুনি মজুমদারের সঙ্গে একটু কথা সেরে নিই, তারপর তোমাদের বলব বন্ধ ঘরের পাজলের সলিউশান। তারপর মার্ডারারকে জালে তোলা তোমার আর ও. সি.-সাহেবের কাজ।'

নিজামুল হক হেসে বললেন, 'শয়তানটার দিকে একবার ইশারা করেই দেখুন না, সার। জালে তুলে এমন মেডিসিন দেব যে, গড়গড় করে সব উগরে দেবে। তার ওপরে ইনস্পেকটর যাদববাবুও তো রয়েছেন...।'

রঘুপতি বলল, 'স্যার, একটু জলদি করুন—অলরেডি দুটো বেজে গেছে। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে।'

'বুঝতে পারছি, রঘুপতি। বাট আর-একটু—বড়জোর হাফ অ্যান আওয়ার কি ওয়ান আওয়ার...প্লিজ!'

সিগারেটে পরপর তিনটে টান দিয়ে সেটা টেবিলের পায়ায় ঘষে নিভিয়ে দিলেন এসিজি। কারণ, টুনি মজুমদার এখুনি আসবেন। কোনও মহিলার সামনে স্মোক করাটা শিষ্টাচার নয়।

নিভে যাওয়া সিগারেটটা নিয়ে এসিজি উঠে গেলেন জানলার কাছে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ফেলে দিলেন বাগানে।

রঘুপতি মিসেস মজুমদারকে খবর দেওয়ার জন্য নিজামুলকে রিকোয়েস্ট করল। হকসাহেব চোখ মটকে হেসে চলে গেলেন।

একটু পরে টুনি মজুমদার যখন এলেন তখন হকসাহেবের চাউনি এবং হাসির মানে বোঝা গেল।

টুনি মজুমদার লাল, সবুজ এবং হলুদ রঙের গডি কম্বিনেশনের একটা পাতিয়ালা চুড়িদার পরেছেন। তার সঙ্গে চড়া দাগের সাজগোজ। সব মিলিয়ে আপাদমস্তক মেকাপ এবং ফ্যাশনের চলমান বিজ্ঞাপন। এই ঘোর দুপুরে যে এরকম উৎকট সাজগোজ করে বাড়িতে ঘোরাঘুরি করা যায় সেটা এসিজি কিংবা রঘুপতির আগে জানা ছিল না। অবশ্য এও হতে পারে যে, এ-ঘরে ডাক পাওয়ার জন্য উনি সাজগোজ করে তৈরি হচ্ছিলেন। সাজগোজ ছাড়াও পারফিউমের উৎকট গন্ধে এসিজিদের দম বন্ধ হয়ে এল।

টুনির আবির্ভাবের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে এসিজি ওঁকে বসতে বললেন। লক্ষ করলেন, রঘুপতির ভুরু কুঁচকে গেছে। এবং সেই অবস্থাতেই ও ফ্রিজ শট হয়ে আছে।

রঘুপতি টুনিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

টুনি মজুমদারের বয়েস বত্তিরিশ কি তেত্তিরিশ হবে। কিন্তু সাজগোজ আর হাবভাবে কচি সেজে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা বেশ নজরে পড়ছে।

রঘুপতির দেওয়া ফাইল খুঁটিয়ে পড়ে এসিজি টুনি মজুমদার সম্পর্কে যেটুকু বুঝেছেন সেটা হল, এই ফ্যাশনদুরস্ত মহিলা মজুমদারবাড়ির সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, এমনকী সাত আর পাঁচের যোগফল বারোতেও নেই।

পুলিশের যে-কোনও কোশ্চেনের উত্তরে ওঁর স্ট্যান্ডার্ড রেসপন্সগুলো হল : 'জানি না', 'দেখিনি', 'শুনিনি' আর 'মনে নেই'। সত্যি, তিন বানরকে হার মানানোর মতো।

ভদ্রমহিলা অকারণে নিজের বুটিক নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিলেন। এ-বাড়ির মালিক নিলয় মজুমদার নামের মানুষটা যে বাইশ দিন আগে ব্রুটালি মার্ডারড হয়ে গেছে সেটা যেন ওঁর মাথাতেই কখনও ঢোকেনি। এই ভদ্রমহিলাকেই এসিজির সবার সেরা ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট বলে মনে হল। তনয় মজুমদার এই অদ্ভুত 'জিনিস'-টিকে নিয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন সেটা ভেবে এসিজি শিউরে উঠলেন।

টুনি মজুমদারের কাছ থেকে সেরকম কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। শুধু এটুকু জানা গেল যে, দিনের বেশিরভাগ সময়টাই তিনি বাইরে ব্যস্ত থাকেন। এত ব্যস্ত যে, তনয়ের সঙ্গে ওঁর দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা

খুবই কম হয়। নেহাত একই বাড়িতে থাকেন বলে দেখা হয়। আর রোজ রাতে তিনি তনয় এবং প্রজেনবাবুর সঙ্গে তাস খেলতে বসেন। তখনই যেটুকু আড্ডা, হুল্লোড় কিংবা কথাবার্তা হয়।

এসিজি জানতে চাইলেন, নিলয় মজুমদার শ্বশুর হিসেবে কেমন ছিলেন।

উত্তরে এসিজির দিকে কয়েকসেকেন্ড স্থির নজরে তাকিয়ে রইলেন টুনি।

এসিজি হঠাৎই ভাবলেন, টুনি ওর চার্মের স্পেল দিয়ে এসিজিকে হিপনোটাইজ করতে চাইছেন কি না। সন্দেহ নেই, অশোকচন্দ্র যথেষ্ট বৃদ্ধ এবং এসব চার্ম-টার্ম-এর রিং-এর বাইরে চলে গেছেন বহুবছর। কিন্তু তবুও ওঁর নজরটা যেন কেমন-কেমন—কোথাও যেন একটা গোপন নষ্টামির ছোঁয়া লেগে আছে।

'শ্বশুর হিসেবে কেমন ছিলেন জানতে চাইছেন?' চোখ সরু করলেন টুনি : 'উনি শ্বশুর ছিলেন না—উনি ছিলেন মহা-শ্বশুর।'

ওঁর কথা বলার ঢঙে যথেষ্ট ঘেন্না এবং বিরক্তির উপাদান টের পেলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দা। ওর মনে হল, নিলয় মজুমদারের জন্য এঁদের কারও মনেই বোধহয় একফোঁটা ভালোবাসা কিংবা শ্রদ্ধা ছিল না।

'মহা-শ্বশুর মানে?' এসিজি শব্দটার মর্মার্থ বুঝতে চাইলেন।

'যা মানে, তাই...।' একটু বাঁকা সুরে মন্তব্য করলেন টুনি।

রঘুপতি এসিজির দিকে তাকাল। যার মানে, ভদ্রমহিলার এই বাঁকা কথার স্টাইলকে সবক শেখাতে রঘুপতি ওর নিজস্ব স্টাইলে কোনও স্টেপ নেবে কি না।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত চোখের ইশারায় রঘুপতিকে শান্ত থাকতে বললেন। তারপর টুনির দিকে সরাসরি চোখ রেখে জানতে চাইলেন, 'শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আপনার রিলেশান কেমন ছিল?'

'ভালো—বিকজ সেরকম কোনও রিলেশানই তো ছিল না যে খারাপ-টারাপ হবে। আমার বুটিক দেখতে আসার জন্যে বহুবার ওঁকে ইনভাইট করেছিলাম, কিন্তু ওঁর টাইম হয়নি। আমার বুটিকে যেসব ড্রেস আমি ডিসপ্লে করি সেগুলোর মেটিরিয়াল আর ডিজাইন দেখলে আপনি স্টানড হয়ে যাবেন। বড়-বড় ব্র্যান্ডের ডিজাইনার ড্রেসও আমার বুটিকের আইটেমের কাছে হার মেনে যাবে। আমাদের ইউ. এস. পি. কী জানেন? আমরা...।'

এসিজি আর বাধা না দিয়ে পারলেন না। বললেন, 'প্লিজ, ম্যাডাম, এখন আমার ''শিবের গীত'' শোনার সময় নেই। পরে কখনও শুনব...।'

' ''শিবের গীত'' মানে?' টুনির ভুরু কুঁচকে গেল।

'ও আপনি বুঝবেন না—' এসিজি হাসলেন। তারপর : 'আচ্ছা, বলুন তো, নিলয়বাবুকে কে বা কারা এরকম নৃশংসভাবে মার্ডার করতে পারে?'

টুনি মজুমদার উত্তরটা ভাবার জন্য এতটুকুও সময় নিলেন না। ফস করে বলে উঠলেন, 'যে-কেউ খুন করতে পারে। ওনার বিহেভিয়ার এত খারাপ ছিল যে আর বলার নয়। মানুষকে মানুষ বলে মনে করতেন না—বলতে গেলে জন্তুর মতো ব্যবহার করতেন। শাশুড়ি-মা চলে যাওয়ার পর থেকে ওনার ব্যবহার একেবারে যা-তা হয়ে গেছে...।'

এসিজি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো নিলয় মজুমদারের ফোটোগুলোর ওপরে চোখ বোলালেন একবার। তারপর : 'আচ্ছা, মিসেস মজুমদার, নিলয়বাবুর মার্ডারার কি বাইরে থেকে পাঁচিল ডিঙিয়ে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

টুনি পোশাকের ভাঁজ ঠিক করতে-করতে নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন, 'আসতে পারে—অবশ্যই আসতে পারে। আমাদের বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালটা যেরকম শর্ট হাইটের! আমার তো মনে হয় এটা একটা স্ট্রং পসিবিলিটি...।'

একটু থেমে টুনি আবার মুখ খুললেন, 'স্যার, আপনার নামটা কী যেন বললেন?'

অশোকচন্দ্র একটা বিরক্তির শ্বাস ফেলে বললেন, 'অশোকচন্দ্র গুপ্ত...।'

'তো হ্যাঁ, অশোকস্যার, এই যে-ড্রেসটা আমি পরে আছি, এটা আমার নিজের ডিজাইন করা। দারুণ হয়েছে না? এটা আসলে...।'

ওঁর বকবকানি চলতেই লাগল।

এসিজির ধৈর্যের জন্য রঘুপতি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সেই এসিজি টুনি মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ধৈর্য হারালেন এবং কথাবার্তার চ্যাপ্টার আচমকাই ক্লোজ করলেন।

টুনি চলে যাওয়ার পর রঘুপতি ঠাট্টার সুরে ওর প্রাক্তন স্যারকে বলল, 'স্যার, ইয়ে আনোখা এক্সপিরিয়েন্স আপকো ক্যায়সা লগা?'

এসিজি হেসে বললেন, 'লাজবাব।' তারপরই মাথা পিছনে হেলিয়ে ঘাড়ের কাছে ঝুলে পড়া চুলের গোছায় টান মেরে বললেন, 'রঘুপতি, এবারে লাস্ট চ্যাপ্টারের জন্যে তৈরি হও। ও. সি. সাহেবকে এ-ঘরে ডেকে নাও। আমরা তিনজন এই মার্ডার মিস্ট্রির সলিউশান নিয়ে ডিসকাস করব। তারপর ঠিক করব কী করে মার্ডারারকে ট্র্যাপ করব...আর সবার শেষে এই ঘরে ডেকে নেব চারজন সাসপেক্টকে—তনয় মজুমদার, টুনি মজুমদার, প্রজেন বসু রায় আর সাবি, মানে সাবিত্রীকে।'

'সাবিত্রীও সাসপেক্ট, স্যার?'

'অবশ্যই। ও কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ-কাজটা করে থাকতে পারে। এ দুনিয়ায় ইমপসিবল বলে কিছু নেই, রঘুপতি...।'

'ও. কে., স্যার—আমি হকসাহেবকে ডেকে নিয়ে আসছি। বাট সত্যিই কি এটা লাস্ট চ্যাপ্টার?'

'আমরা তো তাই মনে হচ্ছে...।'

একটু হেসে রঘুপতি যাদব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে চারটের ঘর ছাড়িয়ে পাঁচটার দিকে গড়িয়ে চলেছে। আকাশে এত মেঘ জমেছে যে, সূর্যের আলো এর মধ্যেই মলিন হয়ে চারপাশে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। এর আগে দু-একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তবে এখন মনে হয় মুষলধারে বৃষ্টির আয়োজন চলছে। একবার শুরু হলেই সবকিছু ভাসিয়ে দেবে।

রঘুপতি বেশ কয়েকবার তাড়া দিলেও অশোকচন্দ্র কাজ সেভাবে সংক্ষেপ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকের তদারকিতে এসিজিরা চারজন স্যান্ডউইচ ইত্যাদি দিয়ে 'ওয়ার্কিং লাঞ্চ' জাতীয় ব্যাপারটা সেরে নিয়েছেন।

নিলয়বাবুর বেডরুমের সবক'টা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। ঘরের একমাত্র টেবিলকে ঘিরে তিনটে চেয়ারে বসে আছেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত, নিজামুল হক, আর রঘুপতি যাদব। এসিজি বসেছেন মাঝখানের চেয়ারে, বাকি দুজন ওঁর দুপাশে। এসিজি শান্ত দৃষ্টিতে ঘরের বাকি চারজনকে পালা করে লক্ষ করছিলেন।

ঘরের একমাত্র দরজার কাছে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কনস্টেবল ভগবান মিস্ত্রি।

নিলয় মজুমদারের বিছানায় পাশাপাশি বসে আছেন তিনজন : তনয় মজুমদার, টুনি মজুমদার, আর প্রজেন বসু রায়। চতুর্থজন সাবিত্রী। ওকে বসতে বলা হলেও ও বসেনি। স্টাডিরুমের দরজার কাছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শাড়ির আঁচলে কী কারণে যেন আঁচড় কাটছে।

চারজনের হাতেই মোবাইল ফোন। অশোকচন্দ্র কিছু বলা শুরু করবেন তারই অপেক্ষায় রয়েছেন চারজন। মোবাইল ফোন নাড়াচাড়া করে ওরা সেই অপেক্ষার সময়টুকু পার করছেন।

রঘুপতি যখন চারজনকে এ-ঘরে আসার জন্য বলেছে, তখন জানিয়েছে, 'আপনারা আপনাদের পারসোনাল মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে আসবেন—মানে, যে-ফোনটা আপনারা রেগুলার ইউজ করেন। আমি

আপনাদের ফোনের কল হিস্ট্রি চেক করে দেখব যে, সেখানে কারেন্ট আউটগোয়িং আর ইনকামিং কলের ঠিকঠাক লিস্ট আছে কি না...।'

রঘুপতি যাদবের এই ইনস্ট্রাকশনের আড়ালে একটা চাপা থ্রেট ছিল। সেই কারণেই কেউ নির্দেশ অমান্য করতে ভরসা পায়নি।

প্রজেন একবার শুধু প্রোটেস্ট করে বলেছিলেন, 'মোবাইল ফোন আমাদের প্রাইভেট প্রপার্টি—আমাদের পারসোনাল ব্যাপার। আমাদের প্রাইভেসি আপনি এভাবে ডিসটার্ব করতে পারেন না, অফিসার। আপনাকে আপনার হায়ার অথরিটির কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসতে হবে।'

'তাই নাকি?' প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছে রঘুপতি : 'মিস্টার প্রজেন বসু রায়, পুলিশ আপনাকে কতরকমভাবে ডিসটার্ব করতে পারে তার কোনও আইডিয়া আপনার নেই। আর এই রঘুপতি যাদব আরও কতরকমভাবে আপনাকে সুপারডিসটার্ব করতে পারে তার থোড়াবহত আইডিয়া দিলে আপনার হাওয়া বেরিয়ে যাবে। ছিবড়েটা মেঝেতে পড়ে থাকবে। আর আপনি আমাকে হায়ার অথরিটি দেখাচ্ছেন? এই কেসের ইনভেস্টিগেশানে আমিই হায়ার অথরিটি, আমিই লোয়ার অথরিটি। অ্যাট লিস্ট আজ, এই স্পটে। সো ডু অ্যাজ ইউ আর ইনস্ট্রাকটেড। ডোন্ট ফোর্স মি টু ফোর্স ইউ।'

রঘুপতির এই হুমকির পর আর কোনও সমস্যা হয়নি।

নিজামুল হক দাড়িতে আলতো করে হাত বুলিয়ে এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিন, গুপ্তসাহেব, এবারে স্টার্ট করেন...।'

এসিজি একবার ওঁর দিকে দেখলেন। নিজামুলের কপালে দু-চারফোঁটা ঘাম। তেলতেলে মুখ আর কপাল আলো পড়ে চকচক করছে। ভদ্রলোক রীতিমতো উৎসুক মুখে অশোকচন্দ্রের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাড়ির সকলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করার পর এসিজির মাথায় বয়ে চলেছে চিন্তা, যুক্তি আর বিশ্লেষণের স্রোত। এ ছাড়া এসিজি নিলয় মজুমদারের বেডরুম এবং স্টাডি আবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তারপর বাইরের বারান্দায় গেছেন। বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন। বারান্দায় লাগানো লোহার জাল পরীক্ষা করেছেন বারবার—বিশেষ করে কাটা জায়গাটা।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, খুনি যদি বাইরের কেউ হয় তা হলে সে ওই লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এসেছিল। তারপর কাতুরি জাতীয় কোনও জিনিস দিয়ে লোহার জাল কাটতে চেষ্টা করে। জাল খানিকটা কাটলেও শেষ পর্যন্ত সুবিধে করতে না পেরে সে সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে যায়। বারান্দার অন্য প্রান্তের একটা ছোট ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকে। এভাবে কসরত করে ঢুকে থাকলে খুনির গা-হাত-পা ছড়ে যাওয়ার কথা।

এসিজি খুনির অ্যাক্টিভিটি মনে-মনে রিকনস্ট্রাকট করার চেষ্টা করছিলেন।

খুনি চুপিসাড়ে এসে নিলয় মজুমদারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দার একপ্রান্তে সাবিত্রী গভীর ঘুমে ডুবে আছে। খুনি আলতো করে দরজায় টোকা দিল। নিলয়বাবু যখন তার পরিচয় জিগ্যেস করলেন তখন খুনি চাপা গলায় নিজের নাম বলল, কিংবা নিলয়বাবুর চেনা অন্য কারও নাম বলল—যাতে উনি দরজা খুলে দেন। কিন্তু তারপর?

নিলয় মজুমদারকে নৃশংসভাবে খুন করার পর খুনি আবার চুপিসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তারপর ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করল কে? সে যদি খুনির সহকারী হয়, তা হলে সে বেরোল কোথা দিয়ে? সবাই শুরু থেকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা বা বেরোনোর কথা ভাবছে, কিন্তু দরজা না হয়ে ব্যাপারটা যদি জানলা হয়? যদি জানলা দিয়ে খুনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে থাকে? স্লাইডিং গ্লাস উইন্ডো কিংবা লোহার গ্রিলের মধ্যে যদি কোনও কারসাজি থাকে?

সেইজন্যই এসিজি দরজার পাশাপাশি জানলাগুলোও চুলচেরা পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু না, ওগুলোর মধ্যে কোনও ফাঁক বা ফাঁকি পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, নিলয় মজুমদারের ঘরের দরজা এবং জানলা অর্থোডক্স এবং ট্যাম্পারফ্রি।

সুতরাং, চিন্তা, যুক্তি আর বিশ্লেষণ এই নিয়েই 'থিংকিং মেশিন' বহুক্ষণ ব্যস্ত থেকেছেন। চোখ বুজে সিগারেটে টান দিয়ে গেছেন একের পর এক।

আচ্ছা, খুনি যদি ভেতরের লোক হয় তা হলে 'অপারেশান'-টা হয়েছে কীভাবে? বাইরের খুনি যেভাবে কাজ সেরেছে সেই একইরকমভাবে—এক্ষেত্রে শুধু পাঁচিল ডিঙিয়ে জাল কেটে বাইরে থেকে বাড়িতে ঢোকার ব্যাপারটুকু বাদ দিতে হবে।

তবে খুনি বাইরের লোক হোক কিংবা ভেতরের লোক, নিলয় মজুমদারের মাথায় বসানোর জন্য ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা সে সঙ্গে করে নিয়েই নিলয়বাবুর ঘরে ঢুকেছিল। কারণ, ঘরের মধ্যে ওরকম কোনও হাতিয়ার পাওয়া যাবে কি না সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল না।

মনে-মনে টুকরো চিন্তাগুলোকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তারপর বলতে শুরু করলেন।

'নিলয় মজুমদারের মার্ডারটা একটা প্রিমেডিটেটেড মার্ডার—মানে, খুনি আগে থেকে পরিকল্পনা করে তারপর কাজে নেমেছে।' এসিজি মাথা ঝুঁকিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। সরু সুতোর মতো ধোঁয়ার কয়েকটা রেখা বাতাসে ভাসিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'মোটিভের দিকটা চিন্তা করে বলা যায়, এই মার্ডারটা হচ্ছে মার্ডার ফর গেইন। তবে তার সঙ্গে আলতো করে জড়িয়ে আছে প্রতিশোধের একটা ডায়মেনশান। হয়তো এই প্রতিশোধের ডায়মেনশানটা থাকার দরুণই খুনি অমন নৃশংসভাবে চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষটিকে খুন করেছে। প্রথমে ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে, শক্তপোক্ত একটা হাতিয়ার দিয়ে নিলয়বাবুর মাথায় প্রচণ্ড জোরে হিট করেছে। তারপর দু-পাঁচমিনিটের মধ্যেই ওঁর গলায় রবারের ফাঁস এটে দিয়েছে। অতিরিক্ত রক্তপাত, আর দমবন্ধ হওয়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হার্ট জবাব দিয়ে দিয়েছে। পুলিশের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এই তথ্যই জানিয়েছে।

'এই মার্ডারটার একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টু মেনি ক্লুজ—বড্ড বেশি সূত্র। ইনস্পেকটর রঘুপতি যাদবের কাছে আমি এই মন্তব্য আগে করেছি। আর একইসঙ্গে আমার মনে হয়েছে, খুনি যেন ইচ্ছে করে অনেকগুলো ধাঁধা ছড়িয়ে গেছে পুলিশের জন্যে। আর এতরকম ধাঁধা ছড়ানো আছে বলেই খুনের এক্সিকিউশানের প্যাটার্নটা আমাদের চোখে পড়ছে না।' এসিজি একবার রঘুপতির দিকে তাকালেন, তারপর নিজামুল হকের দিকে। সবশেষে চোখ বুলিয়ে নিলেন মজুমদার বাড়ির চারজনের দিকে—তনয়, টুনি, প্রজেন এবং সাবিত্রী। বিনীত গলায় অনুমতি চাইলেন, 'আপনাদের সবার কাছে একটা অনুরোধ রাখছি : কাইন্ডলি আমাকে স্মোক করার পারমিশান দিন। সিগারেটের এসেন্স মগজে না গেলে আমার মগজ কেমন যেন ঝিমিয়ে থাকে। এই বদ অভ্যেসটা আমি ছাড়ব-ছাড়ব করেও ঠিক ছাড়তে পারছি না...।'

তনয় আর টুনি মজুমদার সৌজন্যের গলায় বললেন, 'আপনি স্মোক করতে পারেন, মিস্টার গুপ্ত। এত বড় ঘর...জোরে ফ্যান চলছে...মনে হয় না আমাদের কোনও অসুবিধে হবে...।' তনয় কথাটা শুরু করেছিলেন, টুনি মজুমদার কথাটা শেষ করলেন।

এসিজি পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে এমন মনোযোগে সিগারেট ধরালেন যেন সিগারেটের ডগায় আগুন ঠিকঠাকভাবে না ধরলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

আনমনা চোখে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন এসিজি। শূন্যে তৈরি হওয়া ধোঁয়ার নকশার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, 'প্যাটার্ন, প্যাটার্ন...।'

এবার পাজামার পকেটে হাত ঢোকালেন বৃদ্ধ হুনুর। টু বাই টু বাই টু রুবিক কিউব বের করে নিয়ে এলেন। রংচঙে কিউব। বেশ কিউট।

কিউবটা ডানহাতে চোখের সামনে ধরে সেটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন।

রঘুপতি জানে, রুবিক কিউব সলভ করা ওর স্যারের নেশা। প্রথমে স্যারের কাছে ও থ্রি বাই থ্রি বাই থ্রি কিউব দেখেছে। পরে এসিজি ফোর-কিউব এবং ফাইভ-কিউব কিনেছেন। সেগুলো সলভ করার ব্যাপারটাও আয়ত্ত করে নিয়েছেন। এখন, এই প্রথম, স্যারের হাতে দেখছে টু-কিউব। যে-মানুষটা ফাইভ-কিউব সলভ করতে পারে তার হাতে হঠাৎ মোস্ট সিম্পল টু-কিউব কেন?

অশোকচন্দ্র যেন টেলিপ্যাথিতে রঘুপতির প্রশ্নটা টের পেলেন এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ধীরে-ধীরে সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'এটা হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল রুবিক কিউব। টু বাই টু বাই টু। এতে থ্রি বাই থ্রি বাই থ্রি কিউবের মিডল লেয়ারগুলো নেই। তাই পড়ে আছে থ্রি-কিউবের শুধুই আটটা কর্নার কিউব। এই কিউবটা দেখতে যতটা সিম্পল এটা সলভ করা কিন্তু ততটা সিম্পল নয়। অর্থাৎ, এটা একদিক থেকে দেখতে গেলে সিম্পল, আবার আর-একদিক থেকে দেখতে গেলে কমপ্লেক্স—ঠিক নিলয় মজুমদারের মার্ডার মিস্ট্রির মতো। সিম্পল অথচ কমপ্লেক্স, আবার কমপ্লেক্স অথচ সিম্পল।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এসিজি। সিগারেটে ঘন-ঘন কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে বাগানের দিকের জানলার কাছে গেলেন। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন বাইরে। তারপর রুবিক কিউবটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'দেখুন, এই ছোট-ছোট আটটা কিউবের রংগুলো কেমন এলেমেলো হয়ে রয়েছে। রেগুলার প্যাটার্নটা বোঝা যাচ্ছে না। এই খুনের কেসটার মতো। এবার এটা আমি সলভ করব...।' অশোকচন্দ্র দু-হাতে কিউবটা ধরে তার বিভিন্ন লেয়ার চটপট ঘোরাতে লাগলেন। ঘোরানোর সময় মাঝে-মাঝে থামছিলেন, কিউবটার প্যাটার্নটা একঝলক দেখছিলেন।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই কিউবটা সলভ করে ফেললেন। কিউবটার ছ'পিঠ ছ'রঙের হয়ে গেল।

এসিজি হেসে বললেন, 'এই দেখুন, রেগুলার প্যাটার্ন। আর এটা সলভ করতে আমাকে দুটো হাত ব্যবহার করতে হয়েছে। সিম্বলিক্যালি বলতে গেলে, নিলয়বাবুর খুনের এক্সিকিউশানটাও অনেকটা একইরকম...।'

প্রজেন বসু রায় বেশ কিছুক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন। হঠাৎই অধৈর্য হয়ে ঠোঁট বেকিয়ে মন্তব্য করলেন, 'কতক্ষণ এইসব ভ্যানতাড়া চলবে বলতে পারেন? কোথায় একটা মার্ডার কেস সলভ করার চেষ্টা চলছে, আর কোথায় রুবিক কিউব! যত্ত সব বুলশিট!'

রঘুপতি উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এসিজি চোখের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলেন। হাসিমুখে প্রজেন বসু রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধৈর্য, ধৈর্য, এবং ধৈর্য। কোনও খুনের পরিকল্পনার কাজে ধৈর্য হচ্ছে মেইন কি-ওয়ার্ড। তাই আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট, প্লিজ একটু ধৈর্য ধরুন...।'

'আমি কি খুনের প্ল্যান করতে বসেছি নাকি যে ধৈর্য ধরব!' প্রজেনের গলার সুর একেবারে উগ্রপন্থী।

এসিজি রুবিক কিউবটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি কীসের প্ল্যান করতে বসেছেন বা কীসের প্ল্যান করতে ভালোবাসেন সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে। তবে আপনাকে একটা অ্যাডভাইস দিই : ইনস্পেকটর যাদবের ধৈর্য নষ্ট করবেন না। কারণ, তা হলে আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে...।'

'মানে...মানে!' প্রজেনের গলায় সতর্ক উত্তেজনা। এসিজির দিক থেকে চোখ সরিয়ে রঘুপতি যাদবের দিকে একবার তাকালেন। রঘুপতি ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে প্রজেনকে চুপ করতে ইশারা করল।

এসিজি প্রজেনের দিকে তাকিয়ে সামান্য মুচকি হাসলেন। তারপর চেয়ারে এসে বসলেন। দুবার গলাখাঁকারি দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, নিলয় মজুমদার খুব সুবিধের মানুষ ছিলেন না। উনি একজন অসৎ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ওঁর কনস্ট্রাকশনে অনেক ফাঁকফোকর থাকত—যদিও কখনও ওঁর ফার্মের গায়ে

কালি লাগেনি। এ ছাড়া নিলয়বাবুর ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। রেগে গেলে লোকজনকে অত্যন্ত খারাপ-খারাপ কথা বলতেন। ওঁর কোম্পানির কর্মী হোক কি এ-বাড়ির কেউ হোক—উনি কাউকেই রেয়াত করতেন না। ইনস্পেকটর যাদবের দেওয়া ফাইল খুব খুঁটিয়ে পড়ে আর আজ এ-বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আমার সেরকমই মনে হয়েছে...।'

তনয় নীচু গলায় বললেন, 'মাথা গরম হয়ে গেলে বাবার আর কোনওরকম জ্ঞানগম্যি থাকত না। ওঁর মেজাজের আঁচ থেকে কেউই রেহাই পায়নি।'

টুনি মজুমদার ফস করে বলে উঠলেন, 'আমাকে তো একবার বলেছিলেন, ''তুমি র‍্যাম্পে অত হাঁটাহাঁটি না করে ওখানেই একটা কোঠা বানিয়ে নাও—তোমার বুটিকের বিক্রিবাটা বাড়বে।'' ভাবুন তো, কীরকম নোংরা লোক!'

'টুনি! কী হচ্ছে!' তনয় চাপা গলায় স্ত্রীকে যেন ধমক দিলেন।

'হ্যাঁ—এটাই তো নিলয়বাবুর সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল...' এসিজি বলে চললেন, 'তবে এইরকম খারাপ ব্যবহারের জন্যে খুনি ওঁকে খুন করেনি। খুনের আর-একটা প্যারালাল মোটিভ হচ্ছে, মার্ডার ফর গেইন। কারণ, নিলয়বাবু মারা গেলে ওঁর সমস্ত সম্পত্তির ফিফটি-ফিফটি মালিক হয়ে যাবেন তনয় মজুমদার আর প্রজেন বসু রায়। নিলয় মজুমদারের লিগাল অ্যাডভাইসরের কাছ থেকে রঘুপতি এই ইনফরমেশান কালেক্ট করেছে...।

'কিন্তু বন্ধ ঘরের ভেতরে খুনটা হল কীভাবে? এবার সে-কথাতেই আসছি। অনেক ব্রেইন স্টর্মিং করে যে-মেথডটা আমি খুঁজে পেয়েছি সেটা এইরকম।

'খুনি রাতে কোনও একটা সময়ে নিলয় মজুমদারের ঘরে এল। বন্ধ দরজায় টোকা দিল, ডাকল। নিলয়বাবু হয়তো খাটে বসে কোনও বই-টই পড়ছিলেন। সেটা মুলতুবি রেখে দরজার কাছে গেলেন। হয়তো জিগ্যেস করলেন, ''কে?'' উত্তরে খুনি নিজের নাম বলল।

'চেনা মানুষের গলা, তাই নিলয়বাবু দরজা খুলে দিলেন। খুনি ঘরে ঢুকল। নিলয়বাবু দরজা আবার বন্ধ করে দিলেন—ছিটকিনি এঁটে দিলেন ভেতর থেকে। কারণ, উনি সবসময় ওঁর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধই রাখতেন। তারপর খাটে গিয়ে বসলেন আবার। হয়তো ভুরু কুঁচকে আগন্তুককে জিগ্যেস করলেন, ''কী ব্যাপার, কী চাই?''

'খুনি তার উত্তরে ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা বৃদ্ধের মাথার পেছনে বসিয়ে দিল। মাথার খুলি ফাটল। রক্ত বেরোতে লাগল গলগল করে। বৃদ্ধ উপুড় হয়ে পড়লেন বিছানায়। খুনির জামাকাপড়ে রক্ত লেগে গেল।

'খুনি হাতিয়ারটা খাটের ওপরে রাখল। খাটের নীচে পড়ে ছিল দু-চারটে রবারের ফিতে। মানে, স্লাইডিং গ্লাস উইন্ডোর এজগুলো সিল করতে যে-ধরনের ফিতে লাগে। ফিতেগুলো ঘরে পড়ে ছিল, কারণ, কিছুদিন আগেই নিলয় মজুমদারের নির্দেশে ওঁর ঘরের জানলায় স্লাইডিং কাচের জানলা লাগানো হয়।

'তো সেইরকমই একটা ফিতে কুড়িয়ে নিয়ে খুনি নিলয়বাবুর গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। তারপর দু-হাতে রবারের ফিতেটা দু-পাশ থেকে টানতে থাকে। খুনির সেই টানের মধ্যে মিশে ছিল রাগ আর ঘেন্না। মানে, একটা মার্ডার ফর গেইন—বাট উইথ শেডস অফ অ্যাঙ্গার অ্যান্ড হেট্রেড।

'ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে হিট করার পর নিলয়ের মাথার খুলি কয়েক টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার আর অকসিপিটাল লোব ভীষণভাবে চোট পেয়েছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট সেরকম কথাই লিখেছে। তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড প্রোফিউজ ব্লিডিং। ডেথ ওয়জ ইনএভিটেবল। আর তার ওপরে গ্যারোটিং।

'অর্থাৎ, মিস্টার মজুমদার ডায়েড ভায়োলেন্টলি।'

একটু থামলেন এসিজি। প্রজেন, তনয়, টুনি এবং সাবিত্রীর দিকে তাকালেন। প্রথম তিনজন নির্বিকার। শুধু সাবিত্রীকে দেখে মনে হল, খুনের দৃশ্যটা কল্পনা করে ও কেমন যেন শিউরে ওঠা কাঁচুমাচু মুখে বসে আছে।

'কিন্তু তারপর? তারপর খুনি বারান্দার দিকের একটা জানলার কাচের পাল্লা সামান্য সরিয়ে একটু ফাঁক করে দিল। নিলয়বাবুর বালিশের নীচ থেকে ওঁর চাবির গোছাটা বের করে নিল। খুনি জানত যে, নিলয়বাবু চাবির গোছা বালিশের নীচে রাখতেন। তারপর...প্রথমে আলমারি খুলে তার দরজা দুটো হাট করে দিল। আলমারি থেকে চটপট তিনটে হ্যাট বের করে নিল। সেগুলো দুমড়ে-মুচড়ে পকেটে গুঁজে নিল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে চাবি দিয়ে হাঁসকলের তালা খুলল। তারপর খুব সাবধানে হাঁসকল খুলে আবার ঘরে ঢুকল।

'এবার তার কাজ হল প্রথম দরজাটা বন্ধ করে সেটা ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দেওয়া। খুনের হাতিয়ারটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে নিজের জামাকাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে নেওয়া। তারপর ঘরের নানান জায়গার হাতের ছাপ-টাপ মুছে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে খুব সাবধানে হাঁসকল লাগিয়ে আবার তালা দিয়ে দেওয়া।

'এভাবেই তৈরি হল লকড রুম। কিন্তু পাজলটা তৈরি হচ্ছে লাস্টে—একেবারে শেষ ধাপে। অর্থাৎ, যে-জানলাটার কাচ কিছুটা খোলা ছিল সেই জানলার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে নিলয়বাবুর চাবির গোছাটা বিছানা তাক করে ছুড়ে দেওয়া। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল লকড রুম পাজল—বন্ধ ঘরের রহস্য।

'এরপর যেসব কাজ খুনির বাকি রইল সেগুলো হল, নিলয় মজুমদারের ঘরের দুটো দরজার বাইরের দিকের হাতের ছাপ মুছে ফেলা, হাঁসকল আর তালার গায়ের ছাপ মোছা, দোতলার স্পাইরাল সিঁড়ির কাছে লোহার জাল কাতুরি দিয়ে বেশ খানিকটা কেটে ফেলা, খুনের হাতিয়ারটা লুকিয়ে ফেলা, হ্যাট তিনটে বাগানে ছুড়ে ফেলা, এবং রক্তমাখা জামাকাপড়ের একটা জুতসই বন্দোবস্ত করা...।'

নিজামুল হক হঠাৎই লাফিয়ে উঠলেন : 'অসম্ভব, গুপ্তসাহেব, অসম্ভব! এতসব কাজ খুনির একার পক্ষে অসম্ভব! ইমপসিবল! কী বলেন, ইনস্পেকটার যাদব?' প্রশ্নটা করতে রঘুপতি যাদবের দিকে ফিরে তাকালেন হকসাহেব।

এসিজি হাসলেন। বললেন, 'মিস্টার হক ঠিকই বলেছেন, রঘুপতি। এই খুনের ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণটা বড্ড বেশি। অনেকগুলো কাজ। আমার মনে হয়, জাল কাটার কাজটা মার্ডারার আগেই সেরে রেখেছিল। সেটা সন্ধের অন্ধকারে কারও নজরে পড়েনি। তা ছাড়া বারান্দার জাল কাটার ব্যাপারটা সাবিত্রী ছাড়া আর দেখারই বা কে আছে! কিন্তু সাবিত্রী বলেছে, জাল যে কাটা হয়েছে সেটা পুলিশ ওকে বলার আগে ও খেয়ালই করেনি। কী, সাবিত্রী, তাই তো?' প্রশ্নটা সাবিত্রীকে ছুড়ে দিলেন এসিজি।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি মাথা নোয়াল : 'হ্যাঁ, স্যার—।'

'গুড। নাউ, রঘুপতি, এবার আমার মোবাইল ফোনগুলো চাই—চারজনেরটাই।' রঘুপতির দিকে তাকালেন অশোকচন্দ্র। তারপর তনয়, প্রজেনদের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন।

রঘুপতি যাদব চট করে উঠে দাঁড়াল। তিনটে লম্বা স্টেপ ফেলে তনয়দের খুব কাছে পৌঁছে গেল। কোনও কথা না বলে ডানহাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরল।

সত্যিই কোনও কথা বলার দরকার ছিল না। কারণ, তনয়, প্রজেন, আর টুনি একটুও দেরি না করে নিজেদের মোবাইল ফোন রঘুপতির খসখসে হাতের চেটোয় জমা দিলেন।

সাবিত্রী স্টাডিরুমের দরজার কাছ থেকে রঘুপতির কাছে এগিয়ে এল। নিজের ফোনটা রঘুপতিকে দিল।

রঘুপতি লক্ষ করল, তনয়দের ফোনগুলো নামি ব্র্যান্ডের দামি স্মার্টফোন হলেও সাবিত্রীর ফোনটা সস্তার বারফোন। তা ছাড়া ফোনটা ঘামে ভেজা। বোধহয় সাবি এতক্ষণ ফোনটাকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ছিল।

রঘুপতি ফোনগুলো নিয়ে এসিজির কাছে গেল। ওগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে কোনটা কার ফোন সেটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ফোনগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে দিল। এসিজির রেফারেন্সে বাঁ-দিক থেকে তনয়, টুনি, প্রজেন ও সাবিত্রী।

প্রজেনের ফোনটা হাতে তুলে নিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন ফোনটা।

প্রজেন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ডক্টর গুপ্ত, আশা করি আপনি প্রাইভেসি রাইটের ব্যাপারটা ভুলে যাবেন না।'

এসিজি হাসলেন, একটা হাত তুলে ইশারায় ওঁকে আশ্বস্ত করলেন : 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন, মিস্টার বসু রায়। প্রাইভেসি রাইটের কথা আমার ভালো করেই মনে আছে। আমি আপনার ফোনের মেসেজ বা অন্য কোনও পারসোনাল ব্যাপার পড়ে দেখার জন্যে এতটুকুও ইন্টারেস্টেড নই। আমি বরং আই. এম. ই. আই. নাম্বারটা সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনাদের বলব...।

'আপনারা হয়তো জানেন, মোবাইল ফোনে "*#06#" পাঞ্চ করলেই আই. এম. ই. আই. নাম্বারটা ফোনের পরদায় ভেসে ওঠে—স্মার্ট ফোনে তার সঙ্গে থাকে বারকোড। আই. এম. ই. আই.-এর ফুল ফর্মটা হল, "ইনটারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি"। এটা একটা ইউনিক ফিফটিন ডিজিট নাম্বার। মোবাইল ফোন হারিয়ে-টারিয়ে গেলে এই নাম্বারটার হেলপ নিয়ে সেটাকে লোকেট করা যায়। তা ছাড়া এই নাম্বারটা ইউজ করে মোবাইলের সার্ভিস প্রোভাইডাররা হ্যান্ডসেট থেকে যে-কোনও ডেটা অ্যাকসেস করতে পারে—যেমন, কনট্যাক্ট লিস্ট, এস. এম. এস. এবং আরও অনেক কিছু। কেউ যদি ফোন থেকে কোনও কনট্যাক্ট কিংবা মেসেজ ডিলিট করে দেয় তা হলে সেই ডেটা মোটেই চিরকালের জন্য উধাও হয়ে যায় না—থেকে যায় ডিভাইসের ভেতরে একটা হিডন ফাইলে। সার্ভিস প্রোভাইডার যদি চায় তা হলে আই. এম. ই. আই. নাম্বারটা ইউজ করে সেই হিডন ফাইল সহজেই অ্যাকসেস করতে পারে...।'

'এটা তো ইনভেশান অফ প্রাইভেসি...' টুনি মজুমদার বললেন এবং প্রজেনের দিকে একপলক তাকালেন।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম—ঠিক বলেছেন। ইট ইজ ডেফিনিটলি ইনভেশান অফ প্রাইভেসি। তবে এই ইনভেশানের ব্যাপারটা পুলিশ করে থাকে কোনও সিরিয়াস ইনভেস্টিগেশানের সময়...যেমন, এই নিলয়বাবুর মার্ডার কেস। তবে এটা ঠিক যে, পুলিশ সাসপেক্টের হ্যান্ডসেট থেকে কিংবা সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে যা কিছু জানতে পারে সেগুলো তারা সিক্রেট রাখে। শুধুমাত্র যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু ক্রিমিনালের কনভিকশানের কাজে কোর্টে ব্যবহার করে। আশা করি পুরো ব্যাপারটা আপনাদের কাছে এখন ক্লিয়ার?'

তনয় ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বোঝালেন। বাকিরা চুপ করে রইল।

এসিজি একটু দম দিয়ে মাথার চুলে হাত বোলালেন। রঘুপতি ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা টেবিলে আলতো করে ঘষছিল। আর নিজামুল হক দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলেন।

এসিজি সবাইকে একপলক করে দেখে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'আপনাদের মোবাইলের সার্ভিস প্রোভাইডারদের সঙ্গে পুলিশ অনেকদিন আগেই কথা বলেছে। আপনাদের সবার কল রেকর্ডস এবং এস. এম. এস. ইত্যাদি খতিয়ে দেখেছে। তাতে পুলিশের তদন্ত বিশেষ এগোয়নি। আমি এখন আপনাদের ফোনের হিডন ফাইলগুলো চেক করে দেখব। যেসব ডেটা আপনারা স্টোর করেছেন, কিন্তু পরে আবার ডিলিট করে দিয়েছেন—সেগুলো আমি একটু খুঁটিয়ে দেখব। রঘুপতি—' রঘুপতি যাদবের দিকে তাকালেন এসিজি : 'তুমি প্লিজ সার্ভিস প্রোভাইডারদের এক-এক করে ফোন করো—বলো, আমরা এগজ্যাক্টলি কী চাইছি। তোমাকে আমি কিছুক্ষণ আগে সেটা বলেওছি। ওদের বলো, আমরা খুব তাড়াতাড়ি ইনফরমেশানগুলো চাই...।'

'ও. কে., ডক্টর গুপ্তা—।' বলে রঘুপতি টেবিলে রাখা ওর ফোল্ডারটা হাতে তুলে নিল। তারপর চেয়ার ছেড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। এসিজিও চট করে উঠে পড়লেন। রঘুপতির সঙ্গে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘাড় নীচু করে চাপা গলায় রঘুপতির সঙ্গে কীসব কথা বললেন। বড়জোর দশমিনিট—তারপরই এসিজি ফিরে এলেন ঘরে। নিজের চেয়ারে বসে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রঘুপতি ফোল্ডার খুলে বিশেষ একটা পৃষ্ঠা বের করে নিল। সেই পৃষ্ঠায় তনয় মজুমদার ও বাকি তিনজনের মোবাইল নম্বর এবং সার্ভিস প্রোভাইডার সম্পর্কে নানান তথ্য লেখা। রঘুপতি নিজের মোবাইল ফোন বের

করে সেই পৃষ্ঠাটার দিকে চোখ রেখে ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল। তারপর ফোনটা ডানকানে চেপে ধরল। এবং একটু পরেই ফোনে কথা বলতে শুরু করল।

কী কথা যে বলছে সেটা ঘর থেকে ঠিকঠাক বোঝা না গেলেও রঘুপতি যাদব যে বেশ এক্সাইটেড হয়ে কথা বলছে সেটা দিব্যি বোঝা গেল।

ঘরের ভেতরে একটা থমথমে উৎকণ্ঠা। খোলা দরজা দিয়ে রঘুপতির পিঠ দেখা যাচ্ছিল।

প্রজেন বসু রায় এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিলেন। একবার তনয়, আর-একবার টুনিকে দেখছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, প্রজেন বেশ উসখুস করছেন।

এসিজি সন্দেহভাজন চারজনকেই খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

তনয় বেশ শান্তভাবে বসে আছেন।

প্রজেন এখন রঘুপতির দিকে তাকিয়ে আছেন।

টুনি জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সাবিত্রী এসিজিকে তোলমোলের নজরে দেখছে। ওর মুখে ঘামের বিন্দু। শাড়ির আঁচল দিয়ে চট করে একবার ঘাম মুছে নিল।

দরজার কাছ থেকে রঘুপতির টুকরো-টুকরো কথা শোনা যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ, আমি হোল্ড করছি...কিন্তু ইনফরমেশানগুলো খুব জরুরি।...হাঁ, হাঁ—ওহি কোড হমে চাহিয়ে। প্লিজ, হোয়াটসঅ্যাপ করে আমার ফোনে পাঠিয়ে দিন। এই কোডটা ইউজ করলেই হিডন ফাইলগুলো সব দেখা যাবে তো? লাস্ট ওয়ান মান্থে কী-কী ফাইল ডিলিট হয়েছে সেগুলো পাওয়া যাবে?...গুড। থ্যাংক ইউ...।'

একটু পরেই রঘুপতি যাদব দরজার কাছ থেকে চলে এল ঘরের ভেতরে। ফোল্ডারটা গুছিয়ে আবার টেবিলে রেখে দিল। তারপর নিজের মোবাইল ফোনের দু-একটা বোতাম টিপে ফোনটা অশোকচন্দ্রের চোখের সামনে ধরল : 'স্যার, এই যে, কোডটা ওরা পাঠিয়েছে। এটা ইউজ করলেই আপনি হিডন ফাইলের কাহানি জেনে যাবেন। সব সারভিস প্রোভাইডারের সেম কোড—আই. এম. ই. আই. নম্বর দেখতে গেলে যেমন সেম কোড।'

অশোকচন্দ্র কোডটা ভালো করে দেখলেন। ঘাড় নাড়লেন দুবার। বিড়বিড় করে বললেন, 'গুড ওয়ার্ক, রঘুপতি—গুড ওয়ার্ক।'

রঘুপতি এসিজির পাশে বসে পড়ল।

এসিজি টেবিলে রাখা চারটে ফোনের মধ্যে একটা ফোন হাতে তুলে নিলেন। এবং চশমাটা নাকের ওপরে নাড়াচাড়া দিয়ে সেট করে তীক্ষ্ন মনোযোগে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একইসঙ্গে হ্যান্ডসেটের বোতাম টিপতে লাগলেন।

এমন সময় জানলার বাইরে থেকে বৃষ্টির ফোঁটার টপাটপ শব্দ ভেসে এল। বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। এসিজি একবার খোলা জানলার দিকে তাকালেন। তারপর অনেকটা যেন আপনমনেই কথা বলতে শুরু করলেন।

'আপনাদের সবার স্টেটমেন্ট আর পি. এম. রিপোর্ট কোরিলেট করে পুলিশ এই ডিসিশানে এসেছে যে, নিলয় মজুমদার খুন হয়েছেন গত মাসের বাইশ তারিখ রাত দশটা থেকে একটার মধ্যে। কিন্তু আজ সকাল থেকে সব দেখে-শুনে, ফাইলের কাগজপত্র ঘেঁটে, আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার মনে হয়েছে, নিলয়বাবু খুন হয়েছেন দশটা বাজার অন্তত এক কি দেড়ঘণ্টা আগে। খুনের সময়টাকে ঘেঁটে দেওয়ার জন্যে খুনি একটা কায়দা ব্যবহার করেছিল। সেই কায়দাটা এই ফোনের মধ্যে আছে—' হাত উঁচু করে ধরে ফোনটা সবাইকে দেখালেন এসিজি। সময় নিয়ে সবার মুখের দিকে পালা করে তাকালেন। তারপর : 'রঘুপতির এফার্ট আর সাপোর্টে আমরা একটা ডিলিটেড ফাইল রেস্টোর করতে পেরেছি। অবশ্য তার সঙ্গে মোবাইল কানেকশানের সার্ভিস প্রোভাইডারদের হেলপ-এর ব্যাপারটাও অ্যাকনলেজ করতে হবে।

'ফাইলটা একটা অডিয়ো ফাইল। তবে ব্যাপারটা খোলসা করে বলার আগে আমি আপনাদের একটা ঘটনা শোনাতে চাই। সেই ঘটনার সাক্ষী সাবি—মানে, সাবিত্রী...।'

'সাবি আবার আমাদের কী শোনাবে?' রুক্ষভাবে প্রশ্ন তুললেন প্রজেন বসু রায়, 'আর...আপনার হাতের মোবাইলটা কার বলুন তো? আমার?'

এসিজি প্রজেনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেশ চওড়া করে হাসলেন : 'মোবাইলটা কার একটু পরেই সেটা বুঝতে পারবেন।...যাই হোক, এবারে কাজের কথায় ফিরে আসি...।' সাবিত্রীর দিকে নজর ফেরালেন বৃদ্ধ গোয়েন্দা। বেশ নরম এবং শান্ত গলায় বললেন, 'সাবি, তুমি মা আমাদের সবাইকে মহাভারতের গল্পটা আর-একবার শোনাও তো! সেই যে, পাশা খেলার চ্যাপ্টারটা—যেটা নিলয়বাবু খুন হওয়ার রাতে দুবার পড়েছিলেন!'

সাবিত্রী ধন্দভরা চোখে অশোকচন্দ্র গুপ্তকে দেখতে লাগল। বৃদ্ধের চোখমুখ ভীষণ সিরিয়াস—মজা করছেন বলে মোটেই মনে হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সাবি। ছ'জন মানুষের মুখের দিকে পালা করে তাকাল। ঢোঁক গিলল দুবার। তারপর দ্বিতীয়বার তাকাল তনয়ের দিকে।

ধীরে-ধীরে 'মহাভারতের গল্প'-টা শোনাল সাবিত্রী। শেষ দিকে ওর গলার স্বর এত নেমে গিয়েছিল যে, প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না।

ওর কথা শেষ হলে সবাই চুপ করে রইল।

ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। শুধু বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত শব্দ করে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর আপনমনে সামান্য হেসে বিশেষভাবে কারও দিকে না তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

'আপনারা সবাই নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন, খুনের সময়টা ঘেঁটে দেওয়ার জন্যে মার্ডারার কোন কায়দাটা ব্যবহার করেছিল। মহাভারতের একই জায়গা দুবার পড়াটা যেমন একটা পয়েন্টার, তেমনই ওই হাঁচির শব্দ—দুবারই এগজ্যাক্টলি একই জায়গায় হাঁচির শব্দটাও আর-একটা পয়েন্টার...।'

এবার প্রজেনের দিকে তাকালেন এসিজি। কয়েকসেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ওঁর দৃষ্টি শিফট করল তনয়ের দিকে। তারপর টুনির দিকে।

'তার মানে, আপনরা তো এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছেন, নিলয় মজুমদার ওঁর রোজকার নিয়ম মতো মহাভারত পড়া শুরু করার আগেই মার্ডারার ওঁর ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ওঁর নজরের আড়ালে নিজের স্মার্ট ফোনটা রেকর্ডিং মোডে অন করে রেখে এসেছিল।

'পরে খুনি আবার নিলয়বাবুর ঘরে যায়। খুনির হাতে তখন একটা ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল। ইনস্ট্রুমেন্টটা হতে পারে একটা শক্তপোক্ত গাছের ডাল—যেটা দিয়ে ক্রিকেট ব্যাট কিংবা বেসবল ব্যাটের মতো জোরে হাঁকানোর কাজ চলতে পারে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, ফোরেন্সিক এক্সপার্টরা নিলয়বাবুর মাথার উন্ডে কাঠের গুঁড়ো, ময়লা, কিংবা শ্যাওলা, কিছুই পাননি। ফলে, আমার মনে হয়েছে, ওই গাছের ডালটার ওপরে খুনি হয়তো কোনও পলিথিনের প্যাকেট বা ওইরকম একটা কিছু জড়িয়ে নিয়েছিল।

'ওয়েপন হিসেবে আমি যে গাছের একটা মোটা ডালের কথা ভেবেছি সেটার কারণ, এ-বাড়িতে ঢোকার সময় আমি লক্ষ করেছি, বাগানে পাঁচিল ঘেঁষে অনেকগুলো গাছের ডালের টুকরো সাজিয়ে রাখা আছে...।'

এসিজিকে বাধা দিয়ে তনয় বলে উঠলেন, 'ওগুলো রামাইয়া—আমাদের বাগানের মালি—ও রেখেছে। ও ওগুলো জ্বালানি কাঠ হিসেবে ইউজ করে।'

এসিজি তনয়ের দিকে কৌতুকের চোখে তাকালেন : 'মিস্টার মজুমদার, আপনি বলছেন, রামাইয়া ফায়ারউড হিসেবে ওই কাটা ডালগুলোকে ইউজ করে। সে করুক। তাই বলে সেখানকার একটা ডাল মার্ডারার ওয়েপন হিসেবে ইউজ করতে পারবে না এমন তো নয়! তবে হ্যাঁ, ওয়েপনটা গাছের ডাল না হয়ে

একটা লোহার রড কিংবা সেই টাইপের কিছুও হতে পারে। এবং সেই রডটাও পলিথিন বা অন্য কিছু দিয়ে কভার করা ছিল।

'তো মহাভারতের গল্প রেকর্ড করা সেই মোবাইলটা সেফ জায়গায় রেখে খুনি ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তার কাজ শেষ করল। তারপর রাতের অন্ধকারে নিজেকে যতটা সম্ভব মিশিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেল নিজের ঘরে। রক্তের ছিটে লাগা জামাকাপড় পালটে নিল। খুনের অস্ত্রটাকে লুকিয়ে ফেলল রাতারাতি। যদি গাছের ডাল সেই খুনের অস্ত্র হয় তা হলে সেটাকে নিশ্চিহ্ন করতে ওটা কেটেকুটে টুকরো করে স্ট্রেইট পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

'এরপর এল মোবাইলে রেকর্ড করা মহাভারতের পাশা খেলার অংশটা প্লেব্যাক করার সময়। ধরা যাক, স্মার্ট ফোনটা নিয়ে খুনি সেকেন্ড টাইম আবার নিলয়বাবুর ঘরে এল। ফোনে রেকর্ড করা অংশটা প্লেব্যাক মোডে চালিয়ে দিল। আবার মহাভারত পাঠ শুরু হল—শুরু হল পাশা খেলা। খুনি এটুকু জানত, সেই মহাভারত পাঠ আর কেউ না শুনুক অন্তত সাবি শুনবে, এবং পুলিশকে জানাবে। তাতে পুলিশ ভাববে নিলয় মজুমদার তখনও বেঁচে ছিলেন—অথচ তখন মানুষটা নেহাতই একটা ডেডবডি। হয়তো সেই ডেডবডির মুখে-মাথায় তখন মাছি বসতে শুরু করেছে।

'সত্যিই একসময় সাবিত্রীর ঘুম চটে যায় এবং শুনতে পায় ওর "দাদুবাবা" মহাভারত পড়ছেন। সেই মহাভারত পড়া শেষ হলে খুনি কোনও এক ফাঁকে মোবাইল ফোনটা আবার হাতিয়ে নেয়।'

টেবিল থেকে তুলে নেওয়া স্মার্ট ফোনটা অশোকচন্দ্রের হাতেই ধরা ছিল। সেটা সবাইকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আমি সার্ভিস প্রোভাইডারের দেওয়া কোড ইউজ করে ডিলিটেড আডিয়ো ফাইলটা রিট্রিভ করেছি। এবার সেই হিডন ফাইলটা প্লেব্যাক করে সবাইকে শোনাব : নিলয় মজুমদার মহাভারত পড়ছেন—পাশা খেলা শুরু হচ্ছে—।'

'ইয়ে কিসকা ফোন হ্যায়, গুপ্তাসাব?' রঘুপতি প্রশ্ন করল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত কোনও জবাব দেওয়ার আগেই প্রজেন বসু রায় ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন। এসিজির দিকে আঙুল তুলে ঝাঁজালো গলায় বললেন, 'আপনারা কি ন্যাকামো করছেন? আপনারা জানেন না ওটা কার ফোন? ওটা আমার ফোন—আমার! আমার!'

তনয় হাত নেড়ে প্রজেনকে শান্ত করতে চাইলেন : 'আঃ, প্রজেনদা, ডোন্ট গেট এক্সাইটেড। কিপ ইয়োর কুল!'

কিন্তু প্রজেন থামলে তো!

এসিজি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমি কি সবাইকে এখন মহাভারত শোনাব? নাকি আপনার কিছু বলার আছে?'

'প্রজেনদা! প্রজেনদা! বোসো—ঠান্ডা হও।' তনয় তখনও প্রজেনকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছেন। ওঁর চোখে-মুখে আশঙ্কার ছায়া।

প্রজেন তনয়ের দিকে ঘুরেও তাকালেন না। ওঁর কপালে ঘামের বিন্দু। চোয়াল শক্ত। চোখে রাগ। রগের কাছে শিরা ফুলে উঠেছে। হাত থরথর করে কাঁপছে।

'আমার ফোনে কোনও অডিয়ো ফাইল থাকতে পারে না। বিকজ আমি সব ডিলিট করে দিয়েছি। ওই শয়তান বুড়ো লোকটার মতো। ওকেও আমি দুনিয়া থেকে ডিলিট করে দিয়েছি।'

'প্রজেনবাবু, আপনি প্লিজ বসুন—' এসিজি নরম গলায় প্রজেন বসু রায়কে অনুরোধ করলেন। রঘুপতি আর নিজামুল হকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা ওঁকে একটু শান্ত করুন...।'

রঘুপতি আর নিজামুল প্রজেনের কাছে গেলেন। ওঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

একটু পরেই প্রজেন অনেকটা স্বাভাবিক হলেন। বিছানায় বসে পড়লেন আবার।

রঘুপতি আর নিজামুল নিজেদের চেয়ারে ফিরে এলেন।

এর মধ্যে তনয় একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছেন। তাতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছেন।

টুনি মজুমদার যে বারবার ভুরু কুঁচকে অপছন্দের চোখে ওঁর দিকে তাকাচ্ছেন সেটা তনয় খেয়াল করেও করছেন না।

প্রজেন বসু রায় শূন্য চোখে এসিজির দিকে কয়েকসেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। তারপর অনেকটা যেন আপনমনেই বলতে শুরু করলেন।

'নিলয় মজুমদার ভীষণ বাজে লোক ছিলেন। ওঁর মধ্যে অনেস্টি কিংবা প্রিন্সিপল বলে কোনও ব্যাপার ছিল না। আউট অ্যান্ড আউট আনএথিক্যাল পাবলিক ছিলেন। তা ছাড়া সবার সঙ্গে ফর নাথিং বাজে ব্যবহার করতেন। মানুষকে মানুষ বলে মনে করতেন না—চাকরবাকরের চেয়েও বাজেভাবে ট্রিট করতেন। আমার বাবাকে...আমার বাবাকে উনি বলতে গেলে মার্ডার করেছিলেন। কাশীপুরের ফ্লাইওভার তৈরির সময় নিলয় মজুমদার বি গ্রেড কি সি গ্রেডের বিল্ডিং মেটিরিয়াল পারচেজ করেছিলেন। কিন্তু এই মিসহ্যাপটা নিয়ে পুলিশের ইনভেস্টিগেশানের সময় উনি কোনওভাবে বোধহয় পুলিশকেও পারচেজ করেছিলেন। কারণ, ফাইনালি হি কেম আউট ক্লিন। মানে, স্ট্রেইট ছাড়া পেয়ে যান। পরে ওঁর কোম্পানিতে ঢুকে দেখেছি, কনস্ট্রাকশনের কাজে পার্টিকে চিট করাটাই ওঁর স্ট্যান্ডার্ড স্টাইল। দ্যাট ম্যান ডিজার্ভড টু ডাই...।' প্রজেন হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নীচু করলেন।

তনয় হাতের সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পায়ের স্লিপার দিয়ে ঘষে নিভিয়ে দিলেন। তারপর প্রজেনের কাছে গিয়ে 'প্রজেনদা! প্রজেনদা!' বলে ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে মানুষটাকে ভরসা দিতে লাগলেন।

টুনি মজুমদার অস্বস্তি ভরা চোখে প্রজেনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মনে-মনে টুনিও বোধহয় চাইছিলেন প্রজেন শান্ত হোন।

একসময় প্রজেন বসু রায় শান্ত হলেন। মুখ তুলে আনমনা বিভ্রান্ত চোখে তাকালেন এসিজির দিকে।

ওঁর চোখ সামান্য ফোলা। মুখে হেরে যাওয়া মানুষের ছাপ।

'ডক্টর গুপ্ত, কাশীপুরের ফ্লাইওভার তৈরির সময় মিস্টার মজুমদার যে-বাজে চিপ মেটিরিয়াল পারচেজ করেছিলেন তার ওরিজিন্যাল ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে।'

'কী ডকুমেন্ট?' রঘুপতি জিগ্যেস করল।

'দু-নম্বরি বিল্ডিং মেটিরিয়াল পারচেজের সব বিল—আই মিন, বিল আর চালানের কপি। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমি ছোট ছিলাম। কিন্তু আমার মা বাবার সমস্ত কাগজপত্র ফাইল-টাইল যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। আমি বড় হলে পর মা সেগুলো আমাকে দেয়। তার মধ্যে বাবার একটা ডায়েরিও ছিল। সেটা পড়ে আমি জানতে পারি ফ্লাইওভার কনস্ট্রাকশনের চিটিং-এর কথা। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে নিলয় মজুমদারের অনেকবার তর্কাতর্কি কথাকাটাকাটি হয়েছিল। মা আমাকে এসব কথা বলেছে। তারপর...তারপর... বাবা ভাবছিলেন, ''নিলয় কনস্ট্রাকশনস'' ছেড়ে দেবেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি...তার আগেই বাবা...বাবা চলে যান।

'বাবা মারা যাওয়ার পর আমি বাবার সব ফাইলপত্র ঘেঁটে পারচেজ বিলের কপির ফাইলটা খুঁজে পাই। সেইসব বিল দেখলেই বোঝা যায়, মিস্টার মজুমদার সমস্ত দাগি সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে সিমেন্ট, রড আর স্টোনচিপ কিনেছিলেন।।

'ওই ফাইলটা নিয়ে পুলিশে গেলে হয়তো ফ্লাইওভারের কেসটা রি-ওপেন করা যেত, কিন্তু সেটা না করে আমি বলতে গেলে ব্ল্যাকমেইলের পথ ধরলাম। কারণ, বাবা মারা যাওয়ার পর আমি আর মা হেভি ফিনানশিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েছিলাম। মানে, মান্থলি বাড়িভাড়ার টাকাটাও পে করতে পারছিলাম না।

'আমি ফাইলটার একটা ব্যাক আপ কপি তৈরি করে ওটা নিয়ে মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি খুব ধুরন্ধর মানুষ ছিলেন। ব্যাপারটা ছক কষে নিতে ওঁর দশমিনিটের বেশি সময় লাগেনি। উনি আমাকে ওঁর ''নিলয় কনস্ট্রাকশনস''-এর ম্যানেজার করে দিলেন এবং একইসঙ্গে টুয়েন্টি পারসেন্টের পার্টনার করে

নিলেন। চটজলদি সব পেপারস তৈরিও করে দিলেন। আমার মা সেইসময়ে হঠাৎ করে মারা গেলেন। আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম। তখন মিস্টার মজুমদার আমাকে এ-বাড়িতে এসে থাকতে বললেন। যাকে বলে একেবারে পুজো বোনাস। কিন্তু...কিন্তু এতসব করা সত্ত্বেও বাবার মার্ডারারকে আমি ক্ষমা করতে পারছিলাম না। তার ওপর মিস্টার মজুমদার খুব বাজেভাবে কথা বলতেন। বিনা কারণে, বলতে গেলে সবসময়, খিচিরখিচির করতেন। বোধহয় ভাবতেন আমি ওঁর কেনা সম্পত্তি। কে জানে!

'তারপর...তারপর...এখানে থাকতে-থাকতে বুঝলাম, আমি একা নই—এ বাড়ির প্রত্যেকেই নিলয় মজুমদারের কেনা সম্পত্তি। কাউকে এক কণাও সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারতেন না উনি। নতুন-নতুন নোংরা কথা শোনার ভয়ে, নতুন-নতুন অপমানের ভয়ে, আমরা সবাই কাঁটা হয়ে থাকতাম। আমি ভাবতাম...আমি ভাবতাম...' হঠাৎই থেমে গেলেন প্রজেন। কপালে হাত বোলালেন দুবার। রগের কাছটা টিপে ধরে মুখ নীচু করলেন। তারপর...।

'আমি ভাবতাম, মানুষটার বয়েস আশি পেরিয়েছে। হয়তো যে-কোনও দিন ওপর থেকে ডাক আসবে...তখন আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। কিন্তু সে-ডাক আর আসছিল কই!'

'সেইজন্যে আপনি ওনাকে ডাক পাঠালেন?' নিজামুল হক ব্যাঙ্গ করে বললেন।

প্রজেন নিজামুলসাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। ওঁর চোখে জল। ওপর-নীচে মাথা নেড়ে ধরা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ডাক পাঠালাম। একটা শয়তান পাপীকে সাজা দিতে চেয়ে আর-এক পাপ করে বসলাম। নিন, ইনস্পেকটরসাহেব, আমাকে অ্যারেস্ট করুন—সাজা দিন...।' প্রজেন কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন। দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে নিজামুল হকের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন।

তনয় আর টুনি যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন সেটা অশোকচন্দ্র গুপ্ত লক্ষ করেছিলেন। ব্যাপারটা রঘুপতিরও চোখ এড়ায়নি। কিন্তু কেন এই মুখ চাওয়াচাওয়ি সেটা রঘুপতি আঁচ করতে পারল না।

নিজামুল প্রজেনকে বললেন, 'প্রজেনবাবু, একটা কথা বলুন দেখি। সত্যি কথা বলবেন...।'

'কী কথা?' ধরা গলায় জানতে চাইলেন।

'এই মার্ডারটা ঠিকঠাকভাবে করার জন্যে খুনিকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। কাজগুলোর লিস্টি করলে সে-লিস্টি অনেক লম্বা হবে। একটু আগে গুপ্তসাহেবকে, ইনস্পেকটর যাদবকে সে-কথা আমি বলেছি। এত কাজ একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তো এত কাজ আপনি একা-একা করলেন কেমন করে?'

প্রজেন দেওয়ালে বসানো একটা পেরেকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। চোখের কোণে জল, ঠোঁটে হাসির রেখা। মনে হল হাসিটা যেন ওর দুঃখকে আরও বেশি করে চিনিয়ে দিল।

প্রজেনের ঠোঁট কাঁপল তিরতির করে। তারপর তিনি বেশ নীচু গলায় পেরেকটাকেই যেন বললেন, 'ঠিক বলেছেন। মার্ডারটার পেছনে এত কাজ! এত কাজ আমি একা-একা করলাম কেমন করে!' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে মুখ ফেরালেন নিজামুলের দিকে। বললেন, 'কী করে করলাম জানি না...বাট করেছি...একা করেছি। একা করেছি...একা করেছি...একা!' বলতে-বলতে প্রজেন নিজের বুকে কিল মারতে শুরু করলেন। ওঁর মুখে লালচে ভাব, দৃষ্টিতে শুধু শূন্যতা।

সাবিত্রী ভয় পেয়ে গেল, ডুকরে কেঁদে উঠল।

তনয় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর মুখ-চোখ কেমন পালটে গেছে। সকাল থেকে যে-মানুষটার মুখে এসিজি কেবল শান্ত ভাবটাই লক্ষ করেছেন, এখন সেই মানুষটার মুখে ভাব আর আবেগের ছড়াছড়ি। তবে তার সবটাই শুধু দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণা।

কষ্ট পাওয়া গলায় তনয় বললেন, 'আমি আর নিতে পারছি না, প্রজেনদা! তুমি চেঁচিয়ে বললেই একটা মিথ্যে পট করে সত্যি হয়ে যাবে না।' চটপট পা ফেলে রঘুপতির দিকে এগিয়ে এলেন তনয় : 'ইনস্পেকটর যাদব, আপনি প্লিজ আমাকেও অ্যারেস্ট করুন। প্রজেনদার পাশাপাশি আমিও দোষী। আমিও একজন কালপ্রিট...।'

রঘুপতি যাদব খানিকটা বিভ্রান্তভাবে তাকালেন ওর পুরোনো স্যারের দিকে।

'গুপ্তাসাব, ইয়ে সব কেয়া হো রহা হ্যায়? হাউ মেনি মার্ডারার্স ডু উই হ্যাভ রিয়েলি?'

এসিজি খানিকটা অবাক হয়ে প্রজেন এবং তনয়ের দিকে পালা করে দেখছিলেন। অঙ্কটা কোথায় যেন মিলছিল, আবার মিলছিল না। এসিজি কেমন কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলেন।

এতদিন ধরে অশোকচন্দ্র গুপ্ত র' ডেটা স্টাডি করেছেন। তার সঙ্গে বুনে দিয়েছেন গেসওয়ার্ক আর লজিক। আজ এখানে এসে সবকিছু দেখে-শুনে তিনি মার্ডার অ্যাক্টটাকে রিকনস্ট্রাকট করার চেষ্টা করেছেন। 'লকড রুম পাজল'-টাকে সলভ করার চেষ্টা করেছেন। মার্ডার মিস্ট্রিটার ওপরে পুরোটা না পারলেও অনেকটা আলো ফেলতে পেরেছেন। তারপর রঘুপতির সঙ্গে 'ষড়যন্ত্র' করে একটা ব্লাফ দিয়েছেন সবাইকে : যে একটা স্পেশাল কোড ব্যবহার করে মোবাইল হ্যান্ডসেটের ডিলিট করা ফাইল রিট্রিভ করা যায় এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে তিনি সেই স্পেশাল কোড জেনে ডিলিট করা ফাইল রেস্টোর করেছেন। সেই ব্লাফে কাজ হয়েছে। টেনশন আর মেন্টাল প্রেশারে পড়ে একজন মার্ডারার কনফেস করেছে। কিন্তু তারপর...তারপর হঠাৎ সেকেন্ড মার্ডারার! কী কনফিউজিং!

এখন রঘুপতির দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই কনফিউশন নিয়েই চাপা গলায় কথা বলতে লাগলেন এসিজি। বৃদ্ধ হুনুরের বারবার মনে হচ্ছিল তিনি হেরে যাচ্ছেন।

তখন তনয় প্রজেনের একটা হাত চেপে ধরেছেন। দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো বলে চলেছেন কীভাবে তিনি খুনের নানা ধাপে 'প্রজেনদা'-কে সাহায্য করেছেন।

আসলে নিলয় মজুমদারের নোংরা শয়তানি ব্যবহার ওঁরা কেউ আর নিতে পারছিলেন না। তনয়ের মা মারা যাওয়ার পর নিলয় আরও নোংরা, আরও ভয়ংকর চেহারা নিয়েছিলেন। তখন তনয় বা প্রজেনের কাছে নিলয় সিম্পলি অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন।

ওঁদের পাশাপাশি টুনি মজুমদারও নিলয়ের পেট ভিকটিম ছিলেন। খেয়াল অথবা মরজি হলেই নিলয় টুনিকে ডেকে পাঠাতেন। ওঁর মডেলিং করা নিয়ে নানারকম অশালীন মন্তব্য করতেন। এমনকী প্রজেনকে জড়িয়েও অনেক আজেবাজে কথা বলতেন।

তনয় মাথা নীচু করে আঙুল খুঁটছিলেন। একটু থেমে-থেমে কথা বলছিলেন। কথা বলতে-বলতে গলা ধরে এলেও বাবার প্রতি অপছন্দ আর ঘৃণার ভাবটা ভালোই বোঝা যাচ্ছিল।

'বাবা নিজে বাঁচতে ভালোবাসতেন। এই চুরাশি বছর বয়েসেও ওঁর বাঁচার ইচ্ছেটা ছোটবেলার মতোই ছিল। আমাদের তিনজনের কাজ ছিল দিন-রাত ওঁর সেবা করা; ওঁর জঘন্য ধমক, বকুনি আর অপমান হজম করে ওঁকে সবসময় তোয়াজ করে চলা; মুখ থেকে কোনও কথা খসানোমাত্রই সেটা সঙ্গে-সঙ্গে এক্সিকিউট করা—কারণ, না করতে পারলেই উনি মুখ খারাপ করতেন—যা-তা বলে অপমান করতেন।

'দিনের পর দিন আর কত আমরা সহ্য করতাম বলুন তো! একদিন রাতে টুনির সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তখন আমি বিরক্ত হয়ে টুনিকে বলি : ''চুরাশি বছর বয়েস, তবু মরার কোনও লক্ষণ নেই। আমাদের জ্বালানোর জন্যে অসভ্য বুড়ো জানোয়ারটা বেঁচে আছে! কবে যে মরবে কে জানে!'' তখন টুনি জবাব দেয় : 'হ্যাঁ, ওই আশাতেই বসে থাকো!'' তখন আমি বলি, ''তা নয় তো কী করব!'' তার উত্তরে টুনি মারাত্মক একটা কথা বলেছিল, ''নিজেরা একটু ইনিশিয়েটিভ নাও—যাতে চুরাশিটা পঁচাশিতে না পৌঁছোয়।''

'তখন, ডক্টর গুপ্ত, লাস্ট মান্থের বাইশ তারিখে আমরা সেই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। চুরাশিটা আর পঁচাশিতে পৌঁছোতে পারেনি। রোজ রাতে তাস খেলার সময় আমরা তিনজনে মিলে বাবাকে খুনের প্ল্যান করতাম। হ্যাঁ, টুনিও আছে এর মধ্যে—' ঘাড় ঘুরিয়ে টুনি মজুমদারের দিকে তাকালেন তনয়। বিষণ্ণ হাসলেন। টুনিও একচিলতে মলিন হাসি ফিরিয়ে দিল। এই হাসি বিনিময়ে দুজনের মধ্যে বন্ডিংটা ফুটে বেরোল।

তনয় মাথার চুলে বারকয়েক আঙুল চালালেন। চঞ্চলভাবে মাথা ঝাঁকালেন দুবার। প্রজেনের দিকে দেখলেন, তারপর স্ত্রীর দিকে। ওঁকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

নিজামুল হকের দিকে তাকিয়ে তনয় বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, হকসাহেব। এই মার্ডারটা ঠিকঠাকভাবে করার জন্যে খুনিকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। সত্যিই সে-কাজের লিস্ট অনেক লম্বা। তো এত কাজ আমরা কেউ একা করিনি—তিনজনে মিলে করেছি। যেমন, দোতলার বারান্দার লোহার জাল কাটার কাজটা করেছে টুনি। জাল কাটার কাতুরি আমি শ্যামবাজারের একটা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কিনে এনেছি। কাজ হয়ে যাওয়ার পর সেটা বাগানের পেছনদিকের পাঁচিল ঘেঁষে একটা জায়গায় পুঁতে দিয়েছি। চলুন, জায়গাটা আপনাদের দেখিয়ে দেব—।'

উত্তেজিতভাবে কথা বলতে-বলতে তনয় একটু হাঁপাচ্ছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় একটু থামলেন। তারপর বেশ নীচু গলায়, অনেকটা মন্ত্রপাঠের ঢঙে, বলতে শুরু করলেন আবার।

'খুনের দিন রাতে আমি আর প্রজেনদা বেশ কয়েকবার বাবার ঘরে গেছিলাম। সাবিত্রী একসময় শুয়ে পড়েছিল। আমরা জানি, ও একবার ঘুমিয়ে পড়লেই কাদা। আমি বাবার ঘরে একবার গেছিলাম বাবার মহাভারত পড়াটা মোবাইল ফোনে রেকর্ড করার জন্যে। পুলিশের কাছে ব্যাপারটাকে ঘেঁটে দেওয়ার জন্যে প্রজেনদা আমাকে বলেছিল ওর মোবাইলে ব্যাপারটা রেকর্ড করতে। আমিও সেটাই করেছিলাম। পরে সেই অডিয়ো ফাইলটা প্রজেনদা আমার আর টুনির মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এনি ওয়ে...বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাবি আমাকে দেখতে পায়।

'এর আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট পর প্রজেনদা চুপিসাড়ে বাবার ঘরে যায়। প্রজেনদার হাতে মার্ডার ওয়েপনটা ছিল। ডক্টর গুপ্ত ঠিকই আইডিয়া করেছেন—অস্ত্রটা একটা শক্তপোক্ত গাছের ডাল...ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট...অনেকটা বেসবল ব্যাটের মতো। তবে পলিথিন দিয়ে নয়—প্রজেনদা ওটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিল, যাতে হিট করার সময় আওয়াজটা অতটা না হয়। পরে আমরা সেই রক্তে ভেজা কাপড়টা সে-রাতেই পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। ইন ফ্যাক্ট, এই কাজটা টুনি করেছিল। কারণ, তখনও আমার আর প্রজেনদার মাথা ঠান্ডা হয়নি—আমরা দুজনে ভীষণ এক্সাইটেড আর আনস্টেবল ছিলাম।' টুনির দিকে ফিরলেন তনয় : 'টুনি, আ স্পেশাল থ্যাংকস ফর ইউ...।'

সেই রাতটার কথা টুনির খুব মনে পড়ছিল।

ওদের শোওয়ার ঘরে থমথমে মুখে বসেছিলেন টুনি আর তনয়। টুনি চুপচাপ বিছানায় বসে অপেক্ষা করছিলেন প্রজেনের ফেরার জন্য।

ঘরের তিনটে লাইটই জ্বেলে দিয়েছেন টুনি : দুটো টিউবলাইট, আর একটা আট ওয়াটের এল. ই. ডি. ল্যাম্প। কারণ, টুনির মনে হয়েছিল, ঘরের সবগুলো বাতি জ্বেলে দিলে মনের ভয় আর উত্তেজনা খানিকটা হয়তো কমবে।

মাঝে-মাঝে টুনির চোখ চলে যাচ্ছিল ঘরের একটা খোলা জানলার দিকে। জানলার বাইরেটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকালেই ভয়টা যেন আবার মাথাচাড়া দিচ্ছিল। টুনি মনে-মনে ভাবছিল, 'প্রজেনদাটা নীচে গিয়ে এতক্ষণ ধরে কী করছে? এত সময় লাগছে কেন? আচ্ছা, দোতলা থেকে ''ধপ'' করে একটা শব্দ শোনা গেল না? তা হলে কি কাজটা হয়ে গেছে?'

ঘরের মেঝেতে রঙিন বেডকভার পাতা। তার ওপরে ছড়ানো রয়েছে তাস। তনয় বেডকভারের এককোণে বসে সেই তাস নিয়ে এলোমেলোভাবে শাফল করছিলেন, সাজাচ্ছিলেন, আর ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছিল, তনয়ও অপেক্ষা করছিলেন।

বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছে ছুটে যাওয়ার শব্দ, হর্নের আওয়াজ।

তনয় বুকের ভেতরে একটা চাপ টের পাচ্ছিলেন। বারবার ভাবছিলেন, 'এভাবে একজন মানুষকে সময় হওয়ার আগেই সরিয়ে দেওয়াটা কি পাপ?'

একইসঙ্গে ওঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। বাবাকে ঘিরে ভালো-ভালো কয়েকটা স্মৃতি মনের ভেতরে ভিড় করছিল। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই ভয়ংকর অপমান আর হেনস্থার স্মৃতিগুলো হুড়মুড়িয়ে মনের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

তনয় বারবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

'এতক্ষণ লাগছে কেন? তা হলে কি প্রজেনদার সঙ্গে বাবার হাতাহাতি ধস্তাধস্তি হচ্ছে?'

ঠিক সেইসময় প্রজেন বসু রায় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

দৃশ্যটা টুনি মজুমদারের মনে চিরকাল আঁকা হয়ে থাকবে।

দরজার ফ্রেমে বাঁধানো একজন মানুষ। পরনে পাঞ্জাবি আর পাজামা। পাঞ্জাবির রং হালকা বাদামি, আর পাজামার রং সাদা। কিন্তু এখন সেই বাদামি আর সাদা রঙের ওপরে লাল রঙের অজস্র কলঙ্কের ছিটে।

রক্তের দাগ।

পাঞ্জাবির ওপরে যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে রক্তের ছোপ। আর পাজামার ওপরেও ভালোরকম রক্তের ছিটে।

প্রজেনের ডানহাতে ধরা একটা গাছের ডালের টুকরো। তার ওপরে কাপড় জড়ানো। কী রঙের কাপড় সেটা আর বোঝা যাচ্ছে না, কারণ, কাপড়টা লালে লাল। আর মানুষটার গা থেকে রক্তের আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে।

প্রজেনের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। শত চেষ্টাতেও সে-কাঁপুনি থামছিল না।

তনয় আর টুনি চোখে প্রশ্ন নিয়ে প্রজেনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সেই নীরব প্রশ্নের উত্তরে প্রজেন ওপর-নীচে মাথা নেড়েছিলেন আর ভাঙা এবং কাঁপা গলায় বলেছিলেন, 'ডান। আমরা এখন ফ্রি...।'

টুনি একটা বড় পলিথিনের প্যাকেট নিয়ে প্রজেনের কাছে গেলেন। সেটার মুখটা চওড়া করে খুলে প্রজেনকে বললেন, 'হাতের লাঠিটা এর মধ্যে ফেলে দিন—।'

প্রজেন চুপচাপ কথা শুনলেন। ওঁর শরীর তখনও কাঁপছিল।

তনয় বেডকভার থেকে উঠে পড়েছিলেন। বিছানার নীচ থেকে আর-একটা পলিথিনের প্যাকেট বের করে প্রজেনের কাছে গেলেন।

'প্রজেনদা, তুমি আমাদের ওই অ্যাটাচড বাথরুমটায় চলে যাও। এই স্টেইনড জামাকাপড়গুলো খুলে এই প্যাকেটটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ো। পরে টুনি ওটার ব্যবস্থা করবে।'

প্রজেন প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কাঁপা পা ফেলে বাথরুমের দিকে এগোলেন।

টুনি চাপা গলায় বললেন, 'বাথরুমে সাবান, শ্যাম্পু সব আছে। ড্রেস আছে, ডিও আছে। ফ্রেশ হতে আপনার বড়জোর হাফ অ্যান আওয়ার লাগবে। প্লিজ, স্টেবল হোন, প্রজেনদা। আমরা যা করেছি সবার ভালোর জন্যেই করেছি...।'

প্রজেন বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

টুনি গাছের ডালসমেত পলিথিনের প্যাকেটটা নিয়ে চটপটে পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর বুকের ভেতরে ধুপ-ধুপ আওয়াজ হচ্ছিল।

একটু পরে টুনি ফিরে এলেন। দেখলেন, তনয় এখনও বিভ্রান্তভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

প্রজেন যে বাথরুমে আছে সেটা দেখে নিয়ে স্বামীকে জাপটে ধরলেন টুনি। কান্না মেশানো গলায় বারবার বলতে লাগলেন, 'কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি! কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি...!'

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে টুনির আবার কান্না পেয়ে গেল।

টুনি বিছানা থেকে উঠে চলে এলেন স্বামীর কাছটিতে। ওঁকে আর প্রজেনকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বিছানায়। নিজেও বসলেন। নরম মমতায় তনয়ের হাতে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

তনয় মাথা নীচু করে ছিলেন। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছিলেন বারবার। হয়তো আক্ষেপ কিংবা হতাশায়—অথবা পিতৃহত্যার অনুশোচনায়।

ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন। তনয়ের কথা শুনছিলেন, বৃষ্টির শব্দ শুনছিলেন আর ভাবছিলেন, এই খুনটার তদন্তে হাত না দিলেই বোধহয় ভালো হত।

এসিজি চোখ খুলে রঘুপতি আর নিজামুল সাহেবকে লক্ষ করলেন।

ব্যাপারস্যাপার দেখে-শুনে রঘুপতি যাদবের মতো আদ্যন্ত পুলিশি মানুষও কেমন যেন থম মেরে গেছে। আর নিজামুল হক মন দিয়ে সব দেখছিলেন, শুনছিলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার সমৃদ্ধ করছিলেন।

তনয় যে আবার কখন কথা বলতে শুরু করেছিলেন কেউ খেয়াল করেননি।

নিজামুলসাহেবের কোনও একটা কথার পিঠে তনয় বলছিলেন, 'বললাম তো, কাপড়টা সে-রাতেই আমরা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তবে গাছের ডালের টুকরোটা বাগানে রেখে এসেছিল প্রজেনদা। ওই যে, যেখানে গাছের ডালের টুকরো জড়ো করে রাখা আছে...।'

রঘুপতি একবার এসিজির দিকে তাকাল। কারণ, ওর স্যার একবার এরকমই কিছু একটা ইশারা করেছিলেন।

'কয়েকদিন পর গাছের ডালটাকে প্রজেনদা ওর কনস্ট্রাকশন সাইটে নিয়ে গিয়ে কেটেকুটে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে। না, প্রজেনদা শুধু ওই একটা ডাল নিয়ে যায়নি—ওটাকে আড়াল করতে আরও চার-পাঁচটা ডালের টুকরো নিয়ে গিয়েছিল।

'বাইশ তারিখে রাতে প্রজেনদা বাবার ঘরে আরও একবার গিয়েছিল মোবাইল ফোনটাকে প্লে-ব্যাক মোডে চালু করতে। যাতে সাবি অন্তত ভাবে, বাবা তখনও বেঁচে আছেন। ঘর থেকে প্রজেনদা চুপিচুপি বেরিয়ে আসার পর একটু আওয়াজ-টাওয়াজ করে সাবির ঘুম চটিয়ে দেয়। সেসময় প্রজেনদা বাবার ঘরের দরজায় এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যেন মনে হয় ও বাবার ঘরে ঢুকবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। সাবিকে শুনিয়ে প্রজেনদা বলে যে, স্যারকে এখন ডিসটার্ব করে লাভ নেই...এটসেটেরা এটসেটেরা। তারপর সেখান থেকে চলে যায়। মহাভারতের পাশাখেলা তখনও চলছিল।

'অনেক রাতে...বলতে গেলে প্রায় ভোরের দিকে...আমি আর প্রজেনদা আবার বাবার ঘরে আসি...ঘরটা সাজিয়ে-গুছিয়ে লকড রুম পাজল তৈরি করার জন্যে। ডক্টর গুপ্ত...' মুখ তুলে এসিজির দিকে তাকালেন তনয় : 'আপনার বুদ্ধি সত্যিই তারিফ করার মতো। শুধু বুদ্ধি, লজিক আর গেসওয়ার্ক দিয়ে আপনি সত্যি ব্যাপারটার কত কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন!

'ডক্টর গুপ্ত, আমরা এই তিনটে মানুষ—আমি, টুনি আর প্রজেনদা—প্রতিদিন কীভাবে যে টরচারড হচ্ছিলাম সেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। নিজেদের আর মানুষ বলে মনে হত না—মনে হত, আমরা জন্তুজানোয়ার বা সেরকম কিছু। আমরা তিনজন ধীরে-ধীরে একজোট হলাম। বিশ্বাস করবেন না, স্রেফ অপমান আর চোখের জল আমাদের একজোট করল। আমরা মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করেছিলাম। আমি জানি, মুক্তির পথ খোঁজা মানে অন্যায়ের পথে পা বাড়ানো। কিন্তু আপনি একবার ভাবুন তো, দিনের পর দিন কত অন্যায় আমরা সহ্য করছিলাম!'

তনয় থামলেন। টুনির হাতটা ধরে সামান্য চাপ দিলেন। প্রজেন বসু রায়ের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসলেন। তারপর :

'ডক্টর গুপ্ত, আমাদের আর কিছু বলার নেই। আমাদের তিনজনকে নিয়ে আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন...যেরকম শাস্তি দিতে চান দিন।'

তনয় চুপ করতেই ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ ছাপিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

তনয় আর প্রজেনের কথা শুনে এসিজি ভীষণ ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, রঘুপতির কথায় এই খুনের তদন্তে না নামলেই বোধহয় ভালো হত।

বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপ।

টুনি মজুমদার তনয়ের কাঁধে মাথা এলিয়ে আছেন। মুখে দুশ্চিন্তার প্রলেপ।

তনয় শূন্য চোখে ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে।

প্রজেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে অন্ধকার আর বৃষ্টিই বোধহয় ওঁর সবচেয়ে প্রিয়।

অনেকক্ষণ পর রঘুপতিই প্রথম কথা বলল। চাপা গলায় এসিজিকে জিগ্যেস করল, 'স্যার, নাউ হোয়াট টু ডু? প্লিজ অ্যাডভাইজ।'

এসিজি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। রঘুপতির চোখে তাকালেন : 'রঘুপতি, আমার মনে হয়, এই কেসটা আমাদের একটু অন্যভাবে ডিল করা উচিত...।'

'কীভাবে, স্যার?'

'দ্যাখো, নিলয় মজুমদার খুব বাজে টাইপের লোক ছিলেন। কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে গিয়ে উনি অনেক ক্রাইম করেছেন—এমনকী কয়েকজনকে ইনডিরেক্টলি মার্ডারও করেছেন। যেমন, ব্রজেন বসু রায় ওঁর একজন ভিকটিম। তা ছাড়া উনি চুরাশি বছর লাইফ এনজয় করেছেন।...আর...আর সবচেয়ে বড় কথা হল, তনয় মজুমদার, টুনি মজুমদার আর প্রজেন বসু রায়ের ডেইলি লাইফ উনি হেল করে তুলেছিলেন। সো...।'

'সো হোয়াট, গুপ্তাসাব?' রঘুপতি উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল।

নিজামুল হকও হান্ড্রেড পারসেন্ট আগ্রহ নিয়ে এসিজির দিকে তাকিয়ে।

এসিজি ধীরে-ধীরে বললেন, 'রঘুপতি, তোমরা ধরে নাও এই কেসটার মধ্যে আমি ঢুকিনি। মানে, আমি আজ—শুধু আজ কেন, কোনওদিনই—মজুমদারদের ''নিলয়নিবাস''-এ আসিনি। তা হলে পুলিশের রেকর্ড যেমন ছিল তেমনই থাকবে। মানে, কয়েকমাসের মধ্যেই কেসটা আনসলভড মার্ডার কেসের তকমা পেয়ে যাবে। তারপর এই কেসের ফাইলটা কোল্ড স্টোরেজে ঢুকে যাবে। ব্যস—ফিনিশ!'

কথা শেষ করার সময় এসিজির ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল।

রঘুপতি যাবদ আর নিজামুল হক এসিজির কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন।

অশোকচন্দ্র আলতো গলায় বললেন, 'তা ছাড়া এই কেসে প্রমাণ কই, রঘুপতি, প্রমাণ? মার্ডারাররা কনফেস করেছে ঠিকই, বাট সলিড প্রুফ কোথায়, সলিড প্রুফ? খুনটা হওয়ার এতদিন পরে তুমি নতুন কোনও প্রুফ আর পাবে না। সুতরাং, বাইরের কোনও অচেনা অজানা লোক এসে দোতলার লোহার জাল কেটে বারান্দায় ঢুকেছে—তারপর নিলয় মজুমদারের ঘরে ঢুকে ওঁকে ব্রুটালি মার্ডার করে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে—এরকম একটা রিপোর্ট লিখে তুমি এ-কেসের ফাইলটা ক্লোজ করার বন্দোবস্ত করো। দ্যাটস ইট, রঘুপতি। কেস ক্লোজড।'

রঘুপতি আর নিজামুল হক কোনও কথা বললেন না, শুধু ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন।

নিলয়ের বিছানায় বসা তিনটে মানুষ তখন খুব কাছাকাছি। প্রজেন এবং টুনির মাথা দুপাশ থেকে ঝুঁকে পড়েছে ওঁদের মাঝখানে বসা তনয়ের দিকে। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যেন খেলা শুরুর আগে ক্রিকেট প্লেয়ারদের হাডল।

টুনি মজুমদারের মুখের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছিলেন এসিজি। ওঁর মুখে ছেয়ে থাকা দুশ্চিন্তার প্রলেপ তখন অনেকটা সরে গেছে। ওঁকে দেখে এখন আর কিছুতেই 'ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট' বলে মনে হচ্ছে না। একসময় ওঁকে সেরকম ভেবেছিলেন বলে এসিজি মনে-মনে একটু লজ্জা পেলেন।

বৃষ্টিটা ধরে এল রাত সাড়ে আটটার পর।

এসিজি, রঘুপতি, নিজামুল হক আর ভগবান মিস্ত্রি মজুমদারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা জমিতে পা দিলেন। ঠান্ডা বাতাস ওঁদের ছুঁয়ে গেল। বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো বাতাসে উড়ছে।

বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায় একটা মলিন আলো জ্বলছে। সিমেন্ট বাঁধানো পথের দুপাশে এখানে-সেখানে জল জমে ছোট-ছোট গোস্পদ তৈরি হয়েছে। সেই জলে আলোর টুকরো চিকচিক করছে।

এসিজিদের সঙ্গে তনয় আর সাবিত্রী রয়েছে। সামনে আর আট-দশ পা এগোলেই লোহার মেন গেট।

একটা ব্যাপার বহুক্ষণ ধরেই অশোকচন্দ্রের মনের ভেতরে খচখচ করছিল। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছিল বারবার।

সে-রাতে সাবিত্রী বারান্দায় শুয়ে ছিল। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল। কিন্তু একেবারে পাশের ঘরে প্রজেন একটা গাছের ডাল দিয়ে নিলয় মজুমদারের মাথায় প্রচণ্ড জোরে হিট করলেন অথচ সাবিত্রী কোনও শব্দ-টব্দ পেল না! যদিও ডালটার ওপরে কাপড় জড়ানো ছিল, তবুও একটা জোরালো ভোঁতা শব্দ তো হবে!

এসিজি ভাবলেন, 'এখন তো সব চুকেবুকে গেছে। এখন সাবিকে সরাসরি ব্যাপারটা একবার জিগ্যেস করলে হয়...।'

এসিজি তনয় মজুমদারকে বললেন, 'মিস্টার মজুমদার, আর এগোতে হবে না—আপনি এবার আসুন।'

এ-কথায় তনয় ইতস্তত করছেন দেখে এসিজি আরও যোগ করলেন, 'সাবিত্রীকে আমি আলাদা করে দু-একটা কথা বলতে চাই...।'

একটু থতোমতো খেয়ে তনয় বললেন, 'ও, আচ্ছা...আচ্ছা। ঠিক আছে। আমি তা হলে আসি। আপনাদের...আপনাদের অনেক ধন্যবাদ...।' তারপর বাড়ির দিকে ব্যাক করলেন।

রঘুপতি আর নিজামুল অবাক হয়ে ডক্টর গুপ্তর দিকে তাকিয়েছিলেন। সাবিত্রীর সঙ্গে এখন আবার কী কথা!

সাবিও অবাক হয়ে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকিয়ে ছিল। এই দাদু এখন কী বলতে চায়?

এদিক-ওদিক তাকালেন এসিজি।

ভেজা মাটি, ভেজা গাছের পাতা। সদর দরজার বাইরে ভেজা রাস্তা। রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে ভেজা গাড়ি।

চারপাশে কেমন এক মায়াবী বিষণ্ণতা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি সাবিকে মনে-কাঁটা-বেঁধানো প্রশ্নটা করলেন।

'প্রজেনবাবু যখন ওই ডালের বাড়ি মেরে তোমার দাদুবাবাকে খুন করে তখন তুমি কোনও শব্দ শুনতে পাওনি? তুমি তো ঘরের পাশেই বারান্দায় শুয়ে ছিলে!'

সাবি কয়েকসেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'পেয়েছি। কেমন একটা ''ধপ'' শব্দ। আমার তখন ঘুম চটে গেছিল।' একটু থেমে আবার বলল, 'চোর-টোর এসেছে ভেবে আমি চট করে উঠে পড়েছিলাম। অন্ধকারে দাদুবাবার জানলার কাছে গিয়ে দেখি নতুন দাদাবাবু ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে। আর দাদুবাবা বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিছানায় অনেক রক্ত... অনেক রক্ত...।'

'তুমি সব দেখেছ অথচ পুলিশকে কিছু বলোনি!'

'না, স্যার। ফ্যামিলির ঝামেলায় আমার জড়িয়ে কী লাভ! আমি ছোট মানুষ—আর ওনারা আমার অন্নদাতা...। তাই মনে হয়েছিল পুলিশ যা করার করবে।'

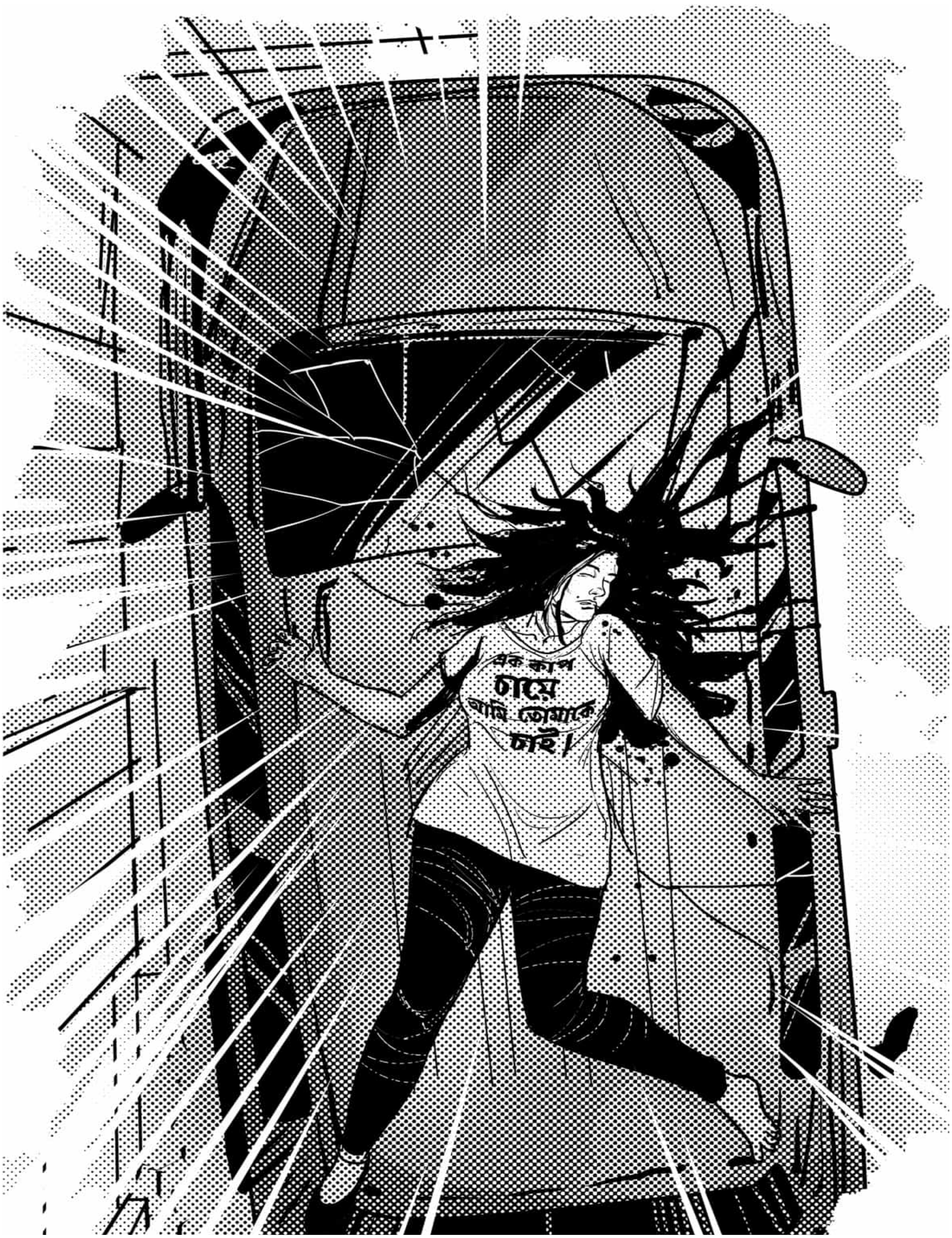
সাবি চুপ করে গেল। আর সবাই চুপচাপ।

একসময় এসিজি বললেন, 'সাবি, এবার তুমি যাও। আমরাও আসি—।'

সাবিত্রী চট করে কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা নমস্কার গোছের ছুড়ে দিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

'নিলয় নিবাস'-এর মেন গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পুরোনো একটা কথা এসিজির আবার মনে পড়ল : 'খুন অতি জঘন্য কাজ, কিন্তু খুনি ধরার কাজটা আরও জঘন্য।'

বিশ্বাসঘাতকদের জন্য





কয়েকটি কথা

১৯৬৮ সালে অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য় আমার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কর্ণধার গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দুর্বল রচনাটি প্রকাশ করে ফেলায় কালক্রমে কীভাবে যেন লেখালিখির মধ্যে চলে এসেছি। তারপর নানা রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকায় লেখালিখি, রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক-সম্পাদকদের সান্নিধ্য এবং আশকারায় অনেক-অনেক বছর কেটে গেছে। এই উপন্যাসে সেই কেটে যাওয়া রক্তঝরা বছরগুলোর কমবেশি ছাপ পড়েছে। তাই সেইসব পরিচিতজনকে এবং সেই সময়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের সঙ্গে, তার পরিমন্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে আমার পক্ষে এ-উপন্যাস লেখা কখনও সম্ভব হত না। রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে এ-রচনাটি আমার আন্তরিক নিবেদন।

এক

নীতিন জোয়ারদার প্যারিসে একটি চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী রিনি। বিয়ের পর এই প্যারিসেই দুজনে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এসেছিলেন। তখনই এই শহরটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন ওঁরা দুজনে। তারপর কেটে গেছে কুড়িটি বছর। এবার এই সম্মেলনের সুযোগে নীতিন সস্ত্রীক এসেছেন প্যারিসে—দ্বিতীয়বার।

নড়বড়ে মান্ধাতার আমলের ট্যাক্সি চড়ে ফ্রান্সের রাজধানীর সদ্য-ঘুম-ভাঙা রাজপথ ধরে ওঁরা এসে উঠলেন বিলাসবহুল গ্র্যান্ড হোটেলে। খানিকক্ষণ পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের রঙ্গ-রসিকতায় ডুবে গেলেন দুজনে।

তারপর রিনি স্নান সেরে নিল। তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। নীতিন বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলেন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, রিনি কার্পেট পাতা মেঝের ওপর দিয়ে জামাকাপড়ের সুটকেসটা টেনে নিয়ে গেল চোখের আড়ালে। এবার পোশাক-টোশাক পরে ও তৈরি হয়ে নেবে। তারপর ওঁরা দুজনেই সম্মেলনের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

দাড়ি কামাতে-কামাতে বাথরুম থেকেই নীতিন গলা উঁচু করে কথা বলছিলেন রিনির সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎই খেয়াল করলেন, রিনির কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তিনি স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন—একবার, দুবার।

কিন্তু কোনও সাড়া নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন নীতিন জোয়ারদার। হতবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, ঘরে আর কেউ নেই। রিনির ভেজা পোশাক একপাশে পড়ে আছে। আর তার কাছেই একটা সুটকেস—এই সুটকেসটা নীতিন আগে কখনও দেখেননি। তন্নতন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না তিনি।

একজন নিরীহ ছাপোষা ডাক্তারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হোটেলের ফ্ল্যাটে তিনি একা—আর কেউ নেই!

ড. নীতিন জোয়ারদারের স্ত্রী নামি হোটেলের দামি ঘর থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে উধাও হয়ে গেছেন।

এরপরই শুরু হল খোঁজ।

হোটেলের রিসেপশনের লোকজন বলল, মিসেস জোয়ারদারকে তাঁরা হোটেল ছেড়ে বেরোতে দেখেননি।

ফরাসি পুলিশ অফিসার মুচকি হেসে বললেন, আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে হোটেলে এসে উঠেছিলেন তো!

কেউ বা বললেন, উনি হয়তো কোনও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ইলোপ করেছেন।

মধ্যবয়স্ক একটি মানুষ বিদেশ-বিভুঁই শহরে পাগলের মতো স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে গ্র্যান্ড হোটেলের একজন পরিচারকের দেওয়া সূত্র ধরে নীতিন জানতে পারলেন, দুজন লোক তাঁর স্ত্রীকে একটা লাক্সারি সিডানে করে তুলে নিয়ে গেছে। সিডানটা যে-গলিতে পার্ক করা ছিল সেখানে গিয়ে নীতিন খুঁজে পেলেন রিনির ব্রেসলেট। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ মানতে রাজি নয় যে, রিনিকে কেউ কিডন্যাপ করেছে।

হোটেলে ফিরে এসে হতাশভাবে বসে রইল একজন বিপন্ন মানুষ। নীতিন এখন কী করবেন? কার কাছে যাবেন সাহায্যের জন্য?

পরদিন ড. জোয়ারদারকে ফোন করল একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ।

ড. জোয়ারদার?

কথা বলছি।

আপনার স্ত্রী আমাদের কাছে রয়েছেন।

নীতিন জোয়ারদার পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলেন অচেনা লোকটিকে।

তারপর জানতে পারলেন, ওরলি এয়ারপোর্টে তাঁর হাতব্যাগটি পালটে গেছে আর একজনের হাতব্যাগের সঙ্গে। সেই হাতব্যাগে একটা জিনিস আছে। সেটা নিয়ে এই লোকটির সঙ্গে কোথাও দেখা করে জিনিসটা দিলে ফেরত পাওয়া যাবে রিনিকে। আর নীতিন যদি পুলিশে খবর দেন তা হলে পাওয়া যাবে রিনির লাশ। এখন যেটা ড. জোয়ারদারের পছন্দ...।

অন্ধকার ঘরের বিশাল পরদায় বয়ে চলেছে রঙিন চলচ্চিত্র। রোমান পোলানস্কির রুদ্ধশ্বাস ছবি 'ফ্র্যানটিক'-এর বাংলায় ডাব করা সংস্করণ। নায়ক ড. নীতিন জোয়ারদারের ভূমিকায় হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড। 'সিরাজ' হোটেলের বলরুমের আবছায়া অন্ধকারে বসে বিশিষ্ট দর্শকরা ছবি দেখছেন।

'বার্ষিক রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক সম্মেলন' এইবার তৃতীয় বছরে পা দিল। উদ্যোক্তারা এ-বছরে কয়েকটি ক্রাইম ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। ফ্লিম আর্কাইভ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে 'জিঘাংসা' ও 'চিড়িয়াখানা'। এ ছাড়া বাছাই করা কয়েকটি বিদেশি ছবি বাংলায় ডাব করে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আজ, প্রথমদিনের ছবি ছিল 'ফ্র্যানটিক'।

ছবি যখন শেষ হল তখন ঠিক পৌনে তিনটে।

বলরুমের সাবেকী ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল। এ ছাড়াও অন্যান্য বাড়তি আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক।

অজস্র সাদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে সুদৃশ্য মঞ্চ। সাদা ফুলের ঘন পটভূমিতে গল্পের গোয়েন্দা শার্লক হোমসের বিখ্যাত ছবি। মাথায় চেক-চেক টুপি। পরনে একই নকশার কোট। ঠোঁটে পাইপ। বাঁকানো লম্বা নাক। ব্যক্তিত্বময় প্রোফাইল। চোয়ালের শক্ত রেখা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কাঁধ পেরোনোর পরই প্রখ্যাত গোয়েন্দার ছবিটা শেষ। কিন্তু অনায়াসেই বাকিটা কল্পনা করে নেওয়া যায়।

অনেকক্ষণ আধো-আঁধারির পর হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় 'বেঙ্গলি ক্রাইম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ভাস্কর রাহা চোখ পিটপিট করছিলেন। চোখের আর দোষ কী! ওদেরও তো বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি হল! পাঁচ বছর আগেই ওদের রিটায়ার করা উচিত ছিল। কিন্তু পুরু লেন্সের চশমা ওদের প্রতি পদে সাহায্য করায় ওরা এখনও হাল ছাড়েনি।

হাল ছাড়েননি ভাস্কর রাহাও। সেই কোন কালে, বলতে গেলে কিশোর বয়েসে, লেখালিখি শুরু করেছিলেন। তারপর আর থামা হয়নি। নিষ্পাপ গল্প-কবিতার পথ থেকে কবে যেন পদস্খলিত হয়ে 'অপরাধ' জগতে পা দিয়ে ফেলেছিলেন। ব্যস, তারপরই ফেরা-যায়-না এমন বিন্দুতে পৌঁছে গেছেন। 'অপরাধী' সাহিত্য চর্চা করতে-করতে কখন যেন ডুবে গেছেন 'পাপের বোঝায়'। আর কয়েক দশকের মধ্যেই জুটে গেছে কয়েকটা খেতাব। তার মধ্যে একটা হল 'রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট'। একদিন

রসিকতা করেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আড্ডায় কথাটা বলেছিলেন উৎপলেন্দু সেন। তারপর সেটাই যেন কেমন করে টিকে গেছে।

'হ্যারিসন ফোর্ডকে ড. নীতিন জোয়ারদার বলে ভাবতে বেশ কষ্ট হয়—' ভাস্কর রাহার পাশ থেকে উৎপলেন্দু মন্তব্য করলেন।

রাহা উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ডাব করা ছবি দেখতে বসে এসব ভাববেন না, উৎপল। আমরাও তো গল্পের আইডিয়া যখন সাহেবদের থেকে লোন নিই তখন জোনাথানকে করি যতীন, ক্যাথারিনকে রীনা, আর রবার্টকে করি রবি। ধীরে-ধীরে এসব গা সওয়া হয়ে যাবে।'

বলরুমে সুন্দর করে সাজানো সারি-সারি আধুনিক চেয়ার। চেয়ারে আমন্ত্রিত অতিথিরা বসে আছেন। লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, পাঠক, সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার—সব ধরনের অতিথিই হাজির হয়েছে এই সম্মেলনে। গত দু-বছরের তুলনায় এবারের সম্মেলনে জাঁকজমক ও আয়োজন একটু বেশি। কারণ, এবার বেশ কয়েকটি ভালো স্পনসর পেয়েছেন উদ্যোক্তারা। এ ছাড়া এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশকরা অন্তত তিরিশটি ক্রাইমজাতীয় বই প্রকাশ করেছেন। বলরুমের পাশের হলে একটি ছোট বইমেলারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভাস্কর রাহার বাঁদিকেই বসেছিলেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে এইবার শুরু হবে গল্প পাঠ। চারজন লেখক গল্প পড়বেন, তারপর সেই গল্পগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। চারজনের মধ্যে প্রথম নামটিই রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ভাস্কর রাহার কথায় তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন, 'আপনি হয়তো গল্পের আইডিয়া লোন নেন, ভাস্করবাবু, কিন্তু সবাই নেয় না। আপনি তো আমার বহু গল্প পড়েছেন। বলতে পারবেন, তার একটাও আমি বিদেশি গল্প থেকে আইডিয়া নিয়ে লিখেছি!'

রাহা হাসলেন। বললেন, 'রতনদা, বয়েস কত হল?'

একটু থতিয়ে গিয়ে রতন বললেন, 'সাতষট্টি—আপনার চেয়ে দু-বছরের বড়। কেন?'

ভাস্কর রাহা হেসে বললেন, 'এখনও সেই বিতর্ক! পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, না সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে! আরে দাদা, আমার কাছে ''ঘুরছে'' এটাই বড় কথা। সুতরাং আইডিয়া যেখান থেকেই আসুক, শেষ পর্যন্ত সাহিত্য হল কিনা সেটাই বড় কথা।'

উৎপলেন্দু চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন। তারপর ভাস্কর রাহার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা ঠাট্টার গলায় বললেন, 'সে কী! আপনি অ্যাদ্দিন ধরে এ-লাইনে রয়েছেন, জানেন না রতন বাঁড়ুজ্জের সব গপ্পো-উপন্যাসই সেন্ট-পারসেন্ট ওরিজিন্যাল। সাহেবরা পর্যন্ত এ-কথা একবাক্যে স্বীকার করেছে।'

ভাস্কর রাহা ছোট্ট করে হাসলেন। উৎপলেন্দু বেশ মজা করে কথা বলতে পারেন। এর একটা কারণ বোধহয়, তিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে 'রূপান্তর' নাটকের দলের সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে যুক্ত। লেখালিখি আর অভিনয়, এই নিয়েই আছেন। কিন্তু ষাটের দোরগোড়ায় এসে স্পষ্ট বুঝতে পারেন, দুটোর কোনওটাই তাকে কিছু দেয়নি। বরং আলেয়া হয়ে তিরিশ বছর ধরে তাঁকে অক্লান্ত ছুটিয়েছে, ছুটিয়েছে।

মঞ্চের ওপরে ঘোষক অনুষ্ঠানসূচি ঘোষণা করে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করল।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ-দিকে বসেছিল পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই লেখক অর্জুন দত্ত। সে নাকে সামান্য নস্যি গুঁজে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একরকম ঠেলা মারল, 'রতনদা, চটপট যান। আপনাকে ডাকছে—।'

সম্মেলন উপলক্ষ্যে রতন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে জামাইটি সেজে এসেছেন। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় তাঁকে বেশ মানিয়েছে। ধবধবে সাদা কোঁচানো ধুঁতি-পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেন। তার আশেপাশে পাউডারের ছোঁয়া। পাকা চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। সরু গোঁফজোড়া দেখলেই বোঝা যায় মালিক রোজ এদের যত্ন নেন।

ফোলিয়ো ব্যাগ থেকে গল্পটি বের করে ব্যাগ চেয়ারে রেখে মঞ্চের দিকে হাঁটা দিলেন রতন। সামনের সারিতে বসেছিলেন বর্ষীয়ান রহস্য-রোমাঞ্চ লেখিকা রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়। ওঁর পাশেই অনামিকা সেনগুপ্ত। ওঁরা দুজনে হেসে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উইশ করলেন।

উৎপলেন্দু লম্বা হাই তুলে বললেন, 'নিন, এবার একটা ওরিজিন্যাল ক্রাইম গল্প শুনুন, ভাস্করবাবু।'

ভাস্কর রাহা হাত নেড়ে বললেন, 'এত চটে যাচ্ছেন কেন? রতনদা সত্যিই হয়তো সব ওরিজিন্যাল লেখেন—।'

উৎপলেন্দু শুধু তাচ্ছিলের একটা 'হুঃ' শব্দ করলেন।

অনামিকা ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, 'ভাস্করদা, অনিমেষবাবু আমার কাছে ব্যাগ রেখে কোথায় গেলেন বলুন তো! আধঘণ্টা হয়ে গেল—আমার তো কোল ব্যথা করছে।'

অনামিকার বয়েস অল্প। লম্বা, ফরসা, সুন্দরী। লেখালিখি করে কম, কিন্তু সেগুলো নামি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। দুজন প্রকাশকের 'ঘর' থেকে এ-বছরের শেষে ওর দুটো বই বেরোনোর কথা।

একটা চুরুট ধরানোর জন্য ভাস্কর রাহার ঠোঁট আর আঙুল নিশপিশ করছিল। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনড বলরুমে স্মোক করার উপায় নেই।

তিনি বললেন, 'সত্যিই তো! পান কিনতে যাচ্ছি বলে যে চলে গেল তা তো প্রায় চল্লিশ মিনিট হবে। এই অধ্যাপকগুলোর না কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে! দাও, তুমি ব্যাগটা আমার কাছে দাও—।'

অনামিকা বলল, 'না, থাক। এখুনি হয়তো এসে পড়বেন—।'

অনিমেষ চৌধুরি ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন বাঙুর কলেজে। লম্বায় ছোটখাটো। তবে দৈর্ঘের খামতি পুষিয়ে দিয়েছেন প্রস্থ দিয়ে। তাঁর ব্যাগটির বপুও নেহাত কম নয়। ব্যাগ হাতে যখন তিনি হেঁটে যান তখন ভারি অদ্ভুত দেখায়।

ভাস্কর রাহা উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এতক্ষণ ধরে প্রফেসর কী পান কিনছে বলুন তো?'

উৎপলেন্দু হাসলেন। বললেন, 'দেখুন গিয়ে, সস্তার পান খুঁজতে-খুঁজতে হয়তো এ-গলি ও-গলি করে তিন কিলোমিটার পথ পার হয়ে কোথাও হারিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, যেরকম অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড...হতেও পারে...।'

'থামুন তো, আর বলবেন না। অন্যের বেলা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, আর নিজের বেলা টনটনে জ্ঞান। দেখছেন না, ব্যাগ রাখার জন্যে কী সুন্দর কোল বেছেছে।' শেষ মন্তব্যটা উৎপলেন্দু করেছেন চাপা গলায়।

সব কিছুতেই তেতো মন্তব্য করা উৎপলেন্দু সেনের একরকম স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে ওঁর সব মন্তব্যই যে উড়িয়ে দেবার মতো তা নয়। আসলে লেখালিখিতে ব্যর্থতা ওঁকে খানিকটা সিনিক করে তুলেছে। ওঁর চশমার পুরু কাচ অনেক বছর ধরেই ক্রোধ আর ঈর্ষায় নীল হয়ে গেছে।

এ-পর্যন্ত উৎপলেন্দুর মোট বারোটা বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে ন-টা অনুবাদ, আর বাকি তিনটে নিজের লেখা। বইগুলো খারাপ চলেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকাশকরা কেন যে ওঁর লেখা ছাপতে চায় না কে জানে!

উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবছিলেন ভাস্কর রাহা। ওঁর সঙ্গে রাহার আলাপ প্রায় পঁচিশ বছরের। রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের অনেক ওঠানামা দেখেছেন দুজনে।

অনামিকা উৎপলেন্দুর শেষ মন্তব্যটা ভালো করে শুনতে পায়নি। ও গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'কী বললেন, উৎপলদা?'

উৎপলেন্দু ভাস্কর রাহার দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'না...ওই অধ্যাপকদের ব্যাপার আর কী...।'

মঞ্চে তখন রতন বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প পড়ছেন। প্রায় সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন সেই গল্প।

গত বিশ বছর ধরে রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য চর্চা করলেও রতন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতির পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র দশ বছর। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। তার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা কিছু গল্প-উপন্যাসও আছে।

লেখনী চর্চার বহু আগে থেকেই শরীর চর্চা করতেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-বার নাকি ইন্টার কলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ানও হয়েছেন। বক্সিং নিয়ে ওঁর লেখা দুটো উপন্যাস বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এ ছাড়া একটা বক্সিং শেখার বই লিখেছেন।

এইসব কারণেই ভাস্কর রাহা অনেক সময় ওঁকে ঠাট্টা করে বলেন, 'দাদা, আপনি হলেন আমাদের লাইনের সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক।'

উত্তরে রতন হাসেন। বলেন, 'যে-অর্থেই বলুন, ভাস্করবাবু, কথাটা কি খুব মিথ্যে!'

এ-সম্পর্কে উৎপলেন্দুর চাপা মন্তব্য : 'শক্তিশালী তো বটেই! নইলে কি আর ওই ফোলিও ব্যাগের মধ্যে হাফ ডজন নানান সাইজের রেডিমেড লেখা নিয়ে সম্পাদক আর প্রকাশকের দপ্তরে দপ্তরে ঘোরা যায়!'

ভাস্কর রাহা মনোযোগ দিয়ে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প শুনছিলেন। উৎপলেন্দু তাঁকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী বুঝছেন? ওরিজিন্যাল?'

মঞ্চের দিকে চোখ রেখেই ভাস্কর বললেন, 'জন কোলিয়ারের একটা গল্পের আবছা ছায়া আছে।'

'আপনার কাছে ছায়াটা আবছা মনে হতে পারে, তবে আমার কাছে ছায়াটা বেশ স্পষ্ট এবং লম্বা। ইংরিজি গল্পটা আমারও পড়া।'

ভাস্কর রাহা গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, কারণ প্রথম সুযোগেই রতন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে গল্প সম্পর্কে মতামত চাইবেন। 'মুকুটহীন সম্রাট' হওয়ার এই জ্বালা!

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের আগাথা ক্রিস্টি। গত পনেরো বছর ধরে একের পর এক চমকে দেওয়া গল্প-উপন্যাস লিখে চলেছেন। অথচ ওঁর প্রথম দিককার লেখা নিয়ে সমালোচকরা খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। আবার ইদানিং কয়েকটা লেখাও বেশ হতাশ করেছে।

রত্নাবলী গৃহবধূ। ফরসা গোলগাল গিন্নিবান্নি চেহারা। কথাবার্তায় মেজাজে একটু সেকেলে। তবে লেখায় ভীষণ আধুনিক। গত পাঁচ বছরে ওঁর উপন্যাস নিয়ে তিনটে হিট ছবি তৈরি হয়েছে। এখন একটা ছবি হচ্ছে হিন্দিতে। ওঁর উপন্যাস ইংরিজিতে অনুবাদ হয়ে 'পেঙ্গুইন' থেকে বেরিয়েছে। ওঁর লেখায় রহস্য-রোমাঞ্চ উপাদানের পাশাপাশি জীবন-দর্শন এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে মুগ্ধ হতে হয়। ভাস্কর রাহা বাংলা গল্প-উপন্যাস খুব বেছে পড়েন। রত্নাবলীর লেখা ওঁর খুব পছন্দের। তা ছাড়া ভদ্রমহিলা সংসারের নানান দায়দায়িত্ব সামাল দিয়ে কী করে যে সময় বের করে নিয়ে লেখেন কে জানে!

মঞ্চের দিকে রওনা হওয়ার আগে রত্নাবলী স্মিত হেসে পরিচিতজনদের দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'নতুন গল্প পড়ব—।'

রত্নাবলী চলে যেতেই অনামিকা পিছনের সারির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'এই বয়েসেও প্রচুর লিখতে পারেন। হিংসে করার মতো।'

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পরিতৃপ্ত মুখে ফিরে আসছেন নিজের চেয়ারে। ভাস্কর রাহার দিকে একবার উৎসুক চোখে তাকালেন। অর্থাৎ, গল্প কেমন লাগল। ভাস্কর রাহা ইশারায় জানালেন, পরে এ নিয়ে আলোচনা করবেন।

উৎপলেন্দু তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, 'ওঁর গল্পটা নিয়ে কী আলোচনা করবেন? বলবেন, কোলিয়ারের লেখা থেকে ঝেড়েছে?'

রাহা হেসে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'উঁহু—প্রশংসা করব। বলব, খুব ভালো লেখা হয়েছে।'

উৎপলেন্দু ব্যঙ্গভরে বললেন, 'বাঃ!'

রাহা এতটুকু বিচলিত না হয়ে বললেন, 'এ ছাড়া কোনও উপায় নেই, উৎপল। আপনি কি চান, আমি ওঁকে বলি এখন থেকে ওরিজিন্যাল লেখা শুরু করতে! ওঁর লেখকজীবনের আর কতটুকু বাকি আছে! অনামিকা হলে সত্যি কথাটা বলতাম। বাংলা রহস্য সাহিত্যকে ওর এখনও অনেক কিছু দেবার আছে।'

অনামিকা গলা লম্বা করে জানতে চাইল, 'কী বলছেন, ভাস্করদা?'

'না, না—কিছু না। তুমি রত্নাবলীর গল্প শোনো।'

এমন সময় দেখা গেল অনিমেষ চৌধুরি ফিরে এসেছেন।

মানুষটা চেহারায় খাটো। বেশ গোলগাল চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পরনে গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি। কচমচ করে পান চিবোচ্ছেন। ঘামে তামাটে মুখ চকচক করছে। ইতি-উতি তাকিয়ে বোধহয় অনামিকাকে খুঁজছেন।

দু-সারি চেয়ারের ফাঁক দিয়ে অধ্যাপক চৌধুরি কোনওরকমে নিজের স্থূলকায় চেহারাটিকে টেনে নিয়ে আসছিলেন, উৎপলেন্দু তড়িঘড়ি তাঁকে কাছাকাছি একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। অধ্যাপক অনামিকার কাছে আসতে চাইছিলেন। কিন্তু উৎপলেন্দু খালি চেয়ার দেখিয়ে দেওয়ায় ফাঁপরে পড়ে গেলেন। অনামিকাও চট করে দাঁড়িয়ে উঠে পেটমোটা চামড়ার ব্যাগটা বাড়িয়ে দিল অনিমেষ চৌধুরির দিকে।

'অনিমেষদা, আপনার ব্যাগ—।'

অসহায়ভাবে ব্যাগটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা 'হুম' শব্দ করে ব্যাগটা ধরলেন অধ্যাপক। তারপর ব্যাগসমেত ধপাস করে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। একই সঙ্গে 'ফোঁস' করে একটা শব্দ করলেন।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাস্কর রাহাকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনই রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের গল্প পড়া শেষ হল। সারা হলে শোনা গেল ভদ্র করতালির শব্দ। ভাস্কর রাহা, উৎপলেন্দু, অধ্যাপক—সকলেই তাতে হাত মেলালেন।

রত্নাবলী হাসিমুখে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিপর্যয়টা ঘটে গেল।

মোটামুটি নিস্তব্ধ হলে একটি মাত্র মানুষ উদ্ধত ভঙ্গিতে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে অশ্লীলভাবে হাততালি দিতে লাগল।

রত্নাবলী তার দিকে তাকালেন।

শুধু রত্নাবলী কেন, হলঘরের প্রায় প্রতিটি মানুষ চোখ ফেরাল সেই দুর্বিনীত তরুণীর দিকে। কে এই অসভ্য রমণী? উপস্থিত দর্শকদের কেউ কেউ তাকে চেনে হয়তো, কিন্তু সকলেই নয়।

মেয়েটির বয়েস ছাব্বিশ কি সাতাশ। গায়ে টকটকে হলদে ঢোলা-টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকের ওপরে নীল হরফে লেখা : এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই। মেয়েটির চুল স্টেপ কাট করা। ছোট-ছোট ঢেউ তুলে ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠের ওপরে নেমে গেছে। চুলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে কানের শৌখিন দুল। গলায় আটোসাঁটো কালো পুঁতির মালা।

মেয়েটির গায়ের রং ময়লা হলেও নাক-চোখ ধারালো। বিশেষ করে দু-চোখে যেন দুটো হিরের কুচি বসানো। ফ্যাকাসে জিনসের প্যান্টের কোমরের কাছে এক হাত রেখে আর এক হাতের আঙুলে গলার মালা অনুভব করছিল।

ও হাততালি বন্ধ করলেও সেই বেপরোয়া শব্দস্রোত সকলের কানে বাজছিল।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎই যেন সাড় ফিরে পেয়ে ভাস্কর রাহাকে জিগ্যেস করলেন, 'ভাস্করবাবু, মেয়েটা কে বলুন তো? চেনেন নাকি?'

ভাস্কর রাহা নীচু গলায় বললেন, 'আমি ভালো করেই চিনি। দেবারতি মানি। ''সুপ্রভাত'' পত্রিকার ক্রাইম জার্নালিস্ট।'

অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজন মাইকে বললেন, 'আপনার কিছু বলার থাকলে মঞ্চে এসে বলতে পারেন —।'

দেবারতি মাথা ঝাঁকাল। ওর চুল সাপের মতো নড়ে উঠল এপাশ-ওপাশ। তারপর বলল, 'আমার বলার জন্যে মঞ্চ দরকার হয় না।' একটু থেমে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল : 'আমার নাম দেবারতি মানি। ''সুপ্রভাত'' পত্রিকার ক্রাইম জার্নালিস্ট। আমি রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস গোগ্রাসে গিলি। এখানে যেসব লেখক-লেখিকাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাঁদের অলমোস্ট সব লেখা আমি পড়েছি। তবে মিসেস রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের কোনও তুলনা নেই। ওঁর লেখার রহস্য একমাত্র ওঁর ডিটেকটিভ করঞ্জাক্ষ রুদ্র ছাড়া আর কেউ ধরতে পারে না। ওঁর লেখা আমার সবচেয়ে ফেভারিট। সুপার্ব! ওঁর এখনকার গল্পটাও আমার ফ্যানট্যাসটিক লেগেছে। ইউ আর সিম্পলি আনপ্যারালাল, মিসেস মুখার্জি—।'

পাশে বসা কেউ একজন দেবারতির হাত ধরে টান মেরে ওকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করল। আর তখনই দেবারতির সুঠাম দেহ সামান্য বেসামাল হয়ে টলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে বুঝতে পারলেন দেবারতি দিনদুপুরে নেশা করেছে।

ভাস্কর রাহা দেবারতির কথাগুলোর মধ্যে অন্য কোনও মাত্রা খুঁজছিলেন। মেয়েটা তাহলে লাঞ্চের সময়েই মদ গিলেছে! মেয়েটার কিসের কষ্ট?

হলঘরের গুঞ্জনের ডেসিবেল মাত্রা ক্রমে চড়তে লাগল।

দেবারতি মানি জড়িয়ে-জড়িয়ে অস্পষ্টভাবে আরও কীসব কথা বলছিল। তারই মধ্যে ওকে টেনে বসিয়ে দিল কেউ। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এখন আবার নিজের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন। ঠোঁটে সম্রাজ্ঞীর স্মিত হাসি ফুটিয়ে তুলে ছোট-ছোট পায়ে নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। তাঁর কাঁচাপাকা চুল, রিমলেস আধুনিক ছাঁদের চশমা, পরনের হালকা গোলাপি-কালোয় কাজ করা জামদানি শাড়ি, মাথা সামান্য হেলিয়ে হাঁটার ভঙ্গি এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে। বোঝা যায়, তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আগাথা ক্রিস্টি বলার সঙ্গত কারণ আছে।

সম্মেলনের তাল কেটে গেল।

এরপর গল্প পড়ার কথা রূপেন মজুমদার আর রঞ্জন দেবনাথের। সেইমতো ঘোষণাও করা হল মাইকে। কিছুক্ষণ চাপা গুঞ্জনের পর রূপেন মজুমদার মঞ্চে গেলেন। খানিকটা কল্পবিজ্ঞান মেশানো একটা ক্রাইম গল্প পড়ে শোনালেন। তারপর কেমন-লাগল-গোছের ভঙ্গিতে হাসলেন। শ্রোতাদের কেউ যখন গল্প নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললেন না, তখন নেমে এলেন মঞ্চ থেকে।

রূপেন মজুমদারের বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। পনেরো-ষোলো বছর বয়েস থেকেই তাঁর লেখা ছাপা হচ্ছে। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, তাই বাইশ বছর বয়েসেই নিজের টাকায় পরপর দুটো উপন্যাস ছেপে বের করেছিলেন। সেই বই দুটোর ভূমিকায় স্পষ্ট করে লেখা ছিল, উপন্যাস-যুগল সম্পূর্ণভাবে তাঁর মৌলিক চিন্তার ফসল। অবশ্য যে-কোনও পাঠক বই দুটো পড়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। কারণ, লেখা দুটোর প্লট যেমন দুর্বল, তেমনই সেকেলে তার ভাষা। পড়লেই মনে হয়, লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছাতার নীচ থেকে এখনও বেরোতে পারেননি।

কিন্তু এসব ব্যাপার রূপেন মজুমদারকে এতটুকু দমিয়ে রাখতে পারেনি। ভদ্রলোক একের পর এক বই লিখে গেছেন। সেগুলো যে-করে-হোক ছাপাও হয়েছে। শত্রুরা বলে সম্পাদক-প্রকাশককে তোয়াজের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি নেই। তবে গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে রূপেন মজুমদারের একটাই স্লোগান : তিনিই রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের একমাত্র মৌলিক লেখক। দুষ্টজনে ফিসফিসিয়ে বলে, রূপেন মজুমদারের ইংরেজি পড়ার অভ্যেস নেই, তাই এখনও 'সতী' রয়ে গেছেন। আর উৎপলেন্দু সেন ওঁকে বলেন, বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের একমাত্র ভার্জিন রাইটার। এখনও ওঁর ধর্ম নষ্ট হয়নি।

রঞ্জন দেবনাথকে বারবার মাইকে ডেকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন কর্মকর্তারা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তখনই হুট করে সে কোত্থেকে এসে হাজির হল। স্মার্ট ভঙ্গিতে মঞ্চে উঠে গিয়ে গল্প পড়তে শুরু করল।

রঞ্জন দেবনাথের চেহারা সুন্দর। লেখালিখির লাইনে না এসে অভিনয় জগতে গেলেও সে হয়তো ছাপ ফেলতে পারত। বয়েস বড়জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। চোখে এখনও চশমা ওঠেনি। গায়ের রং ফরসা, তবে সামান্য চাপা। মাথায় কোঁকড়া চুল। গালে চাপ দাড়ি, সঙ্গে মানানসই সরু গোঁফ। ধারালো নাক। উজ্জ্বল সপ্রতিভ চোখ। পরনে নীল-সবুজ স্ট্রাইপ দেওয়া ফুলহাতা শার্ট আর গাঢ় রঙের টেরিলিনের প্যান্ট।

রঞ্জনের গল্প পড়ার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে বেরোচ্ছে। ভাস্কর রাহা ওর গল্পের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি লাইন গভীর মনোযোগে শুনছিলেন। গল্পের নাম 'সংসারে পাপ আছে'। বেশ নতুন ধরনের নাম।

রঞ্জন দেবনাথের প্রথম উপন্যাস 'অন্ধকারে বাঘবন্দী খেলা' প্রকাশিত হয়েছিল কম করেও বারো-তেরো বছর আগে। তারপর ওর একটা গল্প সঙ্কলন বেরোয়, এবং তার বছরখানেকের মধ্যেই একটা গোয়েন্দা উপন্যাস 'পায়ের শব্দ নেই' প্রকাশিত হয়।

রঞ্জন পত্র-পত্রিকায় কম লিখলেও পাঠকেরা ওর লেখার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তারপর একরকম আচমকাই ও লেখা ছেড়ে দেয়। বলতে গেলে, মঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় গ্রিনরুমে। সম্পাদক-প্রকাশকদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু তারপর...।

তারপর, প্রায় এগারো বছর পর, রঞ্জন এ-বছর 'মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'খুনির নাম অজানা' নামে একটা নভেলেট লেখে। ক্ষুরধার বুদ্ধি মেশানো স্মার্ট লেখা। পড়লেই বোঝা যায়, রঞ্জন এগারো বছর ধরে ওর লেখার তরোয়ালে শান দিতে ভোলেনি। এই লেখাটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদক ও প্রকাশকরা ওর বাড়িতে হানা দিয়ে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলেন। তাঁরা রঞ্জন দেবনাথকে গ্রিনরুম থেকে আবার ঠেলে দেন মঞ্চের দিকে।

কিন্তু এগারো বছর বড় সুদীর্ঘ সময়। ভাবলেন ভাস্কর রাহা। এই লম্বা সময় নষ্ট করে ছেলেটা ভীষণ ভুল করেছে। নইলে এতদিনে ও প্রথম সারিতে নিজের জায়গা করে নিত।

রঞ্জন দেবনাথের গল্প পড়া শেষ। সেই সঙ্গে সম্মেলনের প্রথমদিনের কর্মসূচিতেও ইতি পড়ল। মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, বাইরের লাউঞ্জে চা-কফির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া পাশের হলে যে বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে সেটা দেখতেও যেন কেউ না ভোলেন।

দর্শক-আসন থেকে সকলে উঠে পড়ে রওনা হলেন দরজার দিকে। ছাই রঙের উর্দি পরা হোটেলের কয়েকজন বেয়ারা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অনুরোধ করছে চা-কফির কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে।

ভিড় ঠেলে ভাস্কর রাহা এগোচ্ছিলেন। ওঁর পাশে উৎপলেন্দু সেন। আর পিছনে অর্জুন দত্ত আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এয়ার কন্ডিশনড বলরুমে চুরুটের জন্য ভাস্কর রাহার আঙুল নিশপিশ করছিল, কিন্তু তিন তারা হোটেলের আদব-কায়দা লঙ্ঘন করতে পারেননি। এখন, দরজার বাইরে বেরোনো মাত্রই, তিনি তিনবারের চেষ্টায় একটা সস্তা চুরুট ধরালেন। উৎপলও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী ভাস্করবাবু, কেমন বুঝছেন?'

রাহা বেশ উৎসাহ নিয়ে খুশি-খুশি মুখে বললেন, 'ভালোই তো! কে ভেবেছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ক্রাইম ফিকশন এরকম একটা জায়গায় চলে আসবে! যাই বলুন উৎপল, এই সম্মেলনে এসে আমার বেশ লাগছে। ধরুন পশ্চিমে মডার্ন ক্রাইম স্টোরি শুরু হয়েছে ভলতেয়ারের হাতে—প্রায় আড়াইশো বছর আগে। তার প্রায় একশো বছর পর এডগার অ্যালান পো নিয়ে এলেন গোয়েন্দা দ্যুপাঁকে। আর আমাদের এখানে ক্রাইম কাহিনির পত্তন একশো বছরের কিছু বেশি। মানে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'', গিরিশচন্দ্র বসুর ''সেকালের

দারোগার কাহিনি'' এইসব বইগুলো ধরলে। তার মানে, আমরা পশ্চিমের চেয়ে প্রায় দেড়শো বছর পিছিয়ে থেকে দৌড় শুরু করেছি। সে হিসেবে এখনকার অবস্থাকে তো রীতিমতো রমরমা ব্যাপার বলা যায়—'

উৎপলেন্দু 'হুম' করে ছোট্ট একটা শব্দ করলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, কফি নিই—।'

ভিড় ঠেলে ওঁরা এগোতে যাবেন, পিছন থেকে কেউ ভাস্কর রাহার জামা ধরে টানল।

রাহা একটু অবাক হয়েই পিছন ফিরে তাকালেন।

দেবারতি মানি। চোখ সামান্য কুঁচকে হাসছে।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে! যদি বয়েসটাকে চোখের পলকে চল্লিশটা বছর কমানো যেত, তাহলে খুব ভালো হত। ভাস্কর রাহা ভাবলেন। না, দেবারতির শরীর ভাস্কর রাহাকে লোভাতুর করেনি। মেয়েটার জীবনীশক্তি, টগবগে চনমনে ব্যাপার, উচ্ছল হাসি কেমন যেন হাতছানি দেয়। বলে, কাম অন, হানি, তোমাকে দেখাব জীবন কাকে বলে! আর তখনই বয়েসটা কেমন যেন কমাতে ইচ্ছে করে।

ভাস্কর রাহা দেবারতির বুকের লেখাটা পড়লেন। বললেন, 'এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই। এখন চায়ের সময়।' তারপর হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কিছু বলবে?'

দেবারতিকে এখন দেখে নেশা করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। ওকে দেখে উৎপলেন্দু কেমন যেন একটু সিঁটিয়ে গেছেন। অর্জুন দত্ত আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতূহল নিয়ে দেবারতিকে দেখছেন।

দেবারতি হেসে বলল, 'মুকুটহীন সম্রাট, আপনার সঙ্গে আমার গোপন মন্ত্রণা আছে। টপ সিক্রেট। ওদিকটায় চলুন—'

দেবারতি আঙুল তুলে হোটেলের খোলা বারান্দার দিকে দেখিয়েছে। আধখানা চাঁদের মতো গোল বারান্দা। তার রেলিঙে সুন্দর পোর্সিলেনের টবে বসানো নানান গাছ। একটা পাতাবাহার গাছে বিকেলের রোদ খেলা করছে। দুটো চড়ুই লাফাচ্ছে তার ডালে।

দেবারতিকে ভাস্কর রাহা চেনেন প্রায় চার বছর ধরে। মেয়েটাকে দেখলেই তাঁর মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু সব সময়েই ওর মধ্যে কিসের যেন একটা কষ্ট টের পান তিনি। সেটা কী সত্যি, না তাঁর কল্পনা—কে জানে!

'উৎপল, আপনারা কফি খান, আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি—।'

হলের লোকজনকে পাশ কাটিয়ে ভাস্কর রাহা এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। দেবারতি পিছন পিছন আসছে। পিঠে ওর হাত টের পেলেন রাহা।

বারান্দার টবের পাশে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। 'কী যেন নাম?' ফুল ফুটে আছে টবের গাছে। সাদা আর গোলাপি।

নীচে তাকালেই চোখে পড়ে হোটেল চত্বর। সেখানে গাড়ির আনাগোনা। চত্বরের শেষে কয়েকটা পাম গাছ, তারপর বাহারি রেলিং, আর রেলিং পেরোলেই বড় রাস্তা। রাস্তায় সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি, বাস, মিনিবাস। হর্ন বেজে উঠছে থেকে থেকেই। বোঝা যায় জনজীবন কত ব্যস্ত।

ভাস্কর রাহার খুব কাছে এসে দেবারতি বলল, 'ভাস্করদা, সরি, লাঞ্চের সময় একটু খেয়েছি—' দু-আঙুলে মাপ দেখাল দেবারতি।

'চায়ের জন্যে গলা শুকিয়ে কাঠ। জলদি বলো, কী তোমার সিক্রেট।'

চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছিল। সেটায় বারকয়েক ঘন-ঘন টান দিয়ে রাহা যখন বুঝলেন লাভ নেই, তখন দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ছাই ঝেড়ে চুরুটটা পকেটে রেখে দিলেন। পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।

'ভাস্করদা, আমি একটা টপ সিক্রেট জানতে পেরেছি। শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না।'

ভাস্কর রাহার প্রশস্ত কপালে ভাঁজ পড়ল। কী সিক্রেট জানতে পেরেছে মেয়েটা? নাকি ওর স্বভাব অনুযায়ী ইয়ারকি মারছে?

দেবারতি মানি থেকে থেকেই লাউঞ্জের দিকে দেখছিল। সেখানে চা-কফির কাপ হাতে নিয়ে অতিথিদের জটলা।

বাতাসে ভাস্কর রাহার লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি, তাই শীতের ব্যাপারটা একটা ঠান্ডা আমেজের বেশি কিছু নয়। তবে বাতাসে ঝরাপাতার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

দেবারতি ঘাড়ের কাছে আলতো আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করার চেষ্টা করল। তারপর একটু চিন্তার সুরে বলল, 'এটা জানাজানি হলে কনফারেন্স একেবারে মাটি হয়ে যাবে। খবরের কাগজগুলোয় নির্ঘাত ফ্রন্টপেজ নিউজ—'

তার মানে! কী বলছে মেয়েটা! নেশার ঘোরে ভুল বকছে না তো?

দেবারতির মুখ থেকে হালকা হুইস্কির গন্ধ পাচ্ছিলেন রাহা। তিনি জরিপ নজরে দেখতে লাগলেন মেয়েটাকে।

ভাস্কর রাহা কী ভেবে বললেন, 'দেবারতি, আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে?'

'কী বলুন—।'

'এসব সিক্রেট ব্যাপারগুলো এখন সিক্রেটই থাক। আর চারদিন পরেই এই কনফারেন্স শেষ—তখন যা হয় কোরো—।'

দেবারতি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হবে। ইউ আর দ্য বস—।'

প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য রাহা জিগ্যেস করলেন, 'আজকের গল্প তোমার কেমন লাগল?'

'ওঃ, মিসেস মুখার্জি ওয়াজ গ্রেট। আমি ছোটবেলা থেকেই ওঁর লেখার ফ্যান। তবে রঞ্জন দেবনাথের লেখাও আমার ভালো লাগে। ভদ্রলোকের লেখায় শুধু একটাই গোলমাল—রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের অসম্ভব প্রভাব। এটা কেউ যদি ওঁকে স্ট্রেটকাট বলতে পারে তবে ওঁর পক্ষ ভালো হবে। কিন্তু জানেন তো, নাম-টাম হয়ে গেলে এই লেখকগুলো কেমন স্নব হয়ে যায়।'

'দেবারতি মানি, তুমি কিন্তু আমাকে স্নব বললে—।'

'ওঃ নো, ভাস্করদা। আপনি এসবের বাইরে। আপনি তো জানেন, এ আমার সাজানো কথা নয়। নাইনটি টু-তে আপনার টিভি ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় আমি পাবলিকলি এ-কথা বলেছি।' একটু থেমে দেবারতি ভাস্কর রাহার হাত চেপে ধরল। বলল, 'ডিয়ার ওল্ড ম্যান, আই লাভ ইউ সো মাচ—।'

তারপর জোর পায়ে হেঁটে চলে গেল অতিথিদের ভিড়ের দিকে। ভাস্কর রাহা প্রাণবন্ত এই মেয়েটার চলে যাওয়া দেখলেন।

কী সিক্রেট জেনে ফেলেছে দেবারতি? এমন সিক্রেট যা জানাজানি হলে কনফারেন্স পণ্ড হয়ে যাবে, খবরের কাগজের হেডলাইন হয়ে যাবে!

ভাস্কর রাহা পকেট থেকে আধপোড়া চুরুটটা বের করে আবার ধরালেন। বিকেলের রোদ মরে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলো ছায়া-ছায়া হয়ে গেছে।

মাথার লম্বা-লম্বা সাদা চুলে হাত বুলিয়ে তিনি ভাবলেন, দেবারতি মানি হয়তো তাঁর অনুরোধ রাখবে। কিন্তু চারদিন পরে ও যদি সেই 'গোপন' খবরটা ফাঁস করে তা হলেও কী বিপদ কম হবে!

ষাটের দশক থেকে বহু ঝড়ঝাপটা সহ্য করে রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য আজকের এই অভিজাত জায়গায় উঠে এসেছে। গত তিরিশ বছরে লড়াই কম হয়নি। সমালোচক, সম্পাদক আর প্রকাশকদের অবজ্ঞা-উপেক্ষা ছিল নিয়মিত ব্যাপার। তাঁদের প্রায় সকলেরই বক্তব্য, ১৯৭০ সালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা সাহিত্যের শাখাটিরও অপমৃত্যু ঘটেছে। সাহিত্যের কোনও একটি শাখা যদি মাত্র একজন লেখকের ওপরে নির্ভরশীল হয়, তা হলে সেই শাখার অপমৃত্যু হওয়াই ভালো। সাহিত্যের এই শাখাটি সম্পর্কে যাঁরা ভাবেন, সেইসব সম্পাদক-প্রকাশকরা তো পরে অন্যান্য লেখককে সুযোগ দেননি,

প্রশ্রয় দেননি, আশকারা দেননি! নামি পত্র-পত্রিকার সূচিপত্রে তো কোনওদিনই রহস্য-গোয়েন্দা গল্পের কোনও জায়গা ছিল না!

ভাস্কর রাহা ভোলেননি সেই উপেক্ষার দিনগুলো, অবজ্ঞার দিনগুলো, অবহেলার দিনগুলো। নাকি বলা যায় লাঞ্ছনার দিনগুলো?

তারপর অনেক পথ মাড়িয়ে বহু কান্না-ঘাম-রক্তের পর মাত্র পাঁচ-সাত বছর হল রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্য মর্যাদার জায়গা পেয়েছে। পাঠকরা এখন রত্নবলী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁরা চান ভাস্কর রাহার নভেলেট, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমাঞ্চকর কাহিনি। গত বছরে ভাস্কর রাহার আটটা গোয়েন্দা গল্প নিয়ে টিভিতে দেখানো হল তেরো এপিসোডের সিরিয়াল 'তৃতীয় নয়ন'। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় ওই প্রোগ্রাম যখন শুরু হত তখন পথঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। হাজার-হাজার চোখ অপেক্ষা করত টিভির সামনে—কখন ছোট পরদায় দেখা দেবে ভাস্কর রাহার শখের গোয়েন্দা সুরজিৎ সেন।

আজ ভাস্কর রাহার খ্যাতি, বাড়ি, গাড়ি—সব কিছুই লেখালিখি থেকে। কিন্তু বিলাসিতা তিনি ঘৃণা করেন। তাই হয়তো খেয়ালখুশি মতো লেখেন। যখন লিখলে প্রচুর টাকা পাওয়া যেতে পারে তখন তিনি লেখেন না। সম্পাদক-প্রকাশককে অনায়াসে হতাশ করেন। সংসারের কোনও চাহিদার দিকেই কখনও মনোযোগ দিয়ে তাকাননি। সবরকম বিলাসিতাকে বর্জন করে একটিমাত্র বিলাসিতাকে আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি—লেখার বিলাসিতা। এই তৃপ্তির জায়গাটা তিনি নষ্ট করতে চান না।

রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের এই সফলতাও তাঁকে ভীষণ তৃপ্তি দেয়। এ যেন সুদীর্ঘকাল লড়াইয়ের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-রক্তাক্ত অবস্থায় হঠাৎ জিতে যাওয়া। এর আনন্দই আলাদা।

অথচ সত্তর দশকের শুরুতে অবস্থাটা কী করুণ ছিল! 'ক্রাইম' পত্রিকার সম্পাদক এবং কর্ণধার রামচন্দ্র সাহার কাছে লেখকরা সকলে মিলে দাবি জানিয়েছিলেন, প্রকাশিত লেখার জন্য প্রত্যেক লেখককে পাঁচ টাকা করে হলেও সম্মান-দক্ষিণা দিতে হবে। সে কি ভয়ংকর যুদ্ধের কাল! ভাস্কর রাহা, উৎপলেন্দু সেন, অনিমেষ চৌধুরি, অর্জুন দত্ত, রূপেন মজুমদার—সকলেই সামিল ছিলেন সেই দাবিতে। এঁদের জন্য বড় কাগজের দরজা ছিল বন্ধ। ছোট কয়েকটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকাই একমাত্র সম্বল। প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মান-দক্ষিণা না-দেওয়াটা যখন ক্রমে-ক্রমে সেই সব পত্রিকার অভ্যাস ও অধিকারে দাঁড়িয়ে গেছে, ঠিক তখনই এই স্লোগান : টাকা ছাড়া আমরা লিখব না। অন্তত পাঁচটাকা হলেও দিতে হবে।

রামচন্দ্র সাহা সেই দাবি মেনে নিয়েছিলেন। চাঁদের মাটিতে পা দেওয়ার মতোই সেটা ছিল রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ক্ষণ। রামচন্দ্র সাহা অকাল-মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ১৯৭৪ সালে। কিন্তু ভাস্কর রাহাদের কাছে এই মানুষটা এখনও মরেনি। কখনও মরবে না।

দেবারতি মানি এসব লড়াইয়ের কী জানে! সুতরাং ওর পক্ষেই সম্ভব, পাথরের এক ঘায়ে রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের স্ফটিক-সৌধটিকে চুরমার করে দেওয়া। ওকে বারণ করতে হবে, দরকার হলে বাধা দিতে হবে। গোপন কথা গোপনই থাক। তা নইলে এই ঝড়ের ধাক্কা হয়তো সামলে ওঠা মুশকিল হবে।

ভাস্কর রাহার কপালে ভাঁজ পড়ল, চোখ ছোট হল।

কী তোর গোপন খবর, দেবারতি মানি?

দুই

রাত ন'টা নাগাদ তিনতলায় নিজের ঘরে বসে ছিলেন উৎপলেন্দু সেন। সামনে ছোট গোল টেবিলে ঠান্ডা জলের বোতল, ম্যাকডাওয়েলের ছোট খোকা, আর কাচের গ্লাস। গ্লাসে অল্প হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে

তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। ওর নেশার সঙ্গী হয়ে বসে আছেন আরও দুজন : 'ভয়ঙ্কর' পত্রিকার সম্পাদক প্রেমময় চৌধুরি, আর 'রহস্য প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড'-এর প্রধান মালিক কৌশিক পাল।

কৌশিক পাল বয়েসে তরুণ। সবসময় মোটর বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত স্কুল বইয়ের ব্যবসা করে। আর আগস্ট থেকে জানুয়ারি রহস্য-রোমাঞ্চ বইয়ের ব্যবসা। কলকাতা বইমেলার সময় কৌশিক অন্তত পঁচিশটা বই বের করে। ওর মুখে কখনও কেউ হা-হুতাশ শোনেনি। সবসময়েই উৎসাহে টইটম্বুর।

নিজের গ্লাসে ছোট চুমুক দিয়ে কৌশিক বলল, 'উৎপলদা, আপনি তা হলে ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে কপি রেডি করে দিচ্ছেন। দেখবেন, যেন পনেরো ফর্মার বেশি না হয়। আমি পঞ্চাশ টাকার বেশি দাম করব না।'

উৎপলেন্দু খানিকটা জড়ানো গলায় বললেন, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই। আঠারো-বিশটা গল্প জোগাড় করা তো—ও ঠিক হয়ে যাবে।'

উৎপলেন্দু সেনকে সম্পাদক করে একটা ভৌতিক গল্পের সংকলন বের করতে চায় কৌশিক। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গার বইমেলায় ওর স্টল থাকে। তাতে ও দেখেছে, ভূতের গল্পের বেশ চাহিদা আছে। যে-বস্তুর কোনও অস্তিত্বই নেই, দেখা যাচ্ছে, তার সম্পর্কেই পাঠকের আগ্রহ বেশি। এই মন্তব্যটা করে কৌশিক হাসল।

উৎপলেন্দু কৌশিককে দেখছিলেন। বয়েসে তাঁর প্রায় অর্ধেক। এরই মধ্যে কারণবারির ব্যবহারে ঘাগু হয়ে গেছে। বলে, এটা নাকি অ্যারিস্টোক্র্যাসির লক্ষণ। এই অল্প বয়েসেই ও পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন কেউকেটা। ফলে তিন বছর ধরেই এই সম্মেলনে নেমন্তন্ন পাচ্ছে। তা ছাড়া কৌশিক ব্যবসার নানারকম অন্ধিসন্ধি জানে। সরকারি মহল থেকে বইপত্র কেনা হলে সেই লিস্টে শতকরা দশভাগ অন্তত কৌশিকের বই থাকবেই। গভর্নমেন্ট পারচেজের কথা মনে রেখেই ও অপরাধশাস্ত্রের নানা বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বইও ছেপেছে।

সম্মেলনের প্রথমদিনের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে নানান মন্তব্য করছিল কৌশিক। উৎপলেন্দু ওর চপলতার জবাবে 'হুঁ', 'হ্যাঁ', শব্দ করছিলেন শুধু। আর প্রেমময় চৌধুরি গম্ভীরভাবে গ্লাসের তরলের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, গ্লাসে হুইস্কি নয়—রয়েছে কারও চোখের জল।

রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের সবচেয়ে সফল পত্রিকা 'ভয়ঙ্কর'। পত্রিকার বয়েস বাহান্ন বছর। তার মধ্যে প্রেমময় চৌধুরি সাঁইতিরিশটা বছর জুড়ে এর সম্পাদক হিসেবে। বলতে গেলে এই পত্রিকাতে লেখালিখি করেই রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় অধিষ্ঠিত আজকের জায়গায় পৌঁছেছেন। একটা সময়ে প্রেমময় ও রত্নাবলী যথেষ্ট কাছাকাছি ছিলেন। তখন রত্নাবলীর বয়েস ছিল—আজ নেই। তবে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখনও অটুট। 'ভয়ঙ্কর'-এর পুজো সংখ্যায় রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় বছরের সেরা এবং সুদীর্ঘ উপন্যাসটি লেখেন। ওঁর এবারের উপন্যাস 'দু-নয়নে ভয় আছে' পাঠক মহলে অন্যান্যবারের মতোই সাড়া ফেলেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রেমময় হঠাৎই মুখ খুললেন।

'উৎপলেন্দুবাবু, বিকেলে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন?'

'কী ব্যাপার?'

'দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই দো-আঁশলা ডবকা রিপোর্টারটা ভাস্করবাবুকে আড়ে-আড়ে কী যেন বলছিল—'

দেবারতির বাবা দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা ছিলেন। মদের ব্যবসায়ী। আর মা বাঙালি। পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তরাঁয় গান গাইতেন। কী করে যেন দুজনের দেখা হয়েছিল, ভালোবাসা হয়েছিল, এবং বিয়ে হয়েছিল। দেবারতি নিজেই সবিস্তারে সবাইকে এ-কথা বলে। মেয়েটার জিভ বড় আলগা। ছোটবেলায় একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ওর বাবা মারা যান। ওর মা বিয়ের পর গান-টান ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার

পর নিরুপায় হয়ে আবার ফিরে গেছেন পুরোনো পেশায়। সন্ধেবেলা ঝিমঝিমে আলোয় নেশাগ্রস্ত শ্রোতাদের সামনে 'মেরি হোঁঠ ভি সেক্সি, মেরি আঁখে ভি সেক্সি...'।

দেবারতি গতবারের কনফারেন্সে একঘর লোকের সামনে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমার যা পেডিগ্রি তাতে আমার ক্যাবারে ডান্সার হওয়ার কথা। কিন্তু কী যে হল, লেখাপড়া-টড়া শিখে আই বিকেম আ রিপোর্টার। ক্রাইম জার্নালিস্ট।'

কৌশিক উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'কী বলছিল, প্রেমদা? কিছু শুনতে পাননি?'

গ্লাসটা নাচিয়ে তরলে ঢেউ তুললেন প্রেমময়। ঝাপসা চোখে দেখছিলেন দেবারতির শরীর নাচছে। অনেক কিছু দুলছে। বয়েস প্রায় সত্তর হতে চলল, তবুও শরীরের জ্বালা কমে না। ভেবেছিলেন ষাট পেরোলেই এই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন, কিন্তু...।

বিড়বিড় করে তিনি কৌশিকের কথার জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। ও নাকি কী একটা টপ সিক্রেট জেনে ফেলেছে। সেটা ফাঁস করে দিলে নাকি একটা এক্সপ্লোশন হবে।'

'কী সিক্রেট?' উৎপলেন্দু জিগ্যেস করলেন।

দেবারতিকে তিনি এড়িয়ে চলেন। একবার তাঁর একটা রেডিও ইন্টারভিউর সময় মেয়েটা এমনভাবে অ্যাটাক করেছিল যে, ইন্টারভিউটাই শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। কিন্তু গতবারের সম্মেলনের সময় ফাজিল মেয়েছেলেটা তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাতিল ইন্টারভিউর ক্যাসেটটা বাজিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'উৎপলেন্দুবাবু, এই ক্যাসেটটা আমার পার্সোনাল কালেকশনে থাকবে। দ্য গ্রেট মিস্ট্রি রাইটার উৎ-প-লেন্দু সেন—।'

'লেন্দু' শব্দটার ওপরে অহেতুক অশ্লীলভাবে জোর দিয়েছিল মেয়েটা।

রাগে অপমানে উৎপলেন্দুর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। একে তো 'সুপ্রভাত' খুব নামী পত্রিকা, তার ওপর দেবারতির নিজস্ব কানেকশনও কিছু কম নেই।

উৎপলেন্দু সেন একরকম হেরেই গিয়েছিলেন দো-আঁশলা মেয়েটার কাছে।

উৎপলের প্রশ্নে প্রেমময় বললেন, 'সেটা শুনতে পাইনি।'

ঠিক তখনই ঘরের কলিংবেল বেজে উঠল।

উৎপল কৌশিককে ইশারা করতেই ও উঠে গেল দরজা খুলতে।

প্রেমময় বা উৎপল গ্লাস বোতল ইত্যাদি আড়াল করার কোনওরকম চেষ্টাই করলেন না।

কৌশিক দরজা খুলতেই দেবারতি মানিকে দেখা গেল। অদ্ভুত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দরজায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে। পরনে কালো-সাদা নকশার সালোয়ার কামিজ। কাঁধে ঝোলানো লেডিজ ব্যাগ।

প্রেমময় শরীরের জ্বালাটা আবার টের পেলেন। যৌবনে রত্নাবলী কি এতটা লোভনীয় ছিল?

কৌশিক ফিরে এসে আবার ওর জায়গায় বসে পড়ল।

'ভেতরে আসতে পারি?' ঠোঁঠের কোণে সামান্য হেসে জানতে চাইল দেবারতি।

প্রেমময় চৌধুরি উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'এসো, এসো। এ আবার জিগ্যেস করার কী আছে!'

দেবারতি ঘরে ঢুকে খুব সপ্রতিভ ভাবে উৎপলেন্দুর পরিপাটি বিছানায় বসে পড়ল। 'সিরাজ' হোটেলের তারার সংখ্যা তিন হলেও ঘরদোর বেশ ঝকমকে সুন্দর। আর দুটো তারা যোগ করে ফেলতে পারলেই অনায়াসে পাঁচ তারা হয়ে যেতে পারে।

প্রেমময় চৌধুরির 'ভয়ঙ্কর' কাগজে দেবারতি বেশ কয়েকবার কটা ফিচার লিখেছে। সবগুলোই সত্যঘটনার অন্তর্তদন্ত। লেখাগুলো তখন বেশ সাড়া ফেলেছিল। প্রেমময়ের মনে পড়ল, একবার নিজের দপ্তরে কাচের ঘরে মেয়েটাকে লেখালিখি সম্পর্কে নানান উপদেশ দেবার পর জিগ্যেস করেছিলেন, 'তোমার কবে যেন অফ ডে?'

দেবারতি নিষ্পাপ মুখে জবাব দিয়েছিল, 'কাল—মঙ্গলবার।'

'কাল দুপুরটা ফ্রি আছ?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'মানে, তোমাকে দিয়ে আগামী পুজোয় আমি একটা বড় গল্প লেখাতে চাই। তোমার ফিচারগুলো আমি খুঁটিয়ে পড়েছি—ওর মধ্যে ফিকশনাল কোয়ালিটি আছে। কাল দুপুরে তোমার বাড়ি গিয়ে সেই লেখাটার ব্যাপারে ডিটেইলসে ডিসকাস করতে পারলে ভালো হত।' একটু থেমে আবার বলেছেন, 'তোমার মা কি তখন বাড়িতে থাকবেন?'

দেবারতি জানে, 'ভয়ঙ্কর' পত্রিকায় পুজোয় বড়গল্প লিখলে চারহাজার টাকা পাওয়া যায়। ও পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে পোড় খাওয়া সম্পাদকটিকে জরিপ করল। তারপর খুব সহজ গলায় বলল, 'আপনার কাগজে পুজোয় বড়গল্প লিখতে গেলে শুতে হয়?'

প্রেমময় হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কান দুটো কেমন গরম লাগছিল। দেবারতির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু দেবারতি মানির বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি। ও হাসতে হাসতেই বলেছে, 'শোওয়া নিয়ে আমার কোনও শুচিবায়ু নেই। তবে যার-তার সঙ্গে শুতে আপত্তি আছে। আপনার মতো বুড়ো কোলাব্যাঙের সঙ্গে শোওয়া মানে তো আমি ঘেন্নায় ''বলো হরি, হরি বোল'' হয়ে যাব—।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল দেবারতি। ঠান্ডা গলায় বলেছিল, জানি আপনার কাগজে আমার লেখা আর ছাপা হবে না। কিন্তু কী করব প্রেমময়দা, বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে শুতে আমার আপত্তি আছে।'

মেয়েটা চলে গিয়েছিল কাচের ঘর থেকে। কিন্তু প্রেমময় চৌধুরি মাথা গরম করেননি। মাথা গরম করলে কখনও কাগজ চালানো যায় না, আর কাজও হাসিল হয় না। শিকার করতে গেলে ধৈর্য ধরতে হয়।

তিনি দেবারতির কাছে দুঃখপ্রকাশ করে সম্পর্কটা ওপর-ওপর ঠিক করে নিয়েছিলেন। তারপর দেবারতির লেখাও ছেপেছেন নিয়মিত। আর দেবারতিও ওর কাগজে প্রেমময় চৌধুরিকে নিয়ে টুকটাক নিউজ ছাপিয়ে গেছে, পাবলিসিটি দিয়েছে।

কিন্তু প্রেমময় ভোলেননি। দেবারতি মানিকে একটা চরম শাস্তি দেবার জন্য শুধু লাগসই সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন।

দেবারতি বসবার পর প্রেমময় এক চুমুকে গ্লাসের তরলটুকু শেষ করে জিভ বুলিয়ে নিলেন ঠোঁটে। তারপর বললেন, 'বলো, কী ব্যাপার?'

দেবারতি আঙুল তুলে উৎপলেন্দু সেনকে দেখাল। বলল, 'ওঁর একটা ইন্টারভিউ নেব।'

উৎপলেন্দুর চোখে মুখে প্রথমে দেখা দিল বিস্ময়, তারপরই সন্দেহ।

সেটা লক্ষ করেই দেবারতি হাসল। টান মেরে পোশাকের কয়েকটা ভাঁজ ঠিক করে নিয়ে বলল, 'এবারের এই কনফারেন্স নিয়ে আমি একটা বড় স্টোরি করব। সন্ধেবেলা ফোন করে এডিটরের সঙ্গে কথা বলে গ্রিন সিগনাল নিয়ে নিয়েছি। অনিমেষ চৌধুরির ইন্টারভিউ দিয়ে শুরু করেছি। সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট উৎপলেন্দু সেন। কী উৎপলবাবু, ইন্টারভিউ দেবেন তো?'

শেষ প্রশ্নটা উৎপলের দিকেই। অতএব উৎপলেন্দু সেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তারপর প্রেমময় চৌধুরি আর কৌশিক পালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তা হলে ডাইনিং হলে দেখা হবে। সওয়া দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে যাচ্ছি।'

ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। যাবার আগে প্রেমময় দেবারতিকে একবার দেখলেন। ইন্টারভিউ নেবার ছল করে মেয়েটা উৎপলেন্দুর সঙ্গে শুতে আসেনি তো! মনে হয় না। কারণ বাজারে ওকে আর রঞ্জন দেবনাথকে নিয়েই যত গুজব শোনা যায়।

ঘরের দরজা বন্ধ হতেই দেবারতি একটা খালি গ্লাস টেনে নিয়ে তাতে হুইস্কি ঢালল। তারপর তাতে খানিকটা জল মিশিয়ে নিল ঢকঢক করে। চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বলল, 'এটা কি আপনি খাওয়াচ্ছেন, না কনফারেন্সের স্পনসররা খাওয়াচ্ছে?'

উৎপলেন্দু সবজান্তা হাসি হেসে খানিকটা সহজ হতে চাইলেন। বললেন, 'আমি খাওয়াচ্ছি। জানেন না, কনফারেন্সের এই পাঁচ দিন স্পনসররা শুধু ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার খাওয়াচ্ছে। অবশ্য পাঁচদিন বিনিপয়সায় থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে এই আরামের হোটেলে—।'

দেবারতি বাঁকা চোখে তাকাল উৎপলেন্দুর দিকে। তারপর নোংরা সুরে বলল, 'বিখ্যাত সম্পাদক আর প্রকাশককে হুইস্কি খাইয়ে লাইন করছিলেন?'

উৎপলেন্দু আক্ষেপের হাসি হাসলেন। মেয়েটা সাহসী, বেপরোয়া—তবে অভিজ্ঞতা কম। জানে না, প্রেমময় চৌধুরির মতো সম্পাদকরা সহজে গলে না। নইলে এত খাওয়ানো সত্ত্বেও পুজো সংখ্যা 'ভয়ঙ্কর'-এ প্রতিবারে উৎপলেন্দু সেনের ছোট গল্প! একটা বড় গল্প বা উপন্যাসের জন্য উৎপল প্রেমময়কে ঠারেঠোরে কম বলেছেন! কিন্তু হা হতোস্মি! প্রেমময় চৌধুরি নির্বিবাদে উৎপলেন্দুর আতিথ্য গ্রহণ করেন—যেন সেটা তাঁর চৌদ্দ পুরুষের অধিকার। অথচ উৎপলেন্দুর ইশারাগুলো দিব্যি ন্যাকা সেজে না বোঝার ভান করেন।

আর কৌশিক! প্রকাশক হিসেবে সেদিনের ছোকরা—সে-ও কিনা সেয়ানা হয়ে গেছে! ভাস্কর রাহা, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়, রূপেন মজুমদার, এঁদের একটার পর একটা উপন্যাস ছেপে যাচ্ছে, অথচ উৎপলেন্দুর বেলায় 'সম্পাদিত বই'। এ যেন ছোটবেলার সান্ত্বনা পুরস্কার। কিন্তু তবুও উৎপল নিরাসক্ত হতে পারছেন কোথায়! একটা ক্ষীণ লোভাতুর আশা ওঁকে এখনও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কৌশিক আর প্রেমময়ের সঙ্গে যথাসাধ্য সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওঁরা যেন খুড়োর কল তৈরি করে উৎপলকে তাতে জুতে দিয়ে দৌড় করাচ্ছে।

উৎপলেন্দু সামান্য শব্দ করে হাসলেন, বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার তো জানা উচিত, এখনকার যুগে শুধু ভালো লিখলেই লেখা ছাপা যায় না, তার জন্যে যোগাযোগ দরকার, যোগাযোগ—।'

'যোগাযোগ' শব্দটার ওপরে বেশ জোর দিলেন উৎপলেন্দু।

ব্যাগ থেকে প্যাড আর পেন বের করল দেবারতি। সরলভাবে জিগ্যেস করল, 'আপনার কি ধারণা আপনি ভালো লেখেন—তাও আপনার লেখা ছাপা হয় না?'

উৎপলেন্দুর পুরোনো ইন্টারভিউটার কথা মনে পড়ল। মেয়েটা কি আবার সেই শয়তানি পথ নিয়েছে? মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছে, কিন্তু তাও গ্লাস তুলে নিলেন উৎপল। হতাশার ক্ষতের জ্বালা বড় ভয়ঙ্কর। মেয়েটা কি তার মধ্যে নুনের ছিটে দিতে এসেছে?

ঠকাস করে টেবিলে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন উৎপলেন্দু। একটা পঁচিশ-ছাব্বিশের মেয়েকে ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আক্রমণই করতে হবে।

সুতরাং অকুতোভয়ে মনের কথা বললেন, 'ধারণা নয়, আমি ভালো করেই জানি যে আমি অনেকের চেয়ে ভালো লিখি। কিন্তু পত্রিকাগুলো কখনও ভালো লেখা ছাপবে না। ছাপলে ওদের মাইনে করা জনপ্রিয় লেখকগুলোর নাম-ডাকে টান পড়বে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'জানেন, সেই চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে আমার লেখা ছাপা হচ্ছে!'

'জানি। কিন্তু তাও দেখুন, এই কনফারেন্সে আপনাকে মাঝারি লেখক হিসেবে ডাকা হয়েছে। আপনাকে গল্পপাঠের লিস্টে রাখা হয়নি।'

উৎপলেন্দুর কান গরম হল। মেয়েটা আহত মর্যাদায় ঘা দিয়েছে। তাঁকে এইভাবে হেনস্থা করার পিছনে অনুষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের নিশ্চিত হাত রয়েছে। উৎপলকে ওঁরা কিছুতেই প্রথম সারিতে আসতে দেবে না। কিন্তু তাও তিনি অনুষ্ঠানে এসেছেন। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

সেই চোদ্দো বছর বয়েস থেকে তেতাল্লিশ বছর ধরে লেখালিখি! কী কষ্টের সব দিন, কী অপমানের সব দিন! চুনোপুঁটি, ক-অক্ষর-গোমাংস সব সম্পাদক-প্রকাশকরা কী হেনস্থাটাই না করেছে! ভাস্কর রাহার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়। যখনই উৎপল তাঁর প্রথম ছাপা লেখার কথা বলেন, তখনই রাহা মন্তব্য করেন, 'কী আর করবেন, উৎপল। জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।'

তার মানে! জ্যেষ্ঠ হলেই কি তাহলে নিকৃষ্ট হতে হবে?

উৎপলেন্দুর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে দেবারতি হাসল। সুন্দর দাঁতে পেনটাকে আলতোভাবে কামড়ে ধরল। সামনের বড় আয়নায় উৎপলেন্দু সেনের বাঁ দিকের প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল। ফরসা মুখে লালচে আভা। চওড়া কপাল। যাত্রাদলের নায়কের মতো বাবরি চুল। তবে বয়েসের জন্য কাঁচাপাকা এবং পাতলা হয়ে গেছে। গোটা মুখে কেমন যেন ক্লান্ত, আহত, পরাজিত সৈনিকের ছাপ। তবে আত্মমর্যাদা ও অহঙ্কারের ইশারাও স্পষ্ট।

মাথা নেড়ে এক ঝটকায় চুল সরাল দেবারতি। ওর বুক নড়ে উঠল। হাতের পেনটা বিছানায় রেখে টেবিল থেকে গ্লাস তুলে চুমুক দিল। তারপর জিভ দিয়ে 'চুকচুক' শব্দ করে জিগ্যেস করল, 'রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য তাহলে আপনাকে কিছু দেয়নি?'

উৎপলেন্দু মুখ তুলে মেয়েটাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর : 'বিশেষ কিছু দেয়নি।'

'আচ্ছা, এটা না হয় গেল। তিরিশ বছর তো মাঝারি এক নাটকের দলে অভিনয় করলেন। যদ্দূর জানি, খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেননি। নাটকের মেজর রোল সেরকমভাবে পাননি। সিনেমা বা টিভিতেও কোনও চান্স পাননি। এরকমটা হল কেন?'

ভেতরে-ভেতরে একটা অদ্ভুত রাগ হচ্ছিল উৎপলেন্দুর। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, 'ম্যাডাম, নাটক হোক আর লেখালিখি হোক, ব্যাপারটা আসলে একই। সম্পাদক বলুন, প্রকাশক বলুন আর নাটকের দলের চিফ বলুন—কালচারাল লাইনের লোকগুলো বেসিক্যালি একরকম। ওরা কাউকে সহজে উঠতে দেয় না।'

দেবারতি পেন নিয়ে প্যাডে কিছুক্ষণ কী সব লিখল। তারপর ছোট্ট করে মন্তব্য করল, 'তা হলে আপনাকে মোটামুটিভাবে ব্যর্থ বলা যায়?'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ—কিন্তু সমর্থ। আমাকে ক্ষমতা প্রমাণ করার কেউ সুযোগই দিল না।'

'সমর্থ?' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল দেবারতি। তারপর চাপা গলায় বলল, 'তাহলে বিয়ে করেননি কেন?'

উৎপলেন্দু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'এমনিই—।'

'প্রথম প্রেমের ন্যাকামি—না আর কিছু?' অর্থপূর্ণ নজরে উৎপলকে দেখল দেবারতি।

'না, না, প্রথম প্রেম-টেম কিছু না।'

'তাহলে?'

বড় অবাধ্য এই যুবতী। ভাবলেন উৎপলেন্দু। তাঁর বিয়ে না করার পিছনে কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা সবাইকে বলার নয়। কাউকে বলার নয়। যারা জানে তারা জানে। আর কারও জানার দরকার নেই।

উত্তর না পেয়ে দেবারতি বলল, 'নাটকের দলে তো মেয়ে আছে। সেখানে মজা লুটছেন?'

উৎপলেন্দুর চোখে মুখে রক্তকণিকার দল হইহই করে ভিড় করল। কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। একবার তাঁর মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গেছে। উত্তেজিত হওয়াটা ডাক্তারের বারণ।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে উৎপলেন্দু উত্তর দিয়েছেন, 'ম্যাডাম, এটুকু আপনাকে বলি, আমি কনফার্মড ব্যাচেলার। আর মজা লুটতে গেলে নাটকের দল কেন, অন্য ঢের জায়গা আছে।'

চোখ নাচাল দেবারতি : 'আছে জানি, কিন্তু আপনার যাওয়ার সাহস নেই।' গ্লাসে শব্দ করে একবার চুমুক দিয়ে : 'সে-সাহস থাকলে অ্যাদ্দিনে আপনার মুখেভাত হয়ে যেত।' খিলখিল করে হেসে উঠল দুর্বিনীত নারী।

কান আরও বেশি গরম হল। ঘরটা যেন দুলে উঠল চোখের সামনে। সেই অবস্থাতেই বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। জল মেশাতে ভুলে গেলেন বোধ হয়। গ্লাসে চুমুক দিতেই জ্বলন্ত কাঠকয়লা গলা বেয়ে নেমে গেল পাকস্থলীতে।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে উৎপলেন্দু সেন হয়তো ধৈর্য ও সংযম ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে পালটা জবাব দিলেন, 'কী করে জানলেন হয়নি?'

দেবারতি মানি উৎপলের কথায় একটুও আমল না দিয়ে বলল, 'এ-বছরটা কিসের বছর বলুন তো?'

উৎপলেন্দু খানিকটা বিস্মিত হলেন। চুপ করে থেকে বুঝতে চাইলেন, এর পরের আঘাতটা কোন দিক থেকে আসবে।

ওঁকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল দেবারতি। হাসতে-হাসতেই বলল, 'ও মা! তাও জানেন না! প্রতিবন্ধী বর্ষ।'

'তাতে কী হয়েছে?'

গ্লাসে চুমুক এবং উচ্ছৃঙ্খল হাসির পর : 'আই থিঙ্ক ইউ আর ওয়ান, মিস্টার সেন। যৌন প্রতিবন্ধী—।'

উৎপলেন্দু আর সইতে পারেননি। তাঁর ওপরের ভদ্রতার পোশাক খসে পড়ল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে অভিনেতার ঢঙে শব্দ করে হেসে বলেছেন, 'যদি সাহস থাকে তাহলে পরীক্ষা প্রার্থনীয়, মিস মানি।' মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। অপমানের আগুন। দাঁতে দাঁত চেপে বাঁকা হেসে তিনি আরও যোগ করলেন, 'গ্যারান্টি দিচ্ছি, আনন্দ পাবেন।'

আশ্চর্য! দো-আঁশলা মেয়েটা এ-কথায় এতটুকু বিব্রত হল না। বরং বিদ্রোহের হাসি হেসে বলল, 'আপনাদের মতো হিপোক্রিটদের কথার কী দাম আছে! পরীক্ষার সময়ে হয়তো ভয়ে পিছিয়ে যাবেন—।'

উৎপলেন্দু কিছু বলে ওঠার আগেই দরজায় কলিংবেলের শব্দ।

দেবারতি চট করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

খানিকটা বেসামাল পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন উৎপলেন্দু সেন।

অধ্যাপক অনিমেষ চৌধুরি।

পরনে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। ভুঁড়ির ওপরে গেঞ্জিটা খানিকটা তুলে পাজামার দড়িটা টেনে ধরে আছেন ভদ্রলোক। উৎপলেন্দুর দিকে কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'উৎপলেন্দুবাবু, আপনার কাছে একটা কাঁচি হবে?'

'কাঁচি! কাঁচি দিয়ে কী করবেন?'

'দেখুন না, পাজামার দড়িটায় একটা গেঁট পড়ে গেছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে উৎপলেন্দুকে পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল দেবারতি মানি।

অনিমেষ চৌধুরি ওকে দেখে যেন বোবা হয়ে গেলেন। একবার উৎপলের দিকে, আর একবার দেবারতির দিকে দেখতে লাগলেন। তারপর উৎপলের দশাসই শরীরের পাশ দিয়ে ঘরের ভেতরটায় একবার উঁকি মারার চেষ্টা করলেন।

দেবারতি অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে হাত নাড়ল। বলল, 'হাই, প্রফেসর—!'

তারপর হোটেলের করিডর ধরে হাঁটা দিল। সালোয়ার কামিজ পরার ফলে ওর শরীরের রেখাগুলো জোরালো আলোয় বড় চোখে লাগছিল। অধ্যাপক সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

উৎপলেন্দু তাঁকে বললেন, 'পাজামার গেঁট আর খুলে কাজ নেই। যান, ঘরে যান। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

করিডরের দেওয়ালে লাগানো ঘড়িতে সাড়ে দশটার ইলেকট্রনিক মিউজিক বেজে উঠল।

তিন

ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে দেবারতি মানি এলোমেলো চিন্তা করছিল। ঘরে হালকা সবুজ রঙের নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। রহস্যময় আলোয় ঘরের ছায়া ছায়া আনাচ-কানাচগুলো কেমন যেন ভয় দেখাচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু হঠাৎ কখনও ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বড় রাস্তা থেকে।

লেসের কাজ করা গোলাপি নাইটি পরে বিছানায় শুয়েছিল দেবারতি। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। একটা ডিসপ্রিন ট্যাবলেট খেয়ে নিলে হয়। রাত কত এখন? বারোটা?

মাত্র তিনজনের ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ হয়েছে ওর। অনিমেষ চৌধুরি-উৎপলেন্দু সেন আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাল কনফারেন্সের ফাঁক-ফোকরে বাকি ইন্টারভিউগুলো সেরে নেবার চেষ্টা করবে। এগুলো মিলিয়ে সত্যি সত্যিই একটা স্টোরি লিখবে দেবারতি। কিন্তু অন্য একটা মতলবও আছে ওর। টপ সিক্রেট বোমাটি ফাটানো। কনফারেন্সের শেষ দিনে ভ্যালিডিক্টরি ফাংশানের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে সভার মাঝখানে ও ডিনামাইটের পলতেয় আগুন দেবে। তারপর যা হয় হোক।

রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসে বলেই এ-নিয়ে নোংরা কাজ দেবারতি সহ্য করতে পারে না। তাই পরশুরামের কুঠার হাতে ও লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। জালিয়াত অক্ষম ভন্ড লেখকগুলোকে ও চুরমার করে দেবে। এইসব লেখকদের জন্যই রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য দীর্ঘদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছে। এখন এ-লাইনের অনেক লেখক সফল। তাই এখনই সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর হতে হবে। আর সেই কারণেই ইন্টারভিউ নেবার ছল করে ওর টপ সিক্রেট খবর সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নিতে চায় দেবারতি।

আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলেই হোটেলে রয়েছেন। উদ্যোক্তারা তাঁদের জন্য মাথাপিছু একটা করে ঘর যেমন বরাদ্দ করেছেন, তেমনই দিয়েছেন রোজকার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের কুপন। এছাড়া আজ সকালে কনফারেন্সের রেজিস্ট্রেশনের সময় পাওয়া গেছে সুদৃশ্য ব্যাগ, পেন, প্যাড, আর একটা ব্যাজ। দেবারতি ব্যাজটা ব্যাগেই রেখে দিয়েছিল—বুকে লাগায়নি। লাগানোর দরকারও নেই, কারণ উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই ওকে চেনেন। তা ছাড়া ওর দৈনিক পত্রিকা 'সুপ্রভাত' এই সম্মেলনের অন্যতম স্পনসর।

কলিংবেল বেজে উঠল টুং-টাং।

অবাক হল দেবারতি। ওর ঘরে কে এল এত রাতে?

বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলতে গেল। অত সহজে কাউকে ভয় পায় না দেবারতি। আর তিন তারা এই হোটেলে ডাকাত পড়ার ভয় নিশ্চয়ই নেই!

কিন্তু দরজা খুলতেই ডাকাতের মুখোমুখি হল।

রঞ্জন দেবনাথ। পরনে কটসউলের হাওয়াই শার্ট আর জিনস।

'কী ব্যাপার! এত রাতে!'

দেবারতি মানির বিস্ময়কে আমল দিল না রঞ্জন। হেসে বলল, 'শুনলাম জনগণের ইন্টারভিউ নিয়ে বেড়াচ্ছ—তাই ভাবলাম ঘরে গিয়েই ইন্টারভিউটা দিয়ে আসি। নইলে আমার মতো খাপছাড়া খামখেয়ালি লেখক...কে আর পাত্তা দেয়...হয়তো বাদই পড়ে যাব।'

রঞ্জনটা ইয়ারকি মারতেও জানে! ভাবল দেবারতি! ও কি জানে না, ওকে দেখলেই দেবারতির বুকের ভেতরটা কেমন করে!

দেবারতি চোখের নমনীয় ইশারায় রঞ্জনকে ভেতরে ডাকল। অস্ফুটে বলল, 'এসো—।'

রঞ্জন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। চোখ নাচিয়ে মজা করে বলল, 'কী দেবারতি মানি, বলো তোমার মিস্ট্রি রাইটারদের নামের লিস্টে অধমের শুভনাম আছে কি না। এগারো বছর লেখালেখি ছেড়ে দিয়ে ''সাধু'' হয়ে গিয়েছিলাম বলে কেউ আর পাত্তা-টাত্তা দেয় না, বুঝলে।'

দেবারতি কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই রঞ্জনের খুব কাছে চলে এল। বিড়বিড় করে বলল, 'বাংলা মিস্ত্রি রাইটারদের মধ্যে তুমিই একমাত্র পুরুষ লেখক। ইউ অলওয়েজ রাইট লাইক আ ম্যান। সত্যিকারের পুরুষের মতো লেখো—।'

রঞ্জন দেবারতিকে জাপটে ধরল দু-হাতে। বলল, 'শুধু লেখা নয়, সত্যিকারের পুরুষের মতো আমি আরও অনেক কিছু করতে পারি।'

'জানি।' একটু থেমে : 'আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে!'

কানাঘুষোয় দেবারতি শুনেছে, রত্নাবলীর সেই শুরুর জীবন থেকেই রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর একটা গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। ইদানিং দেবারতি মানির জন্যেই হয়তো সেই বন্ধুত্ব কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। রঞ্জন আর রত্নাবলীর অসমবয়েসি বন্ধুত্ব নিয়ে লেখক মহলে, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আড্ডায় কম আলোচনা হয় না। কিন্তু আলোচনায় কী যায় আসে! রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় দেবারতির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়। অন্তত এখন।

দেবারতি রঞ্জনের আদর খেতে-খেতেই জিগ্যেস করল, 'গল্প লেখার কদ্দূর?'

সম্মেলনের শেষ দিন সকালে একটা ওয়ার্কশপ আছে। তখন আমন্ত্রিত লেখকদের একটা করে লেখা পড়ে শোনাতে হবে। সেটা অসম্পূর্ণ লেখা হলেও চলবে। তারপর সেই লেখা নিয়ে চুলচেরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

রঞ্জন ততক্ষণে দেবারতির কানের কাছে মুখ ঘষছিল। ওর জড়ানো স্বর শোনা গেল, 'টু হেল উইথ ওয়ার্কশপ...ফর গডস সেক, হোল্ড ইয়োর টাঙ অ্যান্ড লেট মি লাভ...।'

আবছায়া সবুজ আলোয় দুটো শরীর এক হয়ে এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। আচমকা ধসে পড়া জীর্ণ বাড়ির মতোই ওরা পড়ে গেল বিছানায়।

অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে কোনওরকমে পোশাক-আশাকগুলো খুলে ফেলল ওরা। তারপর নগ্ন দেবারতিকে দেখে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে রইল রঞ্জন। সবুজ আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে।

'কী ভাবছ?' রঞ্জনের গালে, দাড়িতে, আঙুল চালাল দেবারতি।

'পথের পাঁচালি।'

'পথের পাঁচালি!' অবাক হল দেবারতি।

হ্যাঁ! বিভূতিভূষণের কলমে আঁকা সজীব প্রকৃতি। ভার্জিন নেচার। তুমি।'

খিলখিল করে হাসি : 'আমি ভার্জিন নই—।'

'ভার্জিনিটি কি শুধু শরীরে থাকে?'

আলো-আঁধারেই পুরুষ-লেখককে দেখল দেবারতি। কী সুন্দর করে কথা বলে রঞ্জন! দেবারতি জানে, শতকরা নিরানব্বইজন পুরুষই ওর শরীরের মধ্যে কৌমার্য খুঁজবে। তারা অনন্তকাল ধরে শুধু খুঁজেই যাবে, কিন্তু পাবে না।

রঞ্জনের আদরে দেবারতি আর গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছিল না। নাঃ, লোকটা অন্যরকম করে আদর করতেও জানে!

'রঞ্জন! রঞ্জন! আমাকে জড়িয়ে ধরো, আরও জোরে।'

আবছা আলোয় ওরা লড়াইয়ে মেতে ওঠে। ঠান্ডা বাতাস ওদের শরীরের তাপ শুষে নিতে পারে না। ওদের মসৃণ ত্বক ভিজে যায় ঘামে।

রঞ্জনকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দেবারতি। যেন ওকে ছেড়ে দিলেই ও ছিটকে পড়ে যাবে অতল খাদে। আর রঞ্জন যেন শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে দেবারতিকে। কিন্তু ওর প্রচণ্ড ঝটকাতেও দেবারতির হাতের বাঁধন শিথিল হয় না। ওর মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত গোঙানি বেরিয়ে আসে। তুমুল ভূমিকম্পে সবকিছু দুলে যায়, মেঝে কেঁপে ওঠে, আলো ঝাপসা হয়ে যায়।

তারপর...একসময়...সবকিছু আবার সুস্থির হয়। দেবারতির চোখ আবার ফিরে পায় স্বাভাবিক দৃষ্টি। ওর শরীর হালকা লাগে। রঞ্জন পাশ থেকে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

'দেবারতি, আই লাভ ইউ—।'

'আই লাভ ইউ টু।' নরম গলায় বলল দেবারতি, 'তোমার লেখার মতোই শক্তিশালী তুমি।'

এরপর উঠে বসে ওরা। দেবারতির সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায় দুজনে। একে অপরের গা ঘেঁষে বসে সিগারেটে আকুল টান দেয়।

দেবারতির মাথা ধরা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। এখন আর সহজে ঘুম আসবে না ওর।

রঞ্জনের খোলা পিঠে আলতো নখের আঁচড় কেটে দেবারতি বলল, 'ইউ আর এ জিনিয়াস। এগারো বছর বনবাসে থাকা তোমার ঠিক হয়নি। তুমি জানো কী করে রহস্য গল্প লিখতে হয়।'

সিগারেটে গভীর টান দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়ল রঞ্জন দেবনাথ, বলল, 'দেবী, তুমি জানো না একটা সময়ে আমাকে টাকার জন্যে কী লড়াই করতে হয়েছে! একগাদা ছোট ছোট ভাই বোন রেখে বাবা মারা গেলেন। আমি তখন সবে একটা ফার্টিলাইজার কোম্পানির মার্কেটিং-এ ঢুকেছি। তখন থেকেই লেখালিখির চেষ্টা করেছি। লেখা ছাপতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। তারপর... তারপর হঠাৎ করেই অভাবের গল্পটা ঘুরে গেছে...।'

'জানো, নাইনটি ওয়ান আর নাইনটি টু-তে রবীন্দ্র পুরস্কারের লিস্টে ফাইনাল রাউন্ডে রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ''জীবন যখন ফুরিয়ে যায়'' উপন্যাসটা ছিল! তোমার ইচ্ছে করে না, তোমার একটা উপন্যাস ওই পুরস্কারের ফাইনাল লিস্টে যাক—কিংবা পুরস্কার-টুরস্কার পেয়ে যাক?'

চাপা গলায় হেসে উঠল রঞ্জন দেবনাথ : 'এই ইচ্ছেটা আমার গতবছর থেকে হয়েছে—আগে ছিল না। ওই এগারোটা বছর ধরে টাকার জন্যে আমি পাগলা কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'তোমার লেখাগুলো খুব ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে সরলতা আছে, হৃদয়ের ব্যাপারটা আছে। পুরোপুরি সেরিব্রাল নয়, একটু-আধটু কার্ডিয়াক কোয়ালিটিও হ্যাজ—' খিলখিল করে হাসল দেবারতি।

সিগারেট অ্যাশটেতে ফেলে দিয়ে দেবারতিকে আবার জাপটে ধরল রঞ্জন। বলল, 'এই মুহূর্তে কিন্তু সেরিব্রাল ব্যাপার একটুও নেই। সবটাই কার্ডিয়াক।' আচমকা পাগলের মতো চুমু আঁকতে লাগল দেবারতির শরীরে।

'তুমি আমার বুদ্ধিজীবী শিশু—।'

শিশু তখন দেবারতিতে প্রায় ডুবে গেছে। আজকের সুযোগ সে হারাতে রাজি নয়। অনেক অনেক দিন পর দেবারতি মানিকে সে এইভাবে কাছে পেয়েছে। এই সম্মেলনের দিনগুলোর জন্য কীভাবে যে ওরা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে ছিল তা শুধু ওরাই জানে!

সবুজ আলোয় শুরু হয়ে গেল দেবারতি আর রঞ্জনের ব্যস্ত দ্বিতীয় সম্মিলন।

সাড়ে দশটা বাজতেই চায়ের জন্য দশ মিনিটের বিরতি।

সকালের সেশানে ভাস্কর রাহার বক্তৃতা ছিল। তিনি শুনিয়েছেন তাঁর যৌবনকালের নানা ঘটনার কথা। কী কষ্ট করে দিন কাটিয়েছে রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকাগুলো! লাল নিউজপ্রিন্টে ভাঙা টাইপ আর কাঠের বা জিঙ্কের ব্লক ব্যবহার করে ছেপে এক হাজার কি দু-হাজার কপি কোনওরকমে বিক্রি হত। দারিদ্র্যরেখায় পা ফেলে তারা পথ হাঁটত।

ষাটের দশকের শেষে আর সত্তরের দশকের শুরুতে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল পিন আঁটা যৌন পত্রিকায়। সে-সব পত্রিকা বিক্রিও হত রমরম করে। নামী লেখকদের দু-একজন ছাড়া আর প্রায় সবাই লিখেছেন পিন

আঁটা ওইসব পত্রিকায়।

তারপর একসময় হোম ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে শুরু হয়ে গেল ধরপাকড়। তখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বেশিরভাগ মালিক-সম্পাদক চালু করেন রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা পত্রিকা। সেটা ছিল ওঁদের কাছে বেঁচে থাকার লড়াই। আর নড়বড়ে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে আঁকড়ে ধরে আশ্রয় খুঁজেছিল তখনকার রহস্য-রোমাঞ্চ লেখকরা। তখনকার অবস্থা, আর এখনকার অবস্থা! এ-যেন বস্তি থেকে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ে রূপান্তর।

ভাস্কর রাহার বক্তৃতার পর শুরু হয়েছে চলচ্চিত্র। সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী আর উত্তমকুমারের অভিনয়। তারই মাঝখানে এই-চা পানের বিরতি।

অনামিকা সেনগুপ্তের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভাস্কর রাহা। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন আর এক আমন্ত্রিত রহস্য লেখক জ্যোতিষ্ক সান্যাল। অফিসের মিটিংয়ে বাইরে ছিলেন বলে কাল আসতে পারেননি। আজ এসে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। জ্যোতিষ্ক নীচু গলায় গল্প করছিলেন 'কুয়াশা' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার কল্পনা সেনের সঙ্গে। সম্প্রতি 'কুয়াশা' থেকে জ্যোতিষ্কর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জন গ্রিশ্যাম এর 'টার্মিনেশন'।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাস্কর রাহা বললেন, 'শোনো অনামিকা, তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলি—।'

অনামিকা চা খায় না। সম্ভবত ফরসা রং ময়লা হয়ে যাবে বলে। ও আগ্রহ নিয়ে তাকাল ভাস্কর রাহার দিকে।

রাহা একটা আধপোড়া চুরুট পকেট থেকে বের করে ধরালেন। তারপর তাতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অনেক আগের কথা। তুমি তখন বোধহয় জন্মাওনি। কবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ''সচিত্র তোমার জীবন'' পত্রিকার একটা সংখ্যায় একবার মপাসাঁর একটা গল্প অনুবাদ করেছি। ম্যাগাজিন বেরোনোর পর দপ্তরে গেছি কপি নিতে। কবিরঞ্জনবাবু ছিলেন না। ছিল তাঁর হেড কম্পোজিটার বলাইবাবু। তাঁকে সবিনয়ে বললাম যে, এই সংখ্যায় আমার একটা লেখা আছে—কপি নিতে এসেছি। তিনি জিগ্যেস করলেন, কী লেখা? বললাম, মপাসাঁর একটা গল্প আছে...।'

আবার চায়ের কাপে চুমুক এবং চুরুটে গভীর টান।

'...তাতে বলাইবাবু কী বলেছিলেন জানো?'

ততক্ষণে জ্যোতিষ্ক সান্যাল আর কল্পনা সেন ভাস্কর রাহার কাছাকাছি এসে গল্প শোনায় মন দিয়েছেন।

'কী বলেছিলেন?' আগ্রহের সুরে অনামিকা জানতে চাইল।

ভাস্কর রাহা গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, 'বলাইবাবু আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, আপনিই কি মপাসাঁ?'

এ-কথা শুনে সবাই হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল।

হইচই শুনে কখন যেন ওঁদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল দেবারতি মানি। চোখ সামান্য লাল। চোখের কোল বসা। কিন্তু সেজেছে খুব সুন্দর করে। হালকা নীলের ওপরে কালো ফুল বসানো একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে। কানে নতুন একজোড়া দুল। কপালে নীল টিপ। ঠোঁটে হালকা লিপগ্লস। চোখে সূক্ষ্ম কাজলরেখা।

ভাস্কর রাহা ওর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী, আমার রিকোয়েস্ট মনে আছে তো?'

ও হেসে মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, মনে আছে। তারপর বলল, 'আজ লাঞ্চের ফাঁকে আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব, ভাস্করদা।'

'আমার কথা সবই তো তুমি জানো। নতুন আর কী বলব—।'

'তবুও—।'

এমন সময় কোথা থেকে যেন প্রেমময় চৌধুরি এসে উদয় হলেন। কোনওরকম ভণিতা না করেই বেশ উঁচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এই, দেবারতি, তুমি নাকি কী একটা টপ সিক্রেট জানতে পেরেছ?'

দেবারতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে তাকাল প্রেমময়ের দিকে। লোকটা ওকে হাটের মাঝে অপ্রস্তুত করতে চায়?

ভাস্কর রাহা ভয় পেলেন। মেয়েটা খেপে গিয়ে সাঙ্ঘাতিক কিছু না বলে বসে।

'হ্যাঁ, জানতে পেরেছি। সো হোয়াট?'

'না, মানে, আমরা সিক্রেটটা জানতে পারব না?'

'সময় হলেই জানতে পারবেন। একটু ধৈর্য ধরুন।' তারপরই কী ভেবে দুষ্টুমি চোখে মেয়েটা বলল, 'একটু হিন্টস দিতে পারি—।'

সর্বনাশ। ভাস্কর রাহা প্রমাদ গুনলেন। মেয়েটা যে যা-হোক-একটা সিক্রেট জেনেছে, এ-কথা দেখছি একেবারেই সিক্রেট থাকবে না। তিনি দেবারতিকে বাধা দেবার জন্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বেপরোয়া প্রগলভা মেয়েটা মুখ খুলল।

'পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস।'

তার মানে! ভাস্কর রাহা অবাক হলেন। সিক্রেটের হিন্টস পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস! একজন উনিশ শতকের বাঙালি ডিটেকটিভ কাহিনী লেখক। কোনান ডয়েল-এর 'দ্য সাইন অফ ফোর' কাহিনী অনুবাদ করে প্রথম বাঙালি পাঠকের কাছে শার্লক হোমসকে হাজির করেন। আর দ্বিতীয়জন ১৮৭৫ সালে জন্ম নেওয়া ব্রিটিশ লেখক। দুজনের মধ্যে মিল আছে —দুজনেই ক্রাইম কাহিনীর লেখক এবং যথেষ্ট সফল ও জনপ্রিয় ছিলেন।

ভাস্কর রাহা খালি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন পাশের টেবিলে। বিস্মিত চোখে দেবারতি মানির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রেমময় চৌধুরি কেমন আমতা-আমতা করে সরে গেলেন।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল ভাস্কর রাহার স্নেহভাজন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশ পেরোলেও ভাস্কর রাহার চোখে 'ছোট ভাই'। প্রশ্রয় যেমন দেন, প্রয়োজন হলে বকুনিও ততটাই। জ্যোতিষ্ক খুব সৎ আর পরিশ্রমী। আজকের যুগে যে-দুটো গুণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হয়। তাই রাহা ওকে পছন্দ করেন।

জ্যোতিষ্ক ভাস্কর রাহার কাছে এসে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এই পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস পাবলিক দুটো কে বলুন তো?'

ভাস্কর রাহার দু-চোখে তিরস্কারের অভিব্যক্তি। জ্যোতিষ্কের দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে নিলেন। বললেন, 'তুই কি কোনও দিনই বইটইয়ের পাতা ওলটাবি না!'

অনামিকার কান বেশ প্রখর। ও সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওমা, এঁদের নাম জানেন না! একজন তো...।'

মাইকে ঘোষণা করা হল, সিনেমা আবার শুরু হচ্ছে।

চুরুট নিভিয়ে দিয়ে রাহা সেদিকে এগোলেন। পিছনে অনামিকা আর জ্যোতিষ্কের কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। দেবারতি আবার তাঁর পাশে এসে বলে গেল, 'মুকুটহীন সম্রাট, ভুলবেন না যেন—লাঞ্চের সময়—।'

রাহা হেসে মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মনে আছে।

ঠিক তখনই রঞ্জন দেবনাথ এসে দেবারতিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে চলে গেল এলিভেটরের দিকে। ওরা বোধহয় নির্জনতা খুঁজছে।

বলরুমে ঢুকে নির্দিষ্ট চেয়ারের দিকে যাবার সময় রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাস্কর রাহার।

'কী মিসেস মুখার্জি, এখন নতুন কী লিখছেন?'

'আমার আর লেখালিখি! ওই ওয়ার্কশপের গল্পটাই এখন লেখার চেষ্টা করছি। বয়েস হয়ে গেছে, এত ধকল আর সয় না।'

কী সুন্দর করে কথা বলেন রত্নাবলী! এত যশ আর খ্যাতি—অথচ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অহঙ্কার সেভাবে বাড়তে পারেনি। ওঁর ব্যবহার এত নরম আর মিষ্টি! অথচ লেখেন যখন তখন ঝকঝকে স্মার্ট গদ্য। লেখায় বলতে গেলে কোনও বাড়তি শব্দ থাকে না। অবশ্য দেড়-দু-বছর ধরে ওঁর লেখার ধার কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। সেটা হয়তো বয়েসের জন্য।

'দেবারতির ইন্টারভিউ দিয়েছেন?'

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন রত্নাবলী। বললেন, ''সুপ্রভাত''-এর ওই জার্নালিস্ট মেয়েটি তো! হ্যাঁ, একটু আগে আমাকে বলেছে। ওকে বলেছি, সাতটার সময় আমার ঘরে আসতে। ও তো ঠিক আমার নীচের ঘরটাতেই থাকে।' একটু থেমে বললেন, 'মেয়েটা বেশ স্মার্ট। ওর একটা ফিচার পড়েছিলাম—মন্দ লেখেনি। 'আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন?'

'না। বলেছি লাঞ্চ আওয়ারে কথা বলব।'

'সারাদিন কনফারেন্সের এই ধকলের পর সন্ধেবেলাটা একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। কাল ভাবছি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব। একজন টেলিফিল্ম প্রোডিউসারের আসার কথা আছে। তা ছাড়া আমার বৃদ্ধ কর্তাটি একা একা কী করছে সেটাও একবার দেখে আসা দরকার।' হেসে কথা শেষ করলেন রত্নাবলী।

বলরুমের আলো নিভে গেল। শুধু ঝাড়লণ্ঠনের আলো টিমটিম করে জ্বলছে।

রত্নাবলী নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল ভাস্কর রাহার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'ম্যাডাম ঠিকই বলেছে। পুরুষ মানুষ—চিতায় না ওঠা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।'

অনামিকার কান আবার তার দক্ষতার পরিচয় দিল। ও নীচু গলায় জ্যোতিষ্ককে বলল, 'সেইজন্যেই তো কোনও পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না।'

জ্যোতিষ্ক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন অনামিকার দিকে, বললেন, 'সকালে যে দেখলাম রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছিলে!'

'ওই গল্প পর্যন্তই। আমি সবসময় কেয়ারফুল থাকি।'

আধো-আঁধারিতে অনামিকার মন্তব্যটা ভাস্কর রাহার কানে গেল। তিনি আপনমনেই হাসলেন। রূপেন মজুমদারের মতো অনামিকা সেনগুপ্তও তাহলে ভার্জিন রাইটার হতে চলেছে! সবাই কেন যে বিশেষ্যকে উপেক্ষা করে বিশেষণের ওপরে জোর দেয় কে জানে! কী করে তিনি অনামিকা বা রূপেন মজুমদারকে বোঝাবেন, ভার্জিন থাকার চেয়ে রাইটার হওয়াটা অনেক বেশি জরুরি—অন্তত বাংলা সাহিত্যের পক্ষে।

ততক্ষণে গোলাপ কলোনীর গল্প আবার শুরু হয়ে গেছে পরদায়।

চার

দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

হোটেল 'সিরাজ'-এর রেস্তরাঁর জগঝম্প মিউজিক ছাপিয়েও শোনা গেল শব্দটা। বিশেষ করে হোটেলের বাইরের দিকে পশ্চিমমুখো ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই শুনতে পেলেন। যাঁরা এই অল্প রাতেই ঘুমে ঢলে পড়েছেন, তাঁরা দুর্ঘটনার মাহেন্দ্রক্ষণটি জানতে পারলেন না। তাঁরা জানতে পারলেন না, সংঘর্ষের শব্দ কী বিশ্রী শোনায়।

প্রচণ্ড তীব্র অথচ ভোঁতা শব্দটা তিনতলার ঘরে বসেই শুনতে পেলেন ভাস্কর রাহা। ওয়ার্কশপের জন্য একটা গল্প লিখতে বসেছিলেন। গোটা চারেক পৃষ্ঠা কাটাছেঁড়া করে কোনওরকমে একটা গল্পের শুরুটা খাড়া

করেছেন। সেটা পড়ে মন্দ লাগছে না। লেখালিখির ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে তিনি। এটাই বোধহয় তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি।

সম্মেলনের জন্য একটা বিমূর্ত গল্প লিখছেন তিনি। কখনও কখনও সাদামাঠা গোয়েন্দা বা রহস্য কাহিনী লেখেন বটে, তবে লিখে তৃপ্তি পান দুর্বোধ্য, জটিল, বিমূর্ত রহস্য গল্প। এ যেন পাঠকের সঙ্গে তাঁর লুকোচুরি খেলা, বুদ্ধির খেলা। তাঁর গল্প পড়াটা এখন পাঠক সমাজে এক ফ্যাশান।

লিখতে বসলেই তাঁর মনে পড়ে যায় ছোট ছেলে লালটুর কথা। লালটু প্রায় দশবছর হল চাকরি নিয়ে আমেদাবাদে। বছর তিরিশ আগে, তাঁর লেখালিখির শিক্ষানবিশীর সময় ভাস্কর রাহা নিয়মিতভাবে বিদেশি গল্প অনুবাদ যেমন করেছেন, তেমনি সেগুলো অবলম্বন করে, সেগুলোর বিষয় ও ভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে 'নিজস্ব' গল্পও কম লেখেননি। এতে তাঁর কোনও লজ্জা নেই। কারণ, পাঁচকড়ি দে-র প্রথম লেখা 'সতী-শোভনা'-ও বিদেশি গল্প অবলম্বনে লেখা। তা ছাড়া, রাহার বরাবরের লক্ষ্য ছিল ভালো লেখা। শুধু প্লট আত্মসাৎ করেই ভালো লেখা যায় না।

যখন তিনি বাঁ দিকে বিদেশি বই রেখে মনোযোগ দিয়ে লিখতেন, তখন 'লেখক' পিতার একান্ত অনুগত পুত্র লালটু এসে চুপটি করে বসে থাকত তাঁর কাছে। হঠাৎই একদিন সেই বালক তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'বাবা তুমি সবসময় বই দেখে দেখে লেখো কেন?'

ভাস্কর রাহা কোনও উত্তর দিতেও পারেননি।

লিখতে-লিখতে এসব কথাই ভাবছিলেন, আর তখনই শুনতে পেলেন শব্দটা।

প্রথমটা সামান্য চমকে উঠেছিলেন। কাগজের ওপরে কলম কেঁপে উঠেছিল। কারণ ভেবেছিলেন, ঘটনা হয়তো অসামান্য। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থেকেও তখন স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক আর কোনও শব্দ কানে এল না, তখন আবার মন দিয়েছেন লেখায়। খেয়াল করেননি, হাতের চুরুট কখন নিভে গেছে।

একটু পরেই নীচ থেকে কয়েকজনের কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল। তারপর, ক্রমে-ক্রমে, সেটা ছোটখাটো হইচইয়ে দাঁড়াল।

কলম থামালেন ভাস্কর রাহা। মোটা ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে নামালেন। বিস্তৃত কপালে হাত ঘষলেন একবার। তারপর হাত চালালেন মাথার চুলে। লম্বা ধবধবে সাদা অথবা রুপোলি চুল। সিলভার ব্লন্ড যাকে বলা যায়। কিছুদিন আগেও তাঁর চুলে জাতীয় পতাকার মতো তিন-তিনটে রং খেলা করত : সাদা, লাল আর কালো। এর মধ্যে দুটো রঙের কারণ তাঁর জানা ছিল। সাদা : বয়েসের জন্য। কালো : কলপের জন্য। কিন্তু লাল? সে কি বয়েস আর কলপের দ্বৈত প্রভাব? জীবনের সাদা-কালো রং—সুখ-দুঃখ—সকলেই সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু এমন কিছু রং জীবনে থেকে যায়—এমন কিছু অনুভূতি—যা ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর চুলের ওই লাল রঙের মতো।

এখন তাঁর শুধু সাদামাঠা জীবন। তাতে আর কোনও রং নেই।

নীচ থেকে ভেসে আসা হইচইটা যেহেতু বাড়ছিল সেহেতু লেখার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন ভাস্কর রাহা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন পশ্চিমের জানলার কাছে। বড় মাপের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। নক্ষত্রখচিত হোটেলে যেমন হয়। জানলার পাল্লা খোলাই ছিল। তিনি ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাঁচ-সাতজন মানুষের জটলা ছাড়া অস্বাভাবিক আর কিছু দেখতে পেলেন না। কারণ কার্নিশে তাঁর নজর কিছুটা বাধা পাচ্ছিল।

হোটেলের বাইরের রাস্তা নির্জন, হোটেলের শান বাঁধানো টেরাস নির্জন, আর পাম গাছগুলোকেও বড় নিঃসঙ্গ নির্জন বলে মনে হল। তাহলে শব্দটা কিসের?

এমন সময় তাঁর ঘরের কলিংবেল বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললেন তিনি।

দরজায় দাঁড়িয়ে উৎপলেন্দু সেন। ফরসা মুখ সামান্য লালচে। পরনে পাজামা আর হাওয়াই শার্ট। চশমার পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে চোখ দুটো বেশ ছোট দেখাচ্ছে।

'কী ব্যাপার, উৎপল? এত রাতে?' ওঁকে ভেতরে ডাকলেন রাহা, 'আসুন, ভেতরে আসুন—'

উৎপলেন্দু ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'নীচে কী একটা গোলমাল হয়েছে শুনেছেন?'

ভাস্কর রাহা উৎপলেন্দুকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। এখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা। সুতরাং উৎপলেন্দু এখন পুরোপুরি স্থলপথের বাসিন্দা নন। কিন্তু রঙিন জলপথে তিনি কতটা ডুবে আছেন সেটাই আঁচ করতে চেষ্টা করলেন রাহা।

'হ্যাঁ, খানিক আগে একটা শব্দ শুনলাম মনে হল।' রাহা বললেন।

'আমি একটা পুরোনো লেখা নতুন করে মকশো করছিলাম, হঠাৎই যেন—।'

ঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন 'সিরাজ'-এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার প্রশান্ত রায়। সম্মেলনের শুরুতেই তাঁর সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সতেরো জন অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনওরকম অসুবিধে হলে তাঁরা যেন তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত রায়কে খবর দেন।

কিন্তু রাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কোনও ত্রুটি তো হয়নি—শুধু একটু আগের ওই শব্দটুকু ছাড়া!

'এক্সট্রিমলি সরি, মিস্টার রাহা,' ভাস্কর রাহাকে লক্ষ করে প্রশান্ত রায় বললেন, 'আপনার গাড়ির নম্বর কি ডব্লিউ এন ডব্লিউ ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন?'

'হ্যাঁ, কেন?' নিভে যাওয়া চুরুটটাকে দু-আঙুলে ঘোরাতে লাগলেন রাহা।

'খুব আনফরচুনেট।' ইতস্তত করে প্রশান্ত রায় বললেন, 'আপনার গাড়িটা একটা অ্যাকসিডেন্টে জখম হয়েছে।'

ভাস্কর রাহা হাসলেন : 'ও, এই ব্যাপার! আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমার অ্যামবাসাডর গাড়িটার নিয়মিত জখম হওয়া দিব্যি অভ্যেস আছে।' একটু থেমে বললেন, 'তা কোথায় চোট লাগল। সামনে, পেছনে, না পাশে?'

আবার ইতস্তত করলেন প্রশান্ত রায়। শুকনো মুখে বললেন, 'সামনে, পেছনে, বা পাশে নয়। আপনার গাড়ির ছাদটা জখম হয়েছে।'

ভাস্কর রাহার হাসি মিলিয়ে গেল এই উত্তরে। উৎপলেন্দু সেনও বেশ অবাক হলেন। প্রশান্ত রায় কি এখন জল-পুলিশের আন্ডারে? ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই চিহ্নই খুঁজলেন উৎপল।

ভাস্কর রাহা ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকালেন। তারপর ঠাট্টা করার চেষ্টা করে বললেন, 'তাহলে কি বাজ পড়েছে?'

'বিনা মেঘে বজ্রপাত—' উৎপলেন্দু অস্ফুট স্বরে মন্তব্য করলেন।

প্রশান্ত রায় রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক দুই বুদ্ধিজীবীকে পর্যায়ক্রমে দেখলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় উত্তর দিলেন, 'না বাজ নয়। আমাদের হোটেলের চারতলা থেকে একজন মেয়ে পড়েছে। হোটেল রেজিস্টারের রেকর্ড অনুযায়ী মেয়েটির নাম দেবারতি মানি—আপনাদের কনফারেন্সের একজন গেস্ট। আমরা থানায় খবর দিয়েছি। পুলিশ এখুনি এসে পড়বে।'

কথা শেষ করে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার আর দাঁড়াননি। ব্যস্ত পায়ে চলে গেছেন সিঁড়ির দিকে।

দেবারতি টপ সিক্রেট তাহলে সিক্রেটই থেকে গেল! ভাবলেন ভাস্কর রাহা। তারপর উৎপলেন্দুকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'

উৎপল বসলেন একটা সোফায়। ভাস্কর চুরুট ধরালেন। তারপর অ্যাশট্রেটা হাতে নিয়ে বসে পড়লেন বিছানায়। বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'দেবারতি কী একটা সিক্রেট জানতে পেরেছিল। বলেছিল, সেটা জানাজানি হলে নাকি এই কনফারেন্স পন্ড হয়ে যাবে। দেখুন, নিয়তির কী অদ্ভুত পরিহাস! মেয়েটা নিজে মারা গিয়ে কনফারেন্স পন্ড করল।'

নীচের কথাবার্তা, চাপা হইচই, ঘরে বসেই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া করিডর ও সিঁড়িতে ব্যস্ত পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ঘন ঘন।

'মেয়েটা আত্মহত্যা করেনি তো?' উৎপলেন্দু গলা নামিয়ে জিগ্যেস করলেন।

'আত্মহত্যা! দেবারতি! অসম্ভব!' তিনটে শব্দে নিজের মতামত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে চুরুটে গভীর টান দিলেন রাহা।

যে-মেয়েটার আর এক নাম জীবন, সে করবে আত্মহত্যা! তা ছাড়া ওর বেঁচে থাকার আরও একটা জোরালো কারণ ছিল : গোপন রহস্য ফাঁস। গল্প-উপন্যাসে বহু খুন এবং খুনের সমাধান নিয়ে লিখেছেন ভাস্কর। কিন্তু বাস্তবে কখনও খুনের এত কাছাকাছি আসেননি। গল্পের খুন হয় লেখকের ইচ্ছেয়, খুনিও চলে লেখকের মরজি মতো। কিন্তু বাস্তবে?

'ভাস্করবাবু, ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট নয় তো?' উৎপলেন্দু মনে-মনে বুঝতে পারছেন সবই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবের ঘরে চুরি করছেন দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে।

দেবারতিকে ঘিরে এই দু-দিনের ঘটনাগুলো ভাবছিলেন ভাস্কর রাহা। মাত্র দুটো দিন। তবু মনে হয় যেন কত দিন!

উৎপলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন একটু দেরি করে। বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট কেমন করে হবে?'

ঠিক তখনই দরজায় কেউ নক করল।

পুলিশ কি এরই মধ্যে এসে পড়ল? ভাস্কর রাহা গলা তুলে বললেন, 'দরজা খোলা আছে। ভেতরে আসুন।'

নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল অর্জুন দত্ত আর অনির্বাণ ঘোষ। অর্জুনের চোখেমুখে ভয় ও আশঙ্কা। আর অনির্বাণের মুখে চাপা উত্তেজনা।

অনির্বাণ ঘোষের বয়স পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ। পরনে আধুনিক কাটের শার্ট-প্যান্ট। ও 'ছায়াময়' পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদক হিসেবে যত না সুনাম, তার চেয়ে বেশি সুনাম ভদ্রলোক হিসেবে। সম্ভাবনাময় শক্তিমান লেখকদের উৎসাহ দিতে ওর জুড়ি নেই। বিক্রির হিসেবে 'ছায়াময়'-এর জায়গা 'ভয়ংকর'-এর পরেই। তাতে অনির্বাণের কোনও আক্ষেপ নেই। কারণ প্রেমময় চৌধুরিকে ও ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

অর্জুন দত্তের হাতে সিগারেট ছিল। সেটায় শেষ টান দিয়ে সে ভাস্কর রাহার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। সিগারেটের টুকরোটা ঝুঁকে পড়ে ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। তারপর বিপদে পড়া মানুষের আর্ত গলায় বলল, 'ভাস্করদা, দেবারতি মানি বোধহয় আত্মহত্যা করেছে।'

ভাস্কর রাহা ও উৎপলেন্দু সেন অবাক হয়ে তাকালেন অর্জুনের দিকে।

অর্জুন একটু দম নিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি। আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি দরজায় কেউ কলিংবেল বাজাচ্ছে। দরজা খুলেই দেখি অনির্বাণ। ও-ই আমাকে দেবারতি মানির ইয়ের...খবরটা...দিল। তারপর চলে গেল নীচে।' একটু থামল অর্জুন। তারপর : মিনিট কুড়ি পরে ও ঘোরাঘুরি করে সব খবর এনে আমাকে দিল। কী হয়েছে জিগ্যেস করুন ওকে—' অনির্বাণের দিকে আঙুল দেখাল অর্জুন।

'ছায়াময়' পত্রিকার নিয়মিত লেখক অর্জুন দত্ত। পত্রিকার বয়েস প্রায় ষোলো, কিন্তু এই ষোলো বছরে কোনও সংখ্যাতেই অর্জুনের লেখা বাদ পড়েনি। কফি হাউসের আড্ডায় শোনা যায় অর্জুন নাকি 'ছায়াময়'-এর মালিক ভবতারণ পোদ্দারের মেয়েকে পড়াত। সেই সূত্রেই নাকি ষোলো বছর আগে পত্রিকার সূচিপত্রে নাম ঢুকেছে। তারপর ফরমায়েশি লেখা যোগান দেবার গুণে তার নামটা সূচিপত্রে স্থায়ী হয়ে গেছে।

সদাগরী অফিসে চাকরি করলেও যৌবন বয়েসে অর্জুন দত্ত প্রচুর টিউশানি করত। হয়তো টাকার খুব দরকার ছিল। পরে চাকরি করা এক মহিলার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। বিয়েতে ভাস্কর রাহা আর উৎপলেন্দু সেন গিয়েছিলেন। বোধহয় বিয়ের পরে পরেই অর্জুন টিউশানি করা ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপর থেকেই ওর লেখার

পরিমাণ অন্তত তেরোগুণ বেড়ে যায়। সেটা লক্ষ করে একদিনের আড্ডায় ভাস্কর রাহা, জ্যোতিষ্ক সান্যাল, রূপেন মজুমদার ইত্যাদিকে উৎপলেন্দু বলেছিলেন, 'আসুন মাইরি, আমরা মাসে মাসে চাঁদা তুলে অর্জুন দত্তকে ওর টিউশানির টাকাটা দিয়ে দিই। দিয়ে বলি, তুই আর লিখিস না, বাপ। আমরা যে তোর লেখার বানে ভেসে গেলাম।'

যে যাই বলুক, অর্জুন দত্ত থামেনি। অনুবাদ, ফিচার, গল্প, উপন্যাস, পাজল, কুইজ—যখন যে-ফরমায়েশ এসেছে লিখে গেছে। সে জানে, লিখে খ্যাতি আসেনি। না আসুক—লেখার তৃপ্তি তো আছে। লেখা ছেড়ে দিলে অর্জুন আর কী নিয়ে থাকবে! সবাইকে তো আর নিজের দুঃখের কথা বলা যায় না। বলা যায় না ব্যক্তিগত সমস্যার কথা। ওর স্ত্রী মনিকা চাকরি আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছে। আর অর্জুনের আছে চাকরি আর লেখা। ওদের দুজনের মাঝে ভয়ঙ্কর এক ফাঁক। অর্জুন জানে, সেই ফাঁক আর ভরাট হবে না।

অনির্বাণের চোখমুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, ও কিছু বলার জন্য ছটফট করছে। অর্জুন দত্তকে ও মানুষ হিসেবে পছন্দ করে। তবে লেখক হিসেবে মোটেই সম্ভাবনাময় বলে ভাবে না। পত্রিকার বহু আসন্ন মুহূর্তে অর্জুন দত্ত প্রায় যে-কোনও বিষয়ে যে-কোনও ধরনের লেখা যোগান দিয়েছে। সেই সার্ভিসটাকে অনির্বাণ কখনও অস্বীকার করে না। তাই ভেতরে-ভেতরে অনেক কিছু বলার জন্য ছটফট করলেও অর্জুনকে ও প্রথমে কথা বলতে দিয়েছে। এবার ওর পালা। তিনজনেই ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

'আগামীকাল সেমিনারে আমার বলার কথা আছে সে তো জানেন। বিষয় হল, আধুনিক রহস্য সাহিত্য। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ ঝামেলার বলে মনে হচ্ছিল। তাই ঘরে বসে বক্তৃতার পয়েন্টসগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলাম। তখনই শব্দটা শুনতে পেলাম। তো জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ছুটে নীচে গেলাম। গিয়ে দেখি ভাস্করদার গাড়ির ছাদের একপাশটা তুবড়ে গেছে। গাড়ির গায়ে রক্ত। আর তার পাশেই বাঁধানো চত্বরে পড়ে আছে দেবারতি মানি। মুখটা একেবারে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে। চেনা যাচ্ছে না।'

'তুমি তাহলে বুঝলে কী করে যে, ইয়ে...মানে...ওটাই দেবারতি?' উৎপলেন্দু যুক্তি চেয়ে নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন। যতটা দুঃখ পাওয়া উচিত ঠিক ততটা দুঃখ কি উৎপলেন্দু অনুভব করতে পারছেন?

'বুঝতে পারলাম ওর সেই হলদে টি-শার্টটা দেখে। কাল কনফারেন্সে যেটা পরে ছিল। ওই যে বুকের কাছটায় লেখা, এক কাপ...।'

অনির্বাণকে বাধা দিয়ে ভাস্কর রাহা বললেন, 'বুঝেছি। আজ সন্ধেবেলা এই টি-শার্টটা পরেই ওকে হোটেলের লবিতে ঘুরতে দেখেছি।'

'তারপর কী হল?'

'সেখানে তখন ম্যানেজার প্রশান্তবাবু সমেত বেয়ারা বাবুর্চি অনেকেরই ভিড় জমে গেছে। ডেডবডিটা ওরা প্রথমটায় চিনতে পারেনি। তখন আমিই দেবারতির কথা বললাম। প্রশান্তবাবু তাড়াতাড়ি রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে খাতা-টাতা কী সব দেখে এলেন। তারপর তিনজন লোককে ডেকে নিয়ে লিফটের দিকে এগোলেন। কী ভেবে আমিও ওঁদের সঙ্গে গেলাম। ওঁরা চারতলায় উঠে দেবারতির ঘরের কাছে গেলেন। তারপর প্রশান্তবাবু কলিংবেল বাজালেন বারবার। কোনও সাড়া নেই। তখন দরজায় ধাক্কা দিলেন। তারপর দরজার নব ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাভ হল না। নিজেরা কিছুক্ষণ আলোচনা করে তারপর ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে ফেললেন। আমাদের সবাইকে বাইরে দাঁড়াতে বলে একজন লোককে সঙ্গে করে প্রশান্তবাবু ঘরে ঢুকে তন্নতন্ন করে সব জায়গা খুঁজলেন। খাটের নীচ, আলমারির পেছন, বাথরুম—কোনও জায়গা বাদ দিলেন না। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। শুধু পশ্চিম দিকের জানলাটা হাট করে খোলা। আর জানলার কাছেই একটা গোল টেবিল—টেবিলে কাগজপত্র, বই, পেন এইসব...

'ঘর থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত রায় বললেন, ''যা ভেবেছি তাই—সুইসাইড। ঘরে কেউ নেই। আর ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। স্যাড বিজনেস।'' ঘরের ভাঙা দরজার কাছে দুজন লোককে মাতায়েন করে প্রশান্তবাবু তখন নীচে চলে আসেন। রিসেপশন থেকে থানায় ফোন করে খবর দেন। তারপর

ভাস্করদাকে খবর দিতে যান। আমি আবার নীচে গিয়েছিলাম দেবারতির ডেড বডি দেখতে। সত্যিই খুব স্যাড ব্যাপার। আমি ওপরে এসে অর্জুনদাকে সব বললাম। তারপর আপনাকে খবর দেবার জন্যে এসেছি।'

একদমে অনেকক্ষণ কথা বলে অনির্বাণ থামল। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে একটা খালি সোফায় অবসন্নের মতো বসে পড়ল।

ভাস্কর রাহা চুরুটে শেষ টান দিলেন। ধোঁয়ার স্বাদটা কেমন তেতো হয়ে গেছে। 'সিরাজ'-এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার তাহলে ব্যাপারটা সুইসাইড ভাবছেন! কিন্তু তিনি তো নিশ্চিত যে, দেবারতি আত্মহত্যা করেনি—করতে পারে না। গম্ভীর চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'উৎপল, চলুন, হতভাগা মেয়েটাকে একবার দেখে আসি।' তাঁর বুকের ভেতরে কেমন এক কষ্ট হচ্ছিল : 'এত হাসিখুশি, প্রাণবন্ত উচ্ছল ছিল মেয়েটা...'

এত হারামজাদী, ছেনাল, শয়তান ছিল দো-আঁশলা ওই মাগীটা! উৎপলেন্দুর মগজের ভিতরে কিলবিল করে উঠল এই নোংরা কথাগুলো। তাঁর মনে পড়ল গতকাল রাতের ইন্টারভিউর কথা। মরা মেয়েটার জন্য তাঁর খুব সামান্য খারাপ লাগছে। আর মনের বাকি অংশটায় গজগজ করছে অপমান আর জানোয়ারের মতো রাগ। কিন্তু উপায় কী! আমাদের মনের বেশিরভাগটাই জানোয়ার, আর অল্পটুকু মানুষ—ভাবলেন উৎপলেন্দু। মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, নীচে চলুন। একবার দেখে আসি।'

নীচে নামতেই অনিমেষ চৌধুরির সঙ্গে দেখা। রিসেপশন লাউঞ্জের এখানে ওখানে ভদ্রলোক ঘুরঘুর করছেন। এর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, ওর কথা শুনছেন। দেখে মনে হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

'উৎপলেন্দুবাবু, খবর শুনেছেন? দেবারতি মানি মারা গেছে—।'

উৎপলেন্দু গম্ভীরভাবে ভাস্কর রাহা আর অর্জুন দত্তের দিকে একবার দেখলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, 'হুম শুনেছি।' একটু থেমে : 'কিন্তু আপনি এখানে কী করছেন!'

চোখেমুখে ঘুম জড়িয়ে থাকায় অধ্যাপকের গাল দুটো আরও বেশি ফুলে রয়েছে। তা ছাড়া তাঁর অন্যমনস্ক স্বভাবের প্রমাণ হিসেবে বাঁ-চোখের কোলে পিচুটিও দেখতে পেলেন উৎপলেন্দু।

উৎপলেন্দুর কানের কাছে মুখ এনে অধ্যাপক বললেন, 'ডেটা কালেক্ট করছি। যদি তা থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায়।'

অধ্যাপকের যে শখের গোয়েন্দাগিরির শখ আছে তা কেউই জানতেন না। অর্জুন দত্ত জিগ্যেস করল, 'সূত্র পেলে কী করবেন?'

'পুলিশের তদন্তে সাহায্য করব। ক্রাইম রাইটার হিসেবে এটা আমাদের ডিউটি নয় কি? আমাদের এই কনফারেন্সে গেস্ট হয়ে এসেছেন আর যে-দুজন রিপোর্টার—প্রীতম নন্দী আর সুজন সরকার—ওঁদের বলেছি, ক্রাইম রাইটাররা যে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিয়ে পুলিশকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন, সেকথা কাল ওঁদের কাগজের রিপোর্টে লিখতে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল ভাস্কর রাহার কাছে। সেলফ পাবলিসিটির চেষ্টা। রহস্য-রোমাঞ্চ দিয়ে শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর বেশিরভাগই ভৌতিক আর হরর গল্প লিখেছেন, মাঝে মাঝে কল্পবিজ্ঞান। লেখেন সাবেকী ভাষায়, তবে কলমের গতি বোধহয় অর্জুন দত্তকেও হার মানাবে। তা ছাড়া প্রকাশকের চাপে স্কুল-কলেজের ইতিহাস বইও কম লেখেননি। সেখানে লেখক হিসেবে নাম দেন এ. চৌধুরি। আর আয়কর বাঁচানোর জন্য প্রত্যেকটি বইতেই সহলেখক হিসেবে স্ত্রী অথবা ছেলের নাম জুড়ে দিয়েছেন।

ভাস্কর রাহা হাসলেন মনে-মনে। একেই বোধহয় বলে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর!

'আপনার পাজামার দড়ির গেঁট খুলেছে?' একটু হেসে জিগ্যেস করলেন উৎপলেন্দু।

'অ্যাঁ!...ওহ, হ্যাঁ—হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে খুলেছি।' থতমত খেয়ে জবাব দিলেন অনিমেষ চৌধুরি।

অর্জুন, অনির্বাণ ও ভাস্কর রাহা অবাক হয়ে তাকালেন উৎপলেন্দু সেনের দিকে। অর্থাৎ, কী ব্যাপার!

উৎপল হেসে জবাব দিলেন চাপা গলায়, 'ও কিছু নয়, তদন্তের একটা সূত্র আর কি—!'

অধ্যাপককে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে ব্যস্ত রেখে ওঁরা চারজন হোটেলের বাইরের চত্বরে এলেন।

বাইরের সবক'টা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চত্বরের নানা জায়গায় ভিড় এবং জটলা। দেখে মনেই হয় না, রাত বারোটা বেশ কিছুক্ষণ হল পেরিয়ে গেছে।

ভিড় ঠেলে দেবারতির মৃতদেহের কাছে গেলেন ওঁরা। এক পলক দেখেই চোখ সরিয়ে নিলেন। মৃতদেহ সব সময়েই অসুন্দর।

এমন সময় একটা গুঞ্জন শোনা গেল : পুলিশ এসে গেছে।

প্রশান্ত রায় কোথা থেকে এসে হাজির হলেন ভাস্কর রাহার সামনে। হাত-মুখ নেড়ে বললেন, 'মিস্টার রাহা, আপনারা কাইন্ডলি যে যাঁর ঘরে চলে যান। বুঝতেই পারছেন, একে এই কনফারেন্স তার ওপরে 'সুপ্রভাত' কানেক্টেড। লোকাল থানা ছাড়াও ডিসি-সাউথ আর ডিসি-ডিডি-ওয়ান এসে হাজির হয়েছেন। এছাড়া এসেছেন লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন ইন্সপেক্টর। সঙ্গে আরও লোকজন। এখন নাকি ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোকজন কাজ করবে, ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলবে। ওঁরা বলছেন, কাল সকাল থেকে আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। এখন তাহলে ঘরে চলে যান। প্লিজ—।'

কোনও কথা না বলে ওঁরা চারজন ফিরে চললেন লিফটের দিকে।

উৎপলেন্দু লক্ষ করলেন, খুব তাড়াতাড়ি ভিড় ফিকে হতে শুরু করেছে।

লিফটের কাছে অনেকের সঙ্গে দেখা হল। প্রেমময় চৌধুরি, রঞ্জন দেবনাথ, সুজন সরকার, অনামিকা সেনগুপ্ত, কল্পনা সেন। রঞ্জন ছাড়া বাকি সকলেই নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন। শুধু রঞ্জন চুপচাপ।

ভাস্কর রাহাকে দেখেই কল্পনা সেন জিগ্যেস করলেন, 'ভাস্করবাবু, কাল থেকে সেমিনারের কী হবে?'

রাহা বিষণ্ণভাবে জবাব দিলেন, 'কী জানি। কাল সকালেই হয়তো অরগানাইজাররা জানিয়ে দেবে। এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার—।'

'মেয়েটা কিন্তু বড্ড বেড়েছিল—।'

অনামিকার আকস্মিক মন্তব্যে চমকে ওর দিকে তাকালেন রাহা। কই, এই মেয়েটার মধ্যে এরকম আবেগ লুকিয়ে আছে এটা তো আগে টের পাওয়া যায়নি!

তিনি শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন, 'বেড়েছিল মানে?'

অনামিকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বোধহয় বুঝতে পারল, এখন এই মন্তব্য করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।

'না, মানে, ক্রাইম ফিকশনের জন্যে মেয়েটা বড্ড বেশি দরদ দেখাত।'

দরদ দেখাত বটে, কিন্তু সেটা মেকি দরদ নয়। নারী পরশুরাম দেবারতি সাহিত্যের এই শাখাটির উন্নতিই চেয়েছিল। তাই ফাঁকিবাজ ছদ্মবেশী লেখকদের ও সহ্য করতে পারত না। যেসব বুদ্ধিজীবী রহস্য সাহিত্যের নামে নাক সিটকান তাঁদের অনুকম্পাকে ঘেন্না করত দেবারতি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি যে-সাহিত্য করে গেছেন, সেই সাহিত্য চর্চা করতে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই।' এই কথাটা বারবার সবাইকে শোনাত দেবারতি। ভাস্কর রাহাকে বলত, 'মুকুটহীন সম্রাট, এই সাহিত্যকে ভালোবাসাটাই হচ্ছে আসল। ওয়ার্থলেস ফাঁকিবাজরাই এটার সর্বনাশ হয়ে দাঁড়াবে।'

না, দেবারতি মানির ভালোবাসায় কোনও ফাঁকি ছিল না। আজ লাঞ্চের সময় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ভাস্কর রাহা সেটা আর একবার অনুভব করেছেন। তখন কি ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া গিয়েছিল মেয়েটা এখন আর থাকবে না, 'নেই' হয়ে যাবে!

লিফটে লোকজন উঠছিল। প্রেমময় চৌধুরি লিফটে ওঠার আগে নেশা জড়ানো গলায় বললেন, 'এ গ্রেট লস ফর ক্রাইম লিটারেচার অ্যান্ড জার্নালিজম। মেয়েটা এভাবে সুইসাইড করবে ভাবিনি।'

ভাস্কর রাহা কোনও জবাব দিলেন না। তাঁর শুধু মনে হল, সবাই যেন এটাকে আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনা বলে চালাতে পারলেই বেঁচে যায়। কিন্তু কেন?

লিফট আবার খালি হয়ে নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা পাঁচজন : ভাস্কর রাহা, রঞ্জন দেবনাথ, অনামিকা সেনগুপ্ত, উৎপলেন্দু সেন আর কল্পনা সেন।

রঞ্জনের চোখ লাল, সামান্য ফোলা। মুখে একটা হাসি মাখিয়ে রাখার চেষ্টা করেও নিজের ঝোড়ো অবস্থাটা লুকোতে পারেনি। তা ছাড়া অল্পবিস্তর যাঁরা লেখালিখি করেন তাঁদের কাছে এটা লুকোনো মুশকিল। কারণ তাঁরা সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশি দেখতে পান।

ভাস্কর রাহা রঞ্জনের পিঠে হাত রাখলেন।

ছেলেটার শরীর সামান্য কেঁপে উঠল, কিন্তু ও ভেঙে পড়ল না। দেবারতির সঙ্গে ওর গোপন ভালোবাসার কথা গোপন রাখতে চায়। কিন্তু গোপন ভালোবাসাও তো ভালোবাসা! রঞ্জনের জন্য কষ্ট হল ভাস্কর রাহার।

'দেবারতি সুইসাইড করেনি, ভাস্করদা—'একটু ধরা গলায় রঞ্জন বলল, 'আর এটা অ্যাকসিডেন্টও নয়।'

এই প্রথম একজন স্পষ্ট করে ভাস্কর রাহার মতে মত দিল। দেবারতি মানির মতো মেয়েরা কখনও জীবনের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যায় না।

উৎপলেন্দু বললেন, 'দেবারতি কী একটা সিক্রেট জানতে পেরেছিল। সেটার জন্যেই কি...'

রঞ্জন দেবনাথ তাকাল উৎপলেন্দুর দিকে, বলল, 'হতে পারে। পুলিশ তদন্ত করে নিশ্চয়ই বের করতে পারবে।'

কল্পনা সেন এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এমনিতে তিনি কম কথা বলেন। তার ওপর চেহারা ভীষণ খাটো এবং রোগা হওয়ায় তাঁকে খুব একটা কেউ গুরুত্ব দেয় না। আবার ঠিক সেই কারণেই জ্যোতিষ্ক সান্যাল তাঁকে গুরুত্ব দেন। ইদানিং ভাস্কর রাহাকে তিনি প্রায়ই বলেন, 'বুঝলেন ভাস্করদা, আমি ডিপ্লোম্যাসি শিখে গেছি!' এটা তাঁর অহঙ্কার। চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাস্কর রাহা অন্তরালে হাসেন। শিশু তার সরলতা হারালে সেটা কোনও কৃতিত্বের কথা নয়। কূটনীতি আর সততা বোধহয় দুই সতীন, একসঙ্গে ঘর করতে পারে না। তাই তিনি 'ছোট ভাই'কে জবাব দেন, 'তুই সত্যিকারের ডিপ্লোম্যাট হলে সে-কথা বোকার মতো জাহির করে বলতিস না।' কূটনীতির সম্পর্ক ছাড়াই কল্পনা সেন জোতিষ্কের বই ছেপেছেন—হয়তো আরও ছাপবেন।

কল্পনার ফরসা মুখে আবছা কালো ছাপ। সরু সরু আঙুলে সরু ফ্রেমের চশমাটাকে নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'এটা নিয়ে কাগজে খুব নোংরামি হবে।'

তা তো হবেই। ভাস্কর রাহা ভাবলেন। খুন যে ভীষণ নোংরা কাজ!

পাঁচ

দরজায় কেউ জোরে জোরে ধাক্কা দিতেই উৎপলেন্দুর ঘুম ভাঙল।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। দেবারতি মানিকে নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক স্বপ্ন। শরীরটা ঝিমঝিম করছে, ক্লান্ত লাগছে। চোখ খুলে ঝাপসাভাবে দেখতে পেলেন ডিসটেম্পার করা দেওয়ালে টাঙানো দেওয়াল-ঘড়ি। মনে হচ্ছে সাড়ে আটটা। বালিশের পাশ থেকে চশমাটা নিয়ে চোখে দিলেন। আবার দেখলেন : সাড়ে আটটাই বটে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন উৎপলেন্দু। মাথা দপদপ করছে। মনে হচ্ছে টলে পড়ে যাবেন। কাল মাঝরাত পেরিয়ে ঘরে ফিরে এসে আর এক দফা বোতল নিয়ে বসেছিলেন। গ্লাসে চুমুক দিয়ে গত দু-দিনের জ্বালাটা

অনেক কমে গিয়েছিল। তারপর একসময় ঘুমনোর চেষ্টা। কিন্তু ঘুম স্বল্পবসনা ক্যাবারে ডান্সারের মতো লীলায়িত ভঙ্গিতে ছলনা করেছে। ঘুম আসেনি ঠিকঠাক—কিন্তু দেবারতি এসেছে—রতি এসেছে।

লুঙ্গির কষি ঠিক করে গেঁট দিয়ে স্যান্ডো গেঞ্জির ওপরে একটা হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে নিলেন উৎপলেন্দু। তারপর বেসামাল ক্লান্ত পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুললেন।

অনিমেষ চৌধুরি। পরনে গেরুয়া রঙের একটা লুঙ্গি এবং বিচিত্র এক হাতাওয়ালা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা বোধহয় প্রফেসরের ছেলেবেলার—কারণ সাঙ্ঘাতিকভাবে এঁটে বসেছে তাঁর শরীরে, এবং তাঁর স্ফীত মধ্যপ্রদেশকে স্বমহিমায় আংশিক প্রকাশিত করে রেখেছে।

অধ্যাপকের মনে যে শান্তি নেই সেটা তাঁর মুখচোখ দেখেই দিব্যি বোঝা যাচ্ছে।

'উৎপলেন্দুবাবু, খবর শুনেছেন।'

'কী খবর?' উৎপল অবাক হয়ে অধ্যাপককে দেখছিলেন। ভদ্রলোকের ঘর চারতলায়, দেবারতির ঘরের ঠিক পাশে। সেখান থেকে এই অদ্ভুত পোশাকেই নেমে এসেছেন উৎপলেন্দুর তিনতলার ঘরে!

'পুলিশ এসে পড়েছে—' ছাত্র পড়ানোর ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে অধ্যাপক চৌধুরি বললেন, 'ওরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে। একটু আগে একজন বেয়ারা এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা দিয়ে গেল। বলল, দুশো আট নম্বর ঘর—মানে, ভাস্করবাবুর ঘরে যেতে। ম্যানেজারবাবু নাকি বলেছেন। তাই আপনাকে ডাকতে এলাম। আসার সময় দেখলাম ভাস্করবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ।'

উৎপলেন্দুর পাশের ঘরটা অর্জুন দত্তের। আর তার পাশেরটাই দুশো আট নম্বর। গলা বাড়িয়ে সেদিকে একবার উঁকি দিয়ে অন্য কথা জিগ্যেস করলেন উৎপলেন্দু, 'কাল আপনার ডেটা কালেকশন কেমন হল? কোনও সূত্র-টুত্র পেলেন?'

'অনেক ডেটা জোগাড় করেছি। পুলিশ যদি হেল্প চায় তো ওদের দেব। তা না হলে ওগুলোই জোড়াতালি দিয়ে একটা উপন্যাস লিখে ''ছায়াময়'' পত্রিকায় চালিয়ে দেব। অনির্বাণ ছেলেটি বড় ভালো।'

ভাবতে অবাক লাগে, এই লেখকও অর্ধেক সফলতা পেয়েছে। আর উৎপলেন্দুর রচনাবলীতে শুধুই ট্র্যাজেডি। গোলমালটা যে কোথায়, এত বছরেও উৎপল সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

'কী হল, চলুন! ভাস্করবাবুর ঘরে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে—।'

'আপনি কি এই পোশাকেই যাবেন না কি। যান, জামাটা অন্তত গায়ে দিয়ে আসুন...বাইরের লোকজন থাকবে...।'

'কেন?' নিজের গেঞ্জি আর লুঙ্গির দিকে দেখলেন অধ্যাপক : গেঞ্জি পরে আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?'

'না, তা দেখাচ্ছে না। তবে লেখক মানুষ বলে কথা, এই পোশাক পরে ওখানে গেলে লোকে পালোয়ান বলে ঠাওরাতে পারে।'

অনিমেষ চৌধুরিকে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিব্রত বলে মনে হল।

এমন সময় একজন উর্দি পরা বেয়ারা দরজার কাছে এসে দাড়াল। বলল, 'স্যার, ম্যানেজারসাহেব আপনাদের দুশো আট নম্বর ঘরে যেতে বলেছেন। ওখানে পুলিশের লোকজন সব এসেছে।'

জরুরি খবরটি দিয়ে বেয়ারাটি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বাকিদের তলব করতে।

অনিমেষ চৌধুরি ছটফট করছিলেন। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি তাহলে যাই, চটপট ড্রেস করে আসি। দেরি করে হাজির হলে আবার আমাকেই না সন্দেহ করে বসে। স্ট্রেটকাট সুইসাইড কেস। সেটাকে ওরা হয়তো তখন মার্ডার বলে চালিয়ে দেবে...।'

'সুইসাইড নয়। সবাই বলছে এটা নাকি স্ট্রেট কাট মার্ডার কেস।' অধৈর্যভাবে শেষ কথাটা যোগ করলেন উৎপলেন্দু, 'এখন যান, জলদি জামাকাপড় পরে আসুন—।'

আর অপেক্ষা করলেন না উৎপল। ঘরে ঢুকে, বলতে গেলে অনিমেষ চৌধুরির মুখের ওপরেই, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে তৈরি হওয়ার সময় অবাক হয়ে তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর হাত সামান্য কাঁপছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘরের দরজা লক করে করিডর ধরে হাঁটা দিলেন উৎপলেন্দু। ভারি শরীর নিয়ে ধীরে-ধীরে পথ চলেন তিনি। অর্জুন দত্তের ঘরের দরজার কাছে পৌঁছোনো মাত্র দরজা খুলে বেরিয়ে এল অর্জুন, হাতে নস্যির কৌটো। আর তার ঠিক পিছনেই জ্যোতিষ্ক সান্যাল। ওঁরাও বোধহয় দুশো আট নম্বরের দিকে চলেছেন।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় চললেন, দুশো আট?'

উৎপলেন্দু ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ। এখন সব রাস্তাই দুশো আট নম্বর ঘরের দিকে।'

একটু থমকে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষ্ক চাপা গলায় বললেন, 'বেয়ারাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি। গল্পের গোয়েন্দাকে তো বহুবার গাছে চড়িয়েছেন—এবার সে গাছ থেকে নেমে এসেছে—আমাদের টাইট দেবার জন্যে...'

অর্জুন দত্ত শব্দ করে নস্যি নিয়ে নস্যির ডিবে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। নাকে আঙুল ঘষল কয়েকবার। একটা হাঁচি 'আসব আসব' করায় সেটা সামলাতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তারপর হাঁটা দিল। বাকি দুজনও পা মেলালেন ওর সঙ্গে। কোনও মন্তব্য করলেন না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দুশো আটের দরজায় এবং কলিংবেলের বোতামে আঙুল। দরজা খুলে দিল উর্দি পরা একজন কনস্টেবল। ওরা তিনজন ঢুকে পড়লেন ভাস্কর রাহার ঘরে।

এবং একটা ধাক্কা খেলেন তিনজনেই।

হোটেল 'সিরাজ'-এর পশ্চিমদিকের সতেরোটা ঘরে রয়েছেন সম্মেলনে আমন্ত্রিত সতেরোজন অতিথি। তার মধ্যে দশজন রহস্য কাহিনীকার, দুজন সম্পাদক, দুজন প্রকাশক ও তিনজন সাংবাদিক। এছাড়া অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছেন শুধুমাত্র সম্মেলনের রোজকার অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য। তাঁদের জন্য আয়োজকরা চা ও লাঞ্চের ব্যবস্থা রেখেছেন। এর মধ্যে আবার বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথিকে কর্তৃপক্ষ সামান্য সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ারও বন্দোবস্ত করেছেন।

পশ্চিমমুখো সতেরোটা ঘর ভাগাভাগি হয়েছে এইভাবে :

পাঁচতলার পাশাপাশি চারটে ঘরে আছেন অনামিকা সেনগুপ্ত, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ্ক সান্যাল ও রূপেন মজুমদার।

চারতলায় পরপর পাঁচটা ঘরে রয়েছেন অনিমেষ চৌধুরি, দেবারতি মানি, কল্পনা সেন, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঞ্জন দেবনাথ।

তিনতলায় আছেন প্রেমময় চৌধুরি, ভাস্কর রাহা, অর্জুন দত্ত ও উৎপলেন্দু সেন।

আর দোতলায় পরপর চারটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন কৌশিক পাল, অনির্বাণ ঘোষ, সুজন সরকার ও প্রীতম নন্দী।

এই সতেরোজনের মধ্যে একজন অতিথি 'আছেন' থেকে 'ছিলেন' হয়ে গেছেন।

বড় রাস্তা থেকে দেখলে সতেরোটা ঘরের মধ্যে যোলোটা ঘরের জানলা একটা চার বাই চার দাবার ছক তৈরি করেছে বলে মনে হবে। শুধু চারতলায় রঞ্জন দেবনাথের ঘরটাই ডান দিকে বাড়তি একটা চৌখুপি। অবশ্য আমন্ত্রিত 'অতিথি ছাড়াও হোটেলে অন্যান্য বোর্ডার রয়েছে।

তিনতারা হোটেলের ঘর যেমন হওয়া উচিত ঘরগুলো সেরকমই। তবে সতেরোটা সিঙ্গল রুম পাওয়া যায়নি বলে আয়োজকরা নটা ডাবল রুম ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু কোনও অতিথির গোপনীয়তায় যেন আঁচড় না পড়ে তার জন্য ডাবল রুমগুলোকেও সিঙ্গল রুমের মতো ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাস্কর রাহার ঘরটা ডাবল রুম। ঠিক তার নীচের ডাবল রুমটা পেয়েছেন অনির্বাণ ঘোষ। রাহার ওপরের ডাবল রুম ছিল দেবারতির। আর তার ঠিক ওপরের ডাবল রুমেই আছেন রত্নাবলী।

ঠিক একইরকম ডাবল রুম পেয়েছেন রুপেন মজুমদার, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন দেবনাথ, উৎপলেন্দু সেন ও প্রীতম নন্দী।

তবে রুম সিঙ্গল হোক আর ডাবলই হোক, তাদের চেহারা ও চরিত্রে কোনও তফাত নেই—শুধু আয়তনের সামান্য ফারাকটুকু ছাড়া। সুতরাং তিনতারা হোটেলের একটি অভিজাত ঘরের চরিত্র যদি হঠাৎ করে লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কোনও ঘরের মতো হয়ে যায়, তা হলে ধাক্কা খাওয়ারই কথা।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল, অর্জুন দত্ত এবং উৎপলেন্দু সেন ভাস্কর রাহার ঘরে ঢুকে ঠিক সেই ধাক্কাটাই খেলেন।

ঘরে এত লোকজন যে, ঘরের অক্সিজেন বোধহয় নাভিশ্বাস তুলছে।

বিছানায় বসে আছেন কয়েকজন। তিনজন টেবিলের কাছে। এ ছাড়া ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেউ কেউ। আর পশ্চিমের খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন মানুষ। তার মধ্যে একজনের মাথার চুল ধবধবে সাদা। রোগা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং শ্যামলা। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। পরনে খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা। ডান হাতের লম্বা আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

আর দ্বিতীয়জন বেশ লম্বা, শক্ত পোক্ত। বয়স চল্লিশের এপিঠেই। ছোট করে ছাঁটা চুল। কাঁচাপাকা চওড়া গোঁফ। ফরসা মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। পরনে ছাই রঙের ফুলপ্যান্ট, আর সাদা নীল চেক কাটা হাওয়াই শার্ট। হাতের শিরা এবং পেশি—দুই-ই প্রকট। আর তার চোয়ালের উদ্ধত রেখা যেন সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে : হুঁশিয়ার!

টেবিলের কাছাকাছি একটা সোফায় বসে ছিলেন 'সিরাজ'-এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার। জ্যোতিষ্কদের ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সূত্রধারের ঢঙে বলতে শুরু করলেন,

'আপনারা তো সকলেই জানেন যে, কাল রাত সাড়ে এগোরোটা নাগাদ মিস দেবারতি মানি—আমাদের হোটেলের তিনশো আট নম্বর রুমের বোর্ডার—তাঁর ঘরের জানলা থেকে লাফ দিয়ে সুইসাইড করেছেন। যেহেতু তিনি এই কনফারেন্সের পার্টিসিপ্যান্ট ছিলেন সেহেতু এই দুর্ঘটনা—মানে, মিসহ্যাপের সঙ্গে আপনাদের ইনভলভমেন্টটাই বেশি।' একটু দম নিলেন ম্যানেজারসাহেব তারপর : 'আমাদের হোটেলের একটা রেপুটেশন আছে। মানে, সুনাম আছে। তাই আমরা চাই খুব একটা শোরগোল না তুলে পুলিশের ইনভেস্টিগেশন শেষ হোক—'

'লম্বা অফসানা জলদি খতম করুন, ম্যানেজারসাহেব।' জানলার কাছ থেকে দ্বিতীয়জন আকস্মিকভাবে রুক্ষ মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছে। তার কপালে বিরক্তির ভাঁজ। হাতে কয়েকটা কাগজ, আর খোলা বলপয়েন্ট পেন।

প্রশান্ত রায় থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্রকেশ ভদ্রলোক জ্বলন্ত সিগারেটসমেত ডান হাতটা ওপরে তুলে মাস্টারি ভঙ্গিতে বললেন, 'আঃ, রঘুপতি। টেক ইট ইজি। এত অল্পেতে অধৈর্য হয়ে পড়ো কেন।'

রঘুপতি অবাক চোখে তাকাল বৃদ্ধের দিকে : 'একটা ইয়াং মেয়ে কথা নেই বার্তা নেই একজন আননোন কাতিলের হাতে কোতল হয়ে গেল—আর আপনি সেটাকে বলছেন অল্প! অল্প মাই ফুট, গুপ্তাসাব। আমি খুনিকে চাই, ব্যস।'

বৃদ্ধ সিগারেটে টান দিলেন। বাঁ হাতে রঘুপতির পিঠ চাপড়ে দিলেন দু-বার। তারপর সামান্য হেসে বললেন, 'রঘুপতি যাদব, আমার গায়ের জোর নেই মানছি, কিন্তু আমার বুদ্ধির জোরের ওপরেও তোমার ভরসা নেই! তুমি আমার কাছে সিম্পলি খুনিকে চাইছ, এই তো! কোনও চিন্তা নেই, পাবে। শুধু এক-দু' দিন সময়ের ব্যাপার।'

ঘরের দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল, দরজা খুলল।

ঘরে ঢুকলেন রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়—সঙ্গে অনামিকা।

রত্নাবলী ঘরে ঢুকেই ইতস্তত করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটু দেরি হয়ে গেল। রাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শোওয়া অভ্যেস। অনামিকা দরজায় ধাক্কা না দিলে হয়তো ঘুম এখনও ভাঙত না—'

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি।

অনামিকা এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল বিছানায় বসে থাকা ভাস্কর রাহার দিকে।

হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে অপরিচিত সাদা-চুল বৃদ্ধ হাসি মুখে দু-হাত নেড়ে স্বাগত জানালেন রত্নাবলীকে।

'আসুন, ম্যাডাম—বসুন।'

সাংবাদিক প্রীতম নন্দী নিজের সোফাটা ছেড়ে দিল রত্নাবলীকে।

রত্নাবলী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বৃদ্ধের দিকে। সেই জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝতে পেরে বৃদ্ধ স্মিত হেসে বললেন, 'ম্যাডাম, আমি আপনার লেখার একান্ত ভক্ত। এই সম্মেলনে আপনারা যে দশজন লেখক এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের লেখাই আমি পড়েছি। উইলিয়াম উইলকি কলিন্সের ''দ্য ওম্যান ইন হোয়াইট'' থেকে শুরু করে এডগার অ্যালান পো, আর্থার কোনান ডয়েল, রিচার্ড অস্টিন ফ্রিম্যান, জি. কে. চেস্টারটন, আগাথা ক্রিটি, জর্জ সিমেনন, নিকোলাস ব্লেক, জন ডিকসন কার, পি. ডি. জেমস ছুঁয়ে আজকের রুথ রেন্ডেল পর্যন্ত সকলের লেখা আমি পড়েছি। গোয়েন্দা কাহিনি আমার পড়তে ভালো লাগে। ভালো লাগে খুনির সঙ্গে গোয়েন্দার বুদ্ধির লড়াই।

'ঠিক একইভাবে ''বাঁকাউল্লার দপ্তর'' থেকে শুরু করে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্তের বুড়ি ছুঁয়ে আজকের অনামিকা সেনগুপ্ত পর্যন্ত আমার পড়া।' একটু দম নিলেন বৃদ্ধ। হাতে হাত ঘষলেন। তারপর শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আমি কে?'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা। ঘরের সবাই চুপ। আর ঠিক তখনই দরজার কলিংবেল আবার বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন অনিমেষ চৌধুরি। ধুতি পাঞ্জাবি পরে একেবারে কেতাবী অধ্যাপকটি সেজে এসেছেন।

সুতরাং ষোলো কলা পূর্ণ হল, যেহেতু অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ষোলোজন বিশেষ অতিথিই এখন এই ঘরে হাজির।

শুভ্রকেশ বৃদ্ধ আপনমনেই হাসছিলেন মুখ টিপে, আর ছোট ছোট পা ফেলে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন ঘরের মাঝখানে। হঠাৎই পায়চারি থামিয়ে মুখ তুলে তিনি ভরাট গলায় ঘোষণা করলেন, 'আমি এক হুনুর—থিঙ্কিং মেশিন—এখানে হুনুরি করতে এসেছি।'

ঘর আবার নিস্তব্ধ।

'হুনুর!' প্রেমময় চৌধুরি অবাক হয়ে উচ্চারণ করেছেন।

সেদিকে ঘুরে তাকালেন বৃদ্ধ : 'হ্যাঁ, হুনুর। ফারসী ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। যার অর্থ হল তীকষ্ণবুদ্ধি, দক্ষ ব্যক্তি—অথবা, সহজ কথায় গোয়েন্দা।'

জ্যোতিষ্ক পাশে দাঁড়ানো অর্জুন দত্তকে চাপা গলায় বললেন, 'বুঝলেন, এই সেই মাল—গাছ থেকে নেমে এসেছে।'

বৃদ্ধ তখনও বলছিলেন, 'আমি এখানে হুনুরি করতে এসেছি। প্যারীচাঁদ মিত্রের ''আলালের ঘরের দুলাল'' বইতে ''হুনুরি'' শব্দটা আছে। সেখানে তার অর্থ ''শিল্পকর্ম'' বা ''সূচিকর্ম''। হাসলেন বৃদ্ধ, চোখ বুলিয়ে নিলেন সকলের মুখের ওপরে : 'আমি এখানে অনেকটা সেই কাজই করতে এসেছি। শিল্পকর্ম—মানে গোয়েন্দাগিরি।

'আমার নাম অশোকচন্দ্র গুপ্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এসিজি। কারণ বয়েসকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতাম। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। চিন্তা করতে আমি ভালোবাসি বরাবরই। আর ভালোবাসি দেশি-বিদেশি ডিটেকটিভ ফিকশন বা ক্রাইম ফিকশন পড়তে। এছাড়া আর একটা আজব শখ আমার আছে—পাখি আর পাখির ডাক।' রঘুপতি যাদবের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন অশোকচন্দ্র : 'রঘুপতি যাদব এক সময়ে

আমার ছাত্র ছিল। তারপর কী করে যেন লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর হয়ে গেছে। এই ছেলেটা খুন একদম পছন্দ করে না—আর আমার নেশার কথা জানে। সেইজন্যেই হোটেল ''সিরাজ'' থেকে প্রশান্তবাবুর টেলিফোন পাওয়ার পর ও আমাকে ফোন করে। বলে, ''এসিজি, ইন্টেলেকচুয়ালদের কনফারেন্সে একটা ইয়াং মেয়ে মার্ডার হয়ে গেছে। ক্রাইম রাইটারদের কনফারেন্স। ফিল ইন্টারেস্টেড?''

'তারপর, রাইটারদের নামের সূচিপত্র শুনে, আই বিকেম ইন্টারেস্টেড। যাঁদের লেখা সবসময় পড়ি তাঁদের দশ-দশজনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে! ভাবাই যায় না। সুতরাং কাল রাত থেকেই রঘুপতি যাদবের সঙ্গে আমি এখানে হাজির। রঘুপতির খালি এক কথা : ''পাখি যেন পালাতে না পারে—।'' '

অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে এসিজি—হাসলেন, বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, ও আমার পাখির নেশার কথা জানে। জানে, অনেকরকম পাখির ডাকই আমার চেনা। দ্যাটস অল।'

এসিজির কথা বলার ঢং দেখেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, বক্তৃতা দেবার অভ্যেস তাঁর আছে। কথা শেষ করে দুটো হাত একজোট করে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। সকলের উদ্দেশেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপচাপ। তারপর অনামিকা ফস করে বলে বসল, 'আপনাকে দেখে ডিটেকটিভ বলে মনেই হয় না—।'

অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে পঁয়ষট্টি পেরোনো বৃদ্ধ ঘুরে তাকালেন অনামিকার দিকে। তাঁর চোয়ালের রেখা পলকের জন্য শক্ত হল। তারপর সুন্দর করে হেসে বললেন, 'ওটা আমার ছদ্মবেশ, মা-মণি। আদর করে ''মা-মণি'' বললাম বলে রাগ কোরো না, অনামিকা। তুমি আমার মেয়ে ঊর্মিলার মতো। ঊর্মিলা কিছুতেই মানতে চায় না আমি ডিটেকটিভ। আসলে কী জানো? চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া ছুঁচলো গোঁফ আমার নেই। দেবেন্দ্রবিজয়, হুকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের মতো প্রতিভা আমার নেই। এমনকি রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের বুদ্ধিমান গোয়েন্দা করঞ্জাক্ষ রুদ্র কিংবা ভাস্কর রাহার স্মার্ট ক্ষুরধার বুদ্ধি গোয়েন্দা সুরজিৎ সেনের সঙ্গেও কোনও তুলনা আমার চলে না। কারণ আমি ছাপোষা মানুষ। কোনও করিশমা আমার নেই।' বাঁ-হাতটা মাথার পিছনদিকে ঘোরালেন তিনি : 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার মাথার পেছন থেকে কোনও জ্যোতি বেরোয় না।

তবে—' একটু বিরতি দিলেন এসিজি। রূপেন মজুমদার, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় আর ভাস্কর রাহার দিকে একবার দেখলেন। তারপর : 'তবে আমরা, মানে, বাস্তব জীবনের গোয়েন্দারা মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। যা হোক করে শেষ পর্যন্ত খুনিকে ধরে ফেলতে পারি। তদন্ত করার সময়ে আমার ব্যবহারে যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে আপনারা দয়া করে সেটা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।'

এসিজি এমন সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল সকলকেই তিনি চেনেন। অনামিকা 'মা-মণি' সম্বোধনে বেশ অপমানিত এবং আহত হয়েছিল। কিন্তু ও খানিকটা খুশি হয়েছিল অশোকচন্দ্র ওর লেখা পড়েছেন বলে। নতুন লেখকদের পক্ষে পাঠক পাওয়া যে কী শক্ত! কিন্তু ভদ্রলোক সকলকে অনায়াসে চিনে ফেলেছেন কেমন করে? এ কি ওর হুনুরির নমুনা, না কি...।

উত্তরটা পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। ছোট-ছোট পা ফেলে এসিজি ঘরের গোল টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলেন। টেবিলে পড়ে থাকা নানান কাগজপত্রের মধ্যে থেকে সাদা মলাটের একটা চওড়া ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটাতে লাগলেন : 'বার্ষিক রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক সম্মেলন'-এর সুভেনির। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে এক কপি করে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তিকায় প্রত্যেক লেখকের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া আছে। গতকাল মাঝরাত থেকে এটুকু সময়ের মধ্যে এসিজি তাঁর হোমওয়ার্ক বেশ ভালোভাবেই শেষ করেছেন।

ভাস্কর রাহা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। জ্বলন্ত চুরুটে টান দিচ্ছিলেন আর কৌতুকভরা চোখে প্রায় সমবয়েসি এই গোয়েন্দাকে দেখছিলেন। গল্প-কাহিনির গোয়েন্দাদের সঙ্গে কত অমিল!

এমন সময় ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। ভাস্কর রাহা বিছানা থেকে উঠে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিছানার মাথার কাছে ছোট টেবিলে রাখা সবুজ টেলিফোনটার দিকে, কিন্তু তাঁকে বাধা দিল রঘুপতি যাদব। চট করে তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়াল। বলল, 'মাফ কিজিয়েগা, সাহাব। ইনভেস্টিগেশন চালু হয়ে গেছে। এখন থেকে আপনাদের সব চিঠি আর ফোন কল আমরা ইন্টারসেপ্ট করব। মানে, চেক করব।'

রাহার মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দিলেও রঘুপতি সেটাকে আমল দিল না।

অশোকচন্দ্র রঘুপতির পুরো কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেননি। ছোট্ট করে 'সরি, মিস্টার রাহা' বলে ম্যাগাজিনটা টেবিলে আবার রেখে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেছেন টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নিয়ে স্বাভাবিক ভারি স্বরে কথা বললেন। তারপর রিসিভার বাড়িয়ে দিলেন প্রশান্ত রায়ের দিকে : 'আপনার ফোন—'

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার কথা বললেন টেলিফোনে। তাঁর কথার শতকরা নিরানব্বই ভাগই শুধু 'ইয়েস' আর 'ওকে'। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তারপর ঘরের সকলের মুখের ওপর একদফা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'অনেকগুলো ইম্পরট্যান্ট খবর আছে। আপনাদের কনফারেন্স আজ সাড়ে দশটায় স্টার্ট হবে। অরগানাইজাররা জানিয়েছেন—'

'ম্যানেজারসাহেব।' ভাস্কর রাহার পথ ছেড়ে প্রশান্ত রায়ের দিকে তাকিয়েছে রঘুপতি : 'আপনার সিলেবাসে কি সামারি বলে কিছু নেই? কাল রাত থেকে দেখছি চার লাইন ইনফরমেশন দিতে গিয়ে চল্লিস লাইন ইনট্রোডাকশন। আপনাদের বাংলায় একে কী বলে যেন, এসিজি? বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত কী যেন?'

'ওঃ রঘুপতি!' হাত তুলে ইন্সপেক্টর যাদবকে ক্ষান্ত করতে চাইলেন এসিজি : 'তোমার এখনও সেই স্টুডেন্ট লাইফের মতো মাথা গরম।' প্রশান্ত রায়ের দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি, বললেন, 'মিস্টার রায়, যা বলার সংক্ষেপে সারুন।'

প্রশান্ত রায় সুট পরে ছিলেন। কোটের পকেটের কাছটায় দুটো হাত ঘষলেন কয়েকবার। তার গোলগাল ফরসা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এইমাত্র কেউ তাঁর গালে রুজ মাখিয়ে দিয়েছে। কাল রাত থেকে এই অভদ্র ইন্সপেক্টরটা তাকে কম অপমান করেনি। যেমন গাধার মতো খাটিয়েছে তেমনই শাসন করেছে। শুধু হোটেলের রেপুটেশনের কথা মনে রেখে তিনি সব সহ্য করেছেন। তা ছাড়া ম্যানেজমেন্টও তাঁকে অর্ডার দিয়েছে পুলিশের সঙ্গে টু হান্ড্রেড পারসেন্ট কোঅপারেট করতে। অগত্যা...।

প্রশান্ত রায় একেবারে টেলিগ্রামের ভাষায় বলতে শুরু করলেন, 'আজ থেকে কনফারেন্স শুরু হবে রোজ সাড়ে দশটায়। পুলিশকে না জানিয়ে আপনারা কেউ হোটেল ছেড়ে যাবেন না। আর পুলিশের ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা বাইরের কোনও লোকের কাছে এ-বিষয়ে মুখ খুলবেন না। কোনও পত্রপত্রিকায় কিছু লিখবেন না। ব্রেকফাস্ট রেডি। সাড়ে দশটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।'

'ব্রেকফাস্ট' শব্দটা শোনার পর বোধহয় সকলের খেয়াল হল খিদে পেয়েছে।

রঘুপতি অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে চোখ নাচাল। অর্থাৎ, এবার কী হবে?

অশোকচন্দ্র গুপ্ত হাত তুলে গলা উঁচিয়ে বললেন, 'উপস্থিত রহস্য ভদ্রমন্ডলী, আপনাদেরই একজন, মিস দেবারতি মানি, গতকাল রাতে তাঁর চারতলার ঘরের জানলা থেকে নীচে লাফ দিয়েছে। আপনারা অনেকেই হয়তো ভেবেছেন, ব্যাপারটা আত্মহত্যা—কিন্তু আসলে তা নয়। কেউ তাকে নীচে লাফিয়ে পড়তে সাহায্য করেছে। সম্ভবত আপনাদেরই কেউ।' একটু থেমে অশোকচন্দ্র আনমনাভাবেই তাঁর মাথার একগোছা চুল টানলেন। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা যে খুন—আত্মহত্যা নয়—তার ডেফিনিট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ফলে এখন একটা কাজই বাকি : খুনি পাকড়াও করা। আমি আর রঘুপতি মিলে এর মধ্যেই আপনাদের

ষোলোজন সম্পর্কে ছোটখাটো একটা ডোসিয়ার তৈরি করে ফেলেছি। আপনারা তো জানেন, খুনের ব্যাপারে ডিটেকটিভ বা পুলিশের একটা জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপার থাকে। সেইজন্যেই আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা দরকার। আপনারা এখন ব্রেকফাস্ট, কনফারেন্স, এইসব সেরে নিতে পারেন। আমি লাঞ্চের সময় যতটা পারি কাজ সেরে নেব। তারপর সন্ধে থেকে আবার বিরক্ত করব। অতএব, আপাতত আপনারা যেতে পারেন।'

এসিজির কথা শেষ হতেই ঘরে শুরু হল গুঞ্জন।

অতিথিরা কথা বলতে-বলতে রওনা হলেন ঘরের দরজার দিকে। রঘুপতি যাদব বাজপাখির চোখে তাঁদের লক্ষ করছিল।

অনিমেষ চৌধুরি রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে পাশে হাঁটছিলেন। বললেন, 'আমার সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট খাওয়া অভ্যেস। আজ ভীষণ দেরি হয়ে গেল।'

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকের বপু নিরীক্ষণ করে হাসতে-হাসতে বললেন, 'বুঝতে পারছি আপনার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু খুনের তদন্ত বলে কথা—।'

'খেয়াল করেছেন, ওই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের নামের মধ্যে কেমন একটা ইতিহাসের গন্ধ রয়েছে।'

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলে ওঠার আগেই কথা বলল কৌশিক পাল, 'হ্যাঁ—অশোক আর চন্দ্রগুপ্ত। তবে বুদ্ধি বোধহয় চাণক্যের মতো।'

ভাস্কর রাহা ওঁদের চলে যাওয়া দেখছিলেন। ওঁদের সকলের মনে ভয় আছে, আশঙ্কা আছে। কিন্তু দেবারতি মানির জন্য কতটুকু শোক-দুঃখ-তাপ রয়েছে? মেয়েটা মরেছে বারো ঘণ্টাও হয়নি—অথচ এরই মধ্যে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে! হাসি-ঠাট্টা করা যাচ্ছে অনায়াসে! যেন দেবারতির মৃত্যু এক আচমকা টান মেরেছিল জীবনযাত্রার তারে, তারটা কাঁপতে শুরু করেছিল অনুপ্রস্থ তরঙ্গ গঠন করে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের বিস্তার কমতে-কমতে এই ন'-দশ ঘণ্টায় সেই কম্পন একেবারে থেমে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে না দেবারতি মানি নেই—কোনওদিন ছিল।

অথচ রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের প্রতি কী দারুণ ভালোবাসা ছিল মেয়েটার!

আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এইরকম এক ভালোবাসা থেকেই এই সাহিত্যের টানে গা ভাসিয়েছিলেন ভাস্কর রাহা। এমনি গল্প-উপন্যাস যে লিখতে পারতেন না তা নয়। বেশ কয়েকটা লেখা তো ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু অ্যালান পো, মপাসাঁ, মম, কোনান ডয়েল, ব্র্যাম স্টোকার, অ্যামব্রোজ বিয়ার্স, ব্র্যাডবেরি, রোল্ড ড্যাল এবং আরও অনেকের লেখা পড়তে-পড়তে মনের ভেতরে কী সব যেন হয়ে গেল। পথ বাঁক নিল। এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন ভালোবাসা নিয়ে এই 'অপরাধী' সাহিত্যে পা রাখলেন ভাস্কর রাহা। সেই ভালোবাসা নিয়ে দুর্দিনে পথ হেঁটেছেন, ক্রমাগত লড়াইয়ে পৌঁছে গেছেন সফলতার সোনার দিনে। কিন্তু অদ্ভুত সেই ভালোবাসা—এত বছরেও এক বিন্দু কমেনি।

এরকম কম-বেশি ভালোবাসা নিয়ে আরও অনেক লেখক এসে যোগ দিয়েছেন সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায়। তাঁরা একনিষ্ঠভাবে এই সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন। সে-সময়ে নামি পত্রপত্রিকায় রহস্য গল্প-উপন্যাস ছাপা হত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব 'প্রেমিক' লেখকরা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে গিয়ে সেইসব নামী পত্রিকার দরজায় কড়া নাড়েননি। বরং ছোট পত্রিকায় লিখেছেন নিয়মিত। 'মাসিক রহস্য পত্রিকা', 'মাসিক রোমাঞ্চ', 'মাসিক গোয়েন্দা', 'মাসিক ক্রিমিনাল', 'ভয়ংকর', 'ক্রাইম', 'অপরাধ'—এইসবই ছিল তাঁদের প্রিয় পত্রিকা। স্বর্গের দাসত্ব করার চেয়ে নরকের রাজত্ব তাঁদের পছন্দ ছিল।

দিনের পরে দিন কেটে গেল। সময়ও তার রং বদলাতে লাগল ধীরে-ধীরে। বেশ কয়েকটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল লড়াইয়ে হেরে গিয়ে। কিন্তু জন্ম নিল কয়েকটি নতুন পত্রিকা : 'ছায়াময়', 'রহস্য-রোমাঞ্চ', 'ভৌতিক'। আবার নতুন করে শুরু হল লড়াই।

ইতিমধ্যে কয়েকটি নামি পত্রিকা রহস্য গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করে পাঠকের সাড়া পেয়েছে। টিভিতে প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছে রহস্য-কাহিনি। ফলে রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রকাশকরা এ-জাতীয় বই প্রকাশে মন দিলেন। লেখকরা যেন নতুন করে কোরামিন ইনজেকশান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁদের কলম নিয়ে।

তারপর...গত পাঁচ-সাত বছরে ছবিটা একেবারে বদলে গেল। সফলতার স্বাদ এখন রহস্য-সাহিত্যিকদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু সেই ভালোবাসা? সেটা কি সকলের মধ্যে রয়েছে? সহজে সফলতা পাওয়ার লোভে কেউ কেউ কি এসে যোগ দেননি এই স্রোতে? আর পুরোনো লেখকরা এখনও কি ভাস্কর রাহার মতো বুকে হাত রেখে বলতে পারেন, 'রহস্য-সাহিত্য, তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি।' বোধহয় না। তবে দেবারতি মানি পারত।

আর সেইজন্যেই কি খুন হয়ে গেল মেয়েটা!

'মিস্টার গুপ্ত,' ভাস্কর রাহা শান্ত গলায় বললেন, 'দেবারতির ঘরটা আমি একবার দেখতে পারি?'

ভুরু বাঁকিয়ে আড়চোখে রাহার দিকে তাকাল রঘুপতি যাদব : 'মতলব?'

ভাস্কর রাহা রঘুপতির দিকে ফিরেও তাকালেন না। অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়েই কথা বললেন আবার, 'যদি অবশ্য আপনাদের তদন্তের কোনও অসুবিধে না হয়।' একটু থেমে যেন স্বগত মন্তব্য করলেন, 'মেয়েটাকে আমি বড় ভালোবাসতাম...'

রঘুপতি এবার ভাস্কর রাহার কাছাকাছি এগিয়ে এল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট থাকা সত্ত্বেও ওর ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল। চোয়াল শক্ত করে ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে রঘুপতি চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, 'মোহাব্বত! ইন্টারেস্টিং।'

উৎপলেন্দু সেন রত্নবলী মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 'একেবারে আনকালচারড।' রূপেন মজুমদার ইশারায় উৎপলকে থামতে বললেন।

রত্নাবলী অনেকক্ষণ ধরেই অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। তাই গলা তুলে রঘুপতি যাদবকে লক্ষ করে কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু ভাস্কর রাহা ইশারায় তাঁকে থামালেন। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে চুরুট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে আরামের ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, 'মিস্টার যাদবের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারটা আপনিই ভালো বলতে পারবেন—আপনি ওর মাস্টারমশাই ছিলেন। তা ছাড়া এখানে আমি সহবত শেখানোর ইস্কুল খুলিনি—ওটা বাড়ি থেকেই শিখে আসতে হবে।'

'মিস্টার রাইটার—' গর্জন করে উঠল ইন্সপেক্টর যাদব।

তার মুখ অপমানে লাল হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চোখ ছোট করে সে কিছু একটা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু তাকে সময়মতো বাধা দিয়েছেন এসিজি।

'রঘুপতি, তুমি কি আমাকে একটু শান্তিতে কথা বলতে দেবে না! প্লিজ, একটু চুপ করে থাকো—।'

রঘুপতি যাদব নিজেকে সামলে নিল।

ভাস্কর রাহা চুরুটে টান দিয়ে সামান্য শব্দ করে হাসলেন। হাতের চুরুটের দিকে নজর রেখেই স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত গত বিশ-পঁচিশ বছরে এই ক্রাইম ফিকশন লেখালিখি নিয়ে অনেক লড়াই আমরা দেখেছি। আমরা বলতে, আমি, উৎপলেন্দু সেন, রূপেন মজুমদার, আর মিসেস মুখার্জি তো বটেই—' ওঁদের তিনজনের দিকে ইশারা করে দেখালেন রাহা। মুখ তুলে আবার হাসলেন, বললেন, 'কারও চোখ রাঙানিতে আমরা ভয় পাই না। তা সে সম্পাদকই হোক, প্রকাশকই হোক, কিংবা—' রঘুপতি যাদবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে : 'পেটি কোনও পুলিশ অফিসারই হোক।'

রঘুপতি একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছিল, কিন্তু সে চেতনা হারায়নি। কারণ সে জানে, সেরকম বেচাল কিছু করে ফেললেই পরদিন সেটা খবরের কাগজের নিউজ হবে। বিশেষ করে যেখানে ভাস্কর রাহা আর

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় হাজির রয়েছেন।

এসিজি প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক সময়েই প্রস্তাব দিয়েছেন, ভাস্করবাবু। কারণ আমরা মিস মানির ঘরে এখন একবার যাব। আপনি সঙ্গে এলে আমার বা রঘুপতির কোনও আপত্তিই নেই। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম—' হাসলেন এসিজি।

রঘুপতি যাদব তখন মনে-মনে ঈশ্বরকে ডাকছিল। স্যার যদি এই পাকাচুল রাইটারটাকে শেষ পর্যন্ত খুনি বলে ঠাওরান তা হলে দারুণ হবে। ওই যে সহবত-টহবত কী সব বলল, সেগুলো ওকে হাড়ে-হাড়ে শিখিয়ে দেওয়া যাবে।

'চলুন, তাহলে আমরা ওপরে যাই—' রঘুপতির হাত ধরে টান মারলেন অশোকচন্দ্র : 'চলো, রঘুপতি —।'

'আ-আমি সঙ্গে গেলে কি কোনও অসুবিধে হবে?' ইতস্তত করে এই অনুরোধটি পেশ করেছেন রত্নাবলী। চশমার কাচের পিছনে ওঁর চোখ সামান্য ফোলা। নীল সরু পাড়, বুটির কাজ করা, একটা সাদা টাঙ্গাইল শাড়িতে ওঁকে প্রশান্ত দেখাচ্ছে। দেবারতির ব্যাপারটার জন্য আজ যে বাড়িতে যেতে পারবেন না সে-কথা স্বামীকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন। দেবারতি মেয়েটা বেশ হাসিখুশি ছিল। তা ছাড়া তাঁর লেখার ভক্ত ছিল। অকারণে একজন ভক্ত পাঠক কোন লেখক হারাতে চায়!

অশোকচন্দ্র গুপ্ত চলার পথে থমকে দাঁড়িয়েছেন। ফিরে তাকিয়ে বলেছেন, 'আসুন না, আপনারা সবাই আসুন। রঘুপতিদের ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট আর ক্যামেরাম্যানরা কাল রাতেই তাদের সব কাজ সেরে ফেলেছে। এখন আর কোনও সূত্র খোওয়া যাওয়ার ভয় নেই।'

অতএব অশোকচন্দ্র এবং রঘুপতিকে অনুসরণ করে রওনা হলেন চারজন অভিজ্ঞ লেখক। এই প্রথম ওঁরা সরাসরি কোনও তদন্তে জড়িয়ে পড়েছেন।

ওঁরা ছ'-জন চলে যেতেই ভাস্কর রাহার ঘর খালি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলটিকে রঘুপতি ঘরের বাইরে পাহারা দেবার জন্য নির্দেশ দিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে।

ওপরে রওনা হওয়ার আগে ল্যান্ডিং-এর বারান্দা দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখলেন রূপেন মজুমদার। না, গত রাতের কোনও চিহ্নই চোখে পড়ছে না। ভাস্কর রাহার গাড়িটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। হয়তো শান বাঁধানো টেরাসে হুমড়ি খেয়ে আতসকাচ নিয়ে পরীক্ষা করলে তবেই খুঁজে পাওয়া যাবে এক তরুণীর শরীরের রক্তবিন্দুর সূক্ষ্ম চিহ্ন।

পাঁচতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে বাঁক নেবার সময় বাঁ দিকের খোলা বারান্দার দিকে তাকালেন ভাস্কর রাহা। সুন্দর ঝকঝকে সকাল। নীল আকাশে কোনও মলিনতা নেই। মনেই হয় না, গতকাল রাতে এই হোটেলেই ঘটে গেছে এক বিশ্রী মলিন ঘটনা।

সত্যি, দেবারতি মানি এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন গ্রহান্তরের বাসিন্দা হয়ে গেছে!

ছয়

তিনশো আট নম্বর ঘরে ঢুকতেই এক অশরীরী অনুভূতির তরঙ্গ যেন ঝাঁকুনি দিল ভাস্কর রাহাকে।

চেহারা অথবা বিলাসিতার দিক থেকে ভাস্কর রাহার ঘরের সঙ্গে কোনও তফাত এই ঘরের নেই। অথচ ঘরটার চরিত্র যেন অন্যরকম। একটু আগেই যাকে গ্রহান্তরের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিল, এখন সে যেন দুরন্ত গতিবেগে মহাকাশের দুস্তর দূরত্ব চোখের পলকে অতিক্রম করে ধূমকেতুর মতো ছুটে এসে আছড়ে পড়েছে

এই ঘরের মধ্যে। দেবারতির অশরীরী আত্মা যেন কাতর স্বরে বলছে, 'মুকুটহীন সম্রাট, আপনাদের ছেড়ে আমি যেতে চাইনি। বাট সামওয়ান ফোর্সড মি টু লিভ ইউ অল। আপনাদেরই একজন আমাকে...।'

সে কে, দেবারতি? মনে-মনে প্রশ্ন করলেন রাহা।

দেবারতি মানির ঘরের দরজায় একজন কনস্টেবল পাহারায় মোতায়েন ছিল। রঘুপতি যাদবকে দেখে সে জোড়াতালি দেওয়া ভাঙা দরজা সতর্কভাবে ঠেলে খুলে দিয়েছে। ওঁরা ঘরে ঢুকেছেন একে-একে।

ভাস্কর রাহা শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে দেবারতিকে অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন। পারফিউমের হালকা গন্ধ তাঁর নাকে আসছিল।

সোজাসুজি তাকালেই বড় মাপের জানলা। পশ্চিমদিকের এই জানলা দিয়েই পড়ে মারা গেছে দেবারতি।

রূপেন মজুমদার আর উৎপলেন্দু সেন এসিজির অনুমতি নিয়ে দেবারতির বিছানার এক কোণে বসে পড়লেন। গত পরশুর রাতের কথা উৎপলের মনে পড়ল। মেয়েটা তাঁকে যৌন প্রতিবন্ধী বলে অপমান করেছিল। একজন ব্যর্থ লেখক, একজন ব্যর্থ অভিনেতা বলেছে বলে কিছু মনে করেননি উৎপল। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস। সফলতার চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছু হয় না। উৎপল সাফল্য পাননি। সুতরাং এই বাস্তবটুকু না মেনে তাঁর উপায় নেই। কিন্তু তিনি অসমর্থ নন—কোনও দিক থেকেই অসমর্থ নন।

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! ভাবলেন উৎপলেন্দু। যে-মেয়েটার ওপরে তাঁর এত রাগ এত জ্বালা, তাকেই তিনি স্বপ্নের ঘোরে নায়িকা বলে কামনা করেন! স্বপ্নের ভেতরে ঘটে যাওয়া ঊরুতাড়িত মহাযুদ্ধে তিনি দেবারতি মানিকে পরাস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন! ফ্রয়েড দিয়ে কি এই অদ্ভুত মানসিকতার কোনও ব্যাখ্যা করা যায়?

দেবারতির বিছানার ভারি চাদর ছুঁয়ে এইসব কথাই ভাবছিলেন উৎপল। রূপেন মজুমদার তাঁর পাশে চুপটি করে বসে। চোখেমুখে সামান্য অস্বস্তির ছাপ। রত্নাবলী সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বোধহয় কল্পনায় দেখছেন, দেবারতি ভুরুতে হালকা কাজল ছোঁয়াচ্ছে। আর ভাস্কর রাহা চুরুট হাতে খুব ধীরে পা ফেলে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার সামনে। জানলা তো নয়, মরণের দরজা!

এসিজি কখন যেন সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে। চোখ কার্পেটের নকশার দিকে। আর রঘুপতি যাদব কাগজে কী সব নোট করতে-করতে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল। সোজা চলে গেল ওয়ার্ডরোবের দিকে। দরজার পাল্লা খুলে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

অনেকগুলো থমথমে মুহূর্ত কেটে যাবার পর অশোকচন্দ্র গুপ্ত কথা বললেন, 'জানেন, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম দেবারতি মানি আত্মহত্যা করেছে—' বাঁ হাত চুলের ভেতরে চালিয়ে দিলেন। কয়েক গোছা চুল ধরে আলতো করে টান মারলেন কয়েকবার। তারপর : '...কারণ, এই ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, এইসব আধুনিক হোটেলের দরজা বাইরে থেকে অথবা ভেতর থেকে—দু-দিক থেকেই লক করা যায়, কিন্তু মিস মানির ক্ষেত্রে প্রবলেম হল, ওর দরজার চাবিটা আমরা পেয়েছি ওই টেবিলের ওপরে। তার অর্থ, মিস মানি নিজেই দরজা লক করেছিল ভেতর থেকে। আর তারপর ও...।'

এসিজির কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করল রঘুপতি যাদব। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা বন্ধ করে ও চট করে ঘুরে তাকিয়েছে এদিকে : '...তারপর মিস মানি লাফ দিয়েছেন ওই খিড়কি দিয়ে। সিধা গিয়ে পড়েছেন ওঁর মোটরের ছাদে।' রাহার দিকে আঙুল তুলে দেখাল যাদব : 'তারপর মোটর থেকে শান বাঁধানো টেরাসে। কোয়াইট আ মেসি জব। মাথাটা একেবারে চুরচুর হয়ে গেছে।'

একটু থেমে যাদব আবার বলল, 'লেকিন তাজ্জব কী বাত হল, দেবারতি মানির ঘরের ওই দরজা—' আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখিয়ে সে বলেছে, 'অন্দরসে লক করা ছিল। আর চাবিটা ছিল ওই টেবিলের ওপরে—' জানলার কাছাকাছি রাখা গোল টেবিলটাকে ডান হাতের তর্জনী ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছে রঘুপতি যাদব।

'কেন, তাজ্জব কী বাত কেন?' প্রশ্নটা করেছেন রূপেন মজুমদার, 'সুইসাইড যদি হয় তা হলে তো এরকমটাই হওয়ার কথা—' রূপেন মজুমদার এখনও বোধহয় এই ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারছিলেন না।

'এইরকম ভোলাটাইল মেমোরি নিয়ে আপনি ডিটেকটিভ ফিকশন লেখেন!' ব্যঙ্গের হাসি হাসল রঘুপতি যাদব : 'একটু আগেই তো নীচে স্যার আপনাদের বললেন, ইটস আ কেস অফ মার্ডার—প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল। সেইজন্যেই বলেছি তাজ্জব কী বাত।'

উৎপলেন্দু সেন মাথা ঝুঁকিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'প্রশান্তবাবু তো শুনলাম দরজা ভেঙে এ-ঘরে ঢুকেছেন। তারপর কেউ এসে চাবিটা টেবিলের ওপরে রেখে যায়নি তো?'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত উৎপলের কথার জবাব দিলেন, 'না, সেরকম কোনও সুযোগ ছিল না। এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত এই ঘরের দরজায় কড়া পাহারা ছিল। আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে, উৎপলেন্দুবাবু।'

উৎপলেন্দুর দিশেহারা অভিব্যক্তি দেখে ভাস্কর রাহা এই প্রথম কথা বললেন, 'অর্থাৎ, ইম্পসিবল প্রবলেম—জন ডিকসন কার।'

ভাস্কর রাহা মন্তব্যটি করেছিলেন নীচু গলায়। কিন্তু অশোকচন্দ্রের প্রখর কান সেটা শুনতে পেয়েছে। আর উৎপলেন্দু রাহার কাছাকাছি থাকায় তাঁরও শুনতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

পায়চারি থামিয়ে একটা সোফায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন এসিজি। পাকা চুলের গোছায় বাঁ হাতের আঙুল ডুবিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হাসলেন তিনি : 'চমৎকার বলেছেন, ভাস্করবাবু। জন ডিকসন কার। ডিকসন কার নিজের নামে অথবা কার্টার ডিকসন ছদ্মনামে সারাজীবন শুধু ''অসম্ভব রহস্য'' নিয়েই গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন। ব্যবহার করেছেন দুই গোয়েন্দা : ড. গিডিয়ন ফেল, আর স্যার হেনরি মেরিভেল।' একটু থামলেন অশোকচন্দ্র, সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন : '...সুতরাং ভাস্করবাবু, একটা জিনিস তো আপনি ভালোই জানেন...এই ইম্পসিবল প্রবলেমগুলোর সমাধান খুব সাদামাঠা হয়। আমার ধারণা, দেবারতি মানির বেলাতেও এই জেনারাল রুলের কোনও হেরফের হবে না। শুধু প্রবলেমটা সলভ করতে একটু সময় লাগবে, এই যা।'

উৎপলেন্দু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। বেশ বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, 'সেই কাল রাত থেকে এর-ওর মুখে শুনে আসছি দেবারতি খুন হয়েছে। আবার দু-একজন বলছেন সুইসাইড। আজ সকালে আপনারা বললেন ব্যাপারটা খুন—তার ডেফিনিট প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। অথচ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হয়েছে। দরজার চাবি পাওয়া গেছে ওই টেবিলে। এরপরেও যদি ব্যাপারটা সুইসাইড না হয়, তা হলে কোথায় সেই ডেফিনিট প্রমাণ? আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

কথা শেষ করার পরেও উৎপলেন্দুর মুখ সামান্য লাল। তা ছাড়া কথা বলার সময়ে বিরক্তি ছাড়াও কিছুটা রাগের ছোঁওয়া পাওয়া গিয়েছিল তাঁর ভঙ্গিতে।

উৎপলেন্দুর কথা শেষ হতেই শুরু হল নিস্তব্ধতা।

ভাস্কর রাহার চুরুট নিভে গিয়েছিল। সেটা তিনি ছাই ঝেড়ে পকেটে ঢোকালেন। এসিজি চুপচাপ তাঁর হাতের সিগারেটের অগ্নিবিন্দুর দিকে তাকিয়ে। রূপেন মজুমদার বেশ অপ্রস্তুত—কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আর রঘুপতি যাদব জরিপ নজরে উৎপলেন্দুকে দেখছে।

নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল সে-ই।

'ওয়ান্ডারফুল! ইনভেস্টিগেশনে হেল্প করার মতো এই প্রথম একটা ইমোশনাল রিঅ্যাকশান পাওয়া গেল।' তারপর অশোকচন্দ্রের দিকে ফিরে, 'স্যার, ইসকে বারে মে আপকা কেয়া রায় হ্যায়? এসবই তো আমরা চাই—ইমোশন্যাল রিঅ্যাকশন। কারণ এরকম জোশ থেকেই হয়তো মিস মানি খুন হয়ে গেছেন।'

এসিজি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল।

এবার ভাস্কর রাহা রিসিভার তুললেন।

রঘুপতি যাদব যথারীতি চটপটে পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাহা টেলিফোনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরাস্ত রঘুপতি 'ফোঁস' করে একটা শব্দ করল। ভাস্কর রাহা আড়চোখে ইন্সপেক্টরকে একবার দেখলেন, তারপর টেলিফোনে কথা বললেন। ঘরের সিলিং-এ আধুনিক ডিজাইনের পাখা ঘুরছিল। তার বাতাসে ভাস্কর রাহার চওড়া কপালে শনের মতো চুল উড়ছিল।

ও-প্রান্ত থেকে প্রশান্ত রায় কথা বলছিলেন, 'ডাইনিং হলে আসার দরকার নেই। ছ'জনের ব্রেকফাস্ট পাঠাচ্ছি। তিনশো আট নম্বরে। ওকে?'

'পাঠিয়ে দিন,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহা। ভাবলেন, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারসাহেব এখনও টেলিগ্রাফিক ল্যাঙ্গুয়েজের হুক থেকে বেরোতে পারেননি। পুলিশি ধমক বলে কথা!

ব্রেকফাস্টের খবরটা সকলে শুনলেন।

উৎপলেন্দুর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। অকালমৃত এক তরুণীর ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট! কিন্তু রাহা তা ভাবেননি। দেবারতির ঘরে ব্রেকফাস্ট খেলে ও ভীষণ খুশি হত। প্রাণ ভরে গল্প করত 'মুকুটহীন সম্রাট'-এর সঙ্গে। গল্পে গল্পে সময় কেটে যেত।

এখন তফাতের মধ্যে শুধু ও নেই।

উৎপলেন্দু সেনের প্রশ্নটা তখনও ঘরের বাতাসে ভাসছিল। তাঁর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে অশোকচন্দ্র রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, আর চেপে রেখে লাভ নেই। মিস মানির লেখাটা ওঁদের পড়ে শোনাও—।'

'দেবারতি মানির লেখা!' রত্নাবলী রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন : 'কী লেখা? সুইসাইড নোট?'

'সুইসাইড নোটই বটে—' তেতো হাসলেন অশোকচন্দ্র। তারপর রঘুপতিকে ইশারা করলেন কাজ শুরু করতে।

রঘুপতি যাদব তার হাতের কাগজপত্র একটা সোফার ওপরে নামিয়ে রেখেছিল। ব্যস্ত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড সেগুলো হাঁটকে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করে নিল। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। বলল, 'এই কাগজটা আমরা পেয়েছি ওই গোল টেবিলের ওপরে—' আঙুল তুলে জানলার কাছে রাখা টেবিলটা দেখাল রঘুপতি : '...চাবিটা যেখানে ছিল, সেইখানে। ওই টেবিলে বহত সারে কাগজাত ছিল। ওই সব কাগজাতের ভেতর থেকে এই শিটটা আমরা পেয়েছি। এতে মিস মানির হাফ ফিনিশড একটা লেখা রয়েছে। সেটাই আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।'

সিগারেট আর চুরুটের ভারি গন্ধে হালকা পারফিউমের গন্ধ কখন যেন ঢাকা পড়ে গেছে। রূপেন মজুমদার, উৎপলেন্দু সেন, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় আর ভাস্কর রাহা—এই চারজন প্রবীণ লেখক একরাশ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন রঘুপতি যাদবের দিকে।

রঘুপতি যাদব পড়তে শুরু করল।

'বাংলা ডিটেকটিভ ফিকশন কখনও এরকম সাকসেসফুল জায়গায় আসবে সেটা সাত-আট বছর আগেও কেউ ভাবেনি। পনেরো-বিশজন লেখকের অক্লান্ত চেষ্টার পুরস্কার বলেই এটাকে মানতে হবে। অবশ্য তার সঙ্গে সম্পাদক আর প্রকাশকের ভূমিকাও রয়েছে। ওঁরা প্যাট্রনাইজ না করলে লেখকরা কী করে সামনে আসতেন!

'এইসব চেষ্টার পাশাপাশি চলেছে রেডিও-টিভির পাবলিসিটি। তার ওপর যোগ হয়েছে এই অ্যানুয়াল কনফারেন্স। বলতে গেলে বাংলা ক্রাইম ফিকশনের এখন আর কোনও অভাব নেই। শিক্ষিত পাঠকও এটাকে

এখন অ্যাকসেপ্ট করেছে। এটা আমার দারুণ তৃপ্তির জায়গা! ব্লিসফুল স্যাটিসফ্যাকশন।

'রহস্য-সাহিত্য নিয়ে আন্দোলনের ব্যাপারটাকে আমি বরাবর শ্রেণি-সংগ্রাম হিসেবে দেখেছি। মেইনস্ট্রিম লিটারেচারের সঙ্গে একই সারিতে কখনও একে জায়গা দেওয়া হয়নি। কুলিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই সারিতে কি হরিজনকে বসানো যায়! জন্মসূত্র ধরেই মানুষকে যেমন জাতপাতের বিভেদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, এটার বেলাতেও যেন ঠিক তাই : জন্মসূত্রেই রহস্য-সাহিত্য তৃতীয় শ্রেণির সাহিত্য। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে নাক উঁচু সমালোচকদের কোনও যুক্তির দরকার হয় না। এ তো সবাই জানে, যুক্তি দেখাতে গেলে শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন। সুতরাং অশিক্ষিত সমালোচকের কাছে যুক্তির চেয়ে মতামতই হল বড় হাতিয়ার।

'এরকম একটা অবস্থা থেকে যে-করে হোক সেই 'হরিজন' তার জায়গা করে নিতে পেরেছে 'কুলীন ব্রাহ্মণ'-এর পাশে। নিশ্চয়ই কাজটা খুব সহজে হয়নি। যারা জানে তারা জানে।

'এরকম একটা সিচুয়েশনে একটা খবর আমাকে চমকে দিল। একজন বিশ্বাসঘাতক লেখক হাজির রয়েছে এই কনফারেন্সে। খবরটা আমি যার কাছ থেকে শুনেছি তা মোটেই মিথ্যে হওয়ার নয়। ইটস ট্রুথ—বিটার ট্রুথ। আমি...।'

উর্দি পরা দুজন বেয়ারা ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে এসে ঢুকতেই থেমে গেল রঘুপতি। আয়তাকার ব্রেকফাস্ট টেবিলে খাবার-দাবারগুলো নামিয়ে নীচু গলায় 'ম্যানেজারসাব পাঠিয়ে দিলেন।' বলে তারা চলে গেল।

চোখের সামনে খাবার দেখে খিদেটা টের পেলেন সকলে। ভাস্কর রাহা রত্নাবলীর দিকে একপলক তাকালেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই 'বাংলা সাহিত্যের আগাথা ক্রিস্টি' প্রথাগত বাঙালি গৃহিণী হয়ে গেলেন। খাবারের প্লেটগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে দিতে লাগলেন প্রত্যেকের হাতে।

রঘুপতি যাদব আবার পড়তে শুরু করল,

> *'...আমি যে তাঁকে চিনে ফেলেছি সেটা প্রথমটায় বুঝতে দিইনি। কিন্তু তাঁর ইন্টারভিউ নেবার সময় তিনি বোধহয় আমার ঘেন্না রাগ এগুলো সাসপেক্ট করতে পেরেছেন। তবে আই ডোন্ট কেয়ার। আজ রাতেই আমি সেই লেখককে সরাসরি সব জানিয়ে দেব। জানিয়ে দেব, কনফারেন্সের শেষ দিনে ডায়াসে উঠে আমি তাঁর সবকিছু ফাঁস করে দেব। এরকম একটা শয়তানির পানিশমেন্ট হওয়া দরকার। তা ছাড়া এতগুলো বছর ধরে...।'*

থামল রঘুপতি। বলল, 'লেখাটা এখানেই শেষ।' তারপর কাগজটা আবার রেখে দিল অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে।

রত্নাবলী ওর হাতে ব্রেকফাস্টের প্লেট তুলে দিলেন। তারপর নিজের প্লেটটা নিয়ে এসিজির কাছাকাছি একটা সোফায় বসলেন।

অশোকচন্দ্র হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল চিন্তায় ডুবে আছেন।

বাকি সবাই চুপচাপ খাচ্ছিলেন। বোধহয় ভাবছিলেন দেবারতির শেষ লেখাটার কথা। কে সেই বিশ্বাসঘাতক লেখক? কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে?

'লেখাটা আর একটু থাকলে হয়তো জানা যেত দেবারতি মানি কোন লেখক সম্পর্কে অভিযোগ করছিল।' খেতে-খেতেই হঠাৎ বললেন রূপেন মজুমদার।

এই মন্তব্যের জবাব দিল রঘুপতি : 'লেখাটার শেষের দিকে দু-লাইন মতো হিজিবিজি করে কেটে দেওয়া। সেখানে কী লেখা ছিল কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা কালি কমপেয়ার করে দেখেছি—কাটাকুটিটা মিস মানির পেন দিয়েই করা হয়েছে। হো সকতা হ্যায় কে মিস মানি লাইন দুটো কেটে দিয়েছেন, নহী তো...'

'তার মার্ডারার—' রঘুপতির অসম্পূর্ণ কথা শেষ করলেন রত্নাবলী।

'অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট, মিসেস মুখার্জি।' এসিজি বললেন। তারপর ঘুরে তাকালেন উৎপলেন্দু সেনের দিকে : 'মিস্টার সেন, এটাই আমাদের ডেফিনিট প্রমাণ। আশা করি আপনার আর কোন সংশয় নেই। তবে এ ছাড়াও বাড়তি কয়েকটা ইনডায়রেক্ট প্রুফ আমাদের হাতে আছে। যেমন, ওই টেবিলে একটা বই আধখোলা অবস্থায় পড়ে ছিল—'

'কী বই?' প্রশ্ন করলেন রূপেন মজুমদার।

ভাস্কর রাহাও কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলেন অশোকচন্দ্রের দিকে। খুন হওয়ার আগে কী বই পড়ছিল মেয়েটা?

অশোকচন্দ্রের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তৃপ্তির ছোট্ট শব্দ তুলে তিনি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের খালি প্লেটটা ব্রেকফাস্ট টেবিলের এক কোণে রেখে মিসেস মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকালেন। মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে অনুরোধের সুরে বললেন, 'মিসেস মুখার্জি, যদি কাইন্ডলি আমাদের চায়ের ব্যবস্থাটা করেন—।'

টেবিলে টি-পট, মিল্ক পট, শুগার কিউব এবং সুদৃশ্য পেয়ালা-পিরিচের সেট রাখাই ছিল। সুন্দর করে হেসে আরও একবার গৃহিণী হয়ে গেলেন রত্নাবলী। তাঁকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, তাঁর বয়েস আর কোনওদিন পঁয়ষট্টিতে পা দেবে না। তিনি সপ্রতিভভাবে চলে এলেন ব্রেকফাস্ট টেবিলের কাছে। চায়ের আয়োজন শুরু করলেন।

'মিস্টার গুপ্ত, কী বই পড়ছিল দেবারতি?' ভাস্কর রাহা প্রশ্ন করলেন এবার।

অশোকচন্দ্র মাথার চুলে হাত চালালেন। আপন খেয়ালেই মাথা নাড়লেন এপাশ ওপাশ। তারপর বললেন, 'খুব ইন্টারেস্টিং বই। ''দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড''—আগাথা ক্রিস্টির লেখা।' একটু থেমে মাথাটা বাঁ দিকে সামান্য হেলিয়ে এসিজি আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন : 'বইটা ইন্টারেস্টিং বললাম কেন বলুন তো?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন উৎপলেন্দু সেন, ' ''ড. ওয়াটসন'' অ্যাজ মার্ডারার—এটাই বইটার বিশেষত্ব। যে-চরিত্র ''আমি'' হয়ে গল্পটা বলছে, সে-ই খুনি। আর মজা হল, গল্প বলার সময় খুন করার ব্যাপারটাও সে কায়দা করে পাঠককে বলে গেছে।' একটু থেমে উৎপল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'আরও একটা কারণে বইটা উল্লেখযোগ্য—।'

'কেন?' জিগ্যেস করেছে রঘুপতি যাদব।

উৎপল উত্তর দিলেন অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে, 'এই বইটা থেকে গল্প মেরে বিখ্যাত লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত ''ঘুম নেই'' নামে একটা ''ওরিজিন্যাল'' উপন্যাস লিখে গেছেন।' খুকখুক করে হেসে কথা শেষ করলেন উৎপলেন্দু সেন।

রত্নাবলী একে-একে সকলের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছেন, নিজেও নিয়েছেন। তারপর বসেছেন গিয়ে দেবারতির বিছানায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এসিজি বললেন, 'উৎপলেন্দুবাবু দেখছি নির্ভুল খবর রাখেন। আর আপনি বলেছেনও ঠিক : এই বইটা আগাথা ক্রিস্টির অন্য সব বইয়ের চেয়ে আলাদা। সেইজন্যেই ব্যাপারটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়েছে।'

'এবারে আসা যাক দেবারতি মানির লেখাটার প্রশ্নে—' শব্দ করে কাপে চুমুক দিলেন অশোকচন্দ্র : 'লেখাটা থেকে আমরা কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন পাচ্ছি। এক : দেবারতি মানির চোখে আপনাদের দশজনের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক—বেইমান। সুতরাং, শুনতে খারাপ লাগলেও এই কনফারেন্সে ইনভাইটেড দশজন লেখকের মধ্যে কোনও একজন দেবারতিকে—খুন করেছেন...।'

রূপেন মজুমদার একটু-একটু করে ভয় পাচ্ছিলেন। ভয় পাচ্ছিলেন ভাস্কর রাহাও। ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে, ওঁদের উলঙ্গ সত্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রকাশক, সম্পাদক আর সাংবাদিকরা সন্দেহের আওতার বাইরে চলে গেলেন। বাকি রইলেন দশজন লেখক। শুধু দশজন লেখক।

'ভাস্করবাবু, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেউ এই জঘন্য কাজ করতে পারে না।' রূপেন মজুমদার নীচু গলায় নিজের অবিশ্বাসের কথা ভাঙলেন রাহার কাছে।

ভাস্কর রাহা কিছু বলে ওঠার আগেই জ্বলে উঠল রঘুপতি যাদব। বেপরোয়া সুরে সে বলে উঠল, 'মিস্টার রাইটার, ডোন্ট ট্রাই টু প্লে সন্ত যুধিষ্ঠির। এখানে সন্ত কেউ নেই—সারে কে সারে পাপী হ্যায়। কিঁউ, গুপ্তাসাব?' শেষের কথাটা এসিজিকে উদ্দেশ্য করে, তাঁর সমর্থনের আশায়।

রত্নাবলী একটু সিঁটিয়ে গেলেন। উৎপলেন্দুর গলাটা কেমন শুকিয়ে গেছে। একটু ভিজিয়ে নিতে পারলে ভালো হত।

এসিজি এবারে আর উত্তেজিত রঘুপতিকে সামাল দেবার চেষ্টা করলেন না। বরং রঘুপতির কথা যেন শুনতেই পাননি এমন ভান করে বলে চললেন, 'ফ্যাক্ট নাম্বার টু : যে-ই হোক একজন দেবারতি মানিকে সেই খবরটা দিয়েছে। তিন : দেবারতি সেই বেইমান লেখকটিকে চিনত। চার—দেবারতি তার ইন্টারভিউ নিয়েছে। ঠিক কবে কখন ইন্টারভিউটা ও নিয়েছিল সেটা লেখা না থাকলেও অনুমানে মনে হয়, গত দু-দিনের মধ্যে এই হোটেলেই ও ইন্টারভিউটা নিয়েছে। কারণ, ওর কাগজপত্র ঘেঁটে আমরা কিছু শর্টহ্যান্ড নোটস পেয়েছি—সেগুলো আমরা ডিসাইফার করতে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি।'

একটু দম নিলেন এসিজি। চায়ের কাপ খালি হয়ে গিয়েছিল। সেটা টেবিলে আলতো করে নামিয়ে রেখে উদাস চোখে তাকালেন জানলার বাইরে। সেখানে দূরের ঘরবাড়ি, টিভি অ্যান্টেনা, পাম গাছের পাতা, নীল আকাশ আর চড়া রোদ্দুর। জানলার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। শান্ত স্বরে শেষ কয়েকটা কথা বললেন, 'লাস্ট এবং পাঁচ নম্বর ইনফরমেশন হল, কাল রাতে হয়তো সেই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে দেবারতির একটা মোকাবিলা হয়েছিল। হয়তো এই ঘরেই। তারপর...তারপর ''নটে গাছটি মুড়োল''।'

ঘরের সবাই চুপ। শুধু কারও কারও চায়ের কাপে শেষ চুমুকের শব্দ।

কিছুক্ষণ পর অশোকচন্দ্র পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সিগারেট এবং চুরুট ধরালেন উৎপলেন্দু এবং ভাস্কর। ওঁদের দুজনের কপালেই চিন্তার ছাপ। নাকি দুশ্চিন্তার ছাপ?

কুলকুল করে ধোঁয়া ছাড়লেন অশোকচন্দ্র। কাশির দমক এল হঠাৎ। কাশলেন কয়েকবার। ঊর্মিলা সামনে থাকলে নির্ঘাত হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিত। ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। ওর মা চলে গেছে প্রায় ন'বছর। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে ঊর্মিলা সেই শূন্যস্থানটা বুঝতে দেয়নি। অথচ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট না থাকলে কি থিঙ্কিং মেশিন কখনও কাজ করতে পারে!

অনেকক্ষণ পর অশোকচন্দ্র গুপ্ত কথা বললেন আবার, 'আমাদের যা বলার মোটামুটি বললাম। এবার আপনাদের পালা। ভাস্করবাবু, আপনাকে দিয়ে কি আমরা এখনই শুরু করতে পারি?'

ঘরের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় একেবারে ডুবে ছিলেন ভাস্কর রাহা। এসিজির কথায় চমকে উঠে ফিরে তাকালেন তাঁর দিকে। দুচোখে প্রশ্ন।

এসিজি আবার কথাটা বললেন।

অদ্ভুত হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ভাস্কর রাহা। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'বলুন, কী জানতে চান।'

ঘটনার সবচেয়ে নোংরা অস্বস্তিকর অংশ শুরু হল তাহলে এইবার। ভাবলেন রত্নাবলী। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত কি আমাদের সামনেই ভাস্করবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? আলাদাভাবে হলে কি ব্যাপারটা ভালো হত না!

অশোকচন্দ্র একটা সোফা টেনে নিলেন বিছানার দিকে, ভাস্কর রাহার কাছাকাছি। মেঝেতে কার্পেট থাকায় কোনওরকম শব্দ হল না। সোফায় আরাম করে বসে পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেটে টান দিলেন। চোখ থেকে সরু ফ্রেমের চশমাটা খুলে শূন্যে উঁচু করে ধরে অদৃশ্য কিছু একটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর চশমাটা আবার ঠিকঠাক করে বসালেন নাকের ওপরে। বারকয়েক নাক কুঁচকে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'ভাস্করবাবু, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আবেগ আছে। একটু আগে উৎপলেন্দুবাবু সে-প্রমাণ দিয়েছেন। তা সেই আবেগগুলো হল ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের মতো। দুটো

মানুষের মধ্যে যখন সম্পর্ক তৈরি হয় তখন তাদের আচরণ কীরকম হবে সেটা নির্ভর করে তাদের পোটেনশিয়াল বা আবেগের ওপরে। অর্থাৎ, কোনও কন্ডাক্টরের দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের মান অনুযায়ী যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়—অনেকটা সেইরকম আর কী! আপনারা, লেখকরা, সাধারণত আবেগপ্রবণ মানুষ। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তীব্র আবেগ—হাই পোটেনশিয়াল। এই তীব্র আবেগ থেকেই হয়তো ঘটে গেছে দেবারতি মানির খুনের ঘটনা। ঘটনার পর খুনি হয়তো অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে, অনুতাপে সে হয়তো মর্মাহত, কিন্তু...' একটু থামলেন এসিজি। তারপর : 'কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। রঘুপতি যাদব অনেক আশা নিয়ে আমাকে ডেকে এনেছে।'

ভাস্কর রাহা নীরবে চুরুটে টান দিচ্ছিলেন। এসিজি তাঁকে এখনও কোনও প্রশ্ন করেননি। গল্পে-উপন্যাসে আর্মচেয়ার ডিটেকটিভরা প্রচুর প্রশ্ন করে থাকেন, অনেক জবানবন্দী আদায় করেন গোপনে। কিন্তু এই অহঙ্কারী পলিতকেশ বৃদ্ধ কোন পথে হাঁটতে চাইছেন?

'ভাস্করবাবু, আপনারা লেখক মানুষ—' আবার কথা শুরু করেছেন অশোকচন্দ্র, 'খুন-খারাপি আপনাদের রোজকার অভ্যাসের ব্যাপার—মানে, কাগজে-কলমে। সুতরাং আপনারাই ভালো বুঝবেন, কোনও খুনের ঘটনায় কোন-কোন তথ্য তদন্তের পক্ষে জরুরি। আমি সেই তথ্যগুলোই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি। পরে যদি নিতান্ত দরকার হয়, তখন দু-চারটে প্রশ্ন-টশ্ন করা যাবে।'

ভাস্কর রাহা নিজেকে গুছিয়ে নিলেন মনে-মনে। চুরুটে কয়েকবার ঘনঘন টান দিলেন। তারপর বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত, আপনার স্টাইলেই কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন আপনাকে দিই। কনফারেন্সের প্রথম দিন আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেবারতি বলে, ও একটা টপ সিক্রেট জানতে পেরেছে। সেটা জানাজানি হলে কনফারেন্স মাটি হয়ে যাবে, খবরের কাগজে ফ্রন্টপেজ নিউজ হবে। তবে দেবারতি তখন মদ খেয়েছিল, একটু টিপসি অবস্থায় ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, কনফারেন্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও যেন কিছু না করে। যাই হোক, ও আমার কথায় রাজি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছে, ওর সেই সিক্রেট ফাঁস হলে বাংলা ক্রাইম ফিকশনের মারাত্মক ক্ষতি হবে, একটা বিরাট সেটব্যাক হবে। ষাটের দশক থেকে এই সাহিত্য নিয়ে কম লড়াই হয়নি। দেবারতি সেদিনের মেয়ে—ও সে-সব লড়াইয়ের কী জানে! সুতরাং, আমি ভেবেছিলাম, পরে ওকে বুঝিয়ে নিরস্ত করব। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম কোথায়!'

'ওর এই সিক্রেট জেনে ফেলার খবরটা আপনি ছাড়া আর কে কে জানতেন? এসিজি প্রশ্ন করলেন।

ভাস্কর রাহা মাথা ঝুঁকিয়ে বসে ছিলেন, মুখ তুলে বললেন, 'বোধহয় সবাই জেনে ফেলেছিল। কারণ, ও খুব একটা রাখো-ঢাকো মেয়ে ছিল না। তা ছাড়া ওর ভয়ডরও কম ছিল। যেমন, কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে—মানে, কাল—ও একরকম হাটের মাঝে ওর সেই সিক্রেট নিয়ে প্রেমময় চৌধুরিকে একটু হিন্টস দিয়েছিল। ভারি অদ্ভুত হিন্টস—।'

কৌতূহল ফুটে উঠল অশোকচন্দ্রের উজ্জ্বল চোখে : 'কী হিন্টস?'

'শুধু দুজন লেখকের নাম—পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস।'

এসিজি রঘুপতি যাদবের দিকে তাকালেন। রঘুপতি প্যাড আর পেন নিয়ে নোট নিতে ব্যস্ত ছিল। মুখ তুলে এসিজির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাথা হেলিয়ে জানাল, সে লিখে নিয়েছে।

'এই হিন্টসের মানে?'

'কী জানি! বলতে পারব না। দেবারতি কখন যে সিরিয়াসলি কথা বলত আর কখন ঠাট্টা করত, সেটা বোঝা মুশকিল ছিল।'

'আচ্ছা, এই কনফারেন্সের শুরুর দিন থেকে দেবারতি মানিকে যেভাবে দেখেছেন, যা যা ও করেছে, বলেছে—সেগুলো একটু গুছিয়ে বলুন তো।'

চুরুট নিভে গিয়েছিল। ছাই ঝেড়ে ফেলে সেটাকে পকেটে রেখে দিলেন রাহা। ছোট্ট করে গলাখাঁকারি দিয়ে নীচু গলায় অত্যন্ত ধীরে সব বলে গেলেন। অশরীরী দেবারতি মানি আবার চলেফিরে বেড়াতে লাগল

ঘরের মধ্যে—অন্তত ভাস্কর রাহার চোখের সামনে।

ভাস্কর রাহার কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়েছেন এসিজি। ফুরিয়ে আসা সিগারেটটা গুঁজে দিয়েছেন টেবিলের অ্যাশট্রেতে। তারপর মাথা নীচু করে একমনে শুনে গেছেন ভাস্করের কথা।

রাহার কথা শেষ হল একসময়। রত্নাবলী চোখ ঢেকে বসে রইলেন। রূপেন মজুমদার দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলেন। আর উৎপলেন্দু কেমন এক অস্বস্তি অনুভব করছিলেন।

'মিস মানি আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন?'

প্রশ্নটা করেছে রঘুপতি যাদব। দেবারতির শেষ লেখায় ইন্টারভিউর ব্যাপারে একটা ইঙ্গিত ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, রঘুপতির সন্দেহভাজনের তালিকায় প্রথম স্থানটি এখনও পর্যন্ত কে দখল করে রয়েছে।

রাহা মুখ তুলে রঘুপতিকে দেখলেন। দেখে যতটা আই কিউ.র মালিক বলে মনে হয় আসলে তার চেয়ে বেশি।

শান্ত স্বরে ভাস্কর রাহা বললেন, 'হ্যাঁ, কাল লাঞ্চের সময় ও আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল। তখন আমরা একেবারেই মামুলি কথাবার্তা বলেছি। কারণ, দেবারতি সময়-সুযোগ পেলেই আমার ইন্টারভিউ নিত।' একটু থেমে আবার মুখ খুললেন : 'তবে দেবারতি আমার একার ইনটারভিউ নেয়নি। ও আমাকে বলেছিল, আমাদের দশজন লেখক-লেখিকার ইন্টারভিউ ও নেবে। তারপর সবগুলো মিলিয়ে একটা স্টোরি করবে ওর কাগজে—।'

'সহযোগিতা করার জন্যে ধন্যবাদ, ভাস্করবাবু,' এসিজি বললেন, 'তবে এবার আপনাকে লাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করব। আপনারা গোয়েন্দা কাহিনির লেখক—সুতরাং, বলতে গেলে আপনারা নিজেরাই এক-একজন গোয়েন্দা। যেমন, আপনার গোয়েন্দা সুরজিৎ সেন। দেবারতি মানিকে কেমন করে খুন করা হয়েছে সেটা আমি সুরজিৎ সেনের কাছে জানতে চাই। আশা করি আপনি এ-আর্জিটুকু মঞ্জুর করবেন।'

অশোকচন্দ্র গুপ্তের কথা বলার ঢঙে কৌতুক ছিল বটে, কিন্তু ঠাট্টা অথবা ব্যঙ্গ ছিল না।

সুতরাং রাহার চওড়া কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে কয়েক মিনিট সময় নিলেন। সচেতনভাবেই তিনি ইয়ান ফ্লেমিং-এর জেমস বন্ড আর ড্যাশিয়েল হ্যামেটের গোয়েন্দা স্যাম স্পেডের আদলে সৃষ্টি করেছেন সুরজিৎ সেনকে। অধ্যাপক অশোকচন্দ্র গুপ্ত যে সুরজিৎ সেনকে মনে রেখেছেন সেটা লেখকের পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়। সামান্য হেসে ক্রাইম কাহিনির অসামান্য লেখক থেমে-থেমে পেশ করলেন সুরজিৎ সেনের সমাধান।

'সুরজিতের মনে প্রথম যে-প্রশ্নটা জাগত সেটা হল : এ-হোটেলের সব ঘরের লক একই চাবি দিয়ে খোলা যায় না তো! কারণ—।'

'সরি, জনাব,' রাহাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠেছে ইন্সপেক্টর যাদব, 'এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারের কাছ থেকে আমরা ইনফরমেশন নিয়েছি। নো মাস্টার কি। আপনার কেতাবি জাসুসকে অওর একবার কৌশিশ করতে হবে, মিস্টার রাহা।'

রাহা রঘুপতি যাদবের দিকে একবার তাকিয়েছেন, তারপর ঠোঁটের এক চিলতে হাসি বজায় রেখেই বলেছেন, 'তা হলে সুরজিতের প্রথম অনুমান ভুল হল। দ্বিতীয় চেষ্টা হিসেবে বলা যেতে পারে, খুনি কাজ সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে শক্ত কোনও তার বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে তিনশো আট নম্বরের দরজা লক করে দেয়।'

মাথা নাড়লেন এসিজি : 'সরি, ভাস্করবাবু। কাল রাতে আমি আর রঘুপতি হাতেকলমে সে-চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। তা ছাড়া আতসকাচ দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমরা দেবারতি মানির দরজার লকের গায়ে সন্দেহজনক কোনও আঁচড়ের দাগ দেখতে পাইনি।'

ভাস্কর রাহা একটু অপ্রস্তুত হলেন। তাঁর গালে রক্তের উচ্ছ্বাসের ছোঁওয়া লাগল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'ধরা যাক, দেবারতিকে খুন করার পর খুনি দরজার চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এল

বাইরে। তারপর দরজা লক করে চাবিটা...বাইরের টেরাস থেকে ছুড়ে দিয়েছিল দেবারতির ঘরের জানলা দিয়ে। তখনই চাবিটা গিয়ে পড়ে জানলার কাছে রাখা টেবিলের ওপরে।'

কিন্তু কথা শেষ করেই আপনমনে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন ভাস্কর রাহা। বললেন, 'নাঃ, এই সলিউশনটা বড্ড কষ্টকল্পিত...'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, ' রত্নাবলী বলে উঠলেন তড়িঘড়ি করে, 'নীচের টেরাস থেকে পাঁচতলার ঘরের জানলা দিয়ে চাবি ছুড়ে দেওয়াটা হয়তো অসম্ভব নয়, তবে অবাস্তব। তা ছাড়া কেউ দেখে ফেলার ভয়ও রয়েছে। বিশেষ করে মেয়েটা নীচে পড়ার সময় যখন অমন সাঙ্ঘাতিক একটা শব্দ হয়েছে।'

'কারেক্ট অবজারভেশন, মিসেস মুখার্জি,' বললেন অশোকচন্দ্র, 'সুতরাং সুরজিৎ সেন হার মানলেন।' হাসলেন তিনি : 'তবুও সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, ভাস্করবাবু।'

একমাত্র কাতিলই জানে কীভাবে সে মেয়েটাকে কোতল করেছে। ভাবল রঘুপতি। আর জানলেও স্যারের কথায় সে থোড়াই অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা বলবে! বরং উলটোপালটা আজগুবি কোনও থিয়োরি ঝটপট বাতলে দেবে।

সাত

সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটা নতুন সিগারেট ধরালেন এসিজি। এভাবেই পুরোনোরা পুড়ে ছাই হয়—নতুন আসে তার শূন্যস্থান পূরণ করতে। দেবারতির জায়গাও কেউ একজন দখল করে নেবে। কিন্তু ওর মা? ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এসিজি সংক্ষেপে যতটুকু জেনেছেন, তাতে দুঃখ হয়। ওঁর লড়াই কখনও বিশ্রাম পেল না। স্বামী আর একমাত্র মেয়ের শ্মশানে ওঁকে শ্মশানবন্ধু হতে হল। আর বেঁচে থাকার জন্য এখনও ওঁকে নীল আলোয় শরীর দুলিয়ে গান গেয়ে সকলের মনোরঞ্জন করতে হবে।

ঘরের প্রত্যেকেই অশোকচন্দ্রের কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কয়েক মিনিট একমনে সিগারেটে টান দিয়ে তিনি ইশারায় রঘুপতি যাদবকে কাছে ডাকলেন। যাদব তার হাতের কাগজপত্র একটা সোফায় নামিয়ে রেখে পেন পকেটে গুঁজে এগিয়ে এল এসিজির কাছে।

'তুমি লালবাজারে ফোন করে দেবারতি মানির পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি রেডি করার জন্যে একটু তাগাদা দাও। আজ রাতের মধ্যেই পেলে ভালো হয়। বুঝতেই পারছ, ''সুপ্রভাত'' পত্রিকা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আর শোনো, লাঞ্চের পর আমরা দশজন রাইটারের দশটা রুম একটু ঘুরেফিরে দেখব—।'

'আমাদের রুম সার্চ করবেন?' রূপেন মজুমদার আহত স্বরে জিগ্যেস করলেন।

অশোকচন্দ্র তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এটাকে ঠিক সার্চ বলা যায় না। কারণ, কী খুঁজতে হবে সেটাই আমার জানা নেই।'

রঘুপতি যাদব ঘরের টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে রিসেপশনে লালবাজারের লাইন চাইল।

রত্নাবলী অশোকচন্দ্রকে দেখছিলেন। বয়েসে তাঁর চেয়ে হয়তো দু-চার বছরের ছোটই হবেন, কিন্তু কী অদ্ভুত পরিশ্রম করতে পারেন!

এছাড়া আরও একটা ব্যাপার তাঁকে অবাক করছিল। এরই মধ্যে কতরকম তথ্য জোগাড় করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। সব তথ্য খতিয়ে দেখে একটা তত্ত্বে সেগুলোকে খাপ খাওয়াতে হবে। তবেই মিলবে অঙ্কের উত্তর। তখন উনি নিষ্ঠুর তর্জনী তুলে ধরবেন দশজনের মধ্যে একজনের দিকে। অশোকচন্দ্রকে দেখে রত্নাবলী কেমন এক ভরসা পাচ্ছিলেন। উনি নিশ্চয়ই পারবেন বেচারি মেয়েটার খুনিকে ধরতে। কিন্তু করঞ্জাক্ষ রুদ্র হলে কি পারত?

ভাস্কর রাহা উসখুস করছিলেন। হঠাৎই যেন ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হত।

এসিজি বোধহয় ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। ভাস্কর রাহার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি ইচ্ছে হলে এখন যেতে পারেন, ভাস্করবাবু। পরে দরকার হলে আমি দুশো আট নম্বর ঘরে যাব। আপনি অনেক তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।'

রত্নাবলী এইবার জিগ্যেস না করে পারলেন না : 'কিন্তু এইসব তথ্য আপনি মাথায় রাখেন কী করে?'

রত্নাবলীর দিকে তাকিয়ে মোলায়েম করে হাসলেন এসিজি : 'মিসেস মুখার্জি, এ-ব্যাপারে আমার পদ্ধতি হুবহু শার্লক হোমসের মতো। অন্তত সেভাবে চেষ্টা করি। যেসব তথ্য আমার কোনওদিনও কাজে লাগবে না, সেগুলো আমি মন থেকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করি। যেমন, আলু-পেঁয়াজের দাম, কলকাতার জনসংখ্যা, কিংবা চাঁদের মাটিতে প্রথম কোন মহাকাশচারী পা দিয়েছিলেন। এর কারণ, আমাদের ব্রেন হল একটা ছোট্ট ঘরের মতো। সেটা আমরা পছন্দসই ফার্নিচার—মানে, তথ্য—দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারি। সুতরাং সব তথ্যই যদি সেখানে গাদাগাদি করে ঢোকাই তাহলে দরকারি তথ্যটা সেই ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে। তখন সেটা কাজের সময় খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। সেইজন্যে আমি খুব হিসেব করে সেই ঘরে নতুন ফার্নিচার ঢোকাই। কারণ, ঘরের দেওয়ালগুলো তো আর রবারের নয় যে চাইলেই জায়গা বেড়ে যাবে! বরং একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন—ব্রেনে তথ্য সঞ্চয় করতে-করতে এমন একটা সময় আসবে, যখন নতুন কোনও তথ্য ঢোকানো মানেই হচ্ছে পুরোনো কোনও তথ্যকে বিসর্জন দেওয়া। অর্থাৎ, নতুন তথ্যটা মনে থাকবে বটে, কিন্তু পুরোনোটা কমপ্লিটলি ভুলে যাবেন।'

'দারুণ বলেছেন, মিস্টার গুপ্ত—'প্রশংসার সুরে বললেন রূপেন মজুমদার।

বিনয় করে হাসলেন অশোকচন্দ্র : 'আগেই তো বলেছি, এটা আমার কথা নয়, গোয়েন্দা-সম্রাট শার্লক হোমসের কথা। ''আ স্টাডি ইন স্কারলেট''-এ আছে। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই পড়েছেন—হয়তো ভুলে গেছেন।'

'না, না, আমি পড়িনি।' রূপেন মজুমদার তাড়াতাড়ি তাঁর মৌলিকত্ব জাহির করলেন।

অশোকচন্দ্র বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি তাহলে উঠছি,' বলে উঠে দাঁড়ালেন ভাস্কর।

এসিজি আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

উৎপলেন্দু সেনও বোধহয় উঠতে যাচ্ছিলেন, এসিজি তাঁকে বাধা দিলেন : 'আপনি বসুন, মিস্টার সেন। আপনার সঙ্গে তো এখনও সেরকম কথা বলাই হয়নি।' উৎপলেন্দু বসে পড়লেন। তাঁর চোখেমুখে অস্বস্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। খানিকটা অসহায়ভাবে তিনি ভাস্কর রাহার চলে যাওয়া দেখলেন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি উৎপলেন্দু সেনকে প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'দেবারতি মানিকে কীভাবে খুন করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?'

'বোধহয় কেউ ধাক্কা-টাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। 'দায়সারা উত্তর দিলেন উৎপল। তারপর আবার বললেন, 'আসলে অনেকদিন আমি কোনও গোয়েন্দা গল্প লিখিনি। কারণ, গোয়েন্দা গল্প লিখতে হলে একটু বড় জায়গা দরকার—ততটা জায়গা কোনও পত্রিকা দিতে চায় না। মানে, আমাকে দিতে চায় না।'

উৎপলের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন তেতো হতাশা সূক্ষ্মভাবে যেন অনুভব করতে পারলেন অশোকচন্দ্র। কিছুক্ষণ কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে একটা কথার সরাসরি জবাব দিন...দেবারতিকে কে খুন করেছে?'

কে খুন করেছে সেটা উৎপলেন্দুর জানা নেই। কিন্তু যে-ই করুক, কাজটা কি খুব একটা খারাপ হয়েছে! তা ছাড়া, সত্যিই যদি উৎপলেন্দু সেন খুনিকে চিনতেন, তাহলেও কি এ-প্রশ্নের জবাবে ফস করে বলে দিতেন খুনির নাম! মনে মনে হাসলেন তিনি। মুখে বললেন, 'কে খুন করেছে জানি না। তবে আমরা যখন

গোয়েন্দা গল্প লিখি তখন এমন কাউকে খুনি সাজাই যাকে কেউ কখনও খুনি বলে ভাবতেই পারবে না। ওই ''দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড''-এর মতো।'

'বেশ বলেছেন,' ছোট্ট করে মন্তব্য করলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তারপর—'দেবারতি মানি আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, নিয়েছিল। লেখালিখি নিয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্ন—।'

'ও.কে.। থ্যাংক ইউ,' উৎপলেন্দুকে ধন্যবাদ জানালেন সহযোগিতার জন্য। তারপর রূপেন মজুমদারকে লক্ষ করে একই কথা জানতে চাইলেন—কীভাবে খুন করা হয়েছে দেবারতিকে।

রূপেন মজুমদার জিভের ডগা দিয়ে মাড়ির দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন। এসিজির প্রশ্নে ছোট্ট করে একটা জড়ানো শব্দ করলেন। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা সুপুরির কুচি বের করে মুখে ছুড়ে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড চোয়াল নেড়ে বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত, কোনও সাহেবী আইডিয়া ধার করে আমি আপনাকে কিছু বলব না—যা বলব সবই নিজের। আমার প্রথম বই ''ডাকিনীর হাতছানি''-তে এই ধরনের একটা খুন ছিল। একটা বন্ধ ঘরের ভেতরে একজন যুবতী নিহত হয়ে পড়ে আছে। তার বুকে ছুরির গভীর ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু দরজায় খিল আঁটা আর জানলায় বেশ ঘন মোটা মোটা গরাদ। মেয়েটি মরে পড়ে আছে জানলা থেকে অনেক দূরে। মানে, একটু আগে আপনি যা বললেন—ইমপসিবল প্রবলেম। কিন্তু ওই জন ডিকসন কার নামে কোনও এক সাহেবের কথা আপনি যে বললেন, তাঁর বই পড়া তো দূরের কথা, তাঁর নামই আমি কোনওদিন শুনিনি। আমার ব্যাপারটা সবসময়েই ওরিজিন্যাল। নইলে আমাদের একটা হ্যাংলাপনা আছে দেখবেন, সাহেবদের কথা গদগদ হয়ে মেনে নেওয়া। সাহেব বলিয়াছেন, তাই উহা সত্য...।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন রূপেন মজুমদার। আড়চোখে রত্নাবলী আর উৎপলেন্দুকে একবার দেখে নিয়ে আবার বললেন, 'স্পষ্ট কথা বললাম বলে কিছু মনে করবেন না জানেন, সাহেবদের লেখার প্রভাবের জন্যেই আমাদের বাংলা ক্রাইম ফিকশানকে কেউ আমল দিতে চায় না। ভাবে, আমরা সবাই চোর। সেইজন্যেই তো আমার সব বইতেই লেখা থাকে, কাহিনিটি সম্পূর্ণ মৌলিক—।'

রত্নাবলী বেশ বুঝতে পারছিলেন, রূপেন মজুমদারের কথার খোঁচাটা তাঁকে লক্ষ করে যতটা উৎপলেন্দুকে লক্ষ করে ততটা নয়। আর উৎপলেন্দু হতবাক হয়ে রূপেন মজুমদারের নির্লজ্জ ঢাক পেটানো দেখছিলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন লোকের সামনে কেমন অনায়াসে নিজেকে জাহির করছেন। আজকের যুগে নির্লজ্জতাও বোধহয় একটা আর্ট।

রূপেন মজুমদারের অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বিরক্ত হচ্ছিলেন এসিজি। কিন্তু পেশেন্টদের ওপর বিরক্ত হওয়া নার্সদের ধর্ম নয়। কারণ গূঢ় রোগলক্ষণগুলো জানতে হলে ধৈর্য ধরে পেশেন্টের সব কথা শুনতে হয়। সুতরাং মজুমদারের কথা শেষ হতেই তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু আপনার ওই প্রথম বইতে যুবতীটি খুন হয়েছিল কীভাবে?'

' ''ডাকিনীর হাতছানি'' আপনি পড়েননি?' অবাক হওয়া হাসিতে মুখ ভরিয়ে রূপেন বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাকে এক কপি প্রেজেন্ট করব। আমার ঘরে বই আছে।' তারপর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রঘুপতি যাদবের দিকে তাকিয়ে : 'আপনাকেও এক কপি দেব। পড়ে দেখবেন। এমন নতুন সব আইডিয়া দিয়েছি যে, তাজ্জব হয়ে যাবেন।'

রঘুপতি যাদব পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সকলের কথা শুনছিল। কোনও মন্তব্য করেনি। কিন্তু রূপেনের কথার পর সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। রূঢ় গলায় বলে উঠল, 'আপনার ওই কিতাবের মতো আপনার ব্রেনটাও কি ঘরে জমা করে এসেছেন, মজুমদারবাবু? স্যার আপনাকে তখন থেকে কী জিগ্যেস করছেন তা আপনার মাথায় ঢুকছে না?'

রূপেন মজুমদার চোখের পলকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে এসিজিকে বললেন, 'খুনটা হয়েছিল জানলা দিয়ে। ছুরির হাতলে নাইলনের দড়ি বেঁধে খুনি ছুরিটা ছুড়ে মেরেছিল মেয়েটাকে লক্ষ

করে। তারপর কাজ হাসিল হয়ে যেতেই দড়ি টেনে ছুরিটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'বাঃ, কায়দাটা বেশ নতুন তো! ডিকসন কারের কোনও গল্পে এরকম ইনজিনিয়াস মোডাস অপার‍্যানডাই-এর কথা বলা নেই—' প্রশংসা করলেন রত্নাবলী। কিন্তু উৎপলেন্দুর যেন মনে হল, ওঁর প্রশংসার মধ্যে কোথায় যেন বিদ্রূপের তীর লুকোনো রয়েছে।

প্রশংসায় রূপেন মজুমদার খানিকটা বেপরোয়া হয়ে ঢাক পেটাতে শুরু করলেন : 'তাহলেই দেখুন, ওই সাহেবের চেয়ে বুদ্ধিতে আমি কিছু কম যাই না! তা ছাড়া আমার গল্পে এরকম গরাদ ছাড়া জানলা আর দু-দিক থেকেই লক করা যায় এমন সাহেবী দরজা ছিল না। এসব থাকলে খুনের কায়দা তৈরি করা তো জলের মতো সহজ!' নাটকীয়ভাবে একটু থামলেন রূপেন মজুমদার। তৃপ্তির অহঙ্কার আর এক চিলতে হাসি তাঁর চোখেমুখে। পাতলা হয়ে আসা মাথার চুল ডান হাতের আলতো ছোঁয়ায় ঠিক করে নিলেন। তারপর সরাসরি তাকালেন এসিজির চোখে।

এসিজি বেশ বুঝতে পারছিলেন, অহঙ্কারে ভদ্রলোকের আলুথালু অবস্থা। অফিসে রূপেন মজুমদারের অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের হয়তো বাধ্য হয়ে ওঁর লেখা বই কিনতে হয়। আর অসহায়ভাবে সবিস্তারে শুনতে হয় একজন মৌলিক প্রতিভার নানান কৃতিত্বের কথা।

'ওই জলের মতো সহজ ব্যাপারটা যদি দয়া করে আমাদের খুলে বলেন—', অশোকচন্দ্র বিনয়ের সুরে কথাটা বলেছেন বটে, কিন্তু সেটা যে পুরোপুরি বিনয় নয় তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

রূপেন মজুমদার নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'কেন, খুনি খুন করেছে, ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করেছে। তারপর চাবিটা ওই টেবিলের ওপরে রেখে জানলা দিয়ে পালিয়ে গেছে। এ-হোটেলের কোনও ঘরের জানলাতেই গরাদ নেই—ওটাই তো সাহেবি জানলার সুবিধে।'

গতকাল রাতে ঘটনাস্থলে এসে সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখেছেন এসিজি। রূপেন মজুমদার যত সহজ ভাবছেন, এই ঘরের জানলা দিয়ে পালানো তত সহজ নয়। কারণ জানলার বাইরে কার্নিশ বলতে কিছু নেই। তা ছাড়া জানলা দিয়ে পালাতে গেলে নীচে দাঁড়ানো লোকজনের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

যেসব কিছু না বলে এসিজি ধন্যবাদ জানালেন মৌলিক রহস্য-লেখককে।

উৎপলেন্দু অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন কিছু একটা বলার জন্য। এখন ফাঁক বুঝে কথা বললেন, 'রূপেনবাবু, একটা কথা তখন থেকে ভাবছি। আপনার ''ডাকিনীর হাতছানি''-তে খুনি ওই নাইলনের দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছুরিটা ঠিকমতো টিপ করে ছুড়তে পারল!'

রূপেন মজুমদার বিজ্ঞের মতো হেসে চটপট জবাব দিলেন, 'খুনি তো সার্কাসের নাইফ-থ্রোয়ার ছিল, সেইজন্যেই ব্যাপারটা ইজি হয়ে গেছে। আপনাকে তো ''ডাকিনীর হাতছানি'' বই দিয়েছিলাম, পড়েননি?'

উৎপলেন্দু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার ভাইপোকে পড়তে দিয়েছিলাম। ওর খুব ভালো লেগেছিল। তারপর ও যে কাকে পড়তে দিল...' রূপেন মজুমদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, 'আমি একটু উঠব। ঘরে যেতে হবে। কাজ আছে।'

'একটা কথা, মিস্টার মজুমদার। কাল বা পরশু দেবারতি কি আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিল?'

ভাস্কর রাহার মন্তব্য মনে পড়ল রূপেন মজুমদারের। তাই বললেন, 'হ্যাঁ, পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলেছিল। একেবারেই, মামুলি ইন্টারভিউ।'

'ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন,' এসিজি রূপেন মজুমদারকে অনুমতি দিলেন। তখন উৎপলও অস্পষ্টভাবে এসিজিকে কী যেন বললেন। তারপর রূপেন মজুমদার আর উৎপলেন্দু সেন রওনা হলেন ঘরের দরজার দিকে।

যেতে-যেতে রূপেন উৎপলেন্দুকে বলছিলেন, 'বুঝলেন, ওয়ার্কশপের জন্যে একটা নতুন আইডিয়া ভেবেছি। এমন লিখব না, সাহেবদেরও তাক লেগে যাবে...।'

ভদ্রলোকের 'সাহেব' নিয়ে অবসেশনটা এল কোথা থেকে? ভাবছিলেন উৎপলেন্দু। ওঁর অফিসের ডিরেক্টরদের মধ্যে দু-তিনজন সত্যিকারের সাহেব এখনও আছে বলে ওঁর মুখেই শুনেছেন। অবসেশনটা সেই কারণে বলে তো মনে হয় না। তাহলে কি রূপেন মজুমদার আগের জন্মে-স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন?

অশোকচন্দ্র গুপ্ত আবার নতুন সিগারেট ধরিয়েছেন। ঘরের সিলিং-এর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। এর মধ্যেই অনেক তথ্য পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সব তথ্যের সঠিক অর্থ এখনও স্পষ্ট নয়। তার জন্য কিছুটা হোমওয়ার্ক দরকার।

তিনি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছিলেন। রঘুপতি যাদব দূর থেকে তার 'স্যার'-কে লক্ষ করছিল। সে গোয়েন্দা কাহিনির তেমন ভক্ত না হলেও এটুকু বুঝতে পারছে, স্যারের এবারের লড়াইটা অন্যরকম। যাঁরা কাগজে-কলমে সকাল বিকেল 'খুন' করেন, সেরকম দশজন লেখকের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই। কাল রাত থেকে এখন, এই মুহূর্ত পর্যন্ত রঘুপতি কম নোটস নেয়নি। সেগুলো ঠান্ডা মাথায় বসে খতিয়ে দেখা দরকার। দেবারতি মানি 'সুপ্রভাত'-এর আপকামিং ক্রাইম জার্নালিস্ট ছিল। নেহাত কম বিখ্যাত ছিল না। আজকের সব কাগজেই ওর মারা যাওয়ার খবর ছাপা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে 'আত্মহত্যা' বা 'দুর্ঘটনা'-র মোড়কে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া এই খুনের সুপারফাস্ট সলিউশনের জন্য পলিটিক্যাল প্রেসারও আসতে শুরু করেছে।

অশোকচন্দ্রকে দেখে বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল। অতএব রঘুপতি যাদবও মোটামুটি দিশেহারা। তবে এটা ঠিক, আর দু-তিন দিনের মধ্যে যদি সে কাউকে অ্যারেস্ট করতে না পারে তাহলে প্রচুর ঝামেলা হবে, হইচই হবে।

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় কেমন এক টেনশনে ভুগছিলেন। উৎপলেন্দু আর রূপেন চলে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর ভীষণ একা একা লাগছে। ভুরুর কাছটা টনটন করছে। বোধহয় চশমার পাওয়ার পালটেছে। আর বুকের ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করছে। গত সপ্তাহে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। এখন সেই ওষুধ চলছে। গাদা-গুচ্ছের ট্যাবলেট। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। দুপুরে সামান্য কিছু খেয়ে ওষুধ খেতে হবে। তারপর বিশ্রাম। আজ আর কনফারেন্সে যাবেন না। তাতে খুব একটা ক্ষতিও নেই। কারণ আজ তাঁর শুধু শ্রোতার ভূমিকা। কিন্তু কেন যেন শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। এখন অশোকচন্দ্র তাঁকে কী জিগ্যেস করবেন কে জানে!

'মিসেস মুখার্জি', এসিজি পায়চারি থামিয়ে ঘুরে তাকিয়েছেন রত্নাবলীর দিকে : 'জানি, আপনার খুব ক্লান্ত লাগছে। তাই পাঁচ মিনিট কথা বলেই আপনাকে আমি ছেড়ে দেব। আপনার কাহিনির নায়ক গোয়েন্দা করঞ্জাক্ষ রুদ্রের নাম আজ সব পাঠকের মুখে মুখে ফেরে। আপনার খ্যাতি প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে গেছে। করঞ্জাক্ষ রুদ্র ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিক হলেও আসলে সে-বুদ্ধি আপনারই কাছ থেকে ধার করা। সুতরাং আপনার কাছেই আমি জানতে চাইছি, দেবারতি কীভাবে খুন হয়েছে।'

রত্নাবলী একেবারে বালিকার মতো অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, যেন চাকরির ইন্টারভিউতে তাঁকে খুব শক্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। শাড়ির নীল পাড়ের কাছটায় আলতো করে নখের আঁচড় কাটতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর বিব্রতভাবে হেসে তিনি মিহি গলায় বলতে শুরু করলেন, 'মানে, এক্ষুনি হুট করে কিছু বলা সম্ভব নয়...তবে...ইয়ে, ভেবে দেখা যেতে পারে।' আবার কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর : 'ধরা যাক, খুনি দেবারতির সঙ্গে ওর ঘরে ছিল। আর, ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। একথা-সেকথা বলতে বলতে ওরা দুজনে ওই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর খুনি আচমকা ওকে এক ধাক্কা মেরে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় নীচে। খুনের ঠিক পরেই খুনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই টেবিলের আধখোলা বই বা

কাগজপত্রের দিকে ঠিকমতো খেয়াল করেনি। সোজা দরজা খুলে সে চলে এসেছে বাইরে। দরজায় চাবি দিয়ে চলে গেছে নিজের ঘরে।'

'লেকিন ওই টেবিলের ওপরে যে-চাবিটা পাওয়া গেল সেটা এল কোথা থেকে—' প্রশ্ন করেছে রঘুপতি।

ওর দিকে সরল চোখে তাকালেন রত্নাবলী। আলতো গলায় বললেন, 'খুনি একটা নকল চাবি তৈরি করে সেটা দিয়ে দরজা লক করে চলে গেছে। আর আসল চাবিটা রেখে গেছে ওই টেবিলের ওপরে।'

অশোকচন্দ্র বেশ একটু হতাশভাবেই দেখছিলেন রত্নাবলীকে। ওঁর গল্প-উপন্যাসে করঞ্জাক্ষ রুদ্রের যে-ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সেই তুলনায় এই সমাধানটা যেন বড্ড সাদামাঠা। অবশ্য ডিকসন কারের বইতেও বন্ধ ঘরের রহস্যের এ-জাতীয় সাদামাঠা সমাধানই পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলেও...। বরং অবাস্তব হলেও রূপেন মজুমদারের 'ডাকিনীর হাতছানি'-র সমাধান অনেক অভিনব।

এসিজি জিভ দিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ করলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, মিসেস মুখার্জি। তবে আমার ধারণা, দেবারতি মানির খুনের ঘটনা ঘটে গেছে হঠাৎই। মানে, আগে থেকে কোনওরকম পরিকল্পনা খুনির ছিল না। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে তা হলে নকল চাবি তৈরি করার ব্যাপারটা খুব সলিড গ্রাউন্ডের ওপরে দাঁড়াচ্ছে না।' একটু চুপ করে থেকে অস্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'হয়তো দেবারতি মানির সিক্রেট যাতে ফাঁস না হয়, তার জন্যেই খুনিকে খুনটা করতে হয়েছে। ওই সিক্রেটটা জানতে পারলেই খুনের মোটিভ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

রত্নাবলী কোনও কথা বললেন না। হঠাৎই ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছিল। ভাবছিলেন, 'কখন শেষ হবে এই জিজ্ঞাসাবাদ? দেবারতিকে নিয়ে এত কথা এত আলোচনা আর একটুও ভালো লাগছে না। নিজে খুন হয়ে মেয়েটা আমাদের কী বিপদেই না ফেলে গেছে!'

'আচ্ছা মিসেস মুখার্জি, এই কনফারেন্সে যেসব রাইটার এসেছেন তাঁদের কারও সঙ্গে মিস মানির ইশক ছিল—মানে, ভালোবাসা ছিল?' নীল আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছে রঘুপতি।

এ-ব্যাপারে এসিজি গতকালই হোটেলের লোকজনের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাতে মোটামুটিভাবে একটা নাম তিনি পেয়ে গেছেন। তাই সে-বিষয়ে লেখকদের কাউকে আর কোনও প্রশ্ন করেননি। কিন্তু রঘুপতি বোধহয় সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চায়।

স্পষ্টতই রত্নাবলীর ফরসা মুখ লালচে হয়। কয়েক সেকেন্ড মাথা নীচু করে বসে রইলেন তিনি। তারপর আমতা-আমতা করে বললেন, 'সেরকমভাবে কিছু জানি না, তবে...রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে ওকে প্রায়ই দেখা যেত। আপনারা রঞ্জন দেবনাথকে বরং জিগ্যেস করে দেখবেন—।'

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর মন আর শালীনতাবোধ এসিজিকে অবাক করল। মাথার চুলের গোছায় টান মেরে তিনি বললেন, 'আপনার এই ডিসেন্সি নিয়ে কী করে আপনি ওইসব ভয়ঙ্কর প্যাঁচালো গোয়েন্দা-কাহিনিগুলো লেখেন! ভাবতে অবাক লাগে, মিসেস মুখার্জি।'

রত্নাবলী মুখ তুলে সরাসরি দেখলেন বৃদ্ধ হুনুরের দিকে। ধীরে ধীরে বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত, আমরা, গোয়েন্দা-কাহিনির লেখকরা, বোধহয় অদ্ভুত জাতের মানুষ। কাগজে-কলমে তাঁরা অনায়াসে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটাতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে ওইসব ঘটনার মুখোমুখি হলে তাঁরা আপাদমস্তক শিউরে ওঠেন। ফলে অদ্ভুত এক পরস্পর-বিরোধী মানসিকতা নিয়ে তাঁদের দিন কাটাতে হয়...।'

'না, না, সবাই তা নন,' আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়লেন এসিজি। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'সবাই যে একরকম হয় না তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দেবারতি। ও খুন হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে, আপনাদের দশজন লেখকের মধ্যে অন্তত একজন কাগজ-কলম হোক কিংবা বাস্তব, দু-জায়গাতেই অনায়াসে খুন করতে পারেন।'

'কী শকিং ভাবুন তো!' রত্নাবলীর মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

'শকিং—কিন্তু সত্যি।' ঠান্ডা গলায় বললেন অশোকচন্দ্র। তারপর একটু সময় নিয়ে : 'দেবারতি কি কাল-পরশু আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিল, মিসেস মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, কাল রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ও আমার ঘরে এসেছিল কথা বলতে। নেহাতই সাধারণ কথাবার্তা হয়েছিল। নাইনটি ওয়ান আর নাইনটি টু-তে পরপর দু-বছর রবীন্দ্র পুরস্কারের ফাইনাল লিস্টে আমার একটা উপন্যাসের নাম উঠেছিল। সেটা নিয়েই ও বেশি কথাবার্তা বলেছিল...আমার রিঅ্যাকশন জানতে চাইছিল।'

'ধন্যবাদ, মিসেস মুখার্জি। আপনি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বোঝাই যাচ্ছে। এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন। দরকার হলে পরে কথা বলব।'

অতএব 'সভা' শেষ।

লোহার পায়ে ঘরের কার্পেট অতিক্রম করে দরজার কাছে এলেন রত্নাবলী। মনে হল যেন দরজা পেরোলেই মুক্তি। কিন্তু কিসের হাত থেকে মুক্তি?

দরজা পেরিয়ে করিডর। তারপর শ্লথ পায়ে সিঁড়ির দিকে। তাঁর ঘরটা পাঁচতলায়, না পাঁচশো তলায়? ভুরুর কাছটা এখনও ব্যথা করছে। আর মনে পড়ছে বেপরোয়া প্রাণোচ্ছল মেয়েটার কথা। কাল রাতে ইন্টারভিউ নেবার সময় ব্যক্তিগত আক্রমণই ছিল দেবারতির প্রধান হাতিয়ার। মনেই হচ্ছিল না, কনফারেন্সের প্রথম দিনে মেয়েটা তাঁর গল্পের অমন প্রশংসা করেছিল।

ঘড়িতে তখন কটা হবে? সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটা। নিজের ঘরে অনামিকার সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন, এমন সময় দরজার কলিংবেল বেজে উঠেছে।

অনামিকা উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখে দেবারতি মানি। একটা কালো কর্ডের প্যান্ট আর হলুদ টি-শার্ট পরে আছে। হাতে সিগারেট।

ওকে দেখে হাসল দেবারতি। একটু ভারি গলায় বলল, 'হাই—।'

অনামিকাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে এল দেবারতি। কোনওরকম ভূমিকা না করেই বলল, 'মিসেস মুখার্জি, আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে এলাম। আপনাদের সবার ইন্টারভিউ নিয়ে একটা স্টোরি করব।'

রত্নাবলী হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আর অনামিকাকে বলেছেন, 'অনামিকা, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব। ওঁর সঙ্গে কাজটা একটু সেরে নিই।'

অনামিকা আর দাঁড়ায়নি, চলে গেছে নিজের ঘরে। দেবারতি মেয়েটাকে দেখলেই ওর কেমন অস্বস্তি হয়। ওর সামনে থেকে সরে গিয়ে অনামিকা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এরপর শুরু হয়েছে ইন্টারভিউ।

টেলিফোন করে রুম সার্ভিসকে কফি দিতে বলেছেন রত্নাবলী। দেবারতির মদ খাওয়ার দুর্বলতা তিনি জানেন...সকলেই জানে। কিন্তু রত্নাবলী কফির কথাই বললেন, কফির বদলে হুইস্কি বললে সৌজন্যটা বদলে যেতে পারে তোয়াজে। অন্তত লোকে তাই ভাববে।

কাগজ-কলম আর জ্বলন্ত সিগারেট যুত করে বাগিয়ে প্রথম প্রশ্ন করল দেবারতি, 'আপনার লেখায় বিদেশি প্রভাব কতটুকু, মিসেস মুখার্জি?'

হাসলেন রত্নাবলী : 'এমন নয় যে বলা যাবে চুরি করেছি। মানে, স্টাইল, ফর্ম এসবের প্রভাব আছে।'

'মেইনস্ট্রিম লিটারেচার ছেড়ে হঠাৎ এই অপরাধ-সাহিত্যে এলেন কেন?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন।' কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলেন রত্নাবলী : 'ছোটবেলা থেকেই দেখতাম বাড়িতে ''মাসিক রোমাঞ্চ'' পত্রিকা রাখা হত। ওগুলো পড়তাম। ভালো লাগত। তারপর হঠাৎই, ১৯৪৬ নাগাদ, হাতে এল ''রহস্য রোমাঞ্চ''—সম্পাদক বিমল কর—গত বিশ বছর ধরেই যিনি মেইনস্ট্রিম লিটারেচারের ফিনোমিনন। এই পত্রিকার গল্পগুলো পড়ে বেশ অন্যরকম লাগল। তখন আমার বয়স কত? এই উনিশ কি বিশ। মনে হল, লেখালিখি করলে এইরকম গল্প-টল্পই লিখব। তারপরই আমি টুকটাক লিখতে

শুরু করি। বছর তিন-চারেকের মধ্যে কয়েকটা গল্প ছাপাও হল ''মাসিক রোমাঞ্চ'' পত্রিকায়।' সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন রত্নাবলী। তারপর : 'ঠিক মনে পড়ছে না...বোধহয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার ''তদন্ত'' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন। তখন আমি মোটামুটি লিখি। ওই কাগজে আমার একটা গল্প বেরিয়েছিল—।'

মুচকি হেসে দেবারতি জিগ্যেস করল, 'এই সাহিত্য করেন বলে কোনওরকম ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগেন?'

মিষ্টি শব্দ করে হাসলেন রত্নাবলী। বললেন, 'কেন, কমপ্লেক্সে ভুগব কেন? শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, কমলকুমার মজুমদার, সমরেশ বসু—এঁরা যখন রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তখন আমার ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সটা আসবে কোথা থেকে! বরং সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স যদি আমার থাকত তাহলে সেটা খুব একটা দোষের হত না।'

দেবারতি খুশি হয়ে হাসল। তারপর বলল, 'আপনার গল্পগুলো পড়ে আপনাকে যেরকম ইন্টেলিজেন্ট মনে হয় আসলে আপনি ততটা ইন্টেলিজেন্ট নন। আই. কিউ.-র ঘাটতি আছে। এর কারণ কী?'

অপমানে মুখ লাল হয়ে গেছে রত্নাবলীর। কী জবাব দেবেন এই অভদ্র দোআঁশলা ক্রাইম জার্নালিস্টের অশালীন প্রশ্নের? রাগে কপালের পাশের শিরা দপদপ করে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞান হারাননি রত্নাবলী। সংযত গলায় বলেছেন, 'আপনার মনে হওয়ার ওপরে তো আমার হাত নেই—।'

হাসল দেবারতি মানি : 'কার পেছনে কখন কোন হাত থাকে কে জানে!'

কী বলতে চাইছে মেয়েটা? কাল কনফারেন্সে এই মেয়েটাই না হাততালি দিয়ে তাঁর গল্পের প্রশংসা করছিল!

দরজায় মিষ্টি সুরে কলিংবেল বেজে উঠল।

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল দেবারতি। দরজা খুলল। কফি এসে গেছে। উর্দি পরা বেয়ারা কফির কাপ সাজিয়ে দিয়ে গেল রত্নাবলীর সামনে, টেবিলের ওপরে।

দেবারতি ফিরে এল নিজের জায়গায়। কোনও কথা না বলে কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

আবার শুরু হল প্রশ্ন : 'আপনার লেখায় এত পুরুষালী ভাব কেন?'

'কী করে জানব! এরকম কথা আগে কেউ বলেনি।'

'প্রেমময় চৌধুরির সঙ্গে এককালে আপনার সম্পর্ক ছিল?'

হাসলেন রহস্য-সম্রাজ্ঞী : 'ছিল কেন, এখনও আছে—লেখক সম্পাদক সম্পর্ক।'

'ও—' একটু থমকে গেল দেবারতি মানি। তারপর : 'তা হলে রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে সম্পর্কটা কিসের?'

মেয়েটা আমার মনের ক্ষতচিহ্নগুলো বেছে নিচ্ছে একে একে। আচ্ছা, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন? রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তিনি কখনও অস্বীকার করেননি, এখনও করলেন না। সেকথাই স্পষ্ট করে বললেন সাংবাদিককে।

সিগারেটে গভীর টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল দেবারতি। তারপর থুতনি সামান্য উঁচু করে বলল, 'ধরুন, আপনাকে রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়া হল। তখন আপনার কেমন লাগবে?'

হঠাৎ কেন যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল রত্নাবলীর মাথার ভেতরে। অপমানে লাল চোখমুখ নিয়ে কাঁপা হোঁচট খাওয়া গলায় বললেন, 'ধরুন, এক্ষুনি আপনাকে গলা ধাক্কা দিয়ে এই ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল। তখন আপনার কেমন লাগবে?'

জ্বলন্ত সিগারেটটা কফির কাপে আচমকা ডুবিয়ে দিল দেবারতি। 'ছ্যাঁক' করে শব্দ হল একটা। তারপর ঘাড় কাত করে তাকাল : 'নাঃ, আপনার আই. কিউ. সত্যিই কম! সেটা এখন আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছে।'

রত্নাবলী আর থাকতে পারলেন না। সপাং করে মুখের মতো জবাব দিলেন, 'আই. কিউ. কী করে বাড়বে বলুন! আমার মা তো আর হোটেলে গান গাইত না—আর বাবারও মদের দোকান ছিল না!'

'নীচুজাতের গালাগালিতে সাংবাদিকদের ধৈর্য হারালে চলে না,' উঠে দাঁড়িয়েছে দেবারতি : 'নমস্কার, মিসেস মুখোপাধ্যায়। আবার আমাদের দেখা হবে—সময় মতো।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায়নি দেবারতি। হনহন করে চলে গেছে দরজার বাইরে। আর যাওয়ার সময় দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেছে ঘরের দরজা।

এরই নাম সাধারণ কথাবার্তা! একটু আগে অশোকচন্দ্রকে তিনি সেরকমই বলেছেন।

'আপনার এই ডিসেন্সি নিয়ে কী করে আপনি ওই সব ভয়ঙ্কর প্যাঁচালো গোয়েন্দা-কাহিনিগুলো লেখেন! ভাবতে অবাক লাগে, মিসেস মুখার্জি।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত বিজ্ঞানী হতে পারেন, গোয়েন্দা হতে পারেন—কিন্তু উনি জানেন না, বাইরে যে যা-ই হোক, মেয়েরা আসলে মেয়েই।

আট

হোটেল 'সিরাজ'-এ এসিজি আবার যখন পা দিলেন তখন সন্ধে সাতটা।

দুপুর পর্যন্ত কাজ সেরে বিদায় নিয়েছিলেন এসিজি আর রঘুপতি। তারপর ঘণ্টা চার-পাঁচ যা সময় পেয়েছেন তার খানিকটা কেটেছে বিশ্রামে, আর বাকিটা খরচ হয়েছে হোমওয়ার্কের পিছনে। বিশেষ করে পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেসের লেখাগুলো খতিয়ে দেখার জন্য বেশ কয়েকটা লাইব্রেরিতে এসিজি ঢুঁ মেরেছেন। এই দুই লেখকের নাম উচ্চারণ করে কোনও সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছে দেবারতি? নাকি পুরো ব্যাপারটাই ছিল ওর ফাজলামি? মনে-মনে যেন একটা রুবিক কিউব নাড়াচাড়া করছিলেন অশোকচন্দ্র। কিউবের ছ'টা পিঠে খুদে কিউবগুলো তাদের নানান রং নিয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। কিউবে ঠিকঠাক মোচড় দিয়ে খুদে কিউবগুলোকে নিয়ে আসতে হবে ঠিক-ঠিক জায়গায়। তবেই পাওয়া যাবে হারানিধি নকশা। তখনই বোঝা যায়, কীভাবে খুন হয়েছে দেবারতি মানি, কে খুন করেছে ওকে, আর কেনই বা খুন করেছে।

রঘুপতি যাদব তার কাজ করে গেছে নির্ভুলভাবে। দশজন লেখকের দশটা ঘরের সঙ্গে যুক্ত বেয়ারাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সে একেবারে ভাজা-ভাজা করে ছেড়েছে। তারপর প্রত্যেকটা ঘরের নম্বর লিখে সে হাসপাতালের বেডের মতো প্রতিটি ঘটনার আনুমানিক টাইম-চার্ট তৈরি করেছে। সেই চার্ট সামনে রেখে বহুক্ষণ বুঁদ হয়ে ছিলেন এসিজি, কিন্তু রুবিক কিউবের নকশা মেলেনি।

হোটেলের রিসেপশনে তাঁর দেখা হয়ে গেল অনিমেষ চৌধুরির সঙ্গে। ভদ্রলোক কেমন যেন সন্দেহজনকভাবে এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করছিলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

এসিজিকে দেখেই তিনি একেবারে আঁতকে উঠলেন। কাছে এসে বললেন চাপা গলায়, 'আমি একটা সিক্রেট জানি—।'

হোটেলের লবিতে রঙিন টিভি চলছে। সোফায় গা ডুবিয়ে অনেকেই সেই ছোট পরদায় মন দিয়ে বসে আছেন। লবির বাঁ দিকে একটা বড় প্যানেলে সিরামিক টাইলসের বিমূর্ত কাজ। তার ঠিক নীচেই সুদৃশ্য টবে সাজানো রয়েছে কয়েকটা গাছ।

অশোকচন্দ্রের পাঞ্জাবির হাতা ধরে তাঁকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইলেন অধ্যাপক। এসিজি মনে-মনে প্রমাদ গুনলেন : 'আবার সিক্রেট!'

পান চিবোতে-চিবোতে অধ্যাপক এসিজির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, 'কাল রাত এগারোটা নাগাদ দেবারতি মানির ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল।'

'আপনি তখন কী করছিলেন?' এসিজি জিগ্যেস করলেন। তিনি জানেন, অধ্যাপক চৌধুরির ঘর দেবারতির ঘরের ঠিক পাশেই।

'শ-শ-শ। আস্তে—' ঠোঁটে আঙুল তুলে এসিজিকে সাবধান করলেন অনিমেষ। বললেন, 'সাবধানে বলুন, কেউ হয়তো ওভারহিয়ার করে ফেলতে পারে।' তারপর চারপাশে একবার সতর্ক নজর বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি তখন একটা ক্লাস সেভেনের ইতিহাস বইয়ের প্রুফ দেখছিলাম...।'

'তারপর?'

'...ভাবছি কে ধাক্কা দিচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেলাম উৎপলেন্দু সেনের গলা। দেবারতি মানিকে ডাকছেন। কী যেন পরীক্ষা করার বিষয়ে কীসব বলছেন। ওঁর গলা জড়ানো ছিল, তাই কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু মিস মানির উত্তরটা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি আমি। উনি একটু ধরা গলায় চেঁচিয়ে বললেন, ''মাতাল অবস্থায় এ-পরীক্ষা দেওয়া যায় না। যান, ঘরে গিয়ে বোতল নিয়ে শুয়ে পড়ুন।'' ব্যস, আর কিছু শুনতে পাইনি আমি। তবে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মাতাল অবস্থায় কোন পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। আমিও তো লেখাপড়া নিয়েই আছি—জীবনে কম পরীক্ষা দিতে হয়নি। আর পরীক্ষার খাতাও কম দেখি না। মাতাল অবস্থায় যে-কোনও পরীক্ষাই শক্ত। তা উৎপলেন্দুবাবু রাত এগারোটায় দেবারতিদেবীর ঘরে কী পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন কে জানে!'

'ধন্যবাদ, অনিমেষবাবু,' অশোকচন্দ্র অমায়িক হাসলেন : 'আপনার মতো সহযোগিতা সকলের কাছ থেকে পেলে এতক্ষণে খুনি ধরা পড়ে যেত।'

'উৎপলেন্দুবাবু কিন্তু খুন করেননি—' ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন অনিমেষ চৌধুরি, 'ওঁকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। আর...ওঁকে...ইয়ে, বলবেন না যে, এ-খবরটা আমি দিয়েছি—' একটু চুপ করে থেকে সময় নিয়ে : 'যতই বন্ধু হোক, সত্যি কথা তো আর গোপন রাখা যায় না!'

দেবারতি মানিকে জীবিত অবস্থায় শেষ কে দেখেছিল? ভাবলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। গতকাল আটটা নাগাদ রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ঘরে কফি নিয়ে গিয়েছিল একজন বেয়ারা। তখন দেবারতি ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। এরপর পৌনে নটা নাগাদ দেবারতিকে রূপেন মজুমদারের ঘরে ঢুকতে দেখেছেন জ্যোতিষ্ক সান্যাল। সেটাও ইন্টারভিউর ব্যাপার ছিল বোধহয়। তারপর, রাত সাড়ে নটা নাগাদ, ওকে দেখা যায় করিডোরে দাঁড়িয়ে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছে। আর সব শেষে পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাত দশটার সময় ঘরে ডিনার চেয়ে পাঠায় দেবারতি, সঙ্গে ড্রিঙ্কস। ব্যস, এইটুকুই।

কিন্তু এখন প্রফেসর চৌধুরি যা বলছেন তাতে উৎপলেন্দু সেনই বোধহয় দেবারতিকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছেন—মানে, ওর সঙ্গে কথা বলেছেন।

অশোকচন্দ্রের কপালের ভাঁজ ঘন হল। এখনও তো অনিমেষ চৌধুরিকে নিয়ে মোট ছ'জন লেখকের সঙ্গে তাঁর কথা বলা বাকি। তাঁদের কথা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

'আচ্ছা, অনিমেষবাবু, দেবারতি কীভাবে খুন হয়েছিল বলতে পারেন?'

থতমত খেয়ে গেলেন অধ্যাপক। তারপর সতর্ক চোখে এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে পানের পিক ফেললেন একটা টবের গোড়ায়। কয়েক সেকেন্ড ধরে 'উম-ম' শব্দ করে অবশেষে বললেন, 'আমি জীবনে গোয়েন্দা গল্প লিখেছি একটাই : আমার লেখা প্রথম গল্প। তারপর থেকে শুধু কল্পবিজ্ঞান আর...।'

'পিশাচতন্ত্র, তাই তো!' হাসলেন এসিজি : 'আপনার লেখা আমি পড়েছি। বলতে দ্বিধা নেই, আপনি পিশাচসিদ্ধ। কিন্তু তবুও যদি আমাকে একটু সাজেশন দিয়ে সাহায্য করেন।'

অধ্যাপক চৌধুরি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'এটা ভিনগ্রহের কোনও প্রাণীর কীর্তি নয়তো!'

অশোকচন্দ্র অতি কষ্টে হাসি চাপলেন। কিন্তু তাঁর মগজের ভেতরে একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল : অধ্যাপক অনিমেষ চৌধুরি হয় নিপাট ভালোমানুষ, নয়তো ধুরন্ধরের জাসু। তিনি স্বাভাবিক সুরে বললেন, 'থ্যাংক ইউ প্রফেসর, আমি তা হলে এবার আসি।'

অধ্যাপক চৌধুরি হাত তুলে থামালেন এসিজিকে : 'একটা কথা, মিস্টার গুপ্ত। আমি এই মার্ডারের ব্যাপারে কিছু তথ্য জোগাড় করেছি। ওগুলো আপনাকে দেব।—যদি আপনার কোনও কাজে লাগে। কাজে লাগলে কিন্তু আমার হেল্প করার ব্যাপারটা সবাইকে বলবেন—মানে, অ্যাকনলেজ করবেন...।'

এসিজি একটু অবাক চোখে ভদ্রলোককে দেখলেন। আশ্চর্য! এত নাম-ডাক খ্যাতি হওয়া সত্ত্বেও কী নির্লজ্জ খ্যাতিলোভাতুর।

'এ-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব,' বলে অধ্যাপককে এড়িয়ে গেলেন অশোকচন্দ্র।

অনিমেষ চৌধুরি তাঁকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এসিজি দ্রুতপায়ে পিঠটান দেওয়ায় সে-সুযোগ আর পেলেন না।

তিনতলায় ভাস্কর রাহার দুশো আট নম্বর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। এসিজি সপ্রতিভ পায়ে ঢুকে পড়লেন ঘরে।

জমজমাট আসরে বোধহয় কনফারেন্স চলছিল অথবা দেবারতির রহস্যময় মৃত্যুর ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল, এসিজিকে দেখেই নিমেষে সব স্তব্ধ। ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল পলকে।

ভাস্কর রাহা জ্বলন্ত চুরুট হাতে কিছু একটা বলছিলেন। তাঁকে ঘিরে বসে-দাঁড়িয়ে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সেনগুপ্ত, রঞ্জন দেবনাথ আর প্রেমময় চৌধুরি। খানিকটা দূরে একা একটা সোফায় বসে উৎপলেন্দু সেন কী একটা লেখায় চোখ বোলাচ্ছেন। আর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে উঁকি মেরে কী যেন দেখছিল প্রীতম নন্দী। পাশে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিলেন কল্পনা সেন।

'ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত, ভাস্করবাবু। আপনাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার কথা বলা বাকি আছে—সেটা এখন সেরে নিতে চাই।' কথাগুলো বলে অশোকচন্দ্র গুপ্ত পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে কী যেন দেখলেন। তারপর : 'রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সেনগুপ্ত, রঞ্জন দেবনাথ, জোতিষ্ক সান্যাল আর অর্জুন দত্ত। শেষ দুজন ঘরে নেই দেখতে পাচ্ছি...ভাস্করবাবু, যদি কাইন্ডলি ওঁদের একটু খবর পাঠান এ-ঘরে আসার জন্যে। কথা দিচ্ছি, খুব সংক্ষেপে কাজ সারার চেষ্টা করব।'

ঘরের সবাই এখন অশোকচন্দ্রের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। বাস্তবের এই গোয়েন্দা এবার কী নির্দেশ দেবে কে জানে!

'যাঁদের নাম বললাম তাঁরা ছাড়া আর সবাই ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারেন। তবে ভাস্করবাবু অবশ্যই থাকবেন। কারণ, ওঁর ঘরে আমরা অতিথি।'

ভাস্কর রাহা বিনীত হেসে অশোকচন্দ্রের দেওয়া সম্মান গ্রহণ করলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন টেলিফোনের দিকে।

প্রেমময় চৌধুরি সোফায় যেমন বসে ছিলেন তেমন বসেই রইলেন। তাঁর দু-চোখে কৌতূহল আর শিরা-বের-করা আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে।

উৎপলেন্দু, প্রীতম আর কল্পনা চুপচাপ চলে যাচ্ছিলেন ঘর ছেড়ে। অশোকচন্দ্র উৎপলেন্দুর পিঠে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, 'আপনি থাকুন, উৎপলেন্দুবাবু। কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

উৎপলেন্দু ছোট্ট করে ঘাড় হেলিয়ে বসে পড়লেন একটা সোফায়।

ভাস্কর রাহা অশোকচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, 'খবর দিয়েছি—ওরা আসছে।'

সিগারেটে শব্দ করে টান দিয়ে বারকয়েক কেশে উঠলেন অশোকচন্দ্র। তারপর গলা উঁচু পরদায় তুলে বললেন, 'ভাস্করবাবু, সবার কাছে প্রশ্ন আমার একটাই : কীভাবে খুন হয়েছে দেবারতি মানি—।'

এসিজি প্রশ্নটা প্রথমে রাখলেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখেমুখে বেশ দুশ্চিন্তার ছাপ। প্রথম দিনের হাসিখুশি ফুলবাবু চেহারাটি আর নেই। আজ তাঁর বয়েস বোঝা যাচ্ছে।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাল্পনিক গোয়েন্দা শিবদাস সরখেল—অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি। সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরা পাইপ খাওয়া এই গোয়েন্দা যেন উত্তম-সুচিত্রার পুরোনো আমলের হিট ছবির বড়লোক নায়িকার রাশভারি পিতা। শিবদাস সরখেলের জনপ্রিয়তা করঞ্জাক্ষ রুদ্রের মতো মারাত্মক না হলেও মাঝারি গোছের বলা যায়।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকবার চোখ পিটপিট করলেন। চোখের কোনও দোষ নয়, মুদ্রাদোষ। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আমার গোয়েন্দা শিবদাস সরখেল হলে কী ভাবতেন সেটা বলি।' সকলের মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ধরুন, দেবারতিকে খুন করার পর খুনি ওর চাবি দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে গোটা দরজাটাকে খুলে ফেলল ফ্রেম থেকে। দরজা লক করল চাবি দিয়ে। চাবি রেখে এল ঘরের ভেতরে, টেবিলে। তারপর বন্ধ দরজাটাকে ঠিকমতো সেট করে আবার স্ক্রু এঁটে বসিয়ে দিল দরজার ফ্রেমে।'

'চমৎকার! চমৎকার!' প্রশংসার সাধুবাদ জানালেন এসিজি : 'কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই হোটেলের দরজাগুলো বন্ধ অবস্থায় স্ক্রু-র নাগাল পাওয়া যায় না। ওগুলো দরজা আর ফ্রেমের ভাঁজে লুকিয়ে পড়ে। শুধু এই হোটেলের কেন, বেশিরভাগ দরজার ডিজাইনই তাই। তবু আপনার মৌলিক চিন্তার জন্যে ধন্যবাদ।'

উৎপলেন্দু সেন সোফা ছেড়ে উঠে ভাস্কর রাহার কাছে গেলেন। রাহার কাছ থেকে লাইটার চেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এবং সেই সুযোগে চাপা গলায় তাঁকে বললেন, 'মৌলিক চিন্তাই বটে! জন ডিকসন কারের ''ডেড ম্যানস নক'' উপন্যাসে এ-নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।'

ভাস্কর রাহা কোনও জবাব না দিয়ে উৎপলকে ইশারায় থামতে বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন জোতিষ্ক সান্যাল আর অর্জুন দত্ত। আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

এসিজি ওঁদের তিনজনকেই স্বাগত জানালেন।

রঘুপতির হাতে একটা মোটাসোটা ফাইল ছিল। সেটা ইশারায় দেখিয়ে অশোকচন্দ্রকে একপাশে ডেকে নিল সে। ফাইলটা খুলে কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে কীসব বলল। সব শুনে অশোকচন্দ্র কিছুক্ষণ থম মেরে রইলেন। তারপর হাত তুলে ইশারা করে জানালেন, পরে হবে।

এরপর এসিজি বাকি চারজনকে একে-একে একই প্রশ্ন করলেন : কেমন করে খুন করা হয়েছে দেবারতি মানিকে? ওঁরা একে-একে উত্তর দিলেন।

অনামিকা সেনগুপ্ত : 'আমার মনে হয়, খুন করার পর খুনি ওই ওয়ার্ডরোব অথবা বাথরুমের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। তারপর দরজা ভাঙাভাঙি হইচই সব মিটে গেলে সে লুকিয়ে সটকে পড়ে।'

জ্যোতিষ্ক সান্যাল : 'ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি সুইসাইড নয়তো! দেবারতি মানি হয়তো আমাদের নাকাল করার জন্যে একটা চরম মশকরা করে গেছেন!'

অর্জুন দত্ত : 'সরি, আমি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার কাছে ইম্পসিবল প্রবলেম হয়েই রয়ে গেছে।

সবার শেষে রঞ্জন দেবনাথ। ওর উত্তর এসিজিকে নাড়া দিল। এমনকি চমকে দিল আর সবাইকেও।

রঞ্জন দেবনাথ ইতিমধ্যেই বোধহয় ধাক্কা সামলে উঠেছে। এসিজি লক্ষ করেছেন, একটু আগেই ও গায়ে হাত ছুঁইয়ে অনামিকাকে ডেকে হেসে কী একটা বলেছে। তা ছাড়া এখন ওকে বেশ স্মার্ট সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল দুটো চোখে ঝিলিক মারছে আত্মবিশ্বাস।

অশোকচন্দ্র রঞ্জনের 'অন্ধকারে বাঘবন্দী খেলা', 'পায়ের শব্দ নেই' এবং 'খুনির নাম অজানা'—সবক'টা লেখাই পড়েছেন। বেশ ভালো লেখা। এই সাহিত্যের প্রথম সারিতে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতা যে ওর

আছে সেটা বোঝা যায়। ওর লেখা থেকে সবসময় একটা অদৃশ্য শক্তি ঠিকরে পড়ে চারিদিকে।

'দরজা লক করা হয়েছিল ভেতর থেকে—' রঞ্জন সিরিয়াস সুরে বলল, 'আর খুনি পালিয়েছে জানলা দিয়ে।'

হাততালি দিয়ে উঠল রঘুপতি যাদব। আজ সকাল থেকে এই লকড রুম প্রবলেমের কত উদ্ভট সমাধান যে তাকে শুনতে হল তার কোনও হিসেব নেই। জন ডিকসন কারের বইতেও বোধহয় এত ভ্যারাইটি পাওয়া যেত না! রঘুপতি ক্রমেই ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছিল। সুতরাং এবার ও মুখ খুলল : 'সাবাশ, রাইটারসাহেব, বহত খুব। খুনি তা হলে খিড়কি দিয়ে উড়ে পালিয়েছে!'

রঞ্জন দেবনাথ ঝটিতি ঘুরে তাকাল রঘুপতি যাদবের দিকে : 'কেন, দড়ি বেয়ে সে নীচের তলার কোনও ঘরে পালিয়ে যেতে পারে না?'

'তা হলে, পরে দড়ির গেঁটটা কে এসে খুলে দিয়ে যাবে সেটাও একটা প্রশ্ন—' এই মন্তব্য করেছেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

রঘুপতি হেসে বলল, 'কেন, ভগওয়ান এসে খুলে দিয়ে যাবেন! খুনির এই সঙ্কটে ওপরওয়ালা যদি তরস না খান, রহম না করেন, তা হলে তাঁর ওপর বিসওয়াস রেখে ফায়দা কী?'

ঘরের অনেকেই হেসে উঠলেন এ-কথায়।

রঞ্জন দেবনাথের মুখ লাল হল। উত্তেজনা আর অপমানে সে এক পা এগিয়ে গেল রঘুপতির দিকে।

রঘুপতি ওকে সাবধান করল : 'রাইটার, ডোন্ট মেক এনি মিসটেক।'

এসিজি হাত তুলে শান্ত করতে চাইলেন রঞ্জনকে : 'মিস্টার দেবনাথ, টেক ইট ইজি।'

'একটা ফুটো পয়সার ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে এর বেশি বুদ্ধি আমি আশাও করি না,' রাগে থরথর করছে রঞ্জনের গলা : 'কারণ আই. কিউ. খুব বেশি হলে বোধহয় পুলিশে চাকরি দেওয়া হয় না। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত, আপনার কাছে থেকে এ-প্রশ্ন শুনব এটা ভাবিনি। মনে হয় আপনার থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেছে—রিপেয়ার করতে হবে।'

এসিজি একফোঁটাও বিচলিত হলেন না রঞ্জনের কথায়। শুধু ভাবলেন, দেবারতি মানির প্রেমিক এইবার আলটাহাই পোটেনশিয়ালের প্রদর্শনী শুরু করেছে। সুতরাং নতুন ফার্নিচার সংগ্রহের জন্য তিনি তাঁর মাথার কুঠরিটাকে তৈরি রাখলেন।

কিন্তু এগিয়ে এল রঘুপতি যাদব। শক্তির মোকাবিলা করার অভ্যেস ওর অছে। চোয়াল শক্ত করে ও বলে উঠল, 'রাইটার কে বাচ্চে! বি কেয়ারফুল! পুলিশি দাওয়াই পড়লে এরপর থেকে হাতের বদলে পা দিয়ে লিখতে হবে। হুঁঃ, মুন্না আমার বুদ্ধিতে নোবেল প্রাইজ জিতে নিয়ে এসেছে!'

ভাস্কর রাহা অনেকক্ষণ মুখ বুজে থেকেছেন। আর পারলেন না। এসিজিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'অভদ্রতা ছাড়া কি খুনের তদন্ত করা যায় না, মিস্টার গুপ্ত? শুনেই দেখুন না রঞ্জন কী বলতে চায়—।'

এসিজি হাত তুলে শান্ত করলেন দুজনকেই। তারপর রঞ্জনকে লক্ষ করে বললেন, 'বলুন, মিস্টার দেবনাথ, কী বলতে চান আপনি—।'

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করল রঞ্জন। তারপর নীচু গলায় বলতে শুরু করল, 'আমি বহুদিন লিখিনি ঠিকই, তবে তা বলে গর্দভ হয়ে যাইনি। দড়ি বেঁধে নেমে পড়ার অনেক টেকনিক আছে। তারই একটা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে পারে। এই টেকনিকে দড়িটাকে ঠিক বাঁধার দরকার হয় না। ভারি এবং শক্ত কোনও জিনিসের ফাঁক দিয়ে দড়িটাকে ঠিক ছুঁচে সুতো পরানোর মতো করে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর তার দু-মাথা এক করে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় জানলা দিয়ে। সেই জোড়া দড়ি ধরে খুনি নেমে যেতে পারে নীচে—মানে, নীচের কোনও ঘরে। তারপর দড়ির একমাথা ধরে টান মারলেই সেটা সড়সড় করে চলে আসবে খুনির হাতে। যেমন ধরুন—' ভাস্কর রাহার খাটের কাছে এগিয়ে গেল রঞ্জন দেবনাথ। একটা কারুকাজ করা ভারী পায়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই পায়াটাকে ঘিরেও দড়িটা পরানো যেতে

পারে—কোনও অসুবিধে নেই। তখন ভগওয়ানকে আর তরস খেয়ে রহম করে কষ্ট করে দেবারতির ঘরে নেমে এসে দড়ির গেঁট খুলে দিয়ে যেতে হবে না—'শেষ কথাটা বাঁকা চোখে রঘুপতি যাদবের দিকে ছুড়ে দিয়ে বক্তব্য শেষ করল রঞ্জন।

'আপনাকে অভিনন্দন জানাই, মিস্টার দেবনাথ,' এসিজি হাসিমুখে প্রশংসা উপহার দিলেন রঞ্জনকে, 'রূপেন মজুমদারও আমাদের জানলা দিয়ে খুনির পালানোর কথা বলেছিলেন, তবে এত সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। কিন্তু সমস্যা হল, দেবারতির ঘরের জানলা দিয়ে নেমে খুনি শেষ পর্যন্ত যাবে কোথায়! হয় সে খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়বে ভাস্কর রাহা কিংবা অনির্বাণ ঘোষের ঘরে...অথবা, সে নেমে পড়বে একেবারে নীচে—ভাস্করবাবুর গাড়ির ওপরে। এ তিনটে পথই সমান বিপজ্জনক—কারণ, দেবারতির খুন নিঃশব্দে হয়নি।' একটু দম নিয়ে মাথার চুলে বারতিনেক টান মেরে তারপর : 'সে যা-ই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। খোলা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। নীচ থেকে ভেসে আসছে র‍্যাপ মিউজিক—হোটেল 'সিরাজ'-এর রেস্তরাঁয় আমোদ-প্রমোদ চলছে।

এসিজি একটা সিগারেট ধরিয়ে রঞ্জন দেবনাথকে দেবারতির ইন্টারভিউর কথা জিগ্যেস করলেন। কিন্তু ওর উত্তরে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল একই প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, দেবারতি তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় শুধুই খোঁচা দিয়েছে, অপমান করেছে।

সন্ধের ঠিক মুখোমুখি জ্যোতিষ্ক সান্যালকে ধরেছিল দেবারতি। কনফারেন্স রুমের বাইরের করিডরে একপাশে সরে গিয়ে কথা বলেছিলেন ওঁরা।

'আপনি লেখেন কেন, মিস্টার সান্যাল?'

'লিখতে ইচ্ছে করে, তাই—।'

'কখনও মনে হয় না, শুধু-শুধু পাতার পর পাতা ভরিয়ে লিখে গিয়ে কী লাভ!'

'না, মনে হয় না।'

চোখ ছোট করে, ঘাড় কাত করে হেসেছে রমণী। তারপর : 'অনেক সিরিয়াস লেখক ভালো লিখতে চান, অথচ পারেন না। তাই তাঁরা লেখা ছেড়ে দেন। ভাবেন, এরকম লিখে কী লাভ! আর আপনাদের মতো লেখকদের লজিক ঠিক উলটো : আপনারা ভাবেন, লিখলে কী-ইবা ক্ষতি! তাই না?'

'আপনি কি লেখকদের লেখার লাইসেন্স ইস্যু করার ঠিকে নিয়েছেন?' জ্যোতিষ্ক বেশ বুঝতে পারছিলেন, ব্লাড প্রেশার ক্রমেই ওপর দিকে উঠছে।

দেবারতি মোটেই রেগে যায়নি। খিলখিল করে হেসে বলেছে, 'আপনি লেখা ছাপানোর জন্যে যতটা সিরিয়াস লেখার জন্যে মোটেই ততটা নন।'

এইখানেই শেষ হয়েছে অপমানজনক সাক্ষাৎকার। কারণ, জ্যোতিষ্ক সান্যাল যবনিকা টেনেছেন অকস্মাৎ। দেবারতির সামনে থেকে হনহন করে চলে গেছেন।

অর্জুন দত্ত আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তাঁদের ইন্টারভিউ নেহাতই মামুলি ছিল।

এসিজির গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা গেল না, তিনি সে-কথা কতটা বিশ্বাস করলেন। তাঁর শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল : সকলের সঙ্গে কথা বলে দেবারতি মানির চরিত্র যতটুকু জানা গেছে, তাতে ও সাদামাঠা ইন্টারভিউ নেওয়ার মতো সাংবাদিক ছিল না। কিন্তু এখন তো আর সঠিক সত্য জানার উপায় নেই! তা ছাড়া দেবারতির ঘর থেকে পাওয়া শর্টহ্যান্ড নোটসগুলো রঘুপতি এর মধ্যে ডিসাইফার করিয়ে ফেলেছে। তাতে খাপছাড়াভাবে অনেক কথা লেখা আছে।

বিষয় : রহস্য-সাহিত্য আর রহস্য-সাহিত্যিক। তবে সেই নোটসগুলো ঠিক কোন-কোন লেখক সম্পর্কে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

মোটামুটি হতাশ হয়ে অনামিকা সেনগুপ্তকে ইন্টারভিউর কথা জিগ্যেস করলেন অশোকচন্দ্র। কিন্তু কোনও লাভ হল না। অনামিকাও 'মামুলি' শব্দটার সাহায্য নিল।

অথচ সাক্ষাৎকারটা বোধহয় ঠিক মামুলি ছিল না, ভাবল অনামিকা।

'আপনাকে লেখা ছাপানোর জন্যে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না।' মন্তব্য করেছিল দেবারতি মানি।

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল অনামিকা।

'সম্পাদক, প্রকাশক, সিনিয়ার লেখক—দেখবেন, সবাই আপনাকে হেল্প করবে। আড়াল আর সুযোগ পেলে আপনার লেখা সামনে-পেছনে কারেকশন করে দেবে।' প্রগলভ হাসি—যার সবটাই অর্থময় : 'আপনাকে দেখতে-শুনতে খারাপ নয়। এ যেন ভগবানের দেওয়া লাখ টাকার চেক। শুধু ভাঙাবেন আর খাবেন। সেরকম কোনও পরিশ্রম করার দরকার নেই।'

'আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ—' ঠোঁট টিপে জবাব দিয়েছে অনামিকা।

তারপর অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আক্রমণ করেছে দেবারতি। আর শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউটার ডাকনাম হয়ে গেছে 'ঝগড়া'।

কিন্তু এসব কথা কি প্রকাশ্যে বলা যায়! তা ছাড়া খুনের সঙ্গে কী-ইবা সম্পর্ক আছে এর!

ঘরে হাজির সাতজন লেখককে জরিপ করলেন অশোকচন্দ্র। আপাতভাবে সবাইকেই খুব শান্ত আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ওই প্রশান্ত অভিব্যক্তির আড়ালে চলেছে সর্বনাশা ঢেউয়ের উথালপাথাল।

অনিমেষ চৌধুরিকে ইন্টারভিউর কথা জিগ্যেস করা হয়নি—আর জিগ্যেস করে বোধহয় লাভও নেই। তবে অধ্যাপকের দেওয়া সূত্র ধরে উৎপলেন্দু সেনকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

রঘুপতিকে কাছে ডাকলেন এসিজি। চাপা গলায় বললেন, 'এখানকার কাজ শেষ হলেই তুমি ঘরগুলো সার্চ করার কাজ শুরু করে দাও। ঘরের নম্বর ধরে লিস্ট তৈরি হলে তারপর তোমার ওই টাইম-চার্টগুলো নিয়ে আর একবার বসব।' তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে : 'আচ্ছা, পি.এম. রিপোর্টের খবর কী?'

'কাল পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ফোরেনসিক রিপোর্টও মিলে যাবে।' রঘুপতি উত্তর দিল।

নিজের ঠোঁটে তর্জনী দিয়ে টোকা মারলেন এসিজি। মাথার পাকা চুলের গোছা টানলেন কয়েকবার। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'তা হলে কাল বাদ পরশু...সম্মেলনের শেষ দিন...।'

'শেষ দিন কী, গুপ্তাসাব?'

'ওই শেষ দিন আমাদেরও কাজ শেষ করতে হবে। পাখি ধরতে হবে, রঘুপতি, পাখি।'

রঘুপতি যাদব একটু অবাক চোখে তার পুরোনো 'স্যার'-কে দেখল।

এইবার উৎপলেন্দু সেনের দিকে ঘুরে তাকালেন এসিজি। চোখ ছোট করে সিগারেটে টান দিয়ে হঠাৎই কেশে উঠলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মিস্টার সেন, কাল রাতে আপনি ক'টায় শুতে গেছেন?'

একটু সময় নিয়ে ভেবে তারপর উত্তর দিলেন উৎপলেন্দু, 'এই এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ।'

'শুতে যাওয়ার আগে দেবারতিকে আপনি ডাকতে গিয়েছিলেন?'

'না, কেন বলুন তো?' শান্ত স্বরে কথা বললেন উৎপল।

এসিজি বেশ কয়েক সেকেন্ড উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলার অভ্যেসটা আপনার কবে থেকে হয়েছে—লেখক হওয়ার আগে, না পরে?'

উৎপলেন্দু সেনের মুখ লাল হল। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

'আমরা খবর পেয়েছি, আপনি কাল রাত এগোরোটা নাগাদ দেবারতির ঘরের দরজায় গিয়ে ওকে ডেকেছিলেন। কী একটা রহস্যময় পরীক্ষার ব্যাপারে আপনাদের কথা হয়েছিল।'একটু থেমে এসিজি আবার যোগ করলেন, 'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দেবারতি মানি আপনার সঙ্গেই শেষ কথা বলেছিল।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর মুখ খুললেন উৎপলেন্দু সেন : 'বুঝেছি, অনিমেষ চৌধুরি এসব খবর আপনাকে দিয়েছে...ওর ঘর দেবারতি মানির পাশেই। নির্ঘাত আড়ি পেতে সব শুনেছে...মেয়েছেলেরও অধম!'

উৎপলেন্দু ঘরে হাজির সকলের দিকে একবার তাকালেন। সবার সামনে কি বলা যায় কথাগুলো? বিশেষ করে অনামিকার সামনে? কিন্তু তাঁর বেলা তো সৌজন্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি দেবারতি। তা হলে তিনি কেন মধ্যবিত্ত সৌজন্য নিয়ে সঙ্কোচ পাবেন? যা হওয়ার হাটের মাঝেই হোক।

'দেবারতি মেয়েটা ভীষণ বাজে ছিল...।'

'উৎপলদা, প্লিজ, একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন!' প্রতিবাদে মুখ খুলেছে রঞ্জন দেবনাথ।

'সত্যি কথা চিরকাল একটু অভদ্রই শোনায়,' উৎপলেন্দু প্রথমে রঞ্জনের দিকে তাকালেন, তারপর এসিজির দিকে : 'এই কারণেই প্রথমে মিথ্যে বলেছিলাম, কারণ সত্যি কথা আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। ভালো করে শুনুন—' গলার স্বর কয়েক পরদা উঁচু হল তাঁর : 'দেবারতি আমার পুরুষত্ব পরীক্ষা করতে চেয়েছিল...।'

'সে-সাহস থাকলে অ্যাদ্দিনে আপনার মুখেভাত হয়ে যেত।' কথাটা মনে পড়ে গিয়ে রাগে গা রি-রি করতে লাগল উৎপলেন্দুর।

রঘুপতি যাদব মাথা নীচু করে ডায়েরিতে কীসব নোট করছিল। সেদিকে আঙুল তুলে উঁচু গলায় বললেন উৎপলেন্দু, 'ভালো করে লিখে নিন—যেন কিছু বাদ না যায়। এইমাত্র যা বললাম, সেই পরীক্ষা দিতেই ওর ঘরে কাল রাতে গিয়েছিলাম। দরজা খুললে বুঝিয়ে দিতাম, মুখেভাত হয়েছে কি হয়নি—।'

ভাস্কর রাহা উত্তেজিত উৎপলেন্দুকে শান্ত করার জন্য কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। উৎপলের শেষ কথাটা শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'মুখেভাত! তার মানে!'

এসিজি আর রঘুপতিও একইসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে উৎপলেন্দু বললেন, 'ও কিছু নয়, আপনারা বুঝবেন না—' তেতো হাসলেন তিনি : 'তা মেয়েটা দরজা খোলেনি। হয়তো ঘরে অন্য কেউ ছিল। মেয়েটা তো একা শুতে পারত না। ওর কাছে সব মাসই ভাদ্রমাস।'

'উৎপল! আপনি কি কাণ্ডজ্ঞান হারালেন!' তিরস্কার করে উঠেছেন ভাস্কর। কারণ তিনি লক্ষ করেছেন, কিছুক্ষণ আগেই অনামিকা সরে গেছে সামনে থেকে। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখার ভান করছে। ওর খানিকটা পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঞ্জন দেবনাথ।

উৎপলেন্দুর মুখের ওপর দিয়ে লু বইছিল। অসহ্য এক তাপে তাঁর কান আর গাল যেন পুড়ে যাচ্ছিল। সম্পাদক-প্রকাশকদের উপেক্ষা আর অবহেলার অপমান তিনি সয়ে চলেছেন বহু বছর ধরে। কিন্তু তাই বলে একটা হাঁটুর বয়েসি মেয়ে-জার্নালিস্টের খোঁচাও তাঁকে একইভাবে সইতে হবে! সহ্যের একটা সীমা থাকা দরকার!

একটু সময় নিয়ে শান্ত গলায় অশোকচন্দ্র জিগ্যেস করলেন, 'দেবারতির কথাবার্তা কি আপনার স্বাভাবিক মনে হয়েছিল?'

'না, একটু জড়ানো মনে হয়েছিল—তবে সেটা বোধহয় ড্রিঙ্ক করার জন্যে।'

এসিজি ছোট্ট একটা শব্দ করলেন মুখ দিয়ে। মাথার চুলের গোছায় টান মারলেন দুবার। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'উৎপলেন্দুবাবু, হিসেব মতো বলতে গেলে আপনার সঙ্গে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই দেবারতি মানি জানলা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়েছে। তার মানে, ওই সময়ে কেউ যদি দেবারতির ঘরে থেকে থাকে তা হলে সে-ই ওকে খুন করেছে।'

'তো যান, তাকে গিয়ে ধরুন...' উৎপলেন্দু শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। দেবারতির খুনি ধরা পড়ল কি পড়ল না তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। অসহ্য একটা বিরক্তি আর রাগ ফুলে-ফুলে উঠছিল তাঁর বুকের

ভেতরে।

ভাস্কর রাহা এগিয়ে এসে উৎপলেন্দুর হাত ধরে আলতো করে টান মারলেন। বললেন, 'চলুন, বাইরে যাই—' তারপর এসিজিকে লক্ষ করে : 'মিস্টার গুপ্ত, আমরা একটু বাইরের বারান্দায় যাচ্ছি। এখানে কেমন দম আটকে আসছে।'

ওঁদের দুজনকে দেখলেন এসিজি। তারপর ঘাড় নাড়লেন। অনেক ধকল যাচ্ছে এই দুই প্রবীণ লেখকের ওপর দিয়ে।

উৎপলেন্দু সেনকে নিয়ে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন ভাস্কর রাহা। গত বিশটা বছর তিনি পথ হেঁটেছেন উৎপলের সঙ্গে। ওর মধ্যে কী সুন্দর একটা রসিক মানুষ ছিল। ক্রমাগত আঘাত পেয়ে-পেয়ে সেই মানুষটা □□ঢ়□□□□ বেরসিক হয়ে গেছে।

মনে পড়ে, প্রায় আঠেরো-বিশ বছর আগে 'মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকার সম্পাদক তথা মালিক শুভব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের পইতের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন ওঁরা দুজনে। খেতে বসে সামনের একটা লম্বা করিডর দেখিয়ে উৎপলেন্দু বলেছিলেন, 'বুঝলেন ভাস্করবাবু, ওটা হচ্ছে ''উৎপলেন্দু সেন সরণি''—।'

ভাস্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'মানে?'

উৎপলেন্দু খাওয়া থামিয়ে হেসে জবাব দিয়েছেন, 'মানে আর কী! শুভব্রতদার কাগজে গত পাঁচ বছরে বিনিপয়সায় এত লেখা লিখেছি যে, ওগুলোর পাওনা টাকা দিয়েই ওঁর বাড়ির ওই করিডরটা তৈরি হয়েছে...সোজা বাংলায় ওই করিডরটুকুর মালিক আমি।'

এরপর প্রাণখোলা হেসে উঠেছেন দুজনে।

এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ভাস্করের মনে হল, গত বিশ বছর ধরে উৎপলেন্দু সেন সরণির সব জায়গাতেই শুধু ব্যর্থতা, দুঃখ আর হতাশার তেতো ছাপ পড়েছে। আর উৎপলের সেদিনের সেই প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে কবে থেকে যেন চাপা কান্না মিশে গেছে।

ভাস্কর আর উৎপলেন্দু ঘর থেকে চলে যেতেই উঠে দাঁড়ালেন প্রেমময় চৌধুরি। অশোকচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, 'আমি আসি, মিস্টার গুপ্ত। এতদিন ধরে রহস্য-গোয়েন্দা কাগজ চালাচ্ছি, তাই ব্যাপারটা নেশার মতো হয়ে গেছে। সেইজন্যেই এতক্ষণ ধরে আপনাদের কথাবার্তা শুনছিলাম। এখন যাই—খুব টায়ার্ড লাগছে। তা ছাড়া ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

এসিজি সৌজন্যের হাসি হাসলেন—কিছু বললেন না।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল অর্জুন দত্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'বুঝেছেন, বুড়োর ''ওষুধ'' খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। শালা এমন পাবলিক, আমার একটা গল্প নিয়ে সাত মাস ধরে চেপে বসে আছে।'

অর্জুন দত্ত শুধু বললেন, 'চলুন, আমরাও যাই। আমার একটু লেখালিখির কাজ আছে।'

ওঁরা তিনজন প্রায় একসঙ্গেই বেরোলেন ঘর ছেড়ে। যেতে-যেতে জ্যোতিষ্ক প্রেমময়কে বললেন, 'প্রেমদা, শুনলাম আপনি নাকি কী একটা কাজে সাতাশ তারিখে দিল্লি যাচ্ছেন—।'

'হ্যাঁ, তিনদিনের জন্যে যাব...কিন্তু এখনও টিকিটটা কাটা হয়নি।'

'তাই নাকি! তা হলে আপনি এক কাজ করুন। আপনার ঘরে চলুন, জার্নির ডিটেইলসটা আমাকে দিয়ে দিন। আমার সেজ শালা রেলে কাজ করে। আমি ওকে দিয়ে টিকিটটা করিয়ে আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

'তা হলে তো খুব ভালো হয়,' হাসলেন প্রেমময় : 'বুড়ো হাড়ে আর ধকল পোষায় না।'

ওরা চলে যাওয়ার পর ঘরে এখন মাত্র তিনজন লেখক : রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সেনগুপ্ত আর রঞ্জন দেবনাথ।

এসিজি রঘুপতি যাদবকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'রঘুপতি, তুমি বরং ঘরগুলো সার্চ করার কাজ শুরু করে দাও। আমি এদিকে শেষ করে তারপর যাচ্ছি। তা না হলে শুধু-শুধু রাত হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুমি এখন অনেককেই ঘরে পেয়ে যাবে।'

'ওকে, স্যার।' কাগজপত্র আর ফাইল গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল রঘুপতি।

এসিজি তখন অনামিকা আর রতনকে বললেন যে, রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে তিনি আলাদাভাবে কয়েকটা কথা সেরে নিতে চান।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় নিলেন। যাবার আগে বললেন, 'কোনওরকম দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন...'

অনামিকাও চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎই ও থমকে দাঁড়াল। ফিরে এসে রঞ্জনকে নীচু গলায় কী একটা বলল। তারপর চলে এল এসিজির কাছে—প্রায় মুখোমুখি।

'মিস্টার গুপ্ত একটা কথা বলার ছিল।'

'বোসো,' একটা সোফায় ওকে বসতে বললেন এসিজি। নিজেও আর-একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরালেন। তারপর : 'বলো, কী বলবে—।'

অনামিকার নাকের ডগায় কয়েকটা সূক্ষ্ম ঘামের ফোঁটা। চোখ গভীর অথচ চঞ্চল। মাঝে-মাঝে আড়চোখে দেখছে রঞ্জনের দিকে।

'দেবারতি ঠিক ক'টার সময় খুন হয়েছে বলুন তো?'

'ভাস্করবাবু আর হোটেলের লোকজন যা বলছেন তাতে মনে হয় রাত সোয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

'না, মানে, কাল রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। একটু আগে উৎপলদার কথা শোনার পরই ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

'কী ব্যাপার?'

'কাল রাতে উৎপলদা দেবারতির ঘরের কাছ থেকে চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচ-সাত পর আমি দেবারতির কাছে গিয়েছিলাম...মানে, তখন এগারোটা বেজে বড়জোর পাঁচ-সাত কি দশ মিনিট হবে—'

এসিজি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কী বলছে অনামিকা!

'তোমার টাইমের ব্যাপারটায় কোনও ভুল নেই তো?'

অনামিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না—আমি ঘড়ি দেখেছি।'

'তুমি দেবারতির কাছে গিয়েছিলে কেন?' এসিজি জানতে চাইলেন। সিগারেটে বারকয়েক ঘন-ঘন টান দিলেন।

'আসলে...ওর সঙ্গে...' একটু ইতস্তত করে অনামিকা বলল, 'আমার একটু ইয়ে, মানে, ঝগড়া মতন হয়েছিল—ওই ইন্টারভিউ নেবার সময়। ওর কথায় আমি একটু মাথা গরম করে ফেলেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, কাজটা ঠিক হয়নি। মানে, আমি তো সবে লেখালিখি করছি...''সুপ্রভাত''-এর রবিবারের পাতাতেও গল্প দিয়েছি। ওই পাতাটা যিনি দেখেন, মানে, রমাতোষ ভৌমিক, তাঁর সঙ্গে দেবারতি মানির রিলেশন বেশ ভালো। তাই মনে হল, ব্যাপারটা মিটমাট করে নিই। দেবারতি মনখোলা মেয়ে—ওকে বুঝিয়ে রিকোয়েস্ট করলে হয়তো আর কিছু মাইন্ড করবে না। সেইজন্যেই ওর ঘরে গিয়েছিলাম।'

একটু দম নিয়ে রুমালে নাক-মুখ আলতো করে মুছে অনামিকা আবার বলল, 'তো দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজিয়ে দেখি কোনও সাড়া নেই। তখন নব ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। দরজা খুলল না—লক করা।'

'ভেতর থেকে কোনও কথাবার্তার শব্দ পাওনি?' প্রত্যাশায় চকচক করে উঠেছে বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখ।

'না।'

'কিন্তু আমার ধারণা, সেই সময়ে ঘরের ভেতরে দেবারতির সঙ্গে কেউ ছিল। সে-ই খুন করেছে দেবারতিকে।'

'উঁহু, ওইখানেই তো যত গোলমাল।'

'তার মানে? তুমি কি কিছু দেখেছ নাকি?'

আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত করল অনামিকা। তারপর বলল, 'না, কিছু দেখিনি। আর সেইজন্যেই তো ব্যাপারটার মধ্যে কেমন একটা হেঁয়ালি আছে বলে মনে হচ্ছে। ওর ঘর থেকে কোনওরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি দরজার চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম, দরজার সোজাসুজি পশ্চিমের জানলাটা হাট করে খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই।'

'হয়তো দেবারতি তখন টয়লেটে গিয়ে থাকতে পারে।'

'না। কারণ চাবির ফুটো দিয়ে বাথরুমের দরজাটাও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ওটা খোলা ছিল। আর, বাথরুমে কোনও আলো জ্বলছিল না।' মাথা নাড়ল অনামিকা : 'না, মিস্টার গুপ্ত, তখন তিনশো আট নম্বর ঘরে কেউ ছিল না।'

মাথার চুলের গোছায় টান মারতে লাগলেন এসিজি। উঠে পড়লেন সোফার আরাম ছেড়ে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! অনামিকা দেবারতির ঘরে কাউকে দেখেনি! অথচ তার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই খুন হয়েছে মেয়েটা। তার মানে, উৎপলেন্দুবাবু চলে যাওয়ার ঠিক পরেই দেবারতি মানি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, আবার অনামিকা চলে যাওয়ার পরে-পরেই ঘরে ফিরে এসেছে খুন হওয়ার জন্য। নাঃ, একেবারে অস্বাভাবিক!

এসিজির মগজের ভেতরে রুবিক কিউবের খুদে কিউবগুলো বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর একইসঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করছিল তাঁর। ঘরেই ছিল না মেয়েটা, অথচ পট করে খুন হয়ে গেল!

রঞ্জন দেবনাথ এসিজির কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'থিঙ্কিং মেশিন, দিস ইজ আ রিয়েল প্রবলেম ফর ইউ।' ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

'আ-আমি তা হলে যাই...' অনামিকা বলল।

এসিজির অন্যমনস্কতার ঘোর কেটে গেল হঠাৎ। একটু চমকে উঠেই বললেন, 'হ্যাঁ—যাও।'

অনামিকা চলে যেতেই রঞ্জন দেবনাথ একা। ওকে দেখে একটু অবাক লাগল এসিজির। সবে কাল রাতে মারা গেছে দেবারতি মানি। অথচ এর মধ্যেই রঞ্জন বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

'দেবারতিকে কীরকম ভালোবাসতেন, রঞ্জনবাবু?' আচমকা প্রশ্ন করেছেন এসিজি।

রঞ্জনকে হঠাৎই একটু অপ্রস্তুত দেখাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, ভালোবাসতাম, তবে তার শ্রেণিবিভাগ করতে পারব না।'

পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করল রঞ্জন। মুখ আড়াল করে সিগারেট ধরাল।

'দেবারতি সম্পর্কে দু-চারকথা বলুন,' অনুরোধ করলেন অশোকচন্দ্র।

'নতুন কী আর বলব বলুন!' সিগারেটে গভীর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রঞ্জন : 'ও রহস্য-সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। আর আমাদের মধ্যে কোনও-কোনও লেখককে বলত রেস্তোরাঁর বেয়ারা। মানে, লেখার প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা, যত্ন, কিস্যু নেই...পাঠকরা যখন যা চায় রেস্তোরাঁর বেয়ারার মতো সেটাই প্লেটে সাজিয়ে দেয়...।'

'আপনি কি সেই বেয়ারাদের একজন?' রঞ্জনকে একটু খোঁচা দিতে চাইলেন এসিজি।

'জানি না। ও কখনও আমাকে নামগুলো বলেনি।'

'আপনার সঙ্গে ওর শেষ কখন দেখা হয়েছিল?'

'ওই সাড়ে ন'টা দশটার সময়ে...এই লেখাটেখার ব্যাপার নিয়ে ওর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল...'

এসিজি সরাসরি তাকালেন রঞ্জনের চোখে : 'তা হলে ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য করার মতো আর কিছু আপনার বলার নেই?'

রঞ্জন দেবনাথের চোখের পাতা এতটুকু কাঁপল না। ও উদ্ধতভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনি হুনুর—এখানে হুনুরি করতে এসেছেন। খুনি ধরা আপনার কাজ, আমার নয়। বুদ্ধি থাকলে যেসব তথ্য পেয়েছেন তা থেকেই খুনি ধরা যায়। ইটস ইওর গেম। গুড বাই।'

রঞ্জন দেবনাথ দ্রুতপায়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে। সিগারেটের ধোঁয়ার রেখার মাঝে অশোকচন্দ্র গুপ্ত দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। একা।

চোখ বুজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পলিতকেশ বৃদ্ধ হুনুর প্রাণপণে চেষ্টা করলেন খুনির ছবিটা দেখতে, কিন্তু অদৃশ্য এক পাগল-করা ঢেউ বারবার ছবিটাকে ঝাপসা করে দিচ্ছিল। তবে এটুকু বুঝতে পারছিলেন, দেবারতি কীভাবে খুন হয়েছে সেটা ধরতে পারলেই বাকিটা ধরে ফেলা যাবে অনায়াসে।

কিন্তু ঠিক কীভাবে খুন হয়েছে দেবারতি মানি?

নয়

আজ সম্মেলনের শেষ দিন।

দেবারতি মানির ঘটনার পরদিন থেকেই সম্মেলনের সুর কেটে গেছে। যেন যান্ত্রিকভাবে কয়েকটা রোবট তাদের মাস্টার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে চলেছে। দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই চাপা আলোচনা করে চলেছেন দেবারতির মৃত্যু নিয়ে। খবরের কাগজগুলো এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনা বলে চালাতে চেষ্টা করছে। তবে পাঠকদের বেশিরভাগই সেটা মেনে নিতে নারাজ। তার প্রধান কারণ, সাধারণ মানুষ, যাদের রোজকার জীবন নিতান্তই সাধারণ, তারা সবসময় রহস্য-রোমাঞ্চ পছন্দ করে। কোনও খবর চাঞ্চল্যকর হলে তবেই সেটা তাদের আগ্রহ জাগায়, তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই খবরের ওপরে।

সুতরাং বলরুমে মোটামুটি একটা অশান্তভাব ছিল। গত পরশু সকালে ভাঙা হাটে সম্মেলন শুরু হওয়ার সময়ে দেবারতি মানির আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, আর পালন করা হয়েছিল এক মিনিট নীরবতা। ব্যস, তারপর থেকেই আসর জুড়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে একটাই প্রশ্ন : দেবারতি মানির মৃত্যুর পিছনে রহস্যটা কী?

আজ, বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের শেষ দিনেও, সেই একই প্রশ্ন কুরে-কুরে খাচ্ছে সবাইকে।

হলের একেবারে পিছনের সারিতে বসেছিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। চোখের কোণে, কপালে আর নাকের দুপাশে বলিরেখা প্রকট। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করছিলেন একটা সিগারেট ধরানোর জন্য। কিন্তু এয়ার কন্ডিশন্ড বলরুমে ধূমপান নিষেধ।

এসিজির পাশেই বসে ছিল রঘুপতি যাদব। হাতে যথারীতি কাগজপত্রের ফাইল। এ-ক'দিনের ধকলে বেচারার মুখেও ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

ওয়ার্কশপে গল্পপাঠের আসর বসেছে। প্রত্যেক লেখক নিজের লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন। এই লেখা প্রত্যেকে লিখেছেন গত চারদিনের মধ্যে—অর্থাৎ, কনফারেন্স শুরু হওয়ার দিন থেকে তাঁরা লেখায় হাত দিয়েছেন।

এসিজি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল অনামিকা সেনগুপ্ত। গল্পের বিষয় লকড় রুম প্রবেলম। জানলা-দরজা বন্ধ একটা ঘরের ভেতরে একজন মানুষ মরে পড়ে আছে। বুকে বিঁধে আছে তীর।

জানলা বা দরজায় এমন কোনও ফাঁক-ফোকর নেই যা দিয়ে তীর ছোড়া যায়।

এসিজির মনে পড়ে গেল কার্টার ডিকসনের লেখা 'দ্য জুডাস উইন্ডো' উপন্যাসটার কথা। সেখানেও সমস্যাটা একইরকম ছিল। আর সমাধান ছিল ভারি অদ্ভুত! দরজার হাতলের প্লেটের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলেছিল খুনি। তারপর প্লেটসমেত হাতলটা সরিয়ে নিয়েছে। ফলে দরজার গায়ে যে-ছোট্ট ফোকর তৈরি হয়েছে তাতে ক্রসবো লাগিয়ে সে তীর ছুড়েছে নির্ভুল লক্ষ্যে। তারপর আবার হাতলটা লাগিয়ে দিয়েছে জায়গা মতো। অভিনব, তবে বড্ড কষ্টকল্পিত সমাধান।

কিন্তু অনামিকার সমাধানটা অনেক সহজ-সরল এবং বাস্তব। খুন হওয়ার আগে মানুষটা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। হঠাৎই খুনির ছুড়ে দেওয়া তীর এসে লাগে তার বুকে। সেই অবস্থায় সে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতরে। দরজা বন্ধ করে দেয়। জানলাগুলো সব আগে থেকেই বন্ধ করা ছিল। সুতরাং আহত লোকটি যখন ছটফট করতে-করতে বন্ধ ঘরের মধ্যে মারা যায়, তখনই তৈরি হয়ে যায় 'বন্ধ ঘরের রহস্য'।

এসিজি শুনছিলেন আর অবাক হয়ে ভাবছিলেন। একই ঘটনার কতরকম সমাধান সম্ভব! দেবারতি মানির বেলাতেও তাই। দশজনের মধ্যে অন্তত ছ'জন লেখক ছ'রকম সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকটা সমাধানের মধ্যেই কোনও না কোনও ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সাহায্য নিয়েই তিনি খুঁজে পেয়েছেন সঠিক উত্তর। বিশেষ করে অনামিকার শেষ কথাগুলো শোনার পর আর কোনও অসুবিধে হয়নি। চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ও ঘরে কাউকে দেখতে পায়নি, এই তথ্যটাই এসিজিকে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া রঞ্জন দেবনাথের কাছ থেকেও তিনি কম সাহায্য পাননি। রঞ্জন উদ্ধত, তবে বুদ্ধিমান লেখক তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এত সত্ত্বেও লকড রুম প্রবলেমের কিছুটা অংশ এখনও ঝাপসা থেকে গেছে।

রঘুপতির কাছ থেকে দুটো কাগজ চেয়ে নিলেন তিনি। গত দুদিনে দশটা ঘর সার্চ করে যা-যা পাওয়া গেছে তারই একটা নির্বাচিত তালিকা। আগেও অনেকবার দেখেছেন, তবু আরও একবার চোখ বোলালেন অশোকচন্দ্র।

> *অনামিকা সেনগুপ্ত (রুম নাম্বার ৪০৭) :* রঞ্জন দেবনাথের উপহার দেওয়া দুটো গানের ক্যাসেট আর একটা বই—সমরেশ মজুমদারের 'প্রেমের গল্প'। পাঁচ মিটার লম্বা একটা লাল রঙের নাইলনের দড়ি। একটা খালি বিয়ারের বোতল।
>
> *রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় (রুম নাম্বার ৪০৮) :* দেড় ডজন ভ্যালিয়্যাম ফাইভ ট্যাবলেট। ছ'টা সিপলক্স ক্যাপসুল। চুলে কলপ করার মেহেদি পাতার গুঁড়োর প্যাকেট। ম্যাকডাওয়েল হুইস্কির একটা ছোট বোতল—তার অর্ধেকের বেশি খালি। এক কাটিম সাদা সেলাইয়ের সুতো। একটা মাঝারি মাপের ছুঁচ। রূপেন মজুমদারের উপহার দেওয়া এক কপি 'ডাকিনীর হাতছানি'।
>
> *জ্যোতিষ্ক সান্যাল (রুম নাম্বার ৪০৯) :* একটা এয়ার পিস্তল। একটা ছোট ছুরি। একটা রহস্য উপন্যাসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি—নাম 'খুন জখম রাহাজানি।'।
>
> *রূপেন মজুমদার (রুম নাম্বার ৪১০) :* বাইশ কপি 'ডাকিনীর হাতছানি'। চারটি ছোট গল্প, একটি নভেলেট এবং একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি : প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় ওপরে বাঁদিকে বড় বড় করে লেখা 'সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনি'। এক শিশি 'থার্টি প্লাস' ট্যাবলেট। সবক'টি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকার নাম-ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লেখা একটি ডায়েরি।

রঞ্জন দেবনাথ (রুম নাম্বার ৪১১) : অনামিকা সেনগুপ্তের দেওয়া জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'। কয়েকটা বিদেশি রহস্য উপন্যাস। একটা ক্রসওয়ার্ড পাজলের বই। দুটো প্রেমের কবিতা—অর্ধেকটা করে লেখা। একটা বড় কাঁচি আর হাত তিনেক লম্বা একটা সাদা দড়ি। চারটে রঙিন কাচের পুতুল। তিনটে 'কামসূত্র' কন্ডোম।
অনিমেষ চৌধুরি (রুম নাম্বার ৩০৭) : সতেরোটি বিদেশি কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস—প্রত্যেকটা বইয়ের টাইটেল পেজে ইংরেজি নামের পাশে হাতে লেখা সম্ভাব্য বাংলা নাম। দুটি বিদেশি সফট পর্নো ম্যাগাজিন। এক ফাইল বলবর্ধক 'শিলাজিৎ' ট্যাবলেট। ন'টা অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (রুম নাম্বার ৩১০) : নিজের লেখা বিভিন্ন বই—মোট সাতষট্টি কপি। দুটি উপন্যাস, তিনটি নভেলেট এবং সাতটি ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি। বিভিন্ন পাঠকের লেখা একতাড়া প্রশংসাপত্র। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে পাওয়া বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপের জরাজীর্ণ দুটো সার্টিফিকেট আর তার পাঁচটি করে ফটোকপি। (এই সার্টিফিকেট দুটোর ফটোকপি দেবারতি মানির ঘর থেকে পাওয়া গেছে —সম্ভবত ইন্টারভিউ নেবার সময় লেখক দিয়েছিলেন)।

ভাস্কর রাহা (রুম নাম্বার ২০৮) : হুইস্কির একটা খালি বোতল। কয়েকটা বিদেশি সাহিত্য পত্রিকা। খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া রহস্য-সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটা খবরের কাটিং। দেবারতি মানির লেখা একটা ফিচারের খসড়া। 'ভয়ংকর' আর 'ছায়াময়' পত্রিকার প্রথম বছরের চারটি পুরোনো সংখ্যা। কয়েকটা আধপোড়া চুরুট। এক বাক্স আলপিন। একটা নীল রঙের 'রেনল্ডস' বলপয়েন্ট পেন (দেবারতি মানির ঘরে টেবিলের ওপরে পাওয়া পেনটার মতো)।

অর্জুন দত্ত (রুম নাম্বার ২০৯) : তেরোটি বিদেশি রহস্য-রোমাঞ্চ 'সত্যকাহিনি' জাতীয় পত্রিকা। মহিলাদের চারটে ফ্যাশান ম্যাগাজিন। ব্যায়াম করার জন্য একটা 'বুলওয়ার্কার'। দশটা ক্যামপোজ ট্যাবলেট। নাম-না-জানা দুজন মহিলার ফটো। 'ছায়াময়' পত্রিকার এ-বছরের পুজো সংখ্যা।
উৎপলেন্দু সেন (রুম নাম্বার ২১০) : বাংলা সাহিত্যের নামি কয়েকজন লেখকের লেখা পাঁচটি উপন্যাস—পাঁচটি বই-ই লাল কালি দিয়ে দাগ কেটে নানান মন্তব্যে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর রাহা এবং রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা করে উপন্যাস (এগুলোও লাল কালিতে যথেষ্ট কলঙ্কিত)। দুটো 'প্লেওয়ে' আর একটা 'ফ্যানটাসি' পত্রিকা—তাতে ন্যুড পোস্টারের পাতাগুলো ব্যবহারে ব্যবহারে কোঁচকানো। দেবারতি মানি সম্পর্কে কটু মন্তব্য লেখা দুটো প্যাডের পাতা। পুরুষালী চিহ্নে কলঙ্কিত একটা লুঙ্গি আর একটা পাজামা। চারটে অসমাপ্ত লেখার পাণ্ডুলিপি। এক প্যাকেট '৭৭২' তাস। তিনটে বিদেশি নাটকের বই।

এই তালিকার কোথাও কি লুকিয়ে রয়েছে খুনের উদ্দেশ্য বা কৌশলের কোনও ইঙ্গিত, কোনও সূত্র? অশোকচন্দ্র গুপ্ত ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিলেন চিন্তায়। দেবারতি মানিকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন চোখের সামনে। খিলখিল হেসে মেয়েটা বলছিল, 'ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো আর হুনুরি এক ব্যাপার নয়, স্যার। ফর ডিটেকশন ইউ নিড রিয়েল ব্রেইন। হিন্টসগুলো মনে আছে তো!'

মনে আছে। সেগুলো নানানভাবে খতিয়ে দেখেছেন এসিজি, কিন্তু তার মধ্যে খুনির স্পষ্ট পরিচয় বা সেরকম কোনও ইশারা লুকিয়ে নেই।

আরও একটা ব্যাপার ভাবিয়ে তুলেছে তাঁকে : পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট।

হাতের কাগজ দুটো রঘুপতি যাদবকে ফিরিয়ে দিয়ে পি.এম. রিপোর্টের কপিটা দেখতে চাইলেন এসিজি।

খুন হওয়ার আগে মদ খেয়েছিল দেবারতি। তা ছাড়া ওর পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে ঘুমের ওষুধ।

মেয়েটা কি অনিদ্রায় ভুগত? তা হলে ওর ঘর সার্চ করে স্পিIপিং পিলস পাওয়া গেল না কেন?

এসিজির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এক্ষুনি একটা সিগারেট ধরাতে না পারলে তিনি মরে যাবেন। রঘুপতিকে রিপোর্টের কপিটা ফেরত দিয়ে বললেন নীচু গলায়, 'আমি বাইরের বারান্দায় আছি। তুমি কান খাড়া করে শোনো কে কী বলছে। এখন আমাদের কোনও ইনফরমেশন মিস করা চলবে না।'

রঘুপতি বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় নাড়ল। এসিজি বেরিয়ে গেলেন বলরুম ছেড়ে।

বাইরের বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরাতেই দেখতে পেলেন, বলরুমের আর-একটা কাচের দরজা ঠেলে ভাস্কর রাহাও বেরিয়ে আসছেন। উদ্দেশ্য বোধহয় একই : ধূমপান।

এসিজি ভাস্কর রাহাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়লেন।

চুরুট ধরিয়ে খোলা বারান্দায় এসিজির কাছে চলে এলেন ভাস্কর। চারপাশে সোনা-রোদ, নীল আকাশ, হালকা ঠান্ডা বাতাস, টবে সাজানো গাছ। সামনের বড় রাস্তায় বেলা সাড়ে এগারোটার ব্যস্ততা।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে স্মিত হেসে ভাস্কর রাহা সপ্রশ্নে তাকালেন এসিজির দিকে। দেবারতি খুন হওয়ার পর থেকে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁদের কম জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। গতকালও তাঁর প্রশ্নবাণের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি, তার ওপর ঘর তল্লাশি করার নাজেহাল ব্যাপার।

'আজই তো শেষদিন ভাস্করবাবু—,' 'শেষদিন' শব্দটার ওপরে একটু জোর দিয়ে যেন বললেন এসিজি।

ভাস্কর রাহা ঘাড় নাড়লেন নীরবে।

'আপনি কখনও রুবিক কিউব দেখেছেন, ভাস্করবাবু?'

'না—' মাথা নাড়লেন ভাস্কর।

'হাঙ্গেরির এক অধ্যাপক ছাত্রদের গ্রুপ থিয়োরি পড়াতে গিয়ে একটা কিউব তৈরি করেছিলেন ১৯৭৫ সালে। সেই অধ্যাপকের নাম আর্নো রুবিক। এই কিউবে কতকগুলো খুদে-খুদে রঙিন কিউব জুড়ে তৈরি করা হয়েছে একটা বড় কিউব। খুদে কিউবের থাকগুলোকে নানানভাবে ঘুরিয়ে বড় কিউবটার ছ'টা পিঠে নানানরকম নকশা তৈরি করা যায়। ভারি মজার ধাঁধা...।'

ভাস্কর রাহা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না এখন তাঁর কী বলা উচিত। এই বৃদ্ধ গোয়েন্দা হঠাৎই বা তাঁকে রুবিক কিউবের গল্প শোনাচ্ছেন কেন?

এসিজি রুবিক কিউব নিয়ে যেন আপনমনেই নানান কথা বলছিলেন আর সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন ক্রমাগত। তাঁর মাথার ভেতরে খুদে কিউবগুলো বনবন করে ঘুরপাক খেয়ে দেবারতি মানির খুনের নকশা তৈরি করার চেষ্টা করছিল।

'আচ্ছা ভাস্করবাবু, আপনাদের মধ্যে কারা-কারা ড্রিঙ্ক করেন বলতে পারেন?' হঠাৎই জানতে চাইলেন এসিজি।

মজা করে হাসলেন ভাস্কর, বললেন, 'ঠিক বলতে পারব না—তবে অনেকেই এ-রসে অভ্যস্ত। এটা না হলে লেখালিখি ঠিক জমে না...।'

'তার মানে? নেশা না করলে আপনার লিখতে অসুবিধে হয়?'

আবার প্রসন্ন হাসলেন রাহা : 'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা খুব মুশকিল। মানে, আমার লেখার মূল সূত্র হচ্ছে, রহস্যের প্রত্যেকটি টুকরোকে কল্পনার সুতোয় গেঁথে খুশিমতো খেলিয়ে তারপর সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া সাদা কাগজের পৃষ্ঠায়। একটু-আধটু নেশা করলে লাগামছাড়া কল্পনার সুতো খুশিমতো খেলা করতে পারে—অন্তত আমার তাই মনে হয়...।'

'মাই গড!' অবাক হয়ে বলে উঠলেন এসিজি। তাঁর চোখের নজর ভাস্কর রাহার শরীর ভেদ করে যেন চলে গেছে কোন দিগন্তে। কপালে বয়েসের কারুকাজ। বাতাসে সাদা চুল উড়ছে। দূরে পাখি ডাকছে

কোথাও। আর তাঁর মগজের ভেতরে বনবন করে পাক খাওয়া খুদে কিউবগুলো চোখের পলকে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে ফুটিয়ে তুলল রুবিক কিউবের অভিনব এক নকশা—দেবারতি মানির খুনের নকশা।

কী আশ্চর্য! এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এ ক'দিন কী নাজেহালটাই না হয়েছেন অশোকচন্দ্র! এখন তো বলতে গেলে সব জলের মতো স্পষ্ট! ঝাপসা যেটুকু আছে তা অতি সামান্য। রঞ্জন দেবনাথ পরশুদিন ঠিকই বলেছিল : আপনার থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেছে—রিপেয়ার করতে হবে।

'ভাস্করবাবু, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ—' এসিজির গলার স্বর কাঁপছিল।

'কেন?' ভাস্কর রাহা এই বৃদ্ধ হুনুরের আচরণের কোনও থই পাচ্ছিলেন না।

'এখন আমি জানি, দেবারতি মানিকে কে খুন করেছে, কীভাবে খুন করেছে। আজ সন্ধে সাতটার সময় আপনার ঘরে সবাইকে থাকতে বলবেন—।'

'নাটকের শেষ দৃশ্য?' ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলেন রাহা।

'আপনাদের সাহিত্যের ভাষায় হয়তো তাই...' একটু থেমে সিগারেটে টান দিয়ে এসিজি বললেন, 'তবে আমার কাছে পাখি ধরার কাজ। বুঝলেন, দেবারতি মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতী ছিল।'

'কেন?'

'খুব মজার হিন্টস দিয়েছিল। দারুণ!' আপনমনেই হাসতে শুরু করলেন এসিজি।

রঘুপতি যাদব কখন যেন এসে হাজির হয়েছিল খোলা বারান্দায়। অশোকচন্দ্রকে হাসতে দেখে সে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কিঁউ স্যার, কেয়া বাত হ্যায়? কোই খাস বাত হ্যায় কেয়া?'

ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ডান হাত তুললেন এসিজি। হাসতে-হাসতেই বললেন, 'ওহে আমার প্রাক্তন ছাত্র, অতি দুর্লভ প্রজাতির একটি পাখি আজ সন্ধেবেলা তুলে দেব তোমার হাতে...।'

রঘুপতি যাদব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার 'প্রাক্তন স্যার'-এর দিকে।

প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় যেন ধৈর্যচ্যুতির সীমারেখায় পৌঁছে গেছেন প্রত্যেকে। কারণ, ঘড়িতে এখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। ভাস্কর রাহার দুশো আট নম্বর ঘরে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে বা বসে অপেক্ষা করছেন দশজন রহস্য-লেখক। তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস এখন বোধহয় স্বাভাবিক নয়। 'বার্ষিক রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক সম্মেলন' শেষ হয়ে গেলেও এখন হয়তো শুরু হবে তার আসল সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

অনামিকা একটা পালিশ করা কাঠের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। আর মাঝে-মাঝেই নীচু গলায় কথা বলছিল পাশে দাঁড়ানো রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে।

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় বসে ছিলেন বিছানায়। তাঁর পাশে রূপেন মজুমদার আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সোফায় বসে আছেন অধ্যাপক অনিমেষ চৌধুরি, জ্যোতিষ্ক সান্যাল আর অর্জুন দত্ত।

পশ্চিমের খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাস্কর রাহা আর উৎপলেন্দু সেন। বাইরের গাঢ় আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁরা আলতো গলায় কী একটা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘরের বাতাসে সিগারেট আর চুরুটের ভারি গন্ধ। আবহাওয়ায় উৎকণ্ঠার পরত জমতে-জমতে মাখনের মতো পুরু হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে প্রথম নীরবতা ভাঙল রঞ্জন দেবনাথ। শোনা যায় এমন স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'মিস্টার গুপ্তের এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে!'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরজার কাছ থেকে শোনা গেল, 'উনি এসে গেছেন।'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছেন হোটেলের এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার প্রশান্ত রায়। কথাটা বলেছেন তিনিই। তাঁকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঘুপতি যাদব। সঙ্গে দুজন উর্দি পরা কনস্টেবল।

প্রশান্ত রায়ের কপালে ঘামের ফোঁটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে তিনি বললেন, 'মিস্টার গুপ্ত, এখন গোটা ব্যাপারটাই আপনার হাতে।'

হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালেন এসিজি। ঘরের প্রায় মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'একটা সুতো খুঁজতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।'

'সুতো!' অবাক হয়ে বলে উঠেছেন রত্নাবলী।

ওঁর দিকে তাকিয়ে বিনীত হেসে এসিজি বলেছেন, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম, সুতো। মানে, সূত্র—দেবারতি মানির খুনের সূত্র। কারণ, দেবারতির হত্যারহস্য বলতে গেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুতোর ওপরে।' প্রত্যেকটি লেখককে বেশ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন এসিজি। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দেবারতি মানি ছিল সাংবাদিক। ক্রাইম জার্নালিস্ট। রহস্য-সাহিত্যকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসত ও। কী একটা টপ সিক্রেট ও জেনে ফেলেছিল কেমন করে। তাই এই কনফারেন্সে এসে ওকে খুন হতে হল। ব্রুটাল অ্যান্ড ন্যাস্টি মার্ডার। এবং খুনের পদ্ধতি বেশ জটিল এবং অভিনব—জন ডিকসন কারের বইতেও যা নেই।' একটু থেমে তারপর : 'তবে খুনি যে আগে থেকে প্ল্যান করে খুন করেছে তা নয়। বরং হঠাৎই খুনিকে এমন একটা নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর অনেকটা ঘটনাচক্রেই বলা যায়—খুনের পদ্ধতিটা হয়ে যায় ইনজিনিয়াস। ঠিক রূপেন মজুমদারের ''ডাকিনীর হাতছানি''-র মতো।'

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে শব্দ করে টান দিলেন অশোকচন্দ্র। তারপর বললেন, 'দেবারতির টপ সিক্রেট জেনে ফেলার ব্যাপারটা মোটেই গোপন ছিল না, বরং সকলেই জেনে গিয়েছিলেন—এমনকী খুনিও। সম্পাদক প্রেমময় চৌধুরির উসকানিতে দেবারতি সকলের সামনেই একটু হিন্টস দিয়েছিল : পাঁচকড়ি দে এবং এডগার ওয়ালেস। আমি অনেক বইপত্তর ঘেঁটে মাত্র একটাই মিল পেয়েছি এই দুজন লেখকের মধ্যে। সমালোচকরা সন্দেহ করেন, এই দুজন লেখকেরই গোস্ট রাইটার বা ছায়ালেখক ছিল। অর্থাৎ, ওঁদের নামে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলোই প্রকৃতপক্ষে অন্য কেউ ওঁদের হয়ে লিখে দিয়েছেন।'

'ছায়ালেখক!' ভাস্কর রাহা অবাক হয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়েছেন।

'কিন্তু অন্যের নামে লিখে সেই ছায়ালেখকের লাভ কী?' প্রশ্ন করেছেন জ্যোতিষ্ক সান্যাল।

'উত্তর অতি সহজ। টাকার জন্যে ছায়ালেখকেরা হয়তো বেনামে বই লিখতে রাজি হয়েছিলেন।' অশোকচন্দ্র সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আবার শুরু করলেন, 'পাঁচকড়ি দে-র প্রধান ছায়ালেখক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ পাল—পাঁচকড়ি দে-র বইয়ের প্রকাশক ''পাল ব্রাদার্স''-এর একজন স্বত্বাধিকারী। আর এডগার ওয়ালেস এত উর্বর-লেখনীর মালিক ছিলেন যে, এক-একসময় বছরে পাঁচটা, সাতটা, আটটা কিংবা ন'টা পর্যন্ত বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই অনর্গল লেখার স্রোত দেখে অনেকে মনে করতেন—বা বলা ভালো, এখনও সন্দেহ করেন—তাঁর অনেক গুপ্তলেখক বা ছায়ালেখক ছিল। বুঝতেই পারছেন, সমালোচকরা শুধু সন্দেহই করতে পেরেছেন, প্রমাণ করতে পারেননি। কারণ, এই ধরনের ব্যাপার কখনও প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

'সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবারতি যদি ঠাট্টা না করে থাকে তা হলে বোধহয় ও গোস্ট রাইটারের কথাই বলতে চাইছিল। অর্থাৎ, এই সম্মেলনে—মানে, এখন এই ঘরে—এমন একজন লেখক হাজির রয়েছেন যিনি ছায়ালেখক ব্যবহার করে একের পর এক বই প্রকাশ করে চলেছেন এবং রহস্য-সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছেন—।'

'আজকের যুগে কি এই ছায়ালেখকের ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়, মিস্টার গুপ্ত?' রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় জিগ্যেস করেছেন এসিজিকে।

এসিজি হেসে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, ম্যাডাম। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলেই সেই সিক্রেট জানাজানি হলে সেটা নিউজপেপারের হেডলাইন হয়ে যেত। তখন আপনার তো সুইসাইড করা ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। বলুন, ভুল বলেছি?'

রত্নাবলীর মুখের রক্ত ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ শুষে নিল পলকে। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটা কান্নার মতো দেখাল। শাড়ির আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। এপাশ-ওপাশ কয়েকবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিলেন। ওঁর শরীরটা একটু-একটু কাঁপছিল।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়িয়েছেন ভাস্কর রাহা। তাঁর দু-চোখে বিস্ময়। কোনওরকমে বলতে গেলেন, 'মিস্টার গুপ্ত, বোধহয় কোথাও একটা...,' কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাংলা রহস্য-সাহিত্যের সম্রাজ্ঞীর দিকে। সৌম্য, স্নিগ্ধ, শান্ত। অথচ শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবেও খুন করার ক্ষমতা রাখেন।

'কিন্তু এসব কী বলছেন আপনি!' এসিজিকে লক্ষ্য করে বলে উঠেছে অনামিকা সেনগুপ্ত, 'রত্নাদির হয়ে কে বই লিখে দেয়? কে সেই গোস্ট রাইটার?'

হাত তুলে অনামিকাকে আশ্বাস দিলেন এসিজি, বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরো, মা-মণি, সব বলছি।'

'মাপ করবেন, মিসেস মুখার্জি—মাপ করবেন, ভাস্করবাবু। আপনাদের দক্ষ গোয়েন্দা করঞ্জাক্ষ রুদ্র বা সুরজিৎ সেনের মতো গুছিয়ে নাটকীয়ভাবে হয়তো এই শেষ দৃশ্য আমি জমাতে পারব না, তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই। আমি আগেই তো আপনাদের বলেছি, চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া ছুঁচলো গোঁফও আমার নেই। মানে, আপনাদের কাহিনির গোয়েন্দাদের মতো সর্ববিষয়ে বিশারদ আমি নই—তবে আমি কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। আমার হুনুরি খুব সাদামাঠা, সহজ-সরল।'

ঘরে গুঞ্জন চলছিল। প্রায় সকলেই বিধ্বস্ত রত্নাবলীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

শুধু রঘুপতি যাদব চোয়াল শক্ত করে ঘরের এককোণে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

'প্রথমে বলি লকড রুম প্রবলেমের সলিউশনের কথা। মানে, কী করে খুন হয়েছিল দেবারতি মানি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্যে আমি আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম—এবং আপনাদের অনেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আপনাদের কথাবার্তা থেকেই বন্ধ ঘরের রহস্যের আসল উত্তর খুঁজে পেয়েছি আমি। তবে সেই রহস্য ফাঁস করার আগে উৎপলেন্দুবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই—' এসিজি ঘুরে তাকালেন উৎপলেন্দু সেনের দিকে : 'মিস্টার সেন, খুব ভেবে একটা কথা বলুন তো। খুনের দিন রাত এগারোটা নাগাদ আপনি যখন তিনশো আট নম্বর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেবারতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন ওর গলার স্বর নিয়ে আপনার কোনওরকম সন্দেহ হয়নি? মনে হয়নি, দেবারতির বদলে অন্য কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলছে?'

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর উৎপলেন্দু জবাব দিলেন, 'না, সন্দেহ হয়নি। তবে গলাটা একটু জড়ানো মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, আমিও তো নেশা করে ছিলাম...।'

রত্নাবলী এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছেন। শুকনো হেসে বললেন, 'সন্দেহ হওয়ার কথা নয়, মিস্টার গুপ্ত। আমার গলা শুনে বয়েস বোঝা যায় না। তা ছাড়া একটু জড়িয়ে কথা বলেছিলাম।' একটু ইতস্তত করে আবার বললেন, 'তখন উৎপলেন্দুবাবুর কথার জবাবও দিয়েছি আন্দাজে। কারণ তখন তো আর ''পরীক্ষা'' বলতে কিসের পরীক্ষা বুঝিনি...।'

এই কথাবার্তায় ঘরের সকলেই বেশ অবাক হয়েছেন। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় কেন দেবারতি মানির ঘরে এসে ওকে নকল করে অভিনয় করার চেষ্টা করবেন, এই ব্যাপারটা অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়নি।

অশোকচন্দ্র ফুরিয়ে আসা সিগারেট দিয়ে নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। তাতে কয়েকবার টান দিলেন। সিগারেটের ডগায় অগ্নিবিন্দু দপদপ করে উঠল তালে-তালে। গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি বলে উঠলেন, 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে আমি আন্দাজ করলাম, উৎপলেন্দুবাবু দেবারতির সঙ্গে কথা বলেননি—কথা বলেছেন অন্য কারও সঙ্গে, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।' গালে কয়েকবার হাত বুলিয়ে নিলেন এসিজি : 'এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে অনামিকা। উৎপলেন্দুবাবু চলে যাওয়ার পাঁচ-সাত মিনিট পরেই ও

দেবারতির ঘরের দরজার চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ঘরে কাউকে দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি, কারণ ঘরে সত্যিই তখন কেউ ছিল না। উৎপলেন্দুবাবু দরজার কাছ থেকে সরে যাওয়ার পরই রত্নাবলীদেবী বেরিয়ে আসেন দেবারতির ঘর থেকে। দরজা বন্ধ করে সেটা বাইরে থেকে লক করে চটপট রওনা হয়ে যান পাঁচতলায় নিজের ঘরের দিকে। তার দু-চার মিনিট পরেই অনামিকা এসেছিল দেবারতিকে ডাকতে, এবং স্বাভাবিক কারণেই ও ঘরে কাউকে দেখতে পায়নি।'

রূপেন মজুমদার অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু দেবারতি তখন কোথায়? ও কি তখন খুন হয়ে গেছে?'

হাসলেন এসিজি : 'না, খুন হয়নি। ও তখন—সম্ভবত মদের সঙ্গে মেশানো—ঘুমের ওষুধ খেয়ে মিসেস মুখোপাধ্যায়ের ঘরে খুন হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'রত্নাদি দেবারতি মানির ঘরে এসেছিলেন কী করতে?' অনামিকা।

'উনি দেখতে এসেছিলেন, দেবারতির ঘরের পশ্চিমদিকের—মানে, টেরাসের দিকের জানলাটা খোলা আছে কি না। অর্থাৎ জানলাটা খোলা থাকাটা তাঁর প্ল্যানের পক্ষে খুব জরুরি ছিল। যাতে সবাই ভাবে, দেবারতি ওর ঘরেরই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছে।'

অনেকের মুখেই হতবুদ্ধি ভাব। শুধু রঞ্জন দেবনাথ নির্বিকার। আর অনিমেষ চৌধুরি।

স্মিত হাসলেন এসিজি। রত্নাবলীর দিকে একপলক তাকিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আমার যদি কোথাও ভুল হয় তা হলে দয়া করে শুধরে দেবেন।' তারপর অধ্যাপকের দিকে ফিরে : 'দেবারতি ভাস্করবাবুর গাড়ির ওপরে পড়েছে রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের পাঁচতলার ঘরের পশ্চিমের জানলা দিয়ে, চারতলা থেকে নয়। গালিলেও আর নিউটনের সূত্রের সাহায্য নিয়ে, ভাস্করবাবুর গাড়ির আঘাতের পরিমাণ মাপজোখ করে, মাধ্যাকর্ষণের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে হয়তো সহজেই বোঝা যেত, দেবারতি হোটেলের পাঁচতলা থেকে নীচে পড়েছে—চারতলা থেকে নয়। কিন্তু যেহেতু এসব মাপজোখ বা পরীক্ষা আমরা করে দেখতে পারিনি, তাই ব্যাপারটা বুঝতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।' বাঁ হাতে মাথার পাকা চুলের গোছায় টান মারলেন অশোকচন্দ্র। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনামিকা যখন দেবারতির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকাডাকি করছে, তখন, ঠিক তার ওপরের ঘরে, রত্নাবলী ভীষণ পরিশ্রমের কাজ করছেন : প্রায় অচেতন দেবারতিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছেন জানলার কাছে। অচেতন কেন? এর উত্তর খুব সহজ —সচেতন থাকলে রত্নাবলীর পক্ষে ওকে কায়দা করা সম্ভব হত না।

'হোটেলের বেয়ারাদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে আমরা আপনাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা করে টাইম-চার্ট তৈরি করেছি। সেই চার্ট অনুযায়ী দেবারতি মানিকে রাত সওয়া দশটা নাগাদ রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ঘরে ঢুকতে দেখা গেছে। আর-একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন হল, রাত দশটা নাগাদ রুম সার্ভিসকে ফোন করে মিসেস মুখার্জি হুইস্কির একটা ছোট বোতল আনিয়েছিলেন। অর্ধেকের বেশি খালি বোতলটা পাওয়া গেছে তাঁর ঘরে। কিন্তু আমরা যতদূর খোঁজখবর নিয়েছি তাতে উনি ড্রিঙ্ক করতে অভ্যস্ত এ-কথা কেউ বলেননি। তা হলে তিনি হুইস্কি আনিয়েছিলেন কার জন্যে? দেবারতি মানির জন্যে। অর্থাৎ, সেই মুহূর্ত থেকেই খুনের পরিকল্পনা বাসা বেঁধেছে রত্নাবলীর মনে। তবে দেবারতিকে তিনি ঠিক কোন অজুহাতে ঘরে ডেকেছিলেন তা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, সেই হুইস্কিতেই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে যেভাবেই হোক সেটা দেবারতিকে খাইয়ে দিয়েছিলেন রত্নাবলী। তারপর অচেতন দেবারতিকে ঘরে বন্ধ করে রেখে তিনি ওর ঘরে গিয়েছিলেন জানলাটা খুলতে—।'

উৎপলেন্দু সেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার ডাকাডাকিতে দেবারতির ঘর থেকে রত্নাবলী সাড়া দিলেন কেন?'

উৎপলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এসিজি : 'সাড়া না দিয়ে ওঁর উপায় ছিল না। কারণ, আপনি যদি দেবারতির সাড়া না পেয়ে নেশার ঝোঁকে শোরগোল শুরু করে দিতেন তা হলে রত্নাবলীর সব পরিকল্পনাই

বানচাল হয়ে যেত। অচেতন দেবারতি মানিকে খুঁজে পাওয়া যেত ওঁর ঘরে, আর তারপর, প্রথম সুযোগেই দেবারতি ওঁর লেখালিখির সব রহস্য নিষ্ঠুরভাবে ফাঁস করে দিত।'

টুকরো-টুকরো সব ছবিগুলো এক অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পরপর জুড়ে নিচ্ছিলেন ভাস্কর রাহা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ই সেই বিশ্বাসঘাতক—যাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল দেবারতি।

ভাস্কর রাহা টের পাচ্ছিলেন, চুরুটের প্রিয় স্বাদ কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে তাঁর মুখে।

অনিমেষ চৌধুরি শব্দ করে পান চিবোচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই অতি সাবধানে মুখ নেড়ে বললেন, 'কিন্তু চাবি? চাবিটা বন্ধ ফ্ল্যাটের টেবিলের ওপরে গেল কী করে?'

এসিজি মাথা নাড়লেন, চুল টানলেন কয়েকবার। তারপর যেন আপনমনেই বললেন, 'হুম...চাবি...লকড রুম প্রবলেম।' মুখ তুলে একে-একে দেখলেন সবাইকে : 'এ-ব্যাপারে আপনাদের অনেকের সাহায্যই আমি পেয়েছি। তবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন ভাস্করবাবু। কারণ দেবারতির খুনের বেলায় খুনি বেরিয়ে গেছে দরজা দিয়েই, তবে চাবিটা ওর ঘরে ঢুকেছিল জানলা দিয়ে। ভাস্করবাবু বলেছিলেন, খুনি টেরাস থেকে চারতলার ঘরের জানলা দিয়ে ছুড়ে দিয়েছিল চাবিটা। আসলে চাবিটা জানলা দিয়ে ঢুকলেও সেটা নীচ থেকে আসেনি—এসেছে ওপর থেকে।

'এলোমেলো গল্পটা এবারে খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে নেওয়া যাক। যেভাবেই হোক দেবারতি মানি জেনে ফেলেছিল রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় একজন ছায়ালেখক ব্যবহার করে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছেন। এতে দেবারতি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—কারণ সত্যি-সত্যিই ও রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ভাস্করবাবুর কাছেই শুনেছি, কনফারেন্সের প্রথম দিনে রত্নাবলীর গল্পপাঠের সময় ও কীরকমভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিল। আপনারা হয়তো সেটা প্রশংসা ভেবেছেন, কিন্তু আমার শুনে মনে হয়েছে, সেটা তীব্র ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, দেবারতি—স্পষ্টভাষী। বেপরোয়া দেবারতি তখন ভেতরে-ভেতরে জ্বলছিল। আমার ধারণা, দেবারতি যখন রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ইন্টারভিউ নেয় তখন এ-নিয়ে কথা তোলে, হিন্টস দেয়, হয়তো ওর স্বভাব অনুযায়ী আক্রমণও করে। ঠিক কী হয়েছিল তা এখন একমাত্র রত্নাবলীই বলতে পারবেন।'

'দেবারতি হুমকি দিয়ে শাসিয়ে চলে যাওয়ার পর রত্নাবলী বোধহয় দুশ্চিন্তায় পড়েন। তারপর, একটা প্ল্যান ছকে নিয়ে, সেদিনই রাত দশটা নাগাদ দেবারতিকে আবার নিজের ঘরে ডাকেন। অর্থাৎ, সমঝোতা ইত্যাদির নাম করে মেয়েটাকে ফাঁদে ফেলেন। তারপর স্লিপিং পিল মেশানো হুইস্কি খাইয়ে ওকে অজ্ঞান করে দেন। দেবারতির সঙ্গে বোধহয় কোনও ব্যাগ ছিল—আর ব্যাগেই ছিল ওর ঘরের চাবি। রত্নাবলী ওর ব্যাগটা নিয়ে নিজের ঘর বন্ধ করে চলে আসেন দেবারতির ঘরে। চাবি দিয়ে দরজা খুলতে কোনও অসুবিধে হয়নি ওঁর। তারপর পশ্চিমের বড় জানলাটা খোলার ব্যবস্থা করে গোল টেবিলটাকে সরিয়ে নিয়ে যান জানলার কাছে। টেবিলের কাগজপত্র ঘেঁটে দেবারতির অসমাপ্ত লেখাটা দেখতে পান। আর ঠিক সেই সময়েই হয়তো উৎপলেন্দু সেন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে ডাকাডাকি শুরু করেন ঘরের দরজায়।

'রত্নাবলীর তখনকার মনের অবস্থাটা আপনারা সকলে একবার ভেবে দেখুন। ওপরের তলায় ওঁর ঘরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে এক দুর্বিনীত জার্নালিস্ট—যে সুযোগ পেলেই সারা দুনিয়াকে রহস্য-সম্রাজ্ঞীর রহস্য জানিয়ে দেবে। চুরমার করে দেবে ওঁর মান-সম্মান, তছনছ করে দেবে ওঁর এতদিনের সাজানো বাগান। অর্থাৎ, রত্নাবলী ধ্বংস হয়ে যাবেন...চিরকালের জন্যে। সুতরাং বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন রত্নাবলী। একজন বয়স্ক গৃহবধূ শুধুমাত্র নিজের, নিজের পরিবারের, সামাজিক সম্মান আর প্রতিষ্ঠা অকলঙ্ক রাখার জন্যে কী করুণভাবে হিংস্র হয়ে উঠলেন! করুণ বলছি এই কারণে যে, ওঁর সেই অবস্থার কথা ভাবলে করুণা ছাড়া আর কোনও শব্দ মনে আসে না।

'যাই হোক...উৎপলেন্দুবাবুকে সামাল দিয়ে রত্নাবলী দেবারতির লেখাটার শেষ দুটো লাইন কেটে দেন ওরই পেন দিয়ে। আমার ধারণা, ওই দুটো লাইনের কোথাও হয়তো রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের কীর্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু লেখাটা একেবারে লোপাট করতে ভরসা পাননি তিনি। কারণ, দেবারতি হয়তো পরিচিত অনেককেই বলে রেখেছে যে, ও একটা লেখা লিখছে। লেখাটা হয়তো ও কনফারেন্সের শেষ দিনে—মানে, আজ—পড়ার মতলব করেছিল। সুতরাং সেই লেখা যদি ওর ঘর থেকে খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে মুশকিল হতে পারে। আবার ওই লেখা অর্ধেকটা লিখে কেউ যে আচমকা আত্মহত্যা করতে পারে না, সেটাও তো ঠিক। তাহলে? সেই মুহূর্তে বিপর্যস্ত রত্নাবলী কী করবেন বুঝে উঠতে পারেননি। ওঁর তখন উদভ্রান্ত অবস্থা। তাই আধখোলা ''দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড'' নিয়েও তিনি কিছু ভেবে ওঠার সুযোগ পাননি...।'

একটু হাসলেন এসিজি। কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'তা ছাড়া খুনি একটু-আধটু ভুল না করলে আমাদেরই বা চলে কী করে!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম...দেবারতি মানির ব্যাগটা বিছানার ওপরে রেখে দিয়ে চাবিটা নিয়ে তিনশো আট নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রত্নাবলী। ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে সোজা চলে যান নিজের ঘরে। অজ্ঞান দেবারতিকে টেনেহিঁচড়ে অতিকষ্টে নিয়ে যান জানলার কাছে। তারপর ওকে জানলা দিয়ে ফেলে দেন সোজা নীচে—ভাস্করবাবুর গাড়ির ছাদে।

'রত্নাবলী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ওঁর বিশ্রাম নেওয়ার সময় ছিল না। কারণ, আরও একটা জরুরি কাজ তখনও বাকি। সেটা হল : দেবারতির ঘরের চাবিটা ওর ঘরে পাঠানো। সুতরাং, তাড়াতাড়ি একটা লম্বা সুতো নিয়ে ছুঁচে সুতো পরানোর মতো দেবারতির চাবির রিঙে পরিয়ে দিলেন রত্নাবলী। সুতোর দুটো মাথা এক করে—মানে, ঠিক যেভাবে রঞ্জন দেবনাথ খুনির দড়ি বেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি আমাদের শুনিয়েছিলেন—চাবির রিংটাকে জানলা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন বাইরে। তারপর সেটাকে সামনে পেছনে দোল খাইয়ে কিছুক্ষণের চেষ্টায় চাবিটাকে দেবারতির জানলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন ঘরের ভেতরে। রত্নাবলীর প্ল্যানমাফিক চাবিটা গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরে, তবে মেঝেতে পড়লেও কোনও ক্ষতি ছিল না। এইবার সুতোর একটা মাথা ছেড়ে দিয়ে অন্য মাথাটা ধীরে-ধীরে টানতে শুরু করলেন তিনি। একসময় লম্বা সুতোটা চলে এল ওঁর হাতে, আর চাবিটা পড়ে রইল ভেতর থেকে লক করা ঘরের মধ্যে : জন্ম নিল ''বন্ধ ঘরের রহস্য।'' সব কাজ শেষ হওয়ার পর রত্নাবলী ধকল কাটাতে দু-এক ঢোঁক হুইস্কি হয়তো খেয়েও থাকতে পারেন—ঠিক বলতে পারব না।'

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে কয়েকবার কাশলেন এসিজি। তারপর বললেন, 'আজ সকালে তাঁর লেখালিখি নিয়ে ভাস্করবাবু আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে একটা কথা ছিল অনেকটা এইরকম :...রহস্যের প্রত্যেকটি টুকরোকে কল্পনার সুতোয় গেঁথে খুশিমতো খেলিয়ে...ইত্যাদি-ইত্যাদি। এই কথাটা শুনেই আমার বিগড়ে যাওয়া থিঙ্কিং মেশিন মুহূর্তে ঠিকঠাক হয়ে যায়। চাবি জানলা দিয়ে ঢোকানোর রহস্যটা পলকে ফাঁস হয়ে যায় আমার কাছে। এ-জন্যে ভাস্করবাবুর কাছে আমি ঋণী।'

ভাস্কর রাহার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকালেন এসিজি।

উত্তরে ভাস্কর ছোট্ট করে হাসলেন।

'আশা করি আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব আপনারা পেয়ে গেছেন?' এসিজি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সকলের জন্য।

উত্তরে উৎপলেন্দু বললেন, 'না, একটা প্রশ্নের জবাব পাইনি। কে সেই ছায়ালেখক? আমাদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয়ই?'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত রত্নাবলীর দিকে তাকালেন। নীচু গলায় বিড়বিড় করে বললেন, 'জানি না। একমাত্র মিসেস মুখার্জিই বলতে পারেন।'

রত্নাবলী মুখে আঁচল গুঁজে মাথা নীচু করে বসেছিলেন। ওঁর শরীরটা সামান্য কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মুছে কয়েকবার নাক টেনে মুখ তুললেন তিনি। চোখ লাল, চোখের কোল ফোলা। সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা।

চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে মাথা সামান্য হেলিয়ে ভাঙা গলায় কথা বললেন তিনি, 'এগারো বছর ধরে আমার সব লেখা রঞ্জন লিখে দিয়েছে। যেসব বইয়ের জন্যে আমার এত নামডাক সেগুলো সব রঞ্জনের লেখা...শুধু বইগুলোর টাইটেল পেজে আমার নাম ছাপা আছে।'

সবাই অবাক হয়ে তাকালেন রঞ্জন দেবনাথের দিকে। যা শুনছেন ঠিক শুনছেন তো! কিন্তু রঞ্জন দেবনাথ নির্বাক নির্বিকার।

দু-একবার ঢোঁক গিলে রত্নাবলী আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমার লেখা ও প্রথম দিকে কারেকশান করে দিত। তারপর এক-একসময় গোটা লেখাটাই রিরাইট করে দিত। সেগুলো আমি আবার নিজের হাতে কপি করে ছাপতে দিতাম। প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা অনেকটা খেলা বা মজার মতো ছিল। কিন্তু যেই আমার বইয়ের বিক্রি বাড়তে লাগল তখন সেটা আর নিছক খেলা রইল না। রঞ্জনের দু-একটা বই ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো একদম বিক্রি হত না। ওর তখন ফ্যামিলি বারডেন অনেক—খুব টাকার দরকার। তাই আমিই একদিন ওকে বললাম, ''তুমি লেখো—আর সেগুলো আমার নামে ছেপে বেরোক, তা হলে টাকা আসবে। যা পাব, তুমি অর্ধেক নেবে, আর বাকিটা আমি। অবশ্য যদি চাও সবটাই নিতে পারো। তোমাকে দিতে মন চায় না এমন কিছু তো আমার নেই...।''

শব্দ করে কেঁদে উঠলেন রত্নাবলী। কাঁদতে-কাঁদতেই বললেন, 'আর তো লুকিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। রঞ্জনকে...রঞ্জনকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। এখনও ভালোবাসি। ওর মতো বন্ধু হয় না। আমার জন্যে ও কম স্যাক্রিফাইস করেনি। আমার যে-উপন্যাসটা রবীন্দ্র পুরস্কারের ফাইনাল রাউন্ডে গিয়েছিল সেটাও ওর লেখা। আমার যে-বই ইংরিজিতে বেরিয়েছে সেটারও আসল মালিক রঞ্জন। সত্যি, কত যশ আর খ্যাতি থেকে বেচারা বঞ্চিত হয়েছে! আর আমি? এগারো বছর ধরে অন্যের খ্যাতি নিজের নামে যোগ করে-করে সেটা আমার হকের দাবি বলে ভাবতে শুরু করেছি। সিংহাসনে একবার বসতে পারলে কে আর সহজে নেমে আসতে চায় বলুন! আমারও ঠিক সেই দশা হয়েছিল।

'তারপর...তারপর...বছর দুয়েক ধরে রঞ্জন নানান অজুহাতে আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। নিজের নামে লিখতে শুরু করল আবার। আমার তখন কী দুরবস্থা একবার ভাবুন! সবাই লেখা চায়, কিন্তু আমার মাথায় যুতসই কোনও আইডিয়া আসে না। নিজের সঙ্গে সে যে কী কঠিন লড়াই! স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, রূপ-যৌবন-খ্যাতি সবই একে-একে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখন শুধু অপেক্ষা। এরকমই একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে এল এই কনফারেন্স। তারপর...' দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন রত্নাবলী।

'কিন্তু গোস্ট রাইটারের ব্যাপারটা তো প্রমাণ করা খুব শক্ত। পাঁচকড়ি দে কিংবা এডগার ওয়ালেসের ব্যাপারটা কেউ প্রমাণ করতে পারেননি।' অশোকচন্দ্র মন্তব্য করেছেন রত্নাবলীকে লক্ষ করে।

কোনওরকমে কান্না চাপা দিয়ে রত্নাবলী ভাঙা স্বরে বললেন, 'আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু রঞ্জন একদিন আমাকে কতকগুলো অডিয়ো ক্যাসেট শুনতে দিয়েছিল...আর, কারেকশন করা রিরাইট করা আট-দশটা ম্যানুস্ক্রিপট দেখিয়েছিল। অডিয়ো ক্যাসেটে আমাদের অনেক অন্তরঙ্গ কথা ধরা ছিল। ওগুলো দেখার পর, শোনার পর আর কোনও যুক্তি টেকে না—একেবারে অকাট্য প্রমাণ।'

আবার চোখ মুছলেন রত্নাবলী : 'আশ্চর্য! কীভাবে ''রত্না'' থেকে আমি হঠাৎ ''মিসেস মুখার্জি'' হয়ে গেলাম রঞ্জনের কাছে! শেষটা এত কষ্টের হবে ভাবিনি। আপনারা...আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যাই, মিস্টার গুপ্ত...মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে...ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হবে। বড় ক্লান্ত লাগছে।'

খুব ধীরে পা ফেলে রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন ঘর থেকে। রঘুপতি যাদব নড়েচড়ে উঠেছিল, কিন্তু এসিজি তাকে হাতের ইশারায় থামালেন। রত্নাবলীর ইঙ্গিত তিনি ধরতে পেরেছেন। বিদায় যদি সত্যিই ওঁকে

নিতে হয় তা হলে সম্রাজ্ঞীর মতো বিদায় নেওয়াই ভালো।

উঠে দাঁড়ালেন এসিজি। ভাস্কর রাহাকে লক্ষ করে বললেন, 'চলি ভাস্করবাবু, পরে কখনও আবার দেখা হবে। আর একটা কথা : রঘুপতি যাদবের ফাইলে কিন্তু দেবারতি মানির ব্যাপারটা সুইসাইড বলেই লেখা হবে। আশা করি তাতে আপনাদের কোনও আপত্তি হবে না।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

তারপর প্রশান্ত রায় এসে দাঁড়ালেন এসিজির কাছে। ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু মিস্টার গুপ্ত, দেবারতি মানি ওই সিক্রেট ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল কেমন করে?'

তেতো হাসলেন এসিজি। বললেন, 'সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। রঞ্জন দেবনাথই খবরটা দিয়েছিলেন দেবারতিকে। কারণ তিনি জানতেন, দেবারতি ব্যাপারটা জানার পর পরিণতি কী হবে।'

অশোকচন্দ্র এগিয়ে গেলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রঞ্জনের কাছে। ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আর আপনার কোনও চিন্তা নেই। পথ পরিষ্কার। নাম-ডাক কিংবা টাকা পেতে কাল থেকে আপনার আর কোনও অসুবিধে হবে না।'

পাশেই দাঁড়ানো অনামিকার দিকে তাকালেন এসিজি : 'মা-মণি, তুমি আমার মেয়ের মতো। একটা কথা তোমাকে বলি। এই সর্বনাশা লোকটার খপ্পরে তুমি পোড়ো না। এই লোকটা রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়কে শেষ করেছে, দেবারতি মানিকে শেষ করেছে—এরপর কার পালা কে জানে! আইনের খাতায় এদের শায়েস্তা করার কোনও ব্যবস্থা নেই। কারণ, কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। তাই তোমাকে সাবধান করলাম।'

সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

হাতের ফাইল নামিয়ে রেখে ভারি পায়ে রঞ্জন দেবনাথের সামনে এসে দাঁড়াল রঘুপতি। তারপর ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে বিরাশি সিক্কার এক চড় কষিয়ে দিল রঞ্জনের বাঁ-গালে।

রঞ্জনের মুখটা এক ঝটকায় ঘুরে গেল। ও চিৎকার করে গালাগালি দিল রঘুপতিকে।

রঘুপতি যাদব চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'রাইটার রঞ্জনকো গুসসা কিঁউ আতা হ্যায়?' এবং সঙ্গে-সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে। তারপর টান মেরে ওকে পেড়ে ফেলল মেঝেতে।

'কী হচ্ছে, রঘুপতি!' এসিজি চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! ইউ আর ব্রেকিং দ্য ল!'

রঘুপতি তখন মেঝেতে পড়ে যাওয়া রঞ্জন দেবনাথকে যথেচ্ছ লাথি মারছিল। রঞ্জনের গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল বারবার।

একসময় মারধোর থামিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে রঘুপতি বলল, 'একটু-আধটু ব্রেক না করলে সে আবার কিসের কানুন, স্যার। আর তো চান্স পাব না, তাই এখনই এই কামিনাকে থোড়াসা সবক শিখিয়ে দিলাম।'

অশোকচন্দ্র হাত ধরে টেনে নিলেন রঘুপতিকে। তারপর হাঁটা দিলেন দরজার দিকে। কনস্টেবল দুজনও ওঁদের অনুসরণ করল।

করিডর ধরে ওঁরা প্রায় লিফটের দরজার কাছে চলে এসেছেন, এমন সময় পিছন থেকে ডেকে উঠেছেন রূপেন মজুমদার। ওঁরা থামতেই রূপেন দ্রুত পা ফেলে কাছে চলে এসেছেন। ওঁর হাতে দুটো বই—সেই 'ডাকিনীর হাতছানি'।

একটা করে বই রঘুপতি যাদব আর অশোকচন্দ্র গুপ্তকে দিয়ে রূপেন মজুমদার হেসে বললেন, 'পড়ে দেখবেন, একেবারে ওরিজিন্যাল। অন্য রাইটারদের মতো ''সাহেব বলিয়াছেন'' এরকম কোনও ব্যাপার নেই।'

বই হাতে নিয়ে লিফটে করে নামতে-নামতে এসিজি ভাবলেন, মানুষ সত্যি কতরকম হয়! মানুষ তাঁকে সবসময়ই অবাক করে—রংবেরঙের পাখির মতো।

রঘুপতি যাদব হাতঘড়িতে চোখ রাখল : রাত দশটা বেজে গেছে।


AKASH
AIRLINES